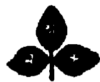
শরদিন্দু অম্নিবাস

শরদিন্দু অম্‌নিবাস

অষ্টম খণ্ড

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬২

নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে শরদিন্দু অম্‌নিবাস নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিশোরদের জন্য লেখা গল্প এবং লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির সমুদয় ছোট গল্প যথাক্রমে শরদিন্দু অম্‌নিবাস প্রথম—সপ্তম খণ্ডে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

অষ্টম খণ্ডে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি গ্রন্থ সঙ্কলিত হল—বিষের ধোঁয়া ও ছায়াপথিক (উপন্যাস), ডিটেকটিভ (নাটক), এবং পথ বেঁধে দিল ও যুগে যুগে (চিত্রনাট্য)। সবগুলিই সামাজিক কাহিনী।

সূচী



বিষের ধোঁয়া

তীর্থনাথ ও কিশোরের মধ্যে সম্বন্ধটা ঠিক যে বন্ধুত্ব ছিল, তাহা বলা চলে না। তবে কলেজ-হস্টেলের একই ঘরে থাকিয়া এবং একসঙ্গে সর্বদা ওঠা-বসা করিয়া দুইজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে যতদূর ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছিল।

তীর্থনাথ কিশোর অপেক্ষা বয়সে বছর চারেকের বড় ছিল। তাহার স্বভাবটা ছিল অত্যন্ত মৃদু, নির্বিরোধ। কলেজে কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সে কোথাও বাহির হইত না, নিজের ঘরটিতে শান্তভাবে বসিয়া বই পড়িত এবং চুরুট টানিত। কিশোরের চরিত্র ছিল ঠিক তাহার বিপরীত। সারা বছর পড়াশুনা করিত না, কিন্তু পরীক্ষা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িলে ঘরে খিল দিয়া কয়েক দিন এমন পড়াই পড়িত যে বেশ ভাল করিয়া পাস করিয়া যাইত। অপর দিকে ফুটবল-হকি-ক্রিকেটের হুজুগে সে সর্বদাই মাতিয়া থাকিত, সভা-সমিতির হৈ-চৈ ব্যাপারেও সে ছিল একজন বড় পাণ্ডা। থিয়েটার জিনিসটা সে সহ্য করিতে পারিত না,—সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া থাকা তাহার পোষাইত না, —কিন্তু বায়োস্কোপ দেখিয়া সে খেদ মিটাইয়া লইত।

দু'জনের চেহারাও ভগবান বিপরীত করিয়া গড়িয়াছিলেন। তীর্থনাথ বেঁটে ও কৃশ, মস্ত বড় মাথাটি বহন করিয়া ঘাড়টি যেন অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, চোখে মোটা কাচের চশমা। আর কিশোর ছ' ফুট লম্বা, দোহারা, অসাধারণ বলবান, গৌরবর্ণ এবং সুশ্রী, কাচের চশমা পরিয়া তাহার চোখের সহজ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে কোনও দিনই তীক্ষ্ণতর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। আবার অর্থের দিক দিয়াও তীর্থনাথের ছিল অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, জলপানির টাকায় কোনও মতে পড়ার খরচ চালাইত। কিশোরের ধনী বাপ জীবিত ছিলেন; কিশোরের মাতার মৃত্যুর পর প্রৌঢ়বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া নতুন সংসার পাতিয়াছিলেন বটে এবং প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তানের প্রতি স্নেহের বন্ধন কিছু আলগা হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু কিশোরের প্রয়োজনমত টাকা পাঠাইতে তিনি কোনও দিন কৃপণতা করেন নাই। কলেজের ছুটি হইলে কিশোর বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া বাড়ি যাইত, কিন্তু সেখানে ছোট বৈমাত্র ভাই-বোন ও প্রায় সমবয়স্কা বিমাতার সংসর্গে তাহার মন টিকিত না। ছুটি ফুরাইবার পূর্বেই একটা ছুতা করিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিত। তীর্থনাথের দেশ একটা ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি বলিতে কিছুই ছিল না, কাজেই সে ছুটির সময়েও হস্টেলে পড়িয়া থাকিত।

সন্ধ্যার পর কিশোর যখন অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ কিংবা শরৎবাবুর আধুনিকতম উপন্যাস সম্বন্ধে সতেজ তর্ক করিত, তীর্থনাথ তখন নিজের কোণটিতে বসিয়া নিবিষ্ট মনে বই পড়িত এবং খেলো সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী করিয়া তুলিত। গল্প শেষ হইলে কিশোর তাহাকে বলিত, 'তীর্থদা, ধন্য বটে তুমি! আমাদের এত গল্প হয়ে গেল, একটা কথাও কি তোমার কানে গেল না? কখনও যদি তোমার নিমতলা প্রাপ্তি হয় তো সে ঐ পচা সিগারেট আর রাতদিন বই পড়ার গুণে!' তীর্থনাথ মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে একটু হাসিয়া আবার পাঠ্যপুস্তকে ডুবিয়া যাইত।

তারপর একদিন তীর্থনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা শেষ করিয়া একটা স্কুলের মাস্টারি পাইয়া দেশে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিশোরকে নিজের ঠিকানা দিয়া বলিয়া গেল, 'মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিও।' বিদায় দিবার সময় কিশোরের মনটা একটু খারাপ হইল

বটে কিন্তু তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। যাহার সহিত তিন বৎসর একই ঘরে কাটাইয়া দিয়াছে, তাহার বিদায়ের সময় মনটা যদি একটু বিষণ্ণও না হয়, তবে তাহাকে ঘোর পাষণ্ড বলিতে হইবে।

মাস ছয়েক পরে গোলাপী খামে একখানা চিঠি আসিল—তীর্থনাথের বিবাহ। ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্রের উল্টা পিঠে তীর্থনাথ নিজের হাতে লিখিয়া দিয়াছে, 'নিশ্চয় আসিতে হইবে, না আসিলে চলিবে না।' চিঠিখানা একটা বইয়ের মধ্যে রাখিয়া কিশোর ভাবিল, এই তো কাছেই যশোর, তীর্থদা যখন এত করিয়া লিখিয়াছে, তখন একদিনের জন্য যাইতে হইবে। কিন্তু বিবাহের দিনটা তাহার তন্দ্রাভিভূত স্মরণশক্তির উপর দিয়া এমনই লঘু পদে চলিয়া গেল যে, সপ্তাহকাল অতীত হইবার পূর্বে সে কথা আর মনে পড়িল না। যখন পড়িল, তখন সে অনুতপ্তভাবে মার্জনা চাহিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া দিল।

ইহার পর আরও বছর তিনেক গত হইয়াছে। কিশোর সম্মানের সহিত এম.এস্‌-সি পাস করিবার পর আমহার্স্ট স্ট্রীটে একখানা ছোট বাসা ভাড়া লইয়া বেকারভাবে বসিয়া ছিল। পয়সা রোজগারের কোনও তাড়া ছিল না, অথচ কিছু না করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার মন উঠিতেছিল না। অনেক দিন বাড়ি যাওয়া হয় নাই, সেখানেও একবার যাওয়া দরকার, কিন্তু ভিতর হইতে সেদিক পানে কোনও তাগিদ ছিল না। একটা কিছু করিতে হইবে, এমনই মনোভাব লইয়া সে গড়িমসি করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ তীর্থনাথের নিকট হইতে তার আসিল—'শীঘ্র এসো, আমি মুমূর্ষু।' কিশোর বিলম্ব করিল না, সেই দিন একটা ব্যাগে গোটাকয়েক জামা-কাপড় পুরিয়া লইয়া যশোর যাত্রা করিল।

যশোর পৌঁছিয়া হাই স্কুলের মাস্টার তীর্থনাথের বাড়ি খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। ভাড়াটে বাড়ি, অতিশয় জীর্ণ, উপরে খোলার ছাদ, কিশোর কড়া নাড়িতেই একটি কুড়ি-একুশ বছর বয়সের মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কিশোর তাহাকে দেখিয়া বুঝিল, তীর্থনাথের স্ত্রী। কিন্তু কী অপরূপ রূপসী এই রমণী! রুক্ষ চুল, ময়লা কাপড়, গহনা না থাকারই মধ্যে, রাত জাগিয়া চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও রূপের জ্যোতি যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। কিশোর একবার চোখ তুলিয়াই সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া ফেলিল।

তীর্থনাথের তখন যক্ষ্মার শেষ অবস্থা, কিশোরকে দেখিয়া তাহার অত্যন্ত নিষ্প্রভ চক্ষু দুটা যেন একটু সজীব হইল। তাহার হাতখানা নিজের কঙ্কালসার অঙ্গুলির মধ্যে টানিয়া লইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, 'এসেছ?'

তীর্থনাথের অবস্থা দেখিয়া কিশোরের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, 'শুধু পড়ে পড়ে আর সিগারেট খেয়ে জীবনটা নষ্ট করে ফেললে, তীর্থদা?' ঘরের মেঝেয় তখনও এককোণে স্তূপে স্তূপে বই ও সিগারেটের টিন পড়িয়া ছিল।

তীর্থনাথের চর্মসার মুখে যেন একটু ব্যথার ভাব প্রকাশ পাইল; সে বলিল, 'বড় ভুল করেছি, ভাই। আগে বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আর ফেরবার পথ নেই! হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠল—সাবধান হবার সময় তো দিলে না। কষ্ট আর কিছু নয়—' চক্ষু দুটা মাথার শিয়রের দিকে তুলিয়া বলিল, 'ওর জন্যেই একটু ভাবনা হত। কিন্তু তুমি যখন এই শেষ সময় এসে পড়েছ, তখন আর ভাবনা নেই।'

কিশোর বলিল, 'আর দু'দিন আগে আমায় খবর দিলে না কেন, তীর্থদা?'

তীর্থনাথ বলিল, 'তোমার পড়াশুনার সময়, পরীক্ষা সামনে, তাই আর কিছু

জানায়নি। আর, জানালেও তো বাঁচাতে পারতে না, ভাই! বরং এই ভাল হল, যাবার সময় তোমায় দেখতে পেলুম!'

কিশোরের মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তীর্থনাথ বোধ করি তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিল, 'ট্রেনে এসেছিস, মুখ হাত-পা ধুয়ে একটু কিছু মুখে দে, কিশোর। তারপর আমার কাছে এসে বসিস, দু' একটা কথা বলব। ওঠ, আর দেরি করিস নে।'

দ্বিরুক্তি না করিয়া কিশোর তীর্থনাথের স্ত্রীর পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আসন করিয়া জলখাবারের থালা কিশোরের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তীর্থনাথের স্ত্রী বিমলা অদূরে মেঝের উপর বসিলে কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়িতে আর কি কেউ নেই, বৌদি? আপনি একলাই—'

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আত্মীয়-স্বজন তো কেউ নেই, তবে পাড়ার ছেলেরা বড় ভাল, সব সময়ে দেখাশুনো করে। আর, শহরের ডাক্তারবাবুরাও যথেষ্ট করেছেন, তাঁদের ঋণ শোধ দেবার নয়। কিন্তু হাজার হলেও তাঁরা সবাই পর তো, তাঁদের কাছে আর কত প্রত্যাশা করা যায়? ইনিও ভুগছেন প্রায় পাঁচ মাস। তাই এখন বেশীর ভাগ আমাকে একলাই চালাতে হয়।'

কিশোর নতমুখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তাররা কী বলেন?'

বিমলা সহজভাবে বলিল, 'ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন। আজকালের মধ্যেই বোধ হয় সব শেষ হয়ে যাবে।'

কিশোর অবাক হইয়া এই অসম্ভব সংযমশালিনী নারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি সত্যই সংযম, না শুধু ঔদাস্য?

কিশোরের মনের ভাব বুঝিয়া বিমলা নীরবে একটু হাসিল; কিন্তু তাহার সংশয় দূর করিবার কোনও চেষ্টা করিল না।

কিশোর আসিয়া আবার তীর্থনাথের শয্যার পাশে বসিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বিমলা ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল।

তীর্থনাথ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, 'পাস করলি, এবার কী করবি, ঠিক করেছিস?' কিশোর চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া তীর্থনাথ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'গেজেট থেকে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু খবর তোর বরাবরই নিয়েছি, কিশোর। আমি বলি, তুই প্রফেসারি কর; বাবার পয়সা আছে বলে চুপ করে বসে থাকিস নে। আমার বিশ্বাস, ও পথে তুই উন্নতি করতে পারবি।'

কিশোর চুপ করিয়াই রহিল; নিজের প্রসঙ্গ লইয়া এ সময়ে আলোচনা করিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু অন্য কী প্রসঙ্গ তুলিয়া সে কথা পাল্টাইবে, তাহাও ভাবিয়া পাইল না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে এত কাছে এমন করিয়া সে আর কখনও দেখে নাই।

তীর্থনাথ বলিল, 'আচ্ছা থাক, তোর কথা আর বলব না, এবার আমার কথা বলি। কথা বেশী নয়, কিশোর, একটুখানি,—কিন্তু তার পেছনে ভার প্রকাণ্ড। তোর কাঁধ যে কতখানি শক্ত, তা ভাল করে জানি বলেই আজ তোর ওপর হঠাৎ এতবড় বোঝা চাপিয়ে দিতে পারছি। জানি, মাঝে মাঝে ভারী মনে হলেও এ বোঝা তুই ইচ্ছে করে কোনও দিন ফেলতে পারবি না।'

অজ্ঞাত আশঙ্কায় কিশোরের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। কিসের ভার, কোন্ বোঝার কথা তীর্থদা বলিতেছে?

একটু থামিয়া তীর্থনাথ বলিতে লাগিল, 'ওকে সব কথা বলেছি, ও সব জানে। হস্টেলে থাকতে অত ছেলের মধ্যে তোকেই কেবল মনে মনে স্নেহ করতুম, কিশোর। তুই জানতিস না, একটা বইয়ের পোকা যে মানুষকে ভালবাসতে পারে, এ বোধ হয় তুই কল্পনাও করতে পারিস নি। তারপর আমি যখন চলে এলুম, তখন দু'-দিনেই তুই আমায় ভুলে গেলি, এমন কি আমার বিয়ের সময় পর্যন্ত এলি না। আমি কিন্তু তোকে চিনতুম, চিনতুম বলেই কোনও দিন একটা প্লানির ছায়া পর্যন্ত আমার মনে পড়েনি। আর আজ শেষ সময়, নির্ভর করতে পারব বলে কেবল তোকেই ডেকেছি।'

একবার দম লইয়া তীর্থনাথ আবার আরম্ভ করিল, 'পৃথিবীতে আর একটি লোককে এমনই ভালবেসেছিলুম, সে ঐ মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমারই মত অভাগা ও, তিন কুলে আপনার বলতে কেউ নেই। আমরা দু'জনে পরস্পরকে পেয়ে কী পরম আশ্রয়ই না পেয়েছিলুম। দারিদ্র্য হয়তো ছিল, কিন্তু অভাব ছিল না। কিন্তু আমি নির্বোধ, নিজের পায়ে কুড়ুল মারলুম, ওরও সর্বনাশ করলুম।—সে যাক ও ভেবে আর এখন কোনও লাভ নেই। শরীরের যত্ন তো কোনও দিনই করতে শিখিনি, চিরদিন তাকে অবহেলার বস্তুই মনে করে এসেছি। কিন্তু আজ ওকে ছেড়ে যেতে যে কী কষ্ট হচ্ছে তা তোকে বোঝাতে পারব না, ভাই। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে, ওকে তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি।'

কিশোরের বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। সে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, তীর্থনাথের স্ত্রী খাটের বাজু ধরিয়া পাথরের প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছে; মুখে ক্রন্দনের চিহ্ন-মাত্র নাই, চক্ষু দুটি স্থির, ওষ্ঠাধর এমন দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ, যেন আর কিছুতেই খুলিবে না।

তীর্থনাথ পুনশ্চ বলিল, 'আমার কথা বুঝতে পেরেছিস, কিশোর? ওর ভার সম্পূর্ণভাবে তোর উপর দিয়ে গেলুম। তুই দেখিস-শুনিস, নিজের কাছে রাখিস। টাকা আমি কিছু রেখে যাব, যাতে একলা বিধবার কষ্টে-সৃষ্টে চলে যায়; কিন্তু টাকাই তো বড় জিনিস নয়, ভাই; ও এখনও ছেলেমানুষ, একজন পুরুষ অভিভাবক চাই, তা নইলে সংসার চারিদিকে রাক্ষসের মত হাঁ করে আছে যে।'

তীর্থনাথ চুপ করিল। স্তব্ধ হইয়া কিশোর ভাবিতে লাগিল, এতখানি বিশ্বাস তাহাকে তীর্থদা করিতে পারিল কি করিয়া? মাত্র তিন বৎসর তাহারা একসঙ্গে কাটাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও সে জানিতে পারে নাই যে, তীর্থনাথ তাহাকে এতখানি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে। কেমন করিয়াই বা জানিবে? তীর্থনাথ থাকিত বই লইয়া, আর সে থাকিত জীবনের সমস্ত উত্তেজনা-উদ্দীপনার মাঝখানে। ইহার মধ্যে কখন আপনার কোণে থাকিয়া তীর্থনাথ তাহাকে নিজের বুকের অন্তরতম স্থানে টানিয়া লইয়াছিল, তাহা সে অনুভবেও জানিতে পারে নাই।

কিশোরের নিশ্চল মূর্তির দিকে চাহিয়া তীর্থনাথের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল, 'কি রে, পারবি না মনে হচ্ছে? বড্ড ভারী লাগছে?'

ব্যাকুল হইয়া কিশোর বলিল, 'না দাদা, ভারী লাগছে না! কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক, তুমি সেরে ওঠো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তীর্থনাথ বলিল, 'অঃ, বড় আরাম দিলি, কিশোর। তোর সম্বন্ধে ভয় আমার কোন কালেই ছিল না। কিন্তু তবু—কত দিন দেখাশুনা নেই—অবস্থার ফেরে মানুষের মনও তো বদলে যায়। তুই কিন্তু ঠিক তাই-ই আছিস কিশোর, তেমনি সোজা আর মজবুত। তোকে দেখলে তৃপ্তি হয়।' বলিয়া সস্নেহে কিশোরের গায়ে কম্পিত শীর্ণ হাতখানা বুলাইয়া দিল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া তীর্থনাথ আবার বলিল, 'আমাকে মিছে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করিস নে, কিশোর। আমি জানি, আমার হয়ে এসেছে, আজকালের মধ্যেই যাব। —একটা উইল করে রেখেছি, আরও যা-কিছু কাগজপত্র—ওর কাছেই পাবি। আমার যা-কিছু সব ওর কাছে।—ভাল কথা, বিয়ে করেছিস?'

কিশোর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, করে নাই।

কিছুকাল শূন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীর্থনাথ বলিল, 'করিস। এমন নিশ্চিত শান্তি আর কিছুতে নেই! নির্ভর করবার, ভালবাসবার, সান্ত্বনা দেবার একটি লোক সর্বদা কাছে থাকা যে কত সুখ, তা তোকে কি করে বোঝাব? গায়ে কখনও একটা আঁচ লাগতে দেয় না রে, সব তারা নিজেরা গা পেতে নেয়। আর শাসনের ঘটা যদি দেখিস, যেন আমরা পুরুষমানুষগুলো সবতাতেই অক্ষম—কিছুই করতে পারি না—ওরাই যেন আমাদের সারথি—' বলিয়া খুব আহ্লাদে হাসিবার চেষ্টা করিতেই প্রবল কাশির ধাক্কায় তাহার সব আহ্লাদ লুপ্ত হইয়া গেল।

কাশি থামিলে তীর্থনাথ আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার অব্যক্ত যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া কিশোর সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

রাত্রিকালে পাশের ঘরে শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এবং দরকার হইলেই ডাকিবে বলিয়া বিমলা স্বামীর কাছে গিয়ে বসিল। শুইবার আগে কিশোর দেখিয়া গেল, তীর্থনাথের আচ্ছন্ন অবস্থা, কখন জ্ঞান আছে, কখন নাই, কিশোর পূর্বে কখন যক্ষ্মা-রোগী দেখে নাই—মৃত্যু যে একেবারে আসন্ন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

রাত্রিতে একবার উঠিয়া আসিয়া কিশোর রোগীর ঘরের দরজার নিকট হইতে মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছেন এখন?'

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—'ভাল আছেন।'

কিশোর আশ্বস্ত হইয়া শুইতে গেল। স্থির করিল, শেষ রাত্রিতে গিয়া ক্লান্ত শুশ্রূষাকারিণীকে বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিবে।

ভোর হইতে না হইতে কিশোর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দেখিল, মেঝের উপর স্বামীর দেহ কোলে লইয়া তীর্থনাথের স্ত্রী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। কিশোরের মাথার ভিতর একটা প্রবল হাতুড়ির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যেন চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। তারপর দৃষ্টি পরিষ্কার হইলে টলিতে টলিতে মৃতের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মৃতের মুখে সংশয় বা ক্লেশের চিহ্নমাত্র নাই, আছে কেবল অপরিসীম যন্ত্রণার অবসানে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

'আমায় একবার ডাকলে না, বৌদি! কখন শেষ হল?'

স্থির, দৃঢ় কণ্ঠে তীর্থনাথের বিধবা উত্তর করিল, 'রাত্রি তিনটের সময়। তোমাকে জাগিয়ে তো কোনও লাভ হত না, ঠাকুরপো। শেষ সময়টা আমি একলাই তাঁর কাছে থাকতে চেয়েছিলুম।—আর কেন, এবার লোকজন ডাকো; মৃতদেহ বেশীক্ষণ ফেলে রাখা তো ঠিক নয়।'

তাহার অটল ধৈর্য দেখিয়া কিশোর ক্ষিপ্তের মত বাহির হইয়া গেল। কেবল তাহার মাথার মধ্যে ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরিতে লাগিল, 'এমন হইল কেন? তীর্থদা অমন স্ত্রী ফেলিয়া যাইতে পারিল কিরূপে?'

পাড়ার লোক আসিয়া যখন তীর্থনাথের কঙ্কালখানা তাহার স্ত্রীর হাত ছাড়াইয়া বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া হরিধ্বনি করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, তখন একবার 'মা গো' বলিয়া সদ্যো-বিধবা মাটিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সমস্ত দিন আর তাহার সংজ্ঞা হইল না।

দশদিন পরে তীর্থনাথের প্রেতকৃত্য সমাধা করিয়া এগারো দিনের দিন বিধবা তাহার

স্বামীর খানকয়েক পুথিপত্র ও একটা টিনের ট্রাঙ্ক লইয়া কিশোরের সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসিল। ব্যাঙ্কে তীর্থনাথের হাজার তিনেক টাকা ছিল। তাহা সে মৃত্যুর পূর্বে কিশোরের নামে নিঃশর্তে উইল করিয়া গিয়াছিল।

২

তারপর কিশোরের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় ন্যূনাধিক ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

কিশোর একখানা টেলিগ্রাম পড়িতে পড়িতে রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিল, 'বৌদি, একখানা তার এল।'

জ্বলন্ত উনানের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমলা বলিল, 'কিসের তার ঠাকুরপো? কোত্থেকে এল?'

কিশোর বলিল, 'বাবা করেছেন। তিনি আজ আসছেন, এই সাড়ে ন'টার গাড়িতে।"

বিমলা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, 'কৈ, তাঁর তো আসার কোনও কথা ছিল না।'

উদ্বিগ্নস্বরে কিশোর বলিল, 'না। হঠাৎ—। যাই আমি হাওড়ায়, ন'টাও তো বাজে।' বলিয়া জুতা-জামা পরিবার জন্য উপরে উঠিয়া গেল।

বিমলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া হাত ধুইয়া, কিশোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে গেল। কিশোর তখন পাঞ্জাবি পরিয়া হাতে ঘড়ি বাঁধিতে-ছিল, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া বিমলা সঙ্কুচিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি যে এখানে আছি, সে কথা তাঁকে লেখা হয়েছিল?'

কিশোর একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'না, লিখব-লিখব করে আর লেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, বৌদি।'—বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ট্রামে যাইতে যাইতে কিশোর ভাবিতে লাগিল, বাবাকে খবর না দেওয়াটা ভাল হয় নাই। তিনি সেকেলে লোক, হয়তো এটাকে ভাল চোখে দেখিবেন না। উপরন্তু যদি অন্য সূত্রে খবর পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে মন্দ ভাবিয়া বসাও বিচিত্র নহে। বিশেষ, সে যখন নিজে কোনও খবরই দেয় নাই, তখন সব দিক দিয়াই ব্যাপারটা অত্যন্ত সন্দেহ-জনক প্রতীয়মান হয়।

কিশোর জোর করিয়া নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, সন্দেহজনকই বা কিসে? নিজের বিধবা অনাথা বৌদিদিকে লইয়া একবাড়িতে থাকা কি এতই নিন্দনীয়? অবশ্য, বিমলা তাহার সত্যিকার বৌদিদি নহে; কিন্তু তাহাতেই বা কী? সে তো বিমলাকে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-বধূর মতই শ্রদ্ধা করে। আর, এটা কীই বা এমন মহামারী ব্যাপার যে দেশসুদ্ধ লোককে সংবাদ না দিলেই নয়?

বাপকে লইয়া ফিরিবার পথে, গাড়িতে কিশোর দুই-একবার কথাটা উত্থাপন করি-বার চেষ্টা করিল; কিন্তু কী বলিবে, কেমন করিয়া কথা তুলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া কিছুই বলা হইল না। তা ছাড়া, তাহার পিতা পশুপতিবাবু গোড়া হইতেই এমন গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন যে, দুই-একটা সাধারণ কুশল প্রশ্ন ছাড়া ভালমন্দ কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না।

গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির ভিতর পা দিবামাত্র বিমলা আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। পশুপতিবাবু গাম্ভীর্যের সহিত বিস্ময় মিশ্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কে?'

কিশোর দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল, 'উনি—উনি আমার বৌদি?'

পাকা ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বে তুলিয়া পশুপতিবাবু বলিলেন, 'বৌদিদি?'

পলকের জন্য বিমলার ভাবলেশহীন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোর নিজেকে সামলাইয়া লইল। নিজের দুর্বলতাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া সহজ সংযত স্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, বৌদিদি। ওপরে চলুন, সব কথা বলছি।'

পুত্রের অনুবর্তী হইয়া পশুপতিবাবু উপরে কিশোরের ঘরে গিয়া বসিলেন। জুতা-জামা ত্যাগ করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, যেন পুরা কৈফিয়ত না শুনিয়া তিনি কোন কাজই করিবেন না।

কিশোর সংক্ষেপে ও সরলভাবে বিমলার আগাগোড়া ইতিহাস বলিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া পশুপতিবাবু বলিলেন, 'হুঁ। আমাকে জানাওনি কেন?'

'জানাব জানাব করে জানানো হয়নি। আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।'

'হুঁ।' পশুপতিবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ বলিলেন, 'আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছি।'

কিশোর চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'বিয়ের সম্বন্ধ? কিন্তু এখন তো—'

হাত নাড়িয়া বাধা দিয়া পশুপতিবাবু বলিলেন, 'কিন্তু তার আগে আজই তুমি ঐ মেয়েমানুষটিকে বিদেয় করে দাও।। ওর পয়সা-কড়ি থাকে ভালই; না থাকে, নিজের পথ ও নিজে দেখে নেবে।'

কিশোর প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পশুপতিবাবু বলিলেন, 'তোমার নামে নানারকম কুৎসা আমার কানে উঠেছিল, তাই নিজের চোখে দেখতে এলুম। তা দেখছি, কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। কিন্তু এ-সব কানাঘুষো বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তুমি ছেলেমানুষ, যা করে ফেলেছ তার আর চারা নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটিকে আর বাড়িতে রাখা চলবে না। আজই ওকে যেতে বলে দাও।'

তবু কিশোর ঘাড় গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

পশুপতিবাবু একটু নরম হইয়া পুনরায় বলিলেন, 'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কলকাতা শহর, তোমার এই উঠতি বয়স, চোখের মোহে অনেকের অমন সর্বনাশ হয়। কিন্তু সময়ে সামলে নেওয়া চাই। তোমার বিয়ের আমি সমস্ত ঠিক করে এসেছি —মেয়েটি বেশ সুন্দরী—'

'আমি এখন বিয়ে করব না।'

'আচ্ছা সে না হয় পরে দেখা যাবে। এখন তুমি ঐ মেয়েমানুষটিকে দূর করো তো দেখি। তোমার চোখের নেশা বই তো নয়। দু'-দিন পরেই দেখবে—'

বার বার বাপের এই কদর্য ইঙ্গিতে লজ্জায়, ক্রোধে, অপমানে কিশোরের নিজের চুল ছিঁড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, 'আমি পারব না।'

পশুপতিবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, 'পারবে না আবার কী? নিজের মুখে না বলতে পার, আমি বলে দিচ্ছি। এ-সব বিষয়ে চক্ষুলজ্জা মহাপাপ। না হয় দু'-পাঁচ টাকাও যদি লাগে।—'

ব্যাকুল হইয়া কিশোর বলিল, 'বাবা, কি বলছেন আপনি! উনি ভদ্রমহিলা বিধবা, শুদ্ধাচারিণী, ওঁর সম্বন্ধে এ-সব কথা মনে আনাও পাপ।'

পশুপতিবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'দেখো, আমি তোমার বাপ, একষট্টি বছর বয়স হয়েছে, আমাকে বোকা বোঝাবার চেষ্টা কোরো না।'

হতাশ হইয়া কিশোর বলিল, 'তবে আর কী বলব বলুন! আমার চরিত্রেও কি

আপনার বিশ্বাস হয় না?'

পশুপতিবাবু কহিলেন, 'বলছি তো, তোমার দোষ কি? পাল্লায় পড়ে অসৎসঙ্গে মিশে অমন কত চরিত্রবান ছেলে নষ্ট হয়ে যায়। সংসার দেখে দেখে আমার চুল পেকে গেল। কিন্তু তোমাকে তো আমি এভাবে অধঃপাতে যেতে দিতে পারি না, শেষ পর্যন্ত বিষয়-আশয় কিছুই যে থাকবে না। ও সব মেয়েমানুষ কালকেউটের জাত, একবার পেয়ে বসলে—'

কথা শেষ হইবার পূর্বেই কিশোর মাথার একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'ওর কথা থাক। আপনি যখন আমাকেও বিশ্বাস করবেন না, তখন আর উপায় কী! কিন্তু আমি ওঁকে নিরাশ্রয় করে পৃথিবীতে একলা ছেড়ে দিতে পারব না, এই আমার শেষ কথা।'

পশুপতিবাবু ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'পারবে না? বটে! হুঁ—আচ্ছা! তবে আমারও শেষ কথা শুনে রাখো। আজ থেকে তোমার সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক রইল না। তোমার দুর্নামের জ্বালায় আমার লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠেছে, তোমার মত দুশ্চরিত্র কুপুত্রকে আমি ত্যাগ করলুম। আজ থেকে তুমি আমার বাড়িতে মাথা গলিও না। আর তোমাকে মাসহারাও আমি বন্ধ করে দিলুম। আমার পয়সায় এই সব নির্লজ্জ ব্যভিচার হতে পারবে না।'

পশুপতিবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন। আজ দুই মাস হইতে নিজের কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পাইবার পর কিশোর যে আপনা হইতেই মাসহারা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে রাগের মাথায় সে কথা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না।

পশুপতিবাবু বাড়ির বাহির হইয়া একেবারে ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিশোর ছুটিয়া তাঁহার কাছে গিয়া ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলিল, 'বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, এখনই যাবেন না। কাল সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছেন—'

একখানা খালি ট্যাক্সি যাইতেছিল, পশুপতিবাবু সেটাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন।

কিশোর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকিয়া তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'বাবা, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—'

প্রত্যুত্তরে পশুপতিবাবু কড়া সুরে ট্যাক্সি-চালককে বলিলেন, 'হাঁকো—হাওড়া স্টেশন।'

ট্যাক্সি বাহির হইয়া গেলে পাংশু-শুষ্কমুখে কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিশোর আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকিল। বাপ তো তাহার চরিত্রের উপর একটা জঘন্য সন্দেহ করিয়া সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু এদিকে বিমলার কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? আর এরূপ একটা কুৎসিত ব্যাপারের পর বিমলা যদি আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে চায়! এ অপমান যদি সে সহ্য করিতে না পারে!

নিজের ঘরে ফিরিয়া কিশোর দেখিল, মেঝের উপর বাম বাহুতে ভর দিয়া বিমলা হেঁট হইয়া বসিয়া আছে। সে প্রবেশ করিতেই মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'রইলেন না? চলে গেলেন?'

'হ্যাঁ, চলে গেলেন।' কিশোর শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিমলা বলিল, 'ঠাকুরপো, আমার জন্য আজ তোমার বাপের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। তুমি না হয়ে অন্য আর কেউ হলে আমি এ মনোমালিন্য হতে

দিতুম না—নিজে সরে দাঁড়াতুম। কিন্তু তোমাকে তো আমি এ অপমান করতে পারব না। তোমার বাবা বিষয়ী লোক, আমার সম্বন্ধে তিনি যা খুশি ভাবতে পারেন, আমাকে তো তিনি চেনেন না। কিন্তু তোমার মত ছেলেকে বাপ হয়ে তিনি চিনলেন না, মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেলেন, এই বড় আশ্চর্য। যাক, তাঁর বিষয়-আশয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক, তোমার মত ছেলে তিনি হারালেন, এই বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে বড় লোকসান।'

কিশোর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'বৌদি, বাবা মিথ্যে সন্দেহ করে ছেড়ে গেলেন, তুমিও আমায় ছেড়ে যেও না।'

বিমলা উঠিলা আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'না। আমি তোমায় ছেড়ে যাব না। তুমি আর আমি আমরা সাধারণ দুর্বল মানুষ নই, নিজেরা মুখে বললেও এ কথা সত্যি। আমরা দু'জনে মিলে দেখাব যে, অপরাধ আমাদের মধ্যে নেই, অপরাধ আছে সমাজের মনে। অন্যান্য সামান্য ছোট মানুষের পক্ষে সতর্কতার যে বিধি-নিয়ম আছে, আমাদের বেলায় তা খাটে না। এ কথা সমাজ যদি দেখতে পায় ভালই, না পায় তাতেই বা ক্ষতি কী! আমরা তো জানি, আমরা খাঁটি আছি!—নাও, এখন ওঠো। স্নান করবে চলো, তোমার কলেজের বেলা হয়ে গেছে।' বলিয়া বিমলা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

৩

কলেজে চাকরি লইবার পর কিশোর নিজের বাসায় দ্বিতলের একটা ঘরে আপনার প্রয়োজনের উপযোগী একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরি করিয়াছিল। সত্যকার কোনও কাজ করিতে পারিবে এমন আশা তাহার ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের ঐ দিকটাতে নাকি তাহার অসাধারণ ঝোঁক ছিল, তাই প্রত্যহ রাত্রিকালে এবং ছুটিছাটার দিনে প্রায় অহোরাত্র সেই ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বুনসেন বার্নার জ্বালিয়া টেস্ট টিউব গরম করিয়া নানা প্রকার বিকট দুর্গন্ধ বাহির করিয়া বাড়ির হাওয়া দূষিত করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে বিমলা কৌতূহলী হইয়া তাহার ম্যাজিক দেখিতে আসিয়া ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোর হাসিয়া বলিত, 'বৌদি, তুমি হলে আমার ছাত্রী, তোমাকে কর্ক বোরিং থেকে আরম্ভ করে যা কিছু জানি, সব শেখাব। দেখবে তখন কী বিচিত্র এক শক্তিময় জগৎ এই সব কলকব্জার ভিতর দিয়ে ধরা পড়বে।' বিমলাও হাসিয়া উত্তর দিত, 'কলেজে এত ছাত্র পেয়েও তোমার তৃপ্তি নেই, আবার বাড়িতেও ছাত্রী চাই? কিন্তু আমি কি সব বুঝতে পারব?' কিশোর দুঃখ করিয়া বলিত, 'বৌদি, তোমার সিকি বুদ্ধি আর অধ্যবসায় যদি কলেজের ছেলেগুলোর থাকত, তাহলে কি আর ভাবনা ছিল!'

যে দিনের কথা গত অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, সেইদিন রাত্রিকালে এই ল্যাবরেটরি ঘরে বসিয়া কিশোর কিছু একটা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দিনের বেলাটা কাজ-কর্মে কোন রকমে কাটিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতে আহারের পর সময়টা আর কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছিল না। সকাল-সকাল আহারাদি শেষ করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাজ করা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, বারোটার পূর্বে কোনমতেই ঘুমাইতে পারিত না। কিন্তু আজ সন্ধ্যা হইতেই সময়টা যেন ভারী হইয়া তাহার স্কন্ধের উপর চাপিয়া ছিল। কাজেও মন বসিতেছিল না, কেবল সেই অত্যন্ত অরুচিকর ব্যাপারটা নাছোড়বান্দা ভিক্ষুকের মত তাহার মনের পশ্চাতে লাগিয়াছিল। পাশের একটি বাড়ি হইতে উচ্চ

কলহাস্য ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানের সুর ভাসিয়া আসিয়া তাহার অস্থির চিত্ত আরও বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছিল। দূরের একটা গির্জার ঘড়িতে সশব্দে এগারোটা বাজিয়া গেল। তখন কিশোর বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের আলো নিভাইয়া চোখেমুখে জল দিয়া ভিতরকার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চোখে পড়িল, বারান্দার অপর প্রান্তে বিমলীর শয়নঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছে। প্রায় দু'-ঘণ্টা আগে বিমলা শুইতে গিয়াছে, তাই কিছু আশ্চর্য হইয়া কিশোর দ্বারের কাছে গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, 'বৌদি, জেগে আছ?'

ভিতর হইতে শ্রান্তস্বরে উত্তর আসিল, 'হ্যাঁ, এসো।' ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া কিশোর ঘরে ঢুকিল। ঘরের কোণে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছিল, শয়নঘরে বিমলা বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করিত না। প্রবেশ করিয়াই কিশোর সচকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি বৌদি, মাটিতে শুয়ে যে!'

'বড্ড মাথা ধরেছে, ঠাকুরপো; আর ভারি বুক ধড়ফড় করছে।' বলিয়া শীতল মেঝের স্পর্শ আরও ভাল করিয়া পাইবার জন্য উপুড় হইয়া শুইল।

বুক ধড়ফড় করা বিমলার পূর্ব হইতেই ছিল, মাথা ধরার উপসর্গও নূতন নহে। তাহার উপর সে পূজা-অর্চনায় আহারের অনিয়ম করিতে ছাড়িত না, অনশন উপবাস লাগিয়াই ছিল। এই লইয়া কিশোরের কাছে অনেকবার বকুনি খাইয়াছে। কিন্তু আজ তাহার এই অসুস্থতার মূলে যে অনেকখানি মানসিক ক্লেশ নিহিত আছে, তাহা বুঝিয়া কিশোর তিরস্কারের কথা মুখে আনিতেও পারিল না। তবু সে জানিত না যে, আজ সমস্ত দিন বিমলার নিরম্বু উপবাস গিয়াছে।

কিশোরের একটা হোমিওপ্যাথি বাক্স ছিল, তাহারই সাহায্যে সে জগতের যাবতীয় রোগ আরাম করিত। সে তাহারই ভিতর হইতে একটা ঔষধ খুঁজিয়া আনিতে গেল। পাশের বাড়িতে গানের সুর ও অর্গানের বাজনা তখন উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিতেছে।

ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিতেই বিমলা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমায় এমন কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পার ঠাকুরপো, যেখানে গোলমাল চেঁচামেচি নেই? যেখানে শান্তিতে দু'দণ্ড ভাবতে পারা যায়?' বলিয়া দুই বাহু দিয়া মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া যেন বাহিরের শব্দ নিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিশোর প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিল না, তারপর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝি কোথায়?'

বাহুর ভিতর হইতে বিমলা বলিল, 'তার মা'র অসুখ, আমি তাকে ছুটি দিয়েছি।' দাসীটা প্রায় প্রত্যহই কার্যের অছিলা করিয়া রাত্রিকালে বাড়ি চলিয়া যাইত।

'আচ্ছা আমিই দেখছি।' বলিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া খালি গায়ের উপর একটা চাদর ফেলিয়া কিশোর নামিয়া গেল।

কিশোরের বাসার পাশ দিয়া একটা গলি গিয়াছিল। যে বাড়ি হইতে গান-বাজনার আওয়াজ আসিতেছিল সেটা গলির অপর পাশে, কিন্তু সদর রাস্তার উপরই। দুইটা বাড়ির মধ্যে কেবল সংকীর্ণ গলির ব্যবধান। দ্বিতল বাড়িখানা এতদিন খালি পড়িয়া ছিল, মাত্র তিন-চারদিন পূর্বে একটি নূতন পরিবার এটি ভাড়া লইয়াছিলেন।

এই পরিবারে আজ একটি ক্ষুদ্র উৎসব ছিল। ইঁহারা হিন্দু বটে কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দুদের অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন; পর্দা-প্রথা, বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধেও প্রচলিত কুসংস্কার ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ এই বাড়ির একমাত্র কন্যা সুহাসিনীর অষ্টাদশ জন্মতিথি উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। আহারাদির পর সকলে মিলিয়া ড্রয়িংরুমে

গুলগুজব করিতেছিল। সুহাসিনী অর্গানে বসিয়া গান গাহিতেছিল এবং একটি ইংরাজী বেশধারী গোঁফ-কামানো যুবক চিবুকের নীচে বেহালা চাপিয়া ছড় টানিতেছিল।

কিশোর বাড়ির বাহির হইতে দুই-একবার ডাকাডাকি করিয়া কোনও সাড়া না পাইয়া ড্রয়িংরুমের পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

চাদর গায়ে নগ্নপদ দীর্ঘাকৃতি একজনকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া অর্ধপথে গান থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি এই অপরিচিত আগন্তুকের উপর গিয়া পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, তাই আকস্মিক আবির্ভাবে সকলের মুখেই একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল। এ পাড়ায় সবে নূতন আসা হইয়াছে, পাড়া-পড়শীর সহিত এখনও আলাপ হয় নাই,—এ কে, হঠাৎ খবর না দিয়াই অসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল?

কিশোর ঘরের মাঝখান পর্যন্ত গিয়া সম্মুখে যে বৃদ্ধগোছের লোকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমাকে মাপ করবেন। পাশের বাড়িতে আমি থাকি। আমার বৌদিদির শরীর বড় অসুস্থ, আপনাদের গান-বাজনায় তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত হচ্ছে।'

সকলে স্তব্ধ হইয়া বক্তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কেহ যেন কিছু বুঝিতেই পারিল না। বাড়ির কর্তা বিনয়কৃষ্ণবাবু কী একটা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুই-বার হাঁ করা ছাড়া কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। যে যুবকটি বেহালা বাজাইতেছিল, সে-ই কেবল উপস্থিত বুদ্ধি হারায় নাই, একটু বিরক্তভাবে বলিল, 'না বলে-কয়ে তো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আপনি কে, জানতে পারি কি?'

কিশোর বলিল, 'বললুম তো, পাশের বাড়িতে আমি থাকি।'

যুবকটি বলিল, 'তা আমরাও শুনেছি, কিন্তু সে তো আর পরিচয় হল না। যাকগে, আপনি এখন চান কী?'

কিশোর কী চায়, পূর্বে বলিয়াছিল, এখন আবার পুনরুক্তি করিল।

গম্ভীরমুখে কিশোরের বক্তব্য শুনিয়া যুবক বলিল, 'তা আপনি যদি নিজের বাড়ির জানলাগুলো বন্ধ করে দেন, তাহলে সুবিধা হতে পারে।'

কিশোর বলিল, 'এত কাছে থেকে জানলা বন্ধ করে দিলে কোনও সুবিধাই হবে না। বরঞ্চ যেটুকু হাওয়া যাচ্ছে, তাও বন্ধ হবে যাবে।'

যুবক আরও গম্ভীর হইয়া 'ও' বলিয়া বেহালাখানা আবার হাতে তুলিয়া লইল।

সুহাসিনী মিউজিক টুলের উপর বসিয়া এতক্ষণ একদৃষ্টে কিশোরের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহার একাগ্র দৃষ্টির দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া যেন কিশোর সেই দিকে ফিরিল, অনুনয়ের কণ্ঠে বলিল, 'রাতও অনেক হয়েছে, সাড়ে এগারোটা বাজে। এখন যদি আপনারা—'

যুবকটি কিশোরের কথা শেষ হইতে দিল না, ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, 'রাত অনেক হয়েছে, এ কথার মানে কি? আপনি কি আমাদের পুলিসের ভয় দেখাচ্ছেন?—তাহলে এও আপনি জেনে রাখুন যে, আমার মামা এই কলকাতা শহরের একজন ডেপুটি পুলিস কমিশনার।'

কিশোর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, 'না, আমি পুলিসের ভয় দেখাইনি। আর, মামা ডেপুটি পুলিস কমিশনার হলে আইন ভঙ্গ করবার অধিকার জন্মায় কিনা, তাও আমার জানা নেই।' সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পাশের বাড়িতেই একটি অসুস্থ মহিলা কষ্ট পাচ্ছেন, তাই আপনাদের অনুরোধ করছি। অকারণে আপনাদের আমোদ-প্রমোদে বাধা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়—আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন—'

খোঁচা খাইয়া যুবক মনে মনে ভারি চটিয়াছিল, সুহাসিনীকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই সে-ই আবার কথা কহিল। রূক্ষস্বরে বলিল, 'আপনিও আমাদের ক্ষমা করবেন, কিন্তু কোথায় কোন মহিলা কষ্ট পাচ্ছেন, সেজন্য আমরা আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করব কেন, তা তো বুঝতে পারছি না। ও সব হবে-টবে না, আপনি যেতে পারেন।'

কিশোরের চোখে যুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিল, সে অন্য সকলের দিকে ফিরিয়া কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের সকলেরই কি তাই মত? গান-বাজনা বন্ধ করবেন না?' বলিয়া স্খলিত চাদরের প্রান্তটা কাঁধে তুলিয়া লইল।

যুবকের গলায় শিরা আবার উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বিনয়কৃষ্ণবাবু এতক্ষণে তাঁহার হারানো কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, 'না না, অনুপম, তুমি চুপ করো, গোলমাল করে কাজ নেই,—নতুন পাড়া, উনি যখন বলছেন বাড়িতে অসুখ,—কাউকে এখানে চিনি না, বুঝলে না?— আমরা গান-বাজনা এখনই বন্ধ করে দিচ্ছি,—অনুপম, তুমি থামো—হাঙ্গামায় দরকার নেই, অনেক রাত হয়েছে—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন, আর গান-বাজনা হবে না।' বলিয়া থপ করিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

'আচ্ছা, ধন্যবাদ' বলিয়া একবার মাথাটা আনত করিয়া কিশোর ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর অনুপম প্রথম কথা কহিল; ঠক করিয়া বেহালাখানা বাক্সে বন্ধ করিয়া বলিল, 'আপনি ভাল করলেন না। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, খবর না দিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তাকে এরকমভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি। বদমায়েস লোক ওতে মাথায় চড়ে বসে!'

ঘরে যে কয়টি প্রৌঢ়া রমণী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মুখে এতক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই। এইবার একজন কথা কহিলেন, ইনি অনুপমের জননী। বলিলেন, 'লোকটা যেন চোয়াড়! পায়ে জুতো নেই, গায়ে আবার একটা চাদর! আর কাঠখোট্টার মত কথা কইবার বা কী ধরন, যেন মারতে এল! কী জানি বাপু, আমার তো একটুও ভাল বোধ হল না!' তিনি মুখখানা বিকৃত করিলেন।

বিনয়কৃষ্ণবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'কী জানি, কিছুই তো বলা যায় না। বললে যখন বাড়িতে অসুখ, তখন কী বলে আর—'

অনুপম বলিল, 'একদম বাজে কথা। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, লোকটার অন্য কোনও মতলব ছিল। হয়তো ঐ ছুতো করে বাড়ির ভেতরটা দেখে গেল।'

অত্যন্ত ভীত হইয়া বিনয়কৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'না না, অনুপম, তুমি ভুল করছ; চোর-ছ্যাঁচড়ের মত চেহারা তো নয়, বরং ভদ্রলোক বলেই—'

অনুপম বলিল, 'ভদ্রলোক ওর সাত গুষ্ঠিতে নেই। ভদ্রলোকের কখনও অমন আখাম্বা ষণ্ডা চেহারা হয়? আমার বিশ্বাস, ও একটা গুণ্ডা। আজকাল সব ভদ্রবেশী গুণ্ডা হয়েছে জানেন না? কাছেই ঐ মেছোবাজারে তাদের আড্ডা।'

বিনয়কৃষ্ণবাবু একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'বল কী অনুপম! আমি একলা মেয়ে নিয়ে থাকি, শেষে কি গুণ্ডার হাতে—এ পাড়ায় ছাই কাউকে চিনিও না।'

অনুপম হাত উল্টাইয়া বলিল, 'আমি আর কী করব বলুন, আমি তো হাঁকিয়েই দিচ্ছিলুম, আপনি মাঝ থেকে ডেকে প্রশ্রয় দিলেন। যাক, কাল এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাবে। আর মামাকেও না হয় খবরটা—'

বিনয়কৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'সে তো কালকের কথা; কিন্তু আজ রাত্তিরটা—'

সুহাসিনী আসিয়া বাপের চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভর্ৎসনার সুরে বলিল, 'কেন বাবা তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ? বাড়িতে দারোয়ান রয়েছে, বদ্‌রী রয়েছে, তা ছাড়া মগের মুল্লুক তো নয়— কলকাতা। চারিদিকে প্রতিবেশীরা রয়েছেন। মনে করুন, যদি গুণ্ডাই হয়, তাতেই বা এত ভয় কিসের?'

অনুপম বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ভয় যদি না-ও থাকে, তবু খুব সাবধানে থাকার দরকার।'

সুহাসিনী হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, আমরা খুব সাবধানেই থাকব।'

অনুপমের মাতা বলিলেন, 'অনুপম, তাহলে আমাদের আর রাত করে কাজ নেই। বারোটা প্রায় বাজে, কাল আবার তোমাকে সকালেই আফিস যেতে হবে।' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিনয়বাবু কন্যার কথায় কিছু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, অতিথিদের উঠিতে দেখিয়া আবার ভীত হইয়া পড়িলেন, 'তা—তা—অনুপম, তোমরা না হয় আজ রাত্রিটা এখানেই —আমার দুটো শোবার ঘর খালি আছে—'

ক্ষুব্ধ লজ্জায় সুহাসিনী বলিয়া উঠিল, 'কী তুমি পাগলের মত করছ, বাবা! ওঁরা থাকতে পারবেন কেন? না না, মাসীমা, আপনারা বাবার কথা শুনবেন না—' অনুপমের মাতার কাছে গিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, 'মা যাবার পর থেকে বাবা কি রকম হয়ে গিয়েছেন জানেন তো? একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।' বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। অনুপমের মাতা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'সে তো জানিই!'

বস্তুত বিনয়বাবুর স্ত্রী যতদিন জীবিতা ছিলেন, তিনিই এই স্বামীটির সর্বকার্যের ও সর্বচিন্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজের বা অন্যের কোন ভাবনাই বিনয়বাবুকে কোনদিন ভাবিতে হয় নাই। তাই, বছর তিনেক আগে স্ত্রী যখন মারা গেলেন, তখন সকল বিষয়েই বিনয়বাবু যেন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন; একটু সামান্য কারণেই অতিশয় ব্যস্ত ও বিচলিত হইয়া পড়িতেন।

অভ্যাগত অতিথিরা একে একে বিদায় লইলেন। অনুপমের ইচ্ছা ছিল, সুহাসিনীর সহিত আড়ালে দুই-একটা কথা কয়; কিন্তু আজ আর তাহার সুবিধা হইল না দেখিয়া মাতাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সকলে চলিয়া গেলে, সদর দরজা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বন্ধ করাইয়া, বিনয়-বাবুকে শান্ত করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া সুহাসিনী নিজের শয়নকক্ষে গেল। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জামা-কাপড় খুলিতে খুলিতে সে অন্যমনস্কভাবে বিগত ঘটনার কথাই চিন্তা করিতে লাগিল।

সুহাসিনী মেয়েটির গায়ের রং কালো, গৌরাঙ্গী তাহাকে কোনমতেই বলা চলে না। কিন্তু এমনই সুন্দর তাহার মুখের শ্রী ও দেহের গঠন যে, একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার বর্ণের কথা আর মনে থাকে না। চোখ দুটি বেশ বড়, পাতলা দুটি ঠোঁট; গ্রীবার রেখাটি এমনই চমৎকার নিটোল যে, কোথায় গ্রীবা শেষ হইয়া চিবুক আরম্ভ হইয়াছে, ধরা যায় না। কিন্তু এ সব ছাড়াইয়া সর্বাপেক্ষা মধুর তাহার মুখের হাসি, যেমন সুমিষ্ট তেমনি অকুণ্ঠিত। এই পূর্ণ-যৌবনা মেয়েটির হৃদয়ের নির্মল সহজতাটুকু যেন অকৃত্রিম হাসির ভিতর দিয়া ধরা পড়ে।

কাপড় ছাড়িয়া সাদা শাড়ি পরিয়া বেণী খুলিতে খুলিতে সুহাসিনী যখন শুইতে গেল, তখনও সে সেই কথাই ভাবিতেছে। ঐ নগ্নপদ দীর্ঘদেহ লোকটির সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া অনেক সন্দেহই তাহার মনে ধরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তবু সে যে একটা

দুর্দান্ত দস্যু, ভদ্রতার মুখোস পরিয়া আসিয়াছিল, এ কথা সুহাসিনী মনে মনে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না এবং লোকটির প্রকৃত পরিচয় জানিবার কৌতূহলও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া লোকটি কে, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কী করে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

ছয়-সাত বৎসর পূর্বে বিনয়কৃষ্ণবাবু বেহার অঞ্চলের কোনও বড় শহরের এক প্রসিদ্ধ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। সেই সময়ে বাঙ্গালী-বেহারীর মধ্যে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা কিছু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। বেহার যে বেহারীদের জন্যই, আর কাহারও জন্য নহে, এই সনাতন সত্য নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইবার পর বেহারের আদিম এবং ন্যায্য অধিবাসিগণ বাঙ্গালীদের আড়ালে 'বাঙ্গালিয়া' উপাধিতে সম্বোধিত করিয়া অবজ্ঞা ও নিজেদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিনয়কৃষ্ণ-বাবুর বেহারী সহকর্মীরা—যাঁহারা এতদিন তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন, তাঁহারা ভিতরে ভিতরে বিনয়বাবুর নানা দোষ-ত্রুটি ধরিয়া উপরওয়ালার কাছে পাঠাইতে লাগিলেন। নিজেদের মধ্যেও তাঁহার অযোগ্যতা সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল; এবং একজন বাঙ্গালী যে হাজার-বারোশ টাকা মাহিনার একটা উচ্চ-পদ অধিকার করিয়া উহা হইতে আদিম অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, এ মনস্তাপের উষ্মা দুই-একখানা প্রাদেশিক সংবাদপত্রেও বাহির হইয়া পড়িল।

তাঁহার সম্বন্ধে এই সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিরুদ্ধতার খবর পাইবামাত্র বিনয়কৃষ্ণবাবু কাজে ইস্তফা দিলেন। কলেজটি গভর্নমেণ্টের প্রসাদলিপ্সু,—তাই তাহার শাসক-সমিতি উপরের কোনও উপদেবতার কটাক্ষ ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া একজন ইংরাজকে বিনয়বাবুর শূন্যপদে বাহাল করিলেন। ইহাতে আদিম অধিবাসিগণ কোন প্রকার আপত্তি করিলেন কি না, তাহা বাহিরের কেহ জানিতে পারিল না।

কর্মত্যাগ করিয়া বিনয়কৃষ্ণবাবু কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পূর্বেই কলিকাতা পর্যন্ত পেঁছিয়াছিল। দুই-তিনটা কলেজ হইতে অধ্যাপনা করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। অর্থোপার্জনের কোনও প্রয়োজন ছিল না, সারা জীবনে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী তাহার অধিকাংশ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাই তিনি অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে বিদ্যাচর্চা করিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার নিশ্চিন্ত প্রশান্ত জীবনযাত্রা যেন ছন্নছাড়া হইয়া গেল। মনের অবস্থা এমনই হইল যে এক বাড়িতে দীর্ঘকাল থাকিতে মন টিকিত না, কলিকাতার মধ্যেই এবাড়ি ওবাড়ি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে শ্যামবাজারের বাড়িখানা অসহ্য মনে হওয়ায় আমহার্স্ট স্ট্রীটে কিশোরের পাশের বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন।

সে রাত্রির ঘটনার পরদিন প্রভাতে বিনয়কৃষ্ণবাবু দুইপাশের বাড়িতে সতর্কভাবে খোঁজ-খবর লইলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। গলির অপর পাশের বাড়িতে অবশ্য তিনি খোঁজ করেন নাই, সুতরাং গতরাত্রির লোকটার উপরে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। সন্ধ্যার পর অনুপম আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিল, 'দেখলেন তো,

আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি। আপনি তখন একেবারে করুণায় গলে গেলেন। আমি এক-নজর দেখেই বুঝেছিলুম, একেবারে পাকা বদমায়েস। ভুরু দেখে লোক চিনে নিতে পারি, সে ক্ষমতা আছে।' বলিয়া ক্ষুদ্র নয়ন-যুগলে আত্ম-প্রীতি ভরিয়া সুহাসিনীর দিকে চাহিল।

সুহাসিনী মুখ নীচু করিল। সকলে প্রথম হইতেই যাহাকে বদলোক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে, দারুণ অনভিজ্ঞতার দোষে কেবল সে-ই যে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, মানুষ চিনিবার এই অক্ষমতায় সে মনে মনে ভারি লজ্জা পাইল। গতরাত্রির আগন্তুকের স্বাভাবিক মন্দচরিত্র ও উপস্থিত দুরভিসন্ধিতে কাহারও সংশয় রহিল না। বিনয়বাবু এ বাড়ি ছাড়িয়া অন্য কোথাও উঠিয়া যাইবেন কি না, উদ্বিগ্নভাবে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনুপম তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেল যে, ভয়ের কোনও কারণ নাই; পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোক এখানে যাতায়াত করে জানিবার পর সে লোকটা খুব সম্ভব এদিকে আর ঘেঁষিবে না।

কিন্তু এত কাছাকাছি থাকিয়া দেখাশুনা না হওয়া অসম্ভব। দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কৃষ্ণবাবু বাড়ি হইতে বাহির হইয়া দারোয়ানকে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিবার হুকুম দিয়া পদব্রজে হ্যারিসন রোডের চৌমাথার দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় সম্মুখ হইতে একজন লোক হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। প্রথমটা ঠাহর করিতে পারেন নাই, কিন্তু চিনিতে পারিয়াই বিনয়বাবু একেবারে কাঠ হইয়া গেলেন। এ আর কেহ নহে—সেই গুন্ডা।

কিশোর কাছে আসিয়া বলিল, 'সে-রাত্রে আপনাদের ওপর বড় উৎপাত করেছিলুম। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের জুলুম আপনারা নিতান্ত ভদ্রলোক বলেই সহ্য করেছিলেন, আর কেউ হলে করত না।'

জল হইতে সদ্য ডাঙায় তোলা কাতলা মাছের মত বিনয়বাবু তিনবার খাবি খাইলেন, কিন্তু কোনও প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না।

কিশোর বলিল, 'সেদিন বড় উপকার করেছিলেন। একদিন গিয়ে আপনাদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করব ইচ্ছে ছিল কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি।'

বিনয়বাবু স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—আপনাকে আমি কখনো—কি বলে—আপনার সঙ্গে—'

'ওঃ, চিনতে পারেন নি বুঝি?' কিশোর হাসিয়া উঠিল, 'তা না পারবারই কথা। গত শুক্রবার রাত্রিতে আপনাদের গান-বাজনার মজলিসে গিয়ে যজ্ঞ-বিঘ্ন করেছিলুম। —তা চলুন না, আপনার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তো আমার বাসাতে গিয়েই একটু বসবেন। আপনি যখন প্রতিবেশী হলেন, তখন আলাপ-পরিচয় হওয়া চাই তো।'

আবার আলাপ-পরিচয়! কম্পিত-কলেবরে বিনয়বাবু একবার 'পুলিস' বলিয়া চেঁচাইবার চেষ্টা করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে উঠি কি পড়ি করিয়া ফিরিয়া চলিলেন।

কিশোর অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, বৃদ্ধের এরূপ অদ্ভুত আচরণের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তারপর জোরে পা চালাইয়া সে তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইল। তাহার ধারণা হইল, পথের মধ্যে বৃদ্ধ নিশ্চয় সহসা গুরুতর রকম অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

বিনয়বাবু নিজের গৃহসম্মুখে পৌঁছিয়া রুদ্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চেঁচাইতে-

ছিলেন, 'দারোয়ান, বদ্রি, কে আছিস, শীগ্গির দরজা খোল।'

এমন সময় কিশোর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে বলুন তো। শরীর খারাপ মনে হচ্ছে কি?'

বিনয়বাবু ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিলেন, ডাকাতটা একেবারে তাঁহার পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি নিশ্চয় একটা সাংঘাতিক কিছু করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় নিতান্ত পরিচিত কণ্ঠে কে একজন বলিল, 'কে ও, কিশোর না? তাই তো হে. বিনয়বাবুর সঙ্গে কবে আলাপ হল?'

রাস্তায় তখন গ্যাস জ্বলিয়া উঠেতেছিল, কিশোর ফিরিয়া দেখিল, তাহার কলেজের সিনিয়র প্রফেসর এবং তাহার ভূতপূর্ব শিক্ষক দীনবন্ধুবাবু মোটা লাঠিটা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বিনয়বাবু এই জনাকীর্ণ শহরের মধ্যে এই প্রথম যেন একটিমাত্র মানুষ দেখিতে পাইলেন, সাগ্রহে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'এই যে দীনবন্ধু এসেছ —এসো এসো এসো! তোমাকে দেখে যে কত খুশি হলুম—'

দীনবন্ধুবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী ব্যাপার, বলুন তো? আপনাকে বড্ড বিচলিত দেখছি।—কিশোর, তুমি কিছু জান?'

কিশোর বলিল, 'আজ্ঞে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় ওঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে।'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'তাই না কি? কিন্তু তাহলে এরকমভাবে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার প্রয়োজন কী, তা তো বুঝতে পারছি না। বাড়ির ভেতর গেলে ক্ষতি কি?'

বিনয়বাবু একবার ইহার মুখ, একবার উহার মুখ দেখিয়া শেষে বলিলেন, 'দীনবন্ধু, তুমি এই—এ'কে চেন না কি?'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'বিলক্ষণ, কিশোরকে চিনি না! ও হল গিয়ে আমার ছাত্র—অর্থাৎ এককালে ছাত্র ছিল, এখন কলীগ। ওর কথাই তো সেদিন আপনাকে বলছিলুম যে. আপনার নতুন পাড়াতে আমার একটি ছাত্র থাকে। ভেবেছিলুম, আমিই আজ আলাপ করিয়ে দেব, তা আলাপ তো হয়ে গেছে দেখছি।'

বিনয়বাবু হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, 'আলাপ! তা—হ্যাঁ—কিন্তু অনুপম যে বললে—'

ইতিপূর্বে বাড়ির দরজা খোলা হইয়াছিল এবং সুহাসিনী পিতার হাঁক-ডাকে সন্ত্রস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, এতক্ষণ অর্ধমুক্ত দ্বার-মুখে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল।

দীনবন্ধু তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'এই যে সুহাস-মায়ী, তোমার বাবার কী হল বল দেখি? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন করছেন কেন?'

প্রত্যুত্তরে সুহাসিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর মুখে আঁচল গুঁজিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, 'আপনারা ভেতরে আসুন; ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অমন করলে রাস্তার লোকে পাগল মনে করবে যে।'

'আমিও তো সেই কথাই বলছি'—দীনবন্ধুবাবু অগ্রে অগ্রে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনয়বাবু তাঁহার পশ্চাতে অসংলগ্নভাবে বলিতে বলিতে চলিলেন, 'সবাই মিলে আমাকে বুঝিয়ে দিলে,— অনুপমটা একটা আস্ত ইয়ে,—আমি গোড়া থেকেই'— ইত্যাদি।

কিশোরও একবার একটু ইতস্তত করিয়া ভিতরে অনুসরণ করিল। এই মেয়েটিকে

সেদিনও সে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। আজ তাহার ভিতরে আসিবার আহ্বানের মধ্যে সে-ও অন্তর্ভুক্ত কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও বিনয়বাবুর অদ্ভুত ব্যবহারের আড়ালে যে একটা মজার রহস্য লুকাইয়া আছে এবং সে নিজেও যে এই রহস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহা এই মেয়েটির উচ্ছ্বসিত দমকা হাসি শুনিয়া টের পাইয়াছিল। তা ছাড়া এই সহসা উদ্বেলিত হাসির মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য মাদকতা ছিল যে, ক্ষণকালের জন্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই, একরকম যন্ত্রচালিতের মতই সে সকলের পিছু পিছু বারান্দা পার হইয়া ড্রয়িংরুমে গিয়া উপস্থিত হইল।

সকলে উপবিষ্ট হইলে দীনবন্ধু বলিলেন, 'একটা কিছু হয়েছে, আমি ধরতে পারছি না। সুহাস-মায়ী, তুমিই বল তো ব্যাপারখানা কী?'

সুহাস মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, 'বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন না।'

বিনয়বাবু অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'আমরা ভারি ভুল করে ফেলেছি, দীনবন্ধু। সেদিন রাত্রিতে উনি হঠাৎ,—কিশোরবাবু, আমাদের অপরাধ আপনাকে মাপ করতে হবে, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আমারই বোকামি—বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু সবাই মিলে, বিশেষ অনুপম—এমন করতে লাগল যে, আমারও সন্দেহ হল, হয়তো—' বলিতে বলিতে লজ্জায় থামিয়া গেলেন।

দীনবন্ধু বলিলেন, 'নাঃ, এরা খোলসা করে কিছু বলবে না দেখছি। কিশোর, তুমিই বলো হে, শুনি।'

কিশোর কহিল, 'আমি তো কিছুই জানি না।'

সুহাসিনী আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কিশোরের দিকে একটা পরিহাস-তরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'উনি কোত্থেকে জানবেন? আমি বলছি, শুনুন।' বলিয়া সকৌতুকে ব্যাপারটা আগাগোড়া বিবৃত করিল।

গল্প শুনিয়া দীনবন্ধুবাবু হো হো করিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন; কিশোরও সে হাসিতে যোগ দিল।

দীনবন্ধুবাবু কিশোরের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, 'তা গুণ্ডার মত চেহারাখানা বটে, রাত-বিরেতে হঠাৎ দেখলে ডরিয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। আরে, আমি যে সেদিন সায়েটিকার জন্যে আসতেই পারলুম না, নইলে এ সব কোনও ফ্যাসাদই হত না।'

কিশোর সুহাসিনীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আচ্ছা, সত্যি আপনারা সবাই আমাকে গুণ্ডা ভেবেছিলেন?'

সুহাসিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ!'

করুণভাবে কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিও?'

সহাস্যে সুহাসিনীও বলিল, 'হ্যাঁ—আমিও।'

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর বলিল, 'আমার কপালই খারাপ দেখছি। অপরিচিত লোকে আমাকে দেখবামাত্র যদি গুণ্ডা মনে করেন, তাহলে আমার চেহারায় নিশ্চয় মারাত্মক কোনও দোষ আছে।' বলিয়া দুঃখিতভাবে নিজের হস্ত-পদাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

দীনবন্ধু বলিলেন, 'কিশোর, দেখছ তো, বলবান হবারও অসুবিধা আছে। এ কথা আগে জানলে বোধ হয় ফুটবল হকি খেলে, জিমন্যাস্টিক করে সময়ের অপব্যয় করতে না।'

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, কখনই করতুম না। কিন্তু এখন তো

আর শোধরাবারও উপায় নেই, চিরজীবন এই ভয়াবহ শরীরটাকে বহন করে বেড়াতে হবে।'

এইসব হাসি-তামাশার মধ্যে বিনয়বাবু আবার বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'কেন. কিশোরবাবুর তো বেশ ভাল চেহারা, পুরুষোচিত চেহারা! বাঙালীর ছেলের ঐ রকম শরীরই তো হওয়া চাই! কাঠির মত লিক্‌লিকে চেহারা আমি ভালবাসি না। যারা জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে, যুদ্ধের উপযোগী স্বাস্থ্য না হলে তাদের চলবে কেন? যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া— যাকে বলে ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ। সেই রকম হওয়া চাই।'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'সে তো ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের দেশের বাপ-মায়েদের ছেলেকে বিদ্বান করে তোলবার আগ্রহ এত বেশী যে, তার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আর ঘটে ওঠে না।'

এটি বিনয়বাবুর প্রিয় প্রসঙ্গ, তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, 'তুমি যথার্থ বলেছ, দীনবন্ধু! অথচ মজা এই যে, শরীর ভাল রকম পুষ্ট না হলে মস্তিষ্ক কিছুতেই পুষ্টিলাভ করতে পারে না। শরীর থেকেই তো মস্তিষ্ক তার সারবস্তু আহরণ করবে! সেই শরীরই যদি পঙ্গু হয়ে রইল, তাহলে মস্তিষ্ক সার পাবে কোত্থেকে? এই কথাটা আমি বরাবর প্রচার করে এসেছি—যখন কাজে ছিলুম, তখন সর্বদাই করতুম—যে, শরীর এবং বুদ্ধি দুইয়েরই সমান পুষ্টি হওয়া চাই, নইলে পরিপূর্ণ আস্ত মানুষটি তৈরি হয় না, একটিমাত্র পাল্লা-বিশিষ্ট তরাজুর মত অকর্মণ্যভাবে কেবল এক-দিকেই ঝুঁকে থাকে।'

দীনবন্ধুবাবু কিশোরের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, 'আপনি যে সত্য কথা প্রচার করেছেন, তার উদাহরণ আপনার সামনেই হাজির রয়েছে। এই ছেলেটির বাহিরটা যেমন নিরেট এবং প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর, ভিতরটিও তেমনি সবল ও সুগঠিত। ক্রমশ পরিচয় পাবেন।'

উপর্যুপরি প্রশংসায় কিশোর লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল, তাই তাড়াতাড়ি বলিল, 'যে পরিচয় ওঁরা গোড়াতেই পেয়েছেন, তার বেশী পরিচয়ের বাসনা বোধ হয় নেই।'

বিনয়বাবু বলিলনে, 'না না, সে কী কথা! ভুল তো আমাদেরই হয়েছিল, সেজন্যে আমরাই অপরাধী হয়ে আছি। এখন তো সত্যিকার পরিচয় হয়ে গেল, এখন মাঝে মাঝে আসলে আমি বড় খুশি হব।'

গম্ভীরমুখে সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কী বলেন।'

মৃদু হাসিয়া সুহাসিনী উত্তর করিল, 'আমিও তাই বলি।'

অতঃপর একথা-সেকথায় আরও কিছুক্ষণ কাটিবার পর সকলে উঠিয়া পড়িলেন। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কিশোর সম্মুখে বিমলাকে দেখিয়া বলিল, 'সাবধান! আমি একজন গুণ্ডা!'

বিমলা বলিল, 'সে কী! গুণ্ডা হলে আবার কবে থেকে?'

কিশোর কহিল, 'সম্প্রতি হয়েছি। তোমার কাছে টাকাকড়ি যা আছে শীগ্‌গির বার করো, নইলে বিপদ ঘটবে।'

বিমলা গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তা বার কচ্ছি, কিন্তু মাসের বাকি কটা দিন আমার চলবে কী করে তা বলে দাও।'

কিশোর হতাশ হইয়া বলিল, 'নাঃ, তোমার কাছে আমার গুণ্ডা হওয়া চলল না। গুণ্ডার সঙ্গে বুঝি অমনি করে কথা কয়?'

বিমলা বলিল, 'তা কী করব, গুন্ডার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়, ক্রমশ শিখে নিতে হবে তো?'

কিশোর হাসিয়া বলিল, 'আজ ভারি মজা হয়েছে, ওপরে চলো, বলছি।'

বিমলা তাহা বুঝিয়াছিল। উপরে গিয়া কাহিনী শুনিয়া সে রাগিয়া উঠিল, 'যা নয় তাই। না হয় খালি গায়ে খালি পায়েই ছিলে, তাই বলে কি সত্যি চোর-ডাকাতের মত চেহারা! কেমন ধারা লোক ওরা? চোখে কি দেখতে পায় না! বুড়োর না হয় ছানি পড়বার বয়স হয়েছে, কিন্তু ঐ যে মেয়েটার কথা বললে, সে-ও কি চোখের মাথা খেয়েছে না কি?'

কিশোর বলিল, 'উঁহু, চোখ আছে—বেশ বড় বড়।'

'তবে?' বিমলা হাসিয়া ফেলিল, 'না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলো তো ওরা কী রকম লোক? উদো-মাদা নয় তো? আচ্ছা, মেয়েটার বয়স কত হবে বলো দেখি?'

ঘাড় চুলকাইয়া কিশোর বলিল, 'তা সতেরো-আঠারো হবে—'

'বিয়ে হয়েছে?'

'বোধ হয় না। কপালে সিঁদুর দেখলাম না।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিমলা বলিল, 'অত বড় আইবুড়ো মেয়ে তোমার সামনে বেরুল? হ্যাঁ ঠাকুরপো, হিন্দু বটে তো?'

কিশোর বলিল, 'কী জানি ভাই, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে যে রকম ড্রয়িংরুম সাজাবার ঘটা, ব্রাহ্ম হওয়াও বিচিত্র নয়।'

বিমলা বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ঐ ঠিক বলেছ—বেম্মই হবে। বেম্মরা শুনেছি কেউ কেউ ঐ রকম হয়, সাদা কথা বুঝতে পারে না, চোখ খুলে দেখতে পায় না, আরও কত কী তোমার দাদা তামাশা করে বলতেন—'

অকস্মাৎ তীর্থনাথের কথা অজ্ঞাতসারে বিমলার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে তাহাদের প্রফুল্ল রহস্যালাপ যেন হেঁচকা দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যদিও কিশোর মনে মনে জানিত যে, দিবারাত্রির মধ্যে অন্তত কুড়ি ঘণ্টা স্বামীর চিন্তা সকল কাজকর্মের অন্তরালে বিমলার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তবু কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে ইঙ্গিতেও কখনও স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই। স্বামীর কথা সে আলোচনা করিতে চাহে না, একান্ত নিজস্ব করিয়া রাখিতে চায়, তাহা কিশোর বুঝিয়াছিল, তাই সে-ও কখনও তীর্থনাথের কথা তোলে নাই। কিন্তু আজ সকল আলোচনার ঊর্ধ্বস্থিত এই অন্তরতম কথাটি যখন বিমলারই মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল, তখন কিশোর যেন বিস্ময়ে ব্যাথায় চমকিয়া উঠিল!

বিমলা ম্লানমুখে জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিশোর বিষণ্ণভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ভাত দেবে চলো, বৌদি! খিদে পাচ্ছে।'

সে রাত্রিতে তাহাদের মধ্যে আর কোনও কথা হইল না।

৫

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পর জলযোগ করিতে বসিয়া কিশোর বলিল, 'ওরা ব্রেহ্ম নয়—হিন্দু।'

বিমলা বলিল, 'কারা?—ওঃ, পাশের বাড়ির কথা বলছ? তা এরি মধ্যে খবর পেলে

কোত্থেকে? দীনবন্ধুবাবু বললেন বুঝি?'

এক টুকরা লুচি মুখে পুরিয়া কিশোর বলিল, 'হুঁ।'

অল্প হাসিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'তা আর কী কী খবর নিলে? শুধু হিন্দু হলে তো চলবে না, কী জাত?'

কিশোর লুচি চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'জাত বামুন—মুখুজ্জে।'

বিমলা হাসিয়া বলিল, 'যাক, তবে তো সবই ভাল। এখন আমি গিয়ে একবার দেখেশুনে এলেই হয়।'

সন্দিগ্ধভাবে বিমলার মুখখানা নিরীক্ষণ করিয়া কিশোর বলিল, 'তার মানে কী হল?'

বিমলা বলিল, 'ঐ দেখো, চোরের মন বোঁচকার দিকে। মানে আবার কী হবে? নতুন প্রতিবেশী এসেছেন—সেদিন অত ভদ্রতা করলেন—ওঁদের বাড়ি গিয়ে ভাব-সাব আলাপ-পরিচয় করতে হবে না? সেই কথাই তো বলছি, একদিন গিয়ে দেখা-শুনা করে আসব।'

'উঁহু, কৈফিয়ত খুব জোরালো শোনাচ্ছে না। কথার মধ্যে কী একটা ইশারা ছিল, এবার সেটা সামলে নিলে।'

'কিছু সামলে নিইনি। তোমার মনে সন্দেহ, তাই ও-কথা ভাবছ।'

'আর তোমার মনে সন্দেহের নামগন্ধও নেই?'

'না, তুমি আমার লক্ষ্মণ দেওর, তোমাকে কি সন্দেহ করতে পারি?' বলিয়া সস্নেহ-কৌতুক-তরল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

কিশোর আহারে মন দিল।

দু'-একটা অন্য কথার পর বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে. আচ্ছা ঠাকুরপো, মেয়েটি দেখতে কেমন?'

এবার কিশোরের পালা, সে বলিল, 'কোন্ মেয়েটি?'

'কোন্ মেয়েটি আবার—পাশের বাড়ির মেয়েটি?'

'ও', কিশোর বিবেচনা করিয়া বলিল, 'কালো।'

'কার মত গায়ের রং হবে—আমার মত?'

'বললুম না কালো? তুমি কি কালো?'

'আচ্ছা, তবে আমাদের ঝির মত?'

'না, অতটা নয়। এই ধরো, আমার ওপর আরও দু' পোঁচ।'

বিমলা বিচারকের মত মুখ করিয়া বলিল, 'তাহলে কালো বলা চলে না—শ্যামবর্ণ।'

'বেশ, তবে শ্যামবর্ণই।'

'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও হতে পারে।'

'তা পারে, আশ্চর্য নয়।'

'আচ্ছা। আর মুখ-চোখ?—গড়ন?'

কিশোর যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'মুখ-চোখ—আছে। আর গড়ন যতদূর মনে পড়ছে—'

'না ঠাট্টা নয়। সত্যি বলো, মুখ-চোখ ভাল নয়?'

কিশোর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'কি জানি বৌদি, আমি অত ভাল করে দেখিনি।'

বিমলা বলিল, 'তুমি বড় লাজুক, ঠাকুরপো; ভাল করে মুখের পানে তাকাতেও পারনি বুঝি?'

কিশোর তড়োতাড়ি বলিল, 'না না, তাকাব না কেন? দেখতে মন্দ নয়—চলনসই। কিন্তু বৌদি, পরের বাড়ির মেয়ের সম্বন্ধে এ-সব আলোচনা করা কি উচিত? তোমার সম্বন্ধে যদি কেউ এভাবে আলোচনা করত, আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগত না।'

'আমরা মুখ্যু মেয়েমানুষ, অমন আলোচনা করে থাকি। তাহলে মেয়েটি চলনসই?'

অনিচ্ছাভাবে কিশোর বলিল, 'হ্যাঁ।'

বিমলা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো, আজ মেয়েটিকে আমি দেখেছি। আমার ঘরের গলির দিকের জানলা দিয়ে ওর শোবার ঘর দেখা যায়।'

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিশোর বলিল, 'তবে আমাকে এত জেরা করলে কেন?'

'দেখছিলুম, সত্যি কথা বল কিনা।'

আশ্চর্য হইয়া কিশোর বলিল, 'সত্যি কথা বলব না কেন?'

'কী জানি, যদি লুকোও।'

'তোমার মনের কথাটা কী বলো তো, বৌদি?'

বিমলা বলিল, 'আমার মনের কথা আবার কী? তোমার মনের কথাই জানতে চেয়েছিলুম।'

'আমার মনের কথা হচ্ছে এই যে, একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু তার নাক, মুখ, চোখ, রঙ, গড়ন কেমন—এ নিয়ে আমি মনে মনেও কোনরকম আলোচনা করিনি।'

মনে মনে হাসিয়া বিমলা বলিল, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি— নইলে আর চলনসই বলতে না। রঙ ময়লা হোক—কিন্তু মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, ঠাকুরপো। মহাভারত পড়েছ তো? স্বয়ংবর-সভা মনে আছে—'যে বিন্ধিবে লভিবে সে কৃষ্ণা গুণবতী!' ওকে একবার দেখেই মনে হল ও সেই কৃষ্ণা গুণবতী, যার জন্যে আর্যাবর্তের রাজারা সব উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। সে-ও কালো ছিল, ঠাকুরপো।'

কিশোর কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে উপরে উঠিয়া গেল। ভ্রমণোপযোগী জামা-কাপড় পরিয়া, ছড়ি হাতে সে নামিয়া আসিতেই বিমলা বলিল, 'এই নাও, পান ধরো। আর মুখগোমড়া করে থাকতে হবে না। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের সম্বন্ধে অমন জিজ্ঞেস করে—ওতে দোষ হয় না। নাও, এবার হাসো তো দেখি!'

কিশোর হাসিয়া ফেলিল, 'না বৌদি, এ ভারি অন্যায়—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, অন্যায়। কিন্তু তুমিও এবার থেকে আমার কাছে সত্যি কথা বোলো—লুকিও না।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে কলঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

৬

দিন আট-দশ পরের কথা। হঠাৎ গুমট গরম শেষ হইয়া বর্ষা নামিয়াছে। ক'দিন ধরিয়া মেঘগুলা আকাশের চারিপাশে ঘুরিয়া জটলা পাকাইয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল, আজ দ্বিপ্রহরে সকলে একজোট হইয়া প্রবলবেগে বর্ষণ শুরু করিয়া দিল। সেইসঙ্গে ঠান্ডা বাতাস দিয়া শহরের তাপক্লিষ্ট অর্ধসিদ্ধ মানুষগুলার অঙ্গে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া দিতে লাগিল।

কিশোর ভিজিতে ভিজিতে কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিল। বিমলা জানিত, সে ছাতা লইয়া যায় নাই, তাই আগে হইতেই জামা-কাপড়, তোয়ালে ইত্যাদি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সে বলিল, 'খুব ভিজেছ তো? নাও, এখন তাড়াতাড়ি ওগুলো ছেড়ে

তোয়ালে দিয়ে গা মোছো। ছাতা নিয়ে বেরুলে বুঝি কোট-প্যাণ্টলুনের অপমান হয়?'

ভিজা জুতা-মোজা খুলিতে খুলিতে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত কিশোর বলিল, 'আজ খুব ভিজেছি। কিন্তু আশা মেটেনি, খালি গায়ে বিষ্টিতে ভিজতে না পারলে আরাম হয় না।' বলিয়া কোট ও কামিজ খুলিয়া মাটিতে ফেলিল।

বিমলা বলিল, 'আচ্ছা, আর একদিন ভিজো। এখন আগে শুকনো তোয়ালে নিয়ে গা-মাথা মুছে ফেলো তো। আমি এইখানেই তোমার খাবার নিয়ে আসছি।'

খালি গায়ে প্যাণ্টলুন পরিয়া কিশোর হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'বৌদি, চলো, দু'জনে তেতলার ছাদে উঠে খানিক ভিজি গে!'

বিমলা বলিল, 'অ্যাঁ! আবার ভিজবে! এই না সারাটা পথ ভিজে এসেছ? না না, আর ভিজলে অসুখ করবে।'

কিশোর আবদার করিয়া বলিল, 'লক্ষ্মীটি বৌদি, একবার চলো। বেশী নয়—পাঁচ মিনিট! প্রথম বর্ষা নেমেছে, আজ ভিজলে কি অসুখ করে? অন্তত আমার করবে না! ভিজতে ভারি ইচ্ছে করছে বৌদি, চলো!'

বিমলার চক্ষু দিয়া সস্নেহ কৌতুক ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে বলিল, 'কী ছেলে-মানুষী বলো তো! তুমি কি স্কুলের ছেলে যে, ক্লাস পালিয়ে জলে ভিজতে যাবে?'

'গলায় প্যাণ্টলুন দিয়ে বলছি বৌদি, চলো।'

'কিন্তু আমার যদি ভিজে চুলে থেকে অসুখ করে—'

'না করবে না' বলিয়া মহানন্দে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বিমলাকে উপরের খোলা ছাদে সে লইয়া চলিল।

খালি গা, খালি পা, কেবল প্যাণ্টলুন-পরা কিশোর বিমলাকে টানিয়া মুক্ত ছাদের বৃষ্টিধারার মধ্যে পদার্পণ করিয়াই সোল্লাসে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিল—

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা—'

হঠাৎ কিশোর থামিয়া গেল।

'থামলে যে—' বলিয়া কিশোরের ত্রস্ত দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিমলা দেখিল, গলির অপর পারের আর একটি বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়াইয়া শ্যামশ্রীমতী বর্ষার মতই আর-একটি নবযৌবনা তরুণী চুল খুলিয়া দিয়া উর্ধ্বমুখী হইয়া যেন এই নববারিধারা সর্বাঙ্গ দিয়া গ্রহণ করিতেছে।

কিশোরের কাব্যোচ্ছ্বাস কানে যাইতেই সুহাসিনী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। ক্ষণেকের জন্য কিশোর হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একবার নিজের অর্ধ-নগ্ন মূর্তির দিকে সত্রাস দৃষ্টিপাত করিয়া বিমলাকে ছাড়িয়া উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়া পলায়ন করিল।

বিমলা নিজের ঘরে গিয়া ভিজা থান ও শেমিজ বদলাইয়া আসিয়া দেখিল, কিশোর শুষ্ক জামা-কাপড় পরিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছে।

সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী? পালিয়ে এলে যে?'

কিশোর বলিল, 'দেখ বৌদি, আজ রাত্তিরে কিন্তু খিচুড়ি রাঁধতে হবে। মুসুর ডালের খিচুড়ি আর হাঁসের ডিম, আর কিছু নয়।'

বিমলা বলিল, 'আচ্ছা খিচুড়ি না হয় হবে, কিন্তু অমন উঠি-কী পড়ি করে পালিয়ে এলে কেন, সেটা তো আগে বলো।'

'পালিয়ে আবার কখন এলুম? তোমার যেমন কথা। আমি তো আস্তে আস্তে নেমে

এলুম।

'তাই বুঝি? ওর নাম আস্তে আস্তে নেমে আসা? আমি ভাই সেটা বুঝতে পারিনি, মনে করেছিলুম, বুঝি পালিয়ে এলে।'

কিশোর লজ্জিত মুখে বলিল, 'আচ্ছা, তুমিই বলো বৌদি, লজ্জা হয় না? কী বেশে আমি ছিলুম বলো তো? শুধু একটা প্যাণ্টুলুন। ঐ বেশে ভদ্রমহিলার কাছে ধরা পড়লে সঙ্কোচ হয় না?'

'কিন্তু আমিও তো একজন ভদ্রমহিলা, আমাকে দেখে তো একটুও লজ্জা হল না! হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলে!'

'হ্যাঁ, তুমি আবার ভদ্রমহিলা হতে গেলে কোন দুঃখে? তুমি তো বৌদি।'

'বৌদির বুঝি ভদ্রমহিলা হতে নেই?'

'না। বৌদি স্রেফ বৌদি।'

কিশোর নিজ মনে কিছুক্ষণ যেন গবেষণা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'কী আশ্চর্য, বৌদি! তুমি আজ বললে বলে খেয়াল হল কিন্তু তোমার কাছে যে সঙ্কোচ করে সম্ভ্রম করে চলা দরকার, এ কখনও আমার মনেই হয়নি। এক দিনের জন্যও ভাবিনি যে, তুমি আমার পর, তোমার কাছ থেকে সন্তর্পণে নিজেকে ঢেকে রাখা উচিত। আচ্ছা, কেন এমন হল? আমি তো ভেবেচিন্তে কিছুই করিনি!'

বিমলা কথা কহিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

কিশোর কতক নিজমনেই বলিতে লাগিল, 'আর তাই বা আশ্চর্য কেন? আপনার লোকের কাছে আবার লজ্জা সঙ্কোচ কে করে থাকে! যারা পর, যাদের সঙ্গে শুধু মুখের আলাপ, তাদের জন্যেই না ঐ সব! তোমাকে তো প্রথম দিন থেকেই পর বলে মনে করতে পারিনি। কী জানি কী করে মনে বসে গিয়েছিল যে, তুমি আমার নিতান্ত আপনার। আমার নিজের বড় দিদি বা ছোট বোন নেই, মাকেও ভাল করে মনে পড়ে না, কিন্তু তাঁরা যদি থাকতেন, তা হলেও বোধ হয়, তাঁদের তোমার চেয়ে বেশী আপনার বলে মনে করতে পারতুম না।' এই বলিয়াই একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিমলার গণ্ড বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'ঠাকুরপো, লোক-দেখানো কথা নয়, সত্যিই আমি তোমার দিদি—আমি তোমার ছোট বোন। তুমি আমার আপনার মা'র পেটের ভাই। উঃ তোমাকে না পেলে আমি যে কী করতুম!' বলিয়া নিজেকে আর সংবরণ করিতে না পারিয়া বিমলা অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিমলার অন্তরের নিগূঢ় আবেগকে এমন করিয়া নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা কিশোরের ছিল না এবং কেন যে তাহার মত স্বভাবত চাপা লোক এতগুলা মনের অন্তরতম কথা ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আজ এই আকস্মিক বর্ষাগমে তাহার মনের মধ্যে কী এক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাই বিমলার স্নেহোদ্গত চোখের জল তাহাকে দুঃখ না দিয়া যেন কানায় কানায় ভরিয়া দিয়া গেল। সে জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, কী অদ্ভুত বস্তু এই নারীর হৃদয়। ইহার ভালবাসার পরিধির মধ্যে আত্মপর বিচারের এতটুকু স্থান নাই। ভগিনীরূপে—মাতৃরূপে—পত্নীরূপে যখনই সে ভালবাসিয়াছে, তখনই সম্ভব-অসম্ভবের গণ্ডী ছাড়াইয়া, শত বাধাবিঘ্ন মাড়াইয়া স্বচ্ছন্দে অবহেলে চলিয়া গিয়াছে, দেহ দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, ইহকাল-পরকাল দিয়াছে, তবু ভালবাসার এক বিন্দু লাঘব করে নাই। শৈশব হইতেই নারীর স্নেহ-ভালবাসা পাইবার সুযোগ কিশোরের হয় নাই, কিন্তু এতকাল এ অভাব সে ভাল করিয়া অনুভব করিতে

পারিত না। আজ তাহার পূর্ণ-যৌবনের ভরা আকাঙ্ক্ষার দিনে কোথা হইতে এই একান্ত নিঃসম্পর্কীয়া রমণী আসিয়া ভাই বলিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল এবং ভগিনীর অপরাজেয় দাবি জানাইয়া দুটি অর্ধস্ফুট অবরুদ্ধ কথায় নিজের বুভুক্ষিত অন্তর উদঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিল! নিজের দিক হইতে কিশোর যে বিমলাকে পরমাত্মীয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহাকেও ছাপাইয়া ভাসাইয়া তাহার প্রতি বিমলার এই বিপুল স্নেহের পরিচয় কিশোরের হৃদয়কে একেবারে প্লাবিত করিয়া দিল। পুলকিত রসাপ্লুত অন্তরে সে ভাবিতে লাগিল বৌদিদি তাহাকে এত ভালবাসেন।—ঠিক নিজের ভাইয়ের মত! সে-ও তো তাঁহাকে আপনার ভগিনীর মতই দেখে কিন্তু ওঁর তুল্য ভালবাসা তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া এমন করিয়া ভালবাসা, পুরুষ তো দূরের কথা কয়জন স্ত্রীলোকেই বা পারে? কি রূপে, কি গুণে, তাহার এই বৌদিদি একেবারে অদ্বিতীয়, কোথাও তাঁহার দোসর নাই। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—কী স্ত্রী-ই তীর্থদা হারাইয়াছে!

'কিশোরবাবু, আজ আর কোথাও বেরুবেন নাকি? তার চেয়ে আসুন না, এইখানে বসেই গল্প-সল্প করা যাক।'

কিশোরের চিন্তার জাল ছিন্ন হইয়া গেল, সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বিনয়কৃষ্ণবাবু নিজের বাড়ির জানালায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহাদের সহিত কিশোরের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল। বালকের মত সরল বৃদ্ধটিকে সে মনে মনে বড় শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এতখানি পাণ্ডিত্যের সহিত এতটা ছেলেমানুষী যেমন তাহার কৌতুকপ্রদ বোধ হইত, তেমনই তাঁহার নিরহংকার সহজ শিষ্টতা এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের সহিত সমান ব্যবহার তাহার প্রীতিও আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল।

সে হাসিয়া বলিল, 'যেতে পারি, কিন্তু আজকের দিনে গরম গরম মুড়ি চালভাজা খাওয়ানো চাই।'

বিনয়বাবু মুখখানা নিরাশ করিয়া বলিলেন, 'এত বড় আশ্বাস কি আমি আপনাকে দিতে পারব? আর দিলেও যদি কথা না রাখতে পারি! সংসারের ঐ বিভাগটি আমার এলাকায় নয়।' একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আর বাকি সব বিভাগই যেন আমার এলাকায়! তা যাক, সুহাসকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। শেষে রোখের মাথায় কথা দিয়ে ফেলে অপদস্থ হব।'

সুহাসিনী বোধ হয় ঘরের মধ্যেই ছিল, তাহার কণ্ঠস্বর শুনা গেল, 'উনি আসুন তো। তারপর দেখা যাবে।'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'শুনতে পেলেন তো? এরকম ভাসা-ভাসা অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে যদি আসতে রাজী থাকেন তো বলুন।'

'আচ্ছা, ওতেই হবে' বলিয়া কিশোর নামিয়া গেল। কিশোরের জুতার শব্দ শুনিয়া বিমলা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো, খাবার খেয়ে বেরোও।'

'বিনয়বাবুর কাছ থেকে এইমাত্র নিমন্ত্রণ পেলুম। এখন আর কিছু খাব না, বৌদি!' বলিয়া কিশোর বাহির হইল।

বিনয়বাবুর ড্রয়িংরুমে বসিয়া তাঁহার সহিত একথা-সেকথা আলাপ করিতে করিতে মিনিট পনেরো কাটিবার পর, থালার উপর একরাশ চিঁড়াভাজা, মাড়োয়ারীর দোকানের ডালমুট ও পাঁপরভাজা লইয়া সুহাসিনী প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, 'আপনার ফরমাশ-মত হল না,—কিন্তু ঘরে আর কিছু ছিল না।'

কিশোর খাদ্যদ্রব্যগুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'একেই বলে, পিপাসিত

হয়ে চাহিলাম বারি, এনে দিল মকরন্দ! কোথায় চেয়েছিলুম মুড়ি চালভাজা, এল কিনা পাঁপরভাজা ডালমুট!—কিন্তু একটা পাত্রেই কি সকলের চলবে!'

সুহাসিনী বলিল, 'বাবা তো খাবেন না, ওঁর সহ্য হয় না।'

কিশোর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, 'তবে কি আমি একাই এতগুলো খাব? আমার শরীরের আয়তন একটু বড় বলে কি আপনি আমাকে রাক্ষস মনে করলেন? আমি কি ফাঁপা?'

'না না, আপনি আরম্ভ করুন না। খেতে না পারেন পড়ে থাকবে।'

'বেশ, কিন্তু নষ্ট হলে দোষ দেবেন না।'

'আপনি বোধ হয় চা খান, কিন্তু ঐ জিনিসটা দিতে পারলুম না। আমরা কেউ চা খাইনে।'

মাথা নাড়িয়া কিশোর বলিল, 'আমিও না। ওটা কোন কালেই বরদাস্ত হয় না।'

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল।

বিনয়বাবু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'জল থেমেছে দেখছি। পুরো চার ঘন্টা একদমে বৃষ্টি হল।'

কিশোর চকিতের ন্যায় একবার সুহাসিনীর দিকে চোখ তুলিয়া আবার চিঁড়া-ভাজায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, এ বৃষ্টিটার দরকার হয়ে পড়েছিল, গরম যেন আর সহ্য হচ্ছিল না।'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'দেখো, আমাদের দেশে এই বর্ষার আগমন একটা অদ্ভুত জিনিস, অন্য কোথাও এমনটি পাবে না। সেই প্রাচীনকাল থেকে কত কবিই না এর কথা লিখে গেছেন, কিন্তু আজও তার শেষ হয়নি। অসহ্য গরমে মানুষ পুড়ে যাচ্ছিল, গাছপালা শুকিয়ে উঠেছিল, নদী কেবল বালুসার হয়ে পড়েছিল, এমন সময় কোথা থেকে মেঘ এসে আকাশ অন্ধকার করে দিল, প্রবল জলধারায় পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে গেল। এই দ্রুত পট পরিবর্তনে মানুষের মনে এমন একটি খুশির ভাব জেগে উঠে যে, তার আত্মার উল্লাস শত শত কাব্যে গানে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আরও কত বিচিত্রভাবে যে এই সহসা-মুক্ত মানব-মন আত্মপ্রকাশ করে তার ইয়ত্তা নেই।'

'ঠিক কথা' বলিয়া কিশোর এবার আর সুহাসিনীর দিকে তাকাইল না। তাহার নিজের সহসা-মুক্ত মানব-মন সম্প্রতি যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা যদি সুহাসিনী ছাদের উপর হইতে দেখিয়া ফেলিয়া থাকে তবে আপাতত তাহার সহিত চোখাচোখি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

বিনয়বাবু বলিতে লাগিলেন, 'সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় নেই, কিন্তু যেটুকু আছে, তা থেকে বুঝতে পারি যে, তার ঋতু-বর্ণনার মধ্যে বর্ষা ঋতুই চৌদ্দ আনা স্থান জুড়ে আছে। সেকালের কবিরা যেন সব ঋতুকে ছেড়ে বর্ষাকেই বেশী করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। আর শুধু সেকালের কবিই বা বলি কেন? একালের রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরো—তাঁর গানে কি বর্ষার সুর বেশী করে বাজেনি?"

কিশোর বলিল, 'রবীন্দ্রনাথকে একেলে কবি বলবেন না, আমাদের দেশের তরুণরা তাহলে ভয়ঙ্কর চটে যাবে।'

বিস্মিত হইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, 'চটে যাবেন কেন?'

'ওর মধ্যে কেন নেই। চটে যাওয়াই তাঁদের স্বভাব।'

বিনয়বাবু বুঝিতে পারিলেন না। তখন কিশোর তরুণদের মনোভাব তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিল। বৃদ্ধের মনে সত্যকার কাব্যরসবোধ ছিল, তিনি ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'না না, ও হতেই পারে না, কিশোরবাবু। আমাদের দেশের নূতন

সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপভোগ করতে পারেন না এ কথা আমি ভাবতেই পারি না। রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমবাবুকে বাদ দিলে আমাদের ভাষায় কি থাকে বলুন দেখি?'

'কিছু না—' বলিয়া কিশোর সহসা নিজের সম্মুখস্থ থালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'কিন্তু এ দিকেও যে কিছু নেই দেখছি! এ কী রকম হল? সত্যিই কি সব খেয়ে ফেললুম নাকি?'

মৃদু হাসিয়া সুহাসিনী বলিল, 'হ্যাঁ, অন্যমনস্ক হয়ে খেয়ে ফেলেছেন।'

কিশোর দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ভেবেছিলুম কম খেয়ে আপনাদের কাছে প্রশংসা অর্জন করব! কিন্তু আমার ভাগ্যই খারাপ, নিজের প্রকৃত স্বরূপ আমি চেপে রাখতে পারি না, অসাবধানে প্রকাশ হয়ে পড়ে।'

চাকর আসিয়া শূন্য থালা-গেলাস লইয়া যাইবার পর কিশোর রুমালে মুখ-হাত মুছিতে মুছিতে বলিল, 'এবার তাহলে মধুরেণ সমাপয়েৎ করুন—একটা গান হোক। সেদিন অর্ধপথে আপনার গানে বাধা দিয়ে অবধি মনের গ্লানি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি নে।'

সুহাসিনী বলিল, 'তাই গান শুনে বুঝি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান?'

কিশোর উত্তর করিল, 'এমনও তো হতে পারে গঙ্গাস্নান করে পাপ ধুয়ে ফেলতে চাই।'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, একটা গাও না সুহাস।'

সুহাস অর্গানের কাছে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ লঘুস্পর্শে পর্দাগুলির উপর আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ পূর্ণকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

আমার নিশীথরাতের বাদলধারা
এসো হে—গোপনে—

কিশোরের মন আজ পূর্ব হইতেই নানা কারণে ছায়ানিবিড় ও রসঘন হইয়া ছিল, সুহাসিনীর কণ্ঠস্বর তাহার মধ্যে যেন তড়িদ্‌বিকাশের মত চমকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। সে মুখ নীচু করিয়া একাগ্র তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল—

একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে—
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া॥

গান থামিলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে ফিরিয়া আসিল। তন্দ্রাবিষ্ট কণ্ঠে বলিল, 'কি সুন্দর আপনার গলা! আমি ডুবে গিয়েছিলুম।'

ইহা যে মামুলি চাটুবাক্য নহে, মুগ্ধ হৃদয়ের স্বতরুৎসারিত স্তুতি, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুহাসিনীর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। কোনমতে লজ্জা দমন করিয়া সে বলিল, 'এবার আপনি একটা গান করুন।'

চমক ভাঙ্গিয়া কিশোর বলিল, 'আমি গান করব? আমি তো গাইতে জানি না।'

ছদ্ম গাম্ভীর্যের সহিত সুহাসিনী বলিল, 'জানেন বৈকি। তখন যে ছাদের উপরে গাইছিলেন।'

এবার কিশোরের লাল হইবার পালা, সে-কার্য সে ভাল করিয়াই করিল। কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া কোন রকমে বলিল, 'অ্যাঁ—ও—আপনি শুনেছিলেন বুঝি? তা সে তো গান নয়। কী মনে হল তাই একটা কবিতা আওড়াচ্ছিলুম—আজ এই হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে—আপনিও তো ছাদে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন—বাদলার ছোঁয়াচ তো

আপনারও—'

তাহাকে এই বিপন্ন অবস্থা হইতে মুক্তি দিবার জন্যই যেন এই সময় সাহেব-বেশী অনুপমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করলি।

ওয়াটারপ্রুফ ও টুপি বাহিরে টাঙ্গাইয়া ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখে কিশোরকে দেখিয়া অনুপম মুখখানা অন্ধকার করিয়া বিনয়বাবুর পাশে গিয়া বসিল। চেষ্টা করিয়া মুখে একটু শুষ্ক হাসি আনিয়া বলিল, 'একটা কাজে এদিকে এসেছিলুম, তাই ভাবলুম দেখা করে যাই।'

৭

সেই প্রথম দিনের সাক্ষাতের পর, ইতিমধ্যে এই বাড়িতেই কিশোরের সহিত অনুপমের আরও দুই-তিনবার দেখা হইয়াছে। কিশোর যে চোর-ডাকাত নহে, সত্য সত্যই একজন ভদ্রলোক, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবার পর অনুপমকে অনেক হাসি তামাশা, বিদ্রূপ ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা বেশী খোঁচা দিয়াছিল সুহাসিনী। তাহার ভুরু দেখিয়া মানুষ চিনিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে চোখা-চোখা দুই-চারিটি কথা বলিয়া তাহার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। এই কারণে কিশোরের উপর অনুপম প্রসন্ন ছিল না। গুন্ডার পরিবর্তে কলেজের প্রফেসর বনিয়া গিয়া কিশোর যে তাহাকে সুহাসিনী ও তাহার পিতার কাছে অত্যন্ত খেলো করিয়া দিয়াছে, এ আক্রোশ সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। সর্বোপরি আরও একটা কারণ হইয়াছিল—যাহাতে কিশোরের বিরুদ্ধে তাহার মন একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিনয়বাবু যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া হাতিবাগান অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর সহিত নিকট-প্রতিবেশিনী অনুপমের মাতা হেমাঙ্গিনীর শীঘ্রই আলাপ জমিয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারাও আলোকপন্থী —হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও পর্দাপ্রথার ধার ধারিতেন না। তাহার উপর হেমাঙ্গিনী বিধবা হইলেও খুব জবরদস্ত স্ত্রীলোক, অপরিণতবয়স্ক পুত্রের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই স্বর্গীয় স্বামীর বিষয়-সম্পত্তি পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সুতরাং সুহাসিনীর মাতার সহিত তাঁহার আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। সেই সূত্রে অনুপম এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করিল। কিন্তু বন্ধুর পুত্র হইলেও বিনয়বাবুর স্ত্রী তাহাকে সুহাসিনীর কাছে বেশী ঘেঁষিতে দিতেন না। এই অকালপক্ক নিরতিশয় জ্যাঠা ছোকরাকে তিনি গোড়া হইতেই দেখিতে পারিতেন না; এবং এই জন্যই পাছে পরে কোনরূপ গোলমাল হয়, সুহাসিনীকে তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে দূরে রাখিতেন।

কিন্তু ঠিক সঙ্কট সময়েই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। সুহাসিনীর বয়স তখন পনেরো বছর; অনুপমের তেইশ। অনুপম ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল এবং সুহাসিনীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। সে তখন আইন পাস করিয়াছে এবং পিতৃবন্ধু এক অ্যাটর্নির অফিসে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সে যে সুহাসিনীর যোগ্য পাত্র, সে বিষয় কি তাহার মনে, কি তাহার মাতার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বিনয়কৃষ্ণবাবুর কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি ছিল না, পত্নীর মৃত্যুতে তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইভাবে বছরখানেক কাটিবার পর শোকের প্রথম ধাক্কাটা কিছু প্রশমিত হইলে, হেমাঙ্গিনী আসিয়া কথায় কথায়

যখন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন যে, সুহাসিনীর বিবাহের বয়স হইয়াছে,—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুপমচন্দ্র আসিয়া ভাবে ভঙ্গিতে জানাইয়া দিল যে, এই কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিতে সে অনিচ্ছুক নহে, এমন কি বিশেষ ইচ্ছুক, তখন বিনয়বাবু চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। জগতে এই এক কন্যা ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, সেই কন্যাকেও যে শীঘ্রই বিবাহ দিয়া পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার বুক প্রায় ভাঙিয়া গেল। কিন্তু নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কন্যাকে তো চিরকাল কুমারী করিয়া রাখা যায় না! তাই একদিন ভারাক্রান্ত বুকে তিনি কন্যার সম্মুখে কথাটা পাড়িলেন। কিন্তু বিবাহের নাম শুনিয়াই সুহাসিনী তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং অস্ফুটভাবে যাহা বলিল, তাহা হইতে এইটুকুই বুঝা গেল যে, পিতাকে ছাড়িয়া সে কোনমতেই কোথাও যাইতে পারিবে না।

সেই অবধি পিতাপুত্রীর মধ্যে ও প্রসঙ্গ আর উঠে নাই। কিন্তু অনুপম তিলমাত্র হতাশ না হইয়া অপরিসীম ধৈর্য সহকারে লাগিয়া আছে। সম্প্রতি তাহার মনে একটা আশাও জাগিয়াছিল যে, শীঘ্রই ইহার একটা নিষ্পত্তি হইতে পারে। সুহাসিনীর জন্মতিথির রাত্রিতে সে একটা সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

এমন সময় কোথা হইতে পাপগ্রহের মত কিশোর আসিয়া উদয় হইল, তখন আশংকায় দুর্ভাবনায় অনুপমের মনে তিলমাত্র সুখ রহিল না। এতদিন সে, সুহাসিনী তাহারই বাগদত্তা, এমন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া অন্যান্য সম্ভব অসম্ভব প্রতি-দ্বন্দ্বীকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু কিশোরকে সে কী করিয়া ঠেকাইবে, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিশোর সুহাসিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই যে ইহাদের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। বরং অপরপক্ষ হইতেই মিশিবার আগ্রহটা যেন একটু বেশী। গোবেচারা বিনয়বাবু গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে উৎসুক, এবং সুহাসিনীও—

সুহাসিনীর ব্যবহারই অনুপমকে সর্বাপেক্ষা বেশী আঘাত করিয়াছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া সে সুহাসিনীর পাশে পাশে ফিরিতেছে এবং নানা কৌশলে তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুহাসিনীও তাহার সহিত বাড়ির লোকের মত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে,—কিন্তু এত মাখামাখি সত্ত্বেও কোথায় যে একটা অলক্ষ্য সীমারেখা রহিয়া গিয়াছিল, অনুপম তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুহাসিনীর মনের অলঙ্ঘনীয় কৌমার্যের গণ্ডীর মধ্যে সে কোনদিন পা বাড়াইতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এখন সে সন্দেহের দূরদৃষ্টি দিয়া দেখিল যে, এতদিনে সে যাহা পারে নাই, আর একজন লোক দুই হপ্তার মধ্যে সেই গণ্ডীর মধ্যস্থলে ন্যায্য অধিকার স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। সে দেখিতে পাইল, যে দ্বার তাহার কাছে চিরদিন রুদ্ধ ছিল, সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া সুহাসিনী সলজ্জ স্মিতহাস্যে আর একজনকে ভিতরে পদার্পণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ইহাতে সে উদ্বেগ ও ঈর্ষার জ্বালায় নিরন্তর ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন তাহার দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত প্রভাব অক্ষুণ্ণই আছে, কোন নবাগত উমেদার তাহার উপর 'আঁচড়টি' কাটিতে পারে নাই।

আজ এই বাদল সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা আশঙ্কা মনে উদয় হওয়াতে সে ঝড়বৃষ্টি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং এ বাড়িতে প্রবেশ করিবামাত্র যখন সে কিশোরের গলা শুনিতে পাইল, তখন একপ্রকার মরিয়া হইয়াই স্থির করিল যে, আর বিলম্ব নহে, আজই একটা হেস্তনেস্ত সে করিয়া ফেলিবে।

'অনুপম আসন গ্রহণ করিলে বিনয়বাবু সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই দুর্যোগে কী এমন কাজ ছিল যে বেরুতে হল?'

প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া অনুপম মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, 'বিষ্টি পড়ে কলকাতা শহরটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন নোংরা, তেমনই প্যাচপেচে। এখন থেকে দু'মাস ধরে এই কাদা আর বিষ্টি চলল। রেনি সীজনের মত এমন যাচ্ছেতাই ন্যাস্টি সীজন আর নেই।'

যে ব্যক্তি দু'মাইল পথ জল ভাঙিয়া ও ধাবমান মোটরের ছিটা খাইয়া আসিয়াছে, সে এ কথা বলিতে পারে; কিন্তু এই ঘরে কিছু পূর্বেই এই বর্ষাঋতু লইয়া আর এক প্রকারের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। 'রেনি সীজন' যে বেশ উঁচুদরের 'সীজন', তাহা গান ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া উপস্থিত তিন জন একমত হইয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইতিমধ্যে বাহির হইতে আসিয়া অনুপম যখন বিরক্তভাবে সেই 'রেনি সীজনের' নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, তখন ঘরের মধ্যে মনের ঐক্য ও সহানুভূতিতে যে একটি আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। পলকের জন্য কিশোর ও সুহাসিনীর চোখাচোখি হইল কিন্তু দু'জনেই তৎক্ষণাৎ যেন পরস্পরের মনের ভাব বুঝিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

অনুপমের কথার বেসুরা ভাবটা সারিয়া লইবার অভিপ্রায়ে কিশোর বলিল, 'আপনি সারাটা পথ কাদা ঘেঁটে আসছেন বলেই ওরকমটা মনে হচ্ছে—নইলে বর্ষা ঋতুটা আমাদের তো ভালই লাগে।'

অনুপম তাচ্ছিল্যভরে বলিল, 'সিলি সেণ্টিমেণ্ট! ও-সব স্কুলমাস্টারি ঢঙ!'

কিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তা হবে। এখানে কিন্তু স্কুল মাস্টারই দলে ভারী। সে যাক, কিন্তু কাজের লোক হবার কত বিপদ দেখুন! আপনাকে এই দুর্যোগ মাথায় করে বেরুতে হয়েছে, আর আমরা বেকার লোক কেমন আরামে বসে বসে গল্প করছি।'

এ কথার মধ্যে আপত্তিজনক কিছুই ছিল না, কিন্তু অনুপম মনে করিল, কিশোর তাহাকে বক্র কটাক্ষ করিয়া হাসিতেছে। তাই সে-ও কণ্ঠস্বরে তীব্র শ্লেষ পুরিয়া নীরস-ভাবে বলিল, 'তাই তো দেখছি। সন্ধ্যাটা আজকাল আপনার মন্দ কাটছে না।' বলিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া একবার সুহাসিনীর দিকে তাকাইল।

কিশোর কিন্তু সে ইশারার ধার ঘেঁষিয়াও গেল না, সহাস্যে বলিল, 'তা—বলতে নেই—একরকম ভালই কাটছে। অন্তত উদরের দিক দিয়ে আমার অনুযোগ করবার কিছু নেই।'

'তা তো বটেই! ভদ্রসমাজে মেশবার সুযোগটা ঘাড়ে চেপে আদায় করে নিচ্ছেন—চক্ষুলজ্জার বালাই নেই।' কথাটা এত রূঢ় যে, বলিয়া ফেলিয়া অনুপমও যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। তারপর কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কথাটা লঘু করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইল না।

সুহাসিনী তাহার দিকে বিস্ময়মিশ্রিত একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আরক্তিম-মুখে তাহার দিকে সম্পূর্ণ পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল। কিশোর কিন্তু এ কথাও গায়ে না মাখিয়া পূর্ববৎ হাসিমুখে বলিল, 'চক্ষুলজ্জা থাকলেই ঠকতে হয়। আর ভদ্রসমাজে মেশবার সুযোগ পেয়েও যদি ছেড়ে দিই, তাহলে আমার মত অভাগা আর কে আ'ছ?'

অনুপমের দিকে পিছু ফিরিয়া বসিতেই সুহাসিনীর চৌকিখানা ঠিক কিশোরের মুখোমুখি হইয়া পড়িয়াছিল। সুহাসিনী তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিল, 'আমাদের যে কথা হচ্ছিল, তাই হোক। আপনার সঙ্গে যাঁকে ছাদে দেখলুম, তিনিই বুঝি আপনার

বৌদি?'

অনুপমের অশিষ্ট ও যার-পর-নাই ইতর ইঙ্গিতে যদি সে অপমানিত বোধ করিয়া থাকে, তাহারই সংশোধনের অভিপ্রায়ে যে সুহাসিনী এতটা কাছে সরিয়া আসিয়া এমন আগ্রহভরে কথা আরম্ভ করিয়াছে কিশোর তাহা বুঝিল, বলিল, 'হ্যাঁ, উনিই আমার বৌদিদি।'

অনুপমের মুখের উপর কে যেন কালির উপর কালি ঢালিয়া দিতে লাগিল। সে কেবল বিদ্বেষপূর্ণ চক্ষু মেলিয়া অন্তরঙ্গভাবে কথোপকথননিরত দু'জনের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সুহাসিনী প্রশ্ন করিল, 'ওঁরই বুঝি সে-রাত্রে মাথা ধরেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কী সুন্দর দেখতে আপনার বৌদিকে—চোখ যেন ফেরানো যায় না। আজ কতটুকুর জন্যেই বা দেখেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে, ওঁর মত সুন্দরী আর কোথাও দেখিনি।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, আমার বৌদিদির মত সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না।' বলিয়া কিশোর নিশ্বাস ফেলিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গভীর সহানুভূতিভরা দুই চোখ তুলিয়া সুহাসিনী বলিল, 'বয়স তো বেশী হয়নি, কতদিন ওঁর এ রকম হয়েছে?'

'এ রকম—? ও বৈধব্য! তা ছ'মাসের বেশী হতে চলল।'

তেমনিই অনুচ্চকণ্ঠে সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'ওঁর স্বামী কি আপনার নিজের দাদা ছিলেন?'

কয়েক ঘণ্টা পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিয়া কিশোর আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তার চেয়েও বোধ হয় বেশী আপনার ছিলেন।'

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও এ প্রসঙ্গ লইয়া সুহাসিনী আর প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিশোরের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিবার জন্য তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা শিষ্টতা-বিগর্হিত হইবে বলিয়া প্রশ্নগুলা তাহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াও সসঙ্কোচে ফিরিয়া গেল।

ঘরের অপর প্রান্তে অনুপম ইহাদের অনুচ্চ কথাবার্তা কিছুই শুনিতে পাইতেছিল না। উপরন্তু কী একটা কথা বিনয়বাবু তাহার কানের কাছে অনবরত বলিয়া চলিয়াছিলেন, অনুপম মাঝে মাঝে তাহার সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ও চক্ষু অন্যত্র পড়িয়াছিল।

দুইজন যুবক-যুবতী পরস্পরের খুব কাছাকাছি বসিয়া নীরব হইয়া থাকার মধ্যে এমন একটি নিবিড় বাণীহীন অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়—যাহা কাহারও চক্ষু এড়াইবার কথা নহে। তাই দূর হইতে এই দুইজনকে সেইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অনুপম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা কইতে চাই, একবার ও ঘরে শুনে যাও।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরাইয়া সুহাসিনী দেখিল, তাহারই উদ্দেশে অনুপম কথাগুলা বলিয়াছে। অনুপমের কণ্ঠস্বরে, তাহার অজ্ঞাতসারেই বোধ করি, এমন একটা আদেশের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল যে, মুহূর্তমধ্যে সুহাসিনীর মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। এই হাস্যময়ী মেয়েটি যে প্রয়োজন হইলে স্ফটিকখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইতে পারে, আজ তাহা প্রথম লক্ষ্য করিয়া কিশোর মনে মনে যেমন আশ্চর্য হইয়া গেল, তেমনই একটু পরিতৃপ্তিও অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, নারী-

চরিত্রের একটি অপরূপ বিকাশলীলা সে দেখিতেছে। এ ক্ষেত্রে অনুপমচন্দ্র যে এই বিকাশলীলার আঘাতে ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম করিয়াছে, তাহাতে তাহার পরিতৃপ্তির তিলমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না।

সুহাসিনীকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অনুপম আবার বলিল, 'শুনতে পেলে? একবার এ ঘরে এসো।'

সুহাসিনী দুই চোখে বিদ্রোহ ভরিয়া শক্তভাবে বলিল, 'আপনি কী বলতে চান এ ঘরেই বলুন, আমি শুনছি।'

'যাবে না?'

'না।'

অনুপমের মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে বুঝি এবার বারুদের মত ফাটিয়া পড়িবে। সুহাসিনী তাহা গ্রাহ্য না করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল; কিন্তু অনুপমের দৃষ্টি তাহাকে অতিক্রম করিয়া কিশোরের নিরপরাধ মস্তকের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। সুহাসিনী তাহাকে অপমান করিয়াছে বটে, কিন্তু এই লোকটা বসিয়া বসিয়া সেই লাঞ্ছনা দেখিতেছে এবং সম্ভবত উপভোগ করিতেছে। তাই আর সকলকে ছাড়াইয়া এই লোকটার উপরেই তাহার ক্রোধের শিখা গগনস্পর্শী হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অনুপমের মুখ দেখিয়া কিশোরের ভয় হইল—হয়তো এখনই সে একটা লজ্জাকর বিশ্রী কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। তাহার মত বাহিরের লোকের সম্মুখে পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে পাছে একটা অশোভন কলহ বাধিয়া যায়, তাই সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। উপায় থাকিলে একটা ছুতা করিয়া সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেও দ্বিধা করিত না। কিন্তু এ সময় বিদায় লইবার চেষ্টা করিলে সেটা যে নিতান্তই পলায়নের মত দেখাইবে, তাহা বুঝিয়া সে উঠিতে পারিল না।

নিজের উপস্থিতির জন্য কুণ্ঠিত হইয়া সে চুপি চুপি সুহাসিনীকে বলিল, 'অনুপমবাবু বোধ হয় অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, আপনি একবার ও ঘরে গেলে পারতেন।'

অধর দংশন করিয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া সুহাসিনী শক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল, উঠিল না।

অনুপম অসীম বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনয়বাবুর দিকে ফিরিল, 'আপনিই চলুন তাহলে। আপনার সঙ্গেও কথা আছে।'

ভিতরে ভিতরে কী একটা গোলমাল পাকাইয়া উঠিতেছে তাহা স্পষ্টভাবে না বুঝিলেও বিনয়বাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন।

পাশের ঘরটা বিনয়বাবুর লাইব্রেরি। সেখানে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিবার পর কিশোর ও সুহাসিনী আগের মতই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে কিশোর নড়িয়া-চড়িয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, 'আমার বোধ হয় উঠে যাওয়া উচিত ছিল। আমি বাইরের লোক—আমার সামনে কথা বলতে ওঁর অসুবিধা হচ্ছিল—'

সুহাসিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, 'আপনি যেমন বাইরের লোক, উনিও তো তাই।'

'তা হলেও'—কিশোর দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িল।

আরও কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে বসিয়া থাকিবার পর সুহাসিনীর হঠাৎ খেয়াল হইল যে, এ ঘরে তাহারা দু'জন ছাড়া আর কেহ নাই এবং তাহারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিয়া আছে। সুহাসিনীর শরীরের উপর দিয়া লজ্জার একটা ঢেউ বহিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং ঘরময় এটা-ওটা নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া শেষে দূরের একটা চেয়ারে গিয়া বসিল।

বিনয়বাবু ও অনুপম ফিরিয়া আসিতেই কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আজ

তাহলে উঠি। রাতও অনেক হল, প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে।' বলিয়া একবার দুই করতল একত্র করিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সুহাসিনী বাপের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল তাঁহার মুখ গম্ভীর এবং তাহার উপর একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে নিজের কেদারায় গিয়া বসিলেন, অনুপমও বোধ করি আবার বসিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সুহাসিনীকে অধীরভাবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সে আর বসিতে পারিল না; অনিশ্চিতভাবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে হঠাৎ একটা শুভ নিশি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

ইহারা চলিয়া যাইবার পর আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, গলাটা একবার সাফ করিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, 'তোমার মা আজ বেঁচে থাকলে এ-সব ভাবনা কিছুই আমাকে ভাবতে হত না, তিনিই সব করতেন। কিন্তু তিনি যখন নেই তখন যেমন করে হোক আমাকে করতে হবে। অথচ সংসারের এ সমস্ত ব্যাপারে আমি একেবারেই—'

কথাটা সমাপ্ত হইল না। বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

অনুপম তাঁহার কাছে সুহাসিনীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত না হইলেও, এমন খোলাখুলিভাবে স্বয়ং পাত্রের নিকট হইতে তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। অভিনবপন্থী হইলেও বিনয়বাবু হিন্দু—তাই বিবাহের প্রস্তাব কন্যাপক্ষের দিক হইতে আসাই তাঁহার কাছে শোভন ও সুষ্ঠু ঠেকে। অথচ কন্যাপক্ষের দিক হইতে কন্যার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ বা চেষ্টা করেন নাই—ভ্রমক্রমেও সৎপাত্রের অনুসন্ধান করেন নাই—এ আত্মগ্লানিও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। তাই অনুপমের প্রস্তাব নেহাত নির্লজ্জ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, তাঁহার নিজের দিক হইতে যখন কোন উদ্যোগই নাই, তখন অন্যের উদ্যোগে দোষ ধরিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সহসা অনুপমকে কথা দিতেও পারিলেন না। অনুপমের চেয়ে সুপাত্র যে বঙ্গদেশে বিরল নহে, এ জ্ঞান বিনয়বাবুর মত ভাল মানুষেরও ছিল; তাই নিজের অক্ষমতার দোষে, যে ব্যক্তি প্রথম পাণি-প্রার্থনা করিল তাহারই হস্তে কন্যাসমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। অনুপমকে বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি সুহাসের মন বুঝে তোমাকে বলব।' মনে মনে ভাবিলেন, সুহাস বড় হইয়াছে, সে যদি স্বেচ্ছায় পছন্দ করিয়া রাজী হয়, তবে তাঁহার আর ক্ষোভ করিবার কিছু থাকিবে না।

কিন্তু তবু তাঁহার সঙ্গিহীন পিতৃহৃদয় কন্যার সহিত আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় ম্রিয়মাণ ও ব্যথাতুর হইয়া উঠিল।

সুহাসিনীও তাঁহার অসম্পূর্ণ ভূমিকার কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে, বাবা? অনুপমবাবু কী বলে গেলেন?'

বিনয়বাবু কন্যার দিকে না তাকাইয়া চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, 'অনুপম তোমার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে গেল। তা—আমি তাকে বলেছি, এ বিষয়ে তোমার মতামত জেনে—'

অজ্ঞাতে সাপের ঘাড়ে পা দিয়া মানুষ যেমন চমকাইয়া উঠে, সুহাসিনী তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আজ এ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি অনুপম অনেক ধৃষ্টতা করিয়াছে বটে, কিন্তু এই শেষ ধৃষ্টতা সুহাসিনীর কাছে যেন তাহার সকল স্পর্ধাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল।

'এ হতে পারে না। তুমি—তাঁকে বলে দিও—এ অসম্ভব।' বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা

না করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কাব্যশাস্ত্র ও গল্প-উপন্যাসের সরস পৃষ্ঠা হইতে প্রণয়রূপী দেবতাটির পরিচয় আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। বাস্তব-জগতে এই ধনুর্ধর দেবতা যখন আমাদের পরিচিত কাহারও উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে চিনিতে আমাদের তিলার্ধ বিলম্ব হয় না। কিন্তু পরিহাস এই যে, ইনি যখন একদিন সহসা হাস্যমুখে আমাদেরই দ্বারে আসিয়া দাঁড়ান, তখন অনেকেই তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারি না।

পুরুষ—বিশেষ করিয়া যুবাপুরুষ সম্বন্ধে সুহাসিনীর মন এতদিন একপ্রকার উদাসীন নিষ্ক্রিয় হইয়াই ছিল। তাহাদের চালচলন কথাবার্তা মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কৌতুকাবহ মনে হইলেও কোনদিন ইহাদের প্রতি একটা স্থায়ী আকর্ষণ সে অনুভব করে নাই। জগতের অন্যান্য বহু কোটি প্রাণবন্ত জীবের মত এগুলিকেও সে ভগবানের এক-প্রকার সৃষ্টি বলিয়া নিরুৎসুক চিত্তে ও বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, সম্প্রদায়-হিসাবে ইহাদের প্রতি বিরাগ বা অনুরাগ কিছুই অন্তরে পোষণ করে নাই। অনুপমকেও সে সহজভাবে সরল চিত্তে এই যুবকজাতির পঙ্‌ক্তিভুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এতদিন পরে কিশোর নামক একটি যুবক আসিয়া তাহার পূর্বধৃত সমস্ত ধারণা ওলট-পালট করিয়া দিল। সর্ববিষয়ে যুবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও লোকটি যেন নিজের কোন্ বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে একেবারে শ্রেণীমুক্ত হইয়া পৃথকভাবে দেখা দিল। যুবক বটে—তবু যেন সে সাধারণ যুবক নহে। অন্যান্য সকলের সহিত তাহার যেন মস্ত একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। সুহাসিনীর কৌমার্যের নির্বিকার যোগনিদ্রা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর কৌতূহল এবং সর্বশেষে অদম্য আগ্রহ তাহার দেহ-মনকে অহরহ কিশোরের দিকে দুর্বার শক্তিতে টানিতে লাগিল।

দুইটি মানুষের মধ্যে পরিচয়ের একটা অবস্থা আছে যখন পরস্পর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ও জানিবার স্পৃহা দুইই নিঃশেষ হইয়া যায়; তখন তাহাদের মধ্যে সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—তা সে শত্রুতা, বন্ধুত্ব বা নির্লিপ্ততা যাহাই হউক। কিন্তু যেখানে তাহা হয় না, যেখানে জানিবার তৃষ্ণা জ্ঞানের সংগে সংগে আরও বাড়িয়া উঠিতে থাকে, কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় না, সেখানে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিটির মনোভাব লইয়া সতর্কভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

কিন্তু জাহাজের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত যাহার মন সকল কাজে অকাজে পাশের একখানা বাড়ির পানে স্থির-নিশ্চল হইয়া আছে, আর একজনের কলেজ যাইবার ও সেখান হইতে ফিরিবার সময়টাতে যাহাকে কোন অদৃশ্য শক্তি ঘাড় ধরিয়া আনিয়া শয়নঘরের জানালার পাশে দাঁড় করাইয়া দেয়, একজনের সহসা শ্রুত কণ্ঠস্বর যাহার বুকে মুগুরের মত ঘা মারিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া দিবার উপক্রম করে এবং প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর হইতেই যে উৎকণ্ঠিতা সন্ধ্যার একটি মধুময় প্রহরের জন্য উৎসুক প্রতীক্ষায় উন্মনা হইয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিতান্তই একটা অনাবশ্যক বাহুল্য বলিয়া মনে হয়।

মনের এইরূপ অবস্থার কথা সুহাসিনী কিন্তু কিছুই জানিতে পারে নাই। নিজের চিত্ত বিশ্লেষণ করিবার তাহার বয়স নহে, অপরূপ অনুভূতির আনন্দেই সে বিভোর হইয়া-

ছিল। তাই আর কাহারও চক্ষু দিয়া সে যদি আজ নিজের মনটা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ করি লজ্জায় মরিয়া যাইত। বাড়িতে অন্য স্ত্রীলোক বা সমবয়স্কা মেয়ে থাকিলেও হয়তো হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়া সে নিজের কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। কিন্তু সেরূপ কেহ না থাকায়, জীবনের এত বড় পরিবর্তনটা তাহার কাছে অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর বিনয়বাবু নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সুহাসিনী একা এই দীর্ঘ অলস বেলাটা কি করিয়া কাটাইবে ভাবিতে ভাবিতে নিজের ঘরের শয্যার উপরে বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া শুইয়া একখানা বই লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল, এমন সময় দরজার বাহির হইতে ঝির গলা শুনিতে পাইল, 'এই যে মা, এ দিকে আসুন। দিদিমণি নিজের ঘরে রয়েছেন।'

কে আগন্তুক আসিয়াছে, দেখিবার জন্য সুহাসিনী বই ফেলিয়া উঠিয়া বসিতেই পর্দা সরাইয়া বিমলা প্রবেশ করিল। সাদা থান ও শেমিজ, মাথার চুলগুলা টান করিয়া পিছনদিকে জড়ানো, গলায় কেবল ইষ্টকবচযুক্ত একগাছি সরু সোনার হার,—তাহাকে দেখিয়া সুহাসিনী কিছুক্ষণ মুগ্ধের মত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, সম্ভাষণ করিতেও ভুলিয়া গেল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'আসুন। আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি, আপনি কিশোরবাবুর বৌদিদি।'

কথাটা বলিতে বলিতে পলকের জন্য সুহাসিনীর চোখ দুটি যেভাবে অবনত হইয়া পড়িল, তাহা বিমলার চক্ষু এড়াইল না। সে বলিল, 'আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে, ঢের আগেই আমার আসা উচিত ছিল। কিন্তু আমার দেওরটি তোমাদের ওপর যে রকম উৎপাত আরম্ভ করেছেন, তার সঙ্গে আমিও যদি আবার যোগ দিই, তাহলে তোমাদের পাড়া ছেড়ে পালাতে হবে, এই ভয়ে এতদিন আসিনি।'

হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের বিছানায় বসাইয়া সুহাসিনী মৃদুহাস্যে বলিল, 'এ রকম উৎপাত যদি মাঝে মাঝে করেন তবেই আপনাদের পাড়ায় থাকব, নইলে সত্যিই উঠে যেতে হবে।'

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'পাড়ার আর কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি বুঝি?'

'না। এসে পর্যন্ত একেবারে একলা পড়ে গেছি।'

অতঃপর সহজেই আলাপ জমিয়া উঠিল। কারণ, দুইদিকেই ভাব করিবার আগ্রহ সমান। সুহাসিনী লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বিমলা শুধু অসামান্য রূপবতী নয়, অতি-শয় সুশিক্ষিত এবং কথাবার্তায় বিশেষ রকম পরিমার্জিত। তাহার কথার মধ্যে বুদ্ধির এমন একটি অনাড়ম্বর অথচ সহজ স্বাতন্ত্র্য আছে যে, সুহাসিনী বিস্মিত না হইয়া পারিল না। ঘণ্টাখানেক গল্পসল্প করিবার পর তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, এত সুন্দরী, এরূপ বুদ্ধিমতী এমন মধুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক সে আর কখনও দেখে নাই।

ইহাদের কথাবার্তা খুব সাধারণ গোছেরই হইল। প্রায় সমবয়স্কা দুটি যুবতী একত্র হইলে যেরূপ আলাপ সাধারণত হইয়া থাকে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। লেখাপড়ার কথা, শেলাইয়ের কথা, সংসারের কথা, সুহাসিনীর মাতার মৃত্যুর কথা ইত্যাদি নানা প্রকার বিশ্রম্ভ আলোচনার মধ্য দিয়া দু'জনেরই দু'জনকে এমন ভাল লাগিয়া গিয়াছিল যে, পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দু'টা বাজিতেই বিমলা চম-কিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আর তো ভাই বসতে পারব না, ঠাকুরপোর আসবার সময় হল।'

'হ্যাঁ, আজ বিষ্যুৎবার, আজ তো তিনটের সময়—' এই পর্যন্ত বলিতেই কে যেন সুহাসিনীর জিভ চাপিয়া ধরিল। বিমলা লক্ষ্যই করে নাই এমনই ভাবে বলিল, 'হ্যাঁ,

আজ ওঁকে শেষের একটা ক্লাস নিতে হয় না, তিনটের মধ্যেই ফেরেন।—আচ্ছা ভাই, আসি তাহলে। আমাদের গল্প শেষ হল না, আর একদিন হবে। এবার কিন্তু তোমায় যেতে হবে। পালটা না দিলে আসব না, তা বলে দিচ্ছি!'

কেবলমাত্র একটা 'আচ্ছা' ছাড়া সুহাসিনী আর কিছু বলিতে পারিল না, বেফাঁস কথাটা বলিয়া অবধি তাহার বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছিল।

নিচে সদরের বারান্দা পর্যন্ত গিয়া হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিমলা বলিল, 'আচ্ছা চললুম, মনে থাকে যেন, সুহাস।'

সুহাসিনী একটু লাল হইয়া, একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি আপনাকে কী বলে ডাকব?'

তাহার অবনত মুখের পানে চাহিয়া বিমলা বলিল, 'তুমি আমাকে দিদি বলে ডেকো।'

পথে তখন বেশী লোক-চলাচল ছিল না, মাথায় আঁচলটা একটু টানিয়া দিয়া বিমলা ত্বরিতপদে রাস্তাটুকু পার হইয়া নিজের বাড়িতে গিয়া ঢুকিল।

তাহাকে বিদায় দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শয্যার উপর বসিবার উপক্রম করিতেই সম্মুখেই বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বখানা সুহাসিনীর চোখে পড়িল। সেই-দিকে তাকাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল, তাহার মত কুৎসিত কুরূপা পৃথিবীতে বুঝি আর দ্বিতীয় নাই।

সন্ধ্যার পর নিত্য-নৈমিত্তিক বৈঠক বসিয়াছিল। বর্তমান বিজ্ঞানের ধারা লইয়া কিশোর ও বিনয়বাবুতে তর্ক এবং গবেষণা চলিতেছিল, অদূরে একখানা চৌকিতে করতলে চিবুক রাখিয়া সুহাসিনী চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। কিন্তু যত না শুনিতেছিল, একজন তার্কিকের বলিষ্ঠ দেহ, সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য, বহুবিস্তৃত জ্ঞান ও নির্মল অন্তঃকরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে বিভোর তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল।

কী একটা তর্কাধীন কথার কোনরূপ নিষ্পত্তি ও মতের ঐক্য না হওয়ায় কিশোর হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কী বলেন?'

চট্‌কা ভাঙিতেই সুহাসিনীর জ্ঞান হইল যে, সে এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া কিশোরের মুখের পানে তাকাইয়া বসিয়াছিল, একটা কথাও শুনিতে পায় নাই। লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘাড়টা অন্যদিকে ফিরাইয়া সে বলিল. 'আপনাদের কী তর্ক, আমি তাই বুঝতে পারছি না।'

'কেন বুঝতে পারছেন না?' কিশোর চেয়ারের মুখ তাহার দিকে ফিরাইয়া বসিয়া বলিল, 'এ তো খুব সহজ কথা। উনি বলছেন'— বলিয়া আলোচ্য বিষয়টা আবার বিশদ করিয়া বিবৃত করিতে যাইবে, এমন সময় দরজার কাছে গাড়ি থামার একটা শব্দ শুনা গেল এবং অনতিকাল পরে অনুপমের মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী প্রবেশ করিলেন।

কুঁচাইয়া পরা গরদের সরুপাড় ধুতি, গায়ে অনুরূপ ব্লাউজ এবং পায়ে বনাতের চটিজুতা পরিয়া হেমাঙ্গিনী হিন্দু-বিধবার আচার ও আধুনিক শিষ্ট সমাজের সভ্যতা এই দুয়ের মধ্যে একটা রফা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আসিতেই সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুহাসিনী কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, তিনি তাহার গণ্ডে একটি লৌকিক চুম্বন দিয়া বলিলেন, 'ওঁর নাকি আবার শরীর খারাপ হয়েছে?' বলিয়া ইঙ্গিতে বিনয়বাবুকে দেখাইলেন।

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কৈ, না। বাবা তো বেশ ভালই আছেন।'

বিনয়বাবু সে কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, 'এখানে এসে অবধি হাঁপানিটা আর চাগায় নি।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, 'তবু ভাল। কে যেন বললে—তাই শুনে পর্যন্ত মনটা ছটফট করছিল। নানান কাজে আসতে পারিনি। আজ আর থাকতে পারলুম না, ভাবলুম, একবারটি গিয়ে দেখে আসি, কচি মেয়েটা একলা না জানি কত কষ্টই পাচ্ছে। আর তো সুজাতা নেই—' বলিয়া তিনি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুজাতা সুহাসিনীর মায়ের নাম।

এই সময় সম্মুখে কিয়দ্দূরে উপবিষ্ট কিশোরের উপর দৃষ্টি পড়ায় তিনি সুহাসিনীকে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চিনি-চিনি মনে হচ্ছে—ছেলেটি কে বলো তো?'

নিজের ত্রুটি এতক্ষণে চোখে পড়ায় বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দু'জনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিশোর কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। হেমাঙ্গিনী খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আপনি কিশোরবাবু? সেদিন রাত্রে মিছিমিছি কী ভয়টাই আমরা পেয়েছিলুম। অনুপমের মুখে আপনার সব কথা শুনেছি। বড় খুশি হলাম।'

কিশোর বিনীতভাবে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ হইয়া গেল। প্রথম-দর্শনেই কাহারও সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করিয়া লওয়া অনুচিত, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটির গোঁফ-কামানো পুরুষের মত মুখ ও উগ্র হাসি তাহার আদৌ ভাল লাগিল না। মনমরা হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, ইঁহার সহিত পরিচয়ের সুযোগ না হইলেই বোধ হয় ভাল হইত।

বিনয়বাবু কিন্তু হাঁফ ছাড়িয়া আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বস্তুত হেমাঙ্গিনীকে সহসা আবির্ভূত হইতে দেখিয়া তিনি অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই যে অনুপম বিবাহের প্রস্তাব করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তারপর আর আসে নাই; বিনয়বাবু চিঠি লিখিয়া তাহাকে সুহাসিনীর অমত জানাইয়া দিয়াছিলেন। তারপরও কয়েক দিন গত হইয়াছে। কিন্তু ওদিক হইতে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। তাই আজ হেমাঙ্গিনীকে দর্শনমাত্র তাঁহার মনে একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। স্বর্গগতা স্ত্রীর এই বান্ধবীটিকে তিনি মনে মনে ভয় করিতেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, হেমাঙ্গিনী বেশ সহজভাবে হাসিমুখে কথা কহিতেছেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আবার ফিরিয়া আসিল।

সাধারণভাবে আবার কথাবার্তা আরম্ভ হইল, শুধু সুহাসিনী তাহাতে যোগ দিতে পারিল না; আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া কোণের একটা চৌকিতে মৌন হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমশ দেখা গেল যে, বিনয়বাবুও কখন অলক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্য হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছেন, শুধু কিশোর আর হেমাঙ্গিনীতে কথা চলিতেছে; অর্থাৎ হেমাঙ্গিনী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছেন এবং কিশোর তাহার উত্তর দিতেছে। হেমাঙ্গিনীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল যে, এই প্রিয়-দর্শন ছেলেটিকে দেখিবামাত্র তাঁহার মাতৃহৃদয়ের বহুকালসঞ্চিত স্নেহ অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে, তাই আজ তাহার নাড়ীনক্ষত্র না জানিয়া তিনি ক্ষান্ত হইবেন না।

'মা নেই—আহা মরে যাই!' মুখখানিকে নিরতিশয় করুণ ও ব্যথিত করিয়া বলিলেন, 'যার মা নেই, তার কেউ নেই। মা-মরা ছেলে দেখলেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকে।—তা, তোমার বাবা আবার সংসার করেছেন বুঝি?'

ঘাড় নাড়িয়া কিশোর জানাইল—'হ্যাঁ।'

বিজ্ঞভাবে শিরঃসঞ্চালন করিয়া হেমাঙ্গিনী কহিলেন, 'তাই। ও তো জানা কথা—দোজ-পক্ষে বিয়ে করলে আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে পর হয়ে যায়—এ আমি ঢের দেখেছি। এ তো নতুন কিছু নয়, বাবা। তোমার সৎমার আবার ছেলেপুলে হয়েছে তো?'

কিশোর বলিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমি বাবার পর হয়ে গেছি, একথা আপনি মনে করছেন কেন?'

'হয় বাবা, অনেক দেখেছি, জানি কি না। আর তাই যদি না হবে, তুমি এখানে একলাটি বাসা নিয়ে রয়েছ, তিনি কি তোমার কাছে এসে থাকতে চাইতেন না?'

কিশোর কহিল, 'ও অঞ্চলে আমাদের কিছু জমিদারি আছে, তাই দেখতে শুনতে হয় বলে তিনি এখানে থাকতে পারেন না। তা ছাড়া—'

বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, 'জমিদারি আছে? তবে তোমার চাকরি করবার দরকার?'

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। শুধু টাকার লোভে যে সকল মানুষ কাজ করে না, কর্মের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগও যে সম্ভব, একথা ইহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পন্ডশ্রম মাত্র। উপরন্তু এই নাছোড়বান্দা জেরায় সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রসঙ্গটাকে শেষ করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে বলিল, 'আমার ভাল লাগে, তাই কাজ করি ; তা ছাড়া আমি তো একলা থাকি না, আমার বৌদিদি থাকেন—' বলিয়া ফেলিয়াই কিশোর ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই নূতন সূত্র ধরিয়া যে আর এক প্রস্থ জেরা আরম্ভ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে তাড়াতাড়ি বিনয়বাবুর দিকে ফিরিয়া কী একটা অন্য কথা বলিতে গেল, কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়া হেমাঙ্গিনী পুনশ্চ বলিলেন, 'বৌদিদি? কিন্তু তুমি যে বললে, তোমার বড় ভাই কেউ নেই! তা তোমার দাদাও কি তোমার সঙ্গেই থাকেন?'

বিরক্তি চাপিয়া কিশোর বলিল, 'না, আমার বৌদি বিধবা।'

'বিধবা'—কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া যেন কী চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, 'সেই কথাই তো ভাবছিলুম, তুমি ছেলেমানুষ, একলা থাক, শুধু বামুন-চাকরের ওপর কি নির্ভর করা চলে? একজন গিন্নীবান্নী মেয়েমানুষ বাড়িতে চাই বৈকি। তাঁর হাতেই বুঝি সংসার? তা—তাঁর ছেলেপুলে নেই বুঝি? কত বয়স হবে?'

প্রশ্নগুলা যে নিঃস্বার্থ কৌতূহল-প্রণোদিত নহে এ সন্দেহ কিশোরের অন্তরে উঁকি মারিতেছিল, এবার সে একেবারে অধৈর্য হইয়া পড়িল, বলিল, 'আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সারাক্ষণ নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি। আপনারাও নিশ্চয় মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।'

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, 'না বাবা, তোমার কথায় আমি বড় আনন্দ পাচ্ছি।'

'সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এঁরা তো ক্লান্তি বোধ করতে পারেন।' বলিয়া ঘরের বাকী দুইজন লোককে নির্দেশ করিল।

কিশোরের দিকে একটা মর্মভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হেমাঙ্গিনী আর কিছু বলিলেন না। আজ তিনি এ বাড়ির আবহাওয়া বুঝিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ করিয়া পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এই যুবকটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনুপম সে রাত্রির ঘটনা প্রথমে মাতার কাছে গোপন করিয়াছিল। কাজটা যে ঠিক হয় নাই, করিয়া ফেলিবার পরই সে বুঝিয়াছিল। তারপর যখন বিনয়বাবুর চিঠি

গেল, তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। অনিচ্ছুক পুত্রের নিকট হইতে খুঁটিনাটি সমস্ত জানিয়া লইয়া হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তুই যেমন বোকা, তেমনি বেহায়া। নিজের মুখে মেয়ের বাপের কাছে বিয়ের কথা তুলতে তোর লজ্জা হল না? ভাগ্যে সুজাতা বেঁচে নেই,—নইলে আমার আজ মাথা কাটা যেত। এই সব কথা—এই লোকটার ব্যাপার—এতদিন আমাকে বলিসনি কেন?'

বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সহিত তিনি অন্তরালে এমন ব্যবহার করিতেন, যেন সে পাঁচ বছরের একটা নির্বোধ শিশু।

বিনয়বাবুর বেশ টাকাকড়ি আছে, একথা চেনা-পরিচিত সকলেই জানিত; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং সুহাসিনী তাঁহার একমাত্র সন্তান—এই তিনটি তত্ত্বের যাহা অনিবার্য যোগফল, তাহাও নিতান্ত গণ্ডমূর্খ ছাড়া কাহারও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। সুতরাং রঙের উপর রসানের মত সুহাসিনীর সহিত অনুপমের বিবাহ যে হেমাঙ্গিনীর একান্ত অভিপ্রেত ছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

তিন-চারিদিন ধরিয়া সমস্যাটিকে চতুর্দিক হইতে ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার পর তিনি নিজেই অকুস্থল পরিদর্শনের জন্য আসিলেন, কিন্তু অনুপমের প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে যে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানেন, তাহার আভাসমাত্র দিলেন না।

কথায় কথায় আরও কিছুকাল কাটিল। আজিকার সন্ধ্যাটা ব্যর্থ হইল, এইরূপ মনোভাব লইয়া কিশোর প্রস্থান করিবার পর, হেমাঙ্গিনী দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যেন নিজে মনেই বলিলেন, 'ছেলেটি বেশ, কিন্তু বাপের সঙ্গে বনে না। ভিতরে কিছু কথা আছে।'

কিছু কুণ্ঠিতভাবে বিনয়বাবু বলিলেন, 'বনে না, তেমন কথা তো কিছু বললে না।'

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, 'বাইরের লোকের কাছে কি সে-কথা বলতে পারে? কিন্তু আমি বলে দিলুম, দেখে নিও, ভিতরে কোনও কথা আছে।' বলিয়া সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

এইরূপে, ভদ্রভাবে কিশোরের যতটা অনিষ্ট করা যাইতে পারে, তাহা করিয়া, পিতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুহাসিনীকে খুব সাবধান করিয়া দিয়া এবং শীঘ্রই আবার আসিবেন, এই আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি ছ্যাকরা গাড়ি চড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

সুহাসিনীর মনের অবস্থা যে ঠিক কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার হৃদয় লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিশোর যে কিরূপ গুরুতর প্রতিপক্ষ, তাহা তাঁহার মত শাণিত-বুদ্ধিশালিনী রমণীর আন্দাজ করিতে বিলম্ব হয় নাই। তাই গাড়ির মধ্যে খাড়া বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাড়ি গিয়া পৌঁছিলেন।

৯

সেই যে প্রায় মাসখানেক পূর্বে পশুপতিবাবু কিশোরকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার দৃঢ় সংকল্প জানাইয়া ট্যাক্সি চড়িয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তারপর হইতেই তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তিনি যে সত্যিই তাহার সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, পত্র লিখিয়াও আর সমাচার লইবেন না, ইহা কিশোর অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহকাল অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিবার

পরও যখন তাঁহার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন একদিন বিমলাকে লুকাইয়া কিশোর নিজেই পত্র লিখিল। সমস্ত ব্যাপার সবিস্তারে বিবৃত করিয়া বহু মিনতি জানাইয়া লিখিল যে, এ অবস্থায় বিমলাকে ত্যাগ করা শুধু যে নিষ্ঠুরতা হইবে, তাহা নহে, ঘোর অধর্ম হইবে; এবং মৃতা জননীর শপথ করিয়া লিখিল যে, বিমলার সহিত তাহার সম্পর্ক ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় নিষ্কলুষ, একথা যেন তিনি অবিশ্বাস না করেন।

সর্বশেষে পত্র সমাপ্ত করিবার সময় লিখিল—এত বলিবার পরও যদি তিনি বিশ্বাস করিতে না চাহেন, বেশ, বিমলাকে তিনি নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখুন; পরমারাধ্যা মাতৃদেবী সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকিবেন, কিশোর তাহার ছায়াও মাড়াইবে না। তাহা হইলে তো আর কোন গোল থাকিবে না?

পত্র পাঠাইয়া দিয়া গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল। কিশোরের প্রকৃতি স্বভাবতই প্রফুল্ল, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা সে সহজে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু তবু পিতার সহিত এই অহেতুক মনোমালিন্য তাহার মনের কোণে গুপ্ত কাঁটার ন্যায় সর্বদাই খচখচ করিতেছিল। ইহার একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহার মন একদণ্ডের জন্যও সুস্থির হইতে পারিতেছিল না।

সে দিনটা ছিল রবিবার। ভাল করিয়া ঘুম ভাঙিবার পূর্বে হইতেই আজিকার দিবসব্যাপী অনাহত অবকাশের কাল্পনিক চিত্রটা কিশোরের সর্বাঙ্গে যেন তৃপ্তির স্পর্শ বুলাইয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। কারণ, এমন দিনের একটা দণ্ডও ঘুমাইয়া নষ্ট করা যাইতে পারে না। হাত-মুখ ধুইয়া, ল্যাবরেটরি-ঘরের সব জানালা খুলিয়া দিয়া প্রাতঃকালের নবীন আলোতে সে কাজ করিতে শুরু করিয়া দিল। যথেচ্ছা কাজ করিবার স্বাধীনতাই যে পরম বিশ্রাম, তাহা জানিয়াই যেন এই নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেও তাহার শ্রান্তি আসিল না।

ময়লা ন্যাতা জলে নিঙড়াইয়া গৃহস্থের মেয়েরা যেমন ঘরের মেঝে মুছিয়া ফেলেন, আকাশের কালো কালো মেঘগুলাও যেন আকাশটিকে তেমনই মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া নিজেরা কোথায় সরিয়া গিয়াছিল। এই সদ্যোধৌত প্রফুল্ল প্রভাতটি যে আজিকার মত ছুটির দিনে বিধাতার বিশেষ একটি দান, ইহা কল্পনা করিয়া পরম আনন্দে নিজের মনে শিস দিতে দিতে কিশোর কাজ করিতে লাগিল। তাহার যদি দিব্য-দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত, পাশের বাড়ির একটি মেয়েও এই মধুর প্রভাতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিজমনে গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সুপ্ত বাড়িময় গৃহকর্ম করিয়া বেড়াইতেছে।

ঘড়িতে আটটা বাজিতেই কিশোরের মন এদিক ওদিক পলাইতে আরম্ভ করিল। একটা পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানের জন্য তাহার ইন্দ্রিয়গুলা সতর্ক হইয়া রহিল। রবিবারে সকালবেলাও বিনয়বাবুর বাড়িতে সভা বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দীনবন্ধুবাবুও এ সভায় আসিয়া যোগ দিতেন। কিশোর পলাতক মনটাকে ধরিয়া আনিয়া কাজে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই মন স্থির থাকিতে চাহিল না।

ওদিকে দীনবন্ধুবাবু বোধ করি কোন কাজে পড়িয়া আসিতে পারিলেন না; সুহাসিনী অন্যমনস্কভাবে দু'-তিনবার ড্রয়িংরুমে ঘুরিয়া গিয়া লাইব্রেরি-ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, বিনয়বাবু কি একটা লেখায় ব্যাপৃত আছেন। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া সে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। বিনয়বাবু লক্ষ্য করিলেন না। তখন সে শেল্‌ফ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া গদি-মোড়া চেয়ারে গিয়া বসিল। ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। কিশোর তখন টেস্ট-টিউব ফেলিয়া হাত ধুইয়া

তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে এবার কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় নীচে সদর-দরজার নিকট হইতে ডাক-পিয়নের সাড়া আসিল, 'চিঠি হ্যায়।'

চিঠি কিশোরের বড় একটা আসে না, কেই বা লিখিবে? সে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

দু'খানি চিঠি। একখানি হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিল, তাহার বাবার। চিঠি দুই-খানা লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কিশোর ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। পত্রের আরম্ভে কোন সম্বোধন বা শিরোনামা নাই। পত্র এইরূপ,—

'তোমার পত্রে যে অসম্ভব স্পর্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। তোমার যে এতদূর ধৃষ্টতা হইতে পারে, তাহা তোমার শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়াও কল্পনা করিতে পারি নাই। তোমার বিমাতা একটা ভ্রষ্টা রমণীর সাহচর্যে বাস করিবেন, এই কদর্য প্রস্তাব করিয়া তুমি আমাকে যে অপমান করিয়াছ, তাহার উত্তরে আমি তোমাকে জানাইতেছি যে, তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করিলাম; আজ হইতে তোমার সহিত আমার কোন সংবাদ রহিল না। আমার মৃত্যুর পর আমার বিষয়-সম্পত্তিতে তোমার কোন দাবি রহিল না জানিবে। আমার অন্যান্য পুত্রেরা বিষয় পাইবে, সেইরূপ উইল করিয়াছি। আশা করি, তাহারা কালে তোমার মত নষ্টচরিত্র গুরুর অবমাননাকারী কুপুত্র হইয়া দাঁড়াইবে না। ভবিষ্যতে আমাকে পত্র লিখিয়া কোনও উপরোধ অনুরোধ করিবার চেষ্টা করিও না, পত্র অপঠিত অবস্থায় বিনষ্ট হইবে। ইতি—

পশুপতিনাথ চক্রবর্তী।'

পত্র হাতে করিয়া কিশোর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিক্ত মনে ভাবিতে লাগিল, ইহা ছাড়া আর কি সে প্রত্যাশা করিয়াছিল? সেদিন সম্মুখে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, আজ পত্রে তিনি সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন, কোথাও এতটুকু গরমিল নাই। শুধু তিনি যে কিশোরকে ত্যাগ করিতে কতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাই যেন পত্রের প্রতি ছত্রে আগুনের মত জ্বলজ্বল করিতেছে। কিশোরের সমস্ত হৃদয় নিঙড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটাই বাহির হইয়া আসিল যে, হায় রে, আজ তাহার মা জীবিত নাই, তাই তাহার বাপ তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া এ পক্ষের সন্তানদের সংস্থান করিতে এত ব্যগ্র যে, একটা সত্যকার অপরাধের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, মিথ্যা পঙ্ক লেপন করিয়া তাহাকে লোকসমাজে অস্পৃশ্য করিয়া দিলেন।

চিঠিখানা সে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। বিমলার চোখে যদি এ চিঠি পড়ে, তবে হীনতা ও অপমানের লজ্জা বাড়িবে বই কমিবে না। তা-ছাড়া নিজের পিতার সম্বন্ধে আর একজনের মনে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়া লাভ কি? এ চিঠির যুক্তিহীন ক্রোধের আড়ালে যে কি স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্রতা লুকাইয়া আছে, তাহা বুঝিতে বিমলার এক মুহূর্ত বিলম্ব হইবে না। তখন পিতার লজ্জায় তাহার নিজের মর্যাদাও যে ধুলায় লুটাইয়া পড়িবে।

অন্য চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া সে চোখ বুলাইয়া দেখিল, কিন্তু কে লিখিয়াছে সহসা বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোকের লেখা চিঠি, নীচে স্বাক্ষর হেমাঙ্গিনী দেবী। বিস্মিত হইয়া পাঠ করিতে করিতে তাহার স্মরণ হইল, সেদিন রাত্রে যাঁহার সহিত পরিচয় হইয়া গিয়াছে, ইনি সেই অনুপমের জননী হেমাঙ্গিনী দেবী।

এই সময়ে ঘরের বন্ধ দ্বারে ঘা পড়িল।

'ঠাকুরপো, দোর বন্ধ কেন? চিঠি কোত্থেকে এল?'

রবিবারে কলেজের রান্না নাই বলিয়া বিমলা প্রায় বেলা নয়টা পর্যন্ত পূজা-অর্চনায় কাটাইত। এইমাত্র পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া ঝির মুখে চিঠি আসার খবর পাইয়া কিশোরের কাছে খোঁজ লইতে আসিয়াছিল। কিশোরের কাছে চিঠিপত্র যে সাধারণত আসে না, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

দ্বার খুলিয়া হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া কিশোর বলিল, 'একখানা নেমন্তন্নর চিঠি, হেমাঙ্গিনী দেবী লিখেছেন।'

'তিনি কে?'

'অনুপমের মা।'

'ও, যাঁর কথা সেদিন বলছিলে। তা নেমন্তন্ন কিসের?'

'কী জানি কিসের নেমন্তন্ন, তা তো কিছু লেখেননি। আর মাত্র একদিনের পরিচয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করবার মানেও তো কিছু বুঝতে পারছি না। ছাপানো চিঠি নয়, হাতে লেখা। এই দেখো না।'

বিমলা চিঠিখানা হাতে লইয়া দেখিল, ছোট চিঠি, তাহাতে এই কয়টি কথা লেখা আছে,—

'বাবা কিশোর,

কাল রবিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে সামান্য একটু চা-পানের আয়োজন করিয়াছি। গুটিকয়েক বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত থাকিবেন। তুমি আসিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত হইব। ইতি—

আশীর্বাদিকা
হেমাঙ্গিনী দেবী।'

চিঠি ফিরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বিমলা বলিল, 'তোমার ওপর এঁর ভারি মায়া পড়ে গেছে দেখছি, একেবারে 'বাবা কিশোর' লিখে ফেলেছেন। একটু সাবধানে থেকো, ঠাকুরপো।'

কিশোর বলিল, 'হুঁ, সেদিন মায়ার ঠেলায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন।' বলিতে বলিতে তাহার মুখখানা মলিন হইয়া গেল। স্মরণ হইল, এই স্ত্রীলোকটিই সেদিন বলিয়াছিলেন যে, তাহার বাবা তাহার পর হইয়া গিয়াছেন। কথাটা তখন তাহার ভাল লাগে নাই।

বিমলা তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মুখখানা শুকনো শুকনো দেখছি। রাত্রে কি ঘুম ভাল হয়নি?'

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, ঘুম বেশ হয়েছিল, এই মহিলাটির কথা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কি জন্যে নিমন্ত্রণ কিছুই জানি না—চা পানও করি না—আমার যাওয়াটা কি উচিত হবে?'

বিমলা বলিল, 'সে কি কথা, যেতে হবে বৈকি! চা না হয় না খাবে। তুমি কুঁড়ে মানুষ, কোথাও যেতে হলেই তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে—এক ঐ বাড়ি ছাড়া।' বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জানালার দিকে দেখাইল।

কিশোর কী একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, বিমলা বাধা দিয়া বলিল, 'তোমার কৈফিয়ত শোনবার এখন আমার সময় নেই। উনুন জ্বলে যাচ্ছে, রান্না চড়াতে চললুম।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

১০

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে হেমাঙ্গিনী দেবীর হাতিবাগানের বাড়ির দ্বিতলে এক-খানা বড় ঘরে গুটি দশ-বারো ভদ্রলোক ও মহিলা জড় হইয়াছিলেন। সকলে বিশিষ্ট পারিবারিক বন্ধু, বাহিরের লোক কেহ ছিল না। সুহাসকে লইয়া বিনয়বাবু উপস্থিত ছিলেন, দীনবন্ধুবাবুও আসিয়াছিলেন। ঘরের স্থানে স্থানে দুইজন বা তিনজন অতিথি একত্র হইয়া নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সকলের সম্মিলিত অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যে একটি অস্ফুট গুঞ্জন উঠিতেছিল। গৃহকর্ত্রী সোনার নাকটেপা চশমা আঁটিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ইহাকে উহাকে সম্বোধন করিয়া আপ্যায়িত করিতেছিলেন। অনুপমচন্দ্র আকাশে চক্রায়মান চিলের মত সুহাসিনীকে কেন্দ্র করিয়া ঘরময় পরিভ্রমণ করিতেছিল।

ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে একটা কৌচের উপর সুহাসিনী এবং আর একটি মেয়ে বসিয়া গল্প করিতেছিল। মেয়েটির নাম করবী, সে অনুপমের মামাত বোন। এতদিন দার্জিলিঙে মেয়েদের এক কনভেণ্টে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল; এখন হঠাৎ কি খেয়াল হইয়াছে তাই লেখাপড়ায় ইতি করিয়া দিয়া বাপের কাছে চলিয়া আসিয়াছে। আজিকার এই অনুষ্ঠানের সে-ই প্রধান উপলক্ষ্য।

করবী মেয়েটি বয়সে সুহাসিনীর সমান কি এক-আধ বছরের ছোটই হবে। ছোট-খাটো গোলগাল গড়ন, চাঁপা-ফুলের মত রঙ, মুখে চোখে বেশ একটি শ্রী আছে,—এই মেয়েটি সহজে ছোট-বড় সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইতে পারিত। বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনের অতিরিক্ত আদর ও বিলাতী স্কুলের শিক্ষার গুণে সে একটু ফাজিল ও স্বেচ্ছা-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সত্যকার মন্দ তাহার স্বভাবে কিছু ছিল না বলিয়া সকলেই তাহা ছেলেমানুষী মনে করিয়া উড়াইয়া দিতেন।

করবী সুহাসিনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিতেছিল 'হাসিদি, তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে, ভাই।'

সুহাসিনী বলিল, 'ছেলেমানুষী করিস নি, করবী! এত লোকের সামনে—তোর কি একটু লজ্জাও নেই! তার চেয়ে স্কুলের গল্প বল্ শুনি!'

করবী বলিল, 'সে হবে 'খন। কদ্দিন পরে দেখা বল তো, একটা চুমুও খাব না। আচ্ছা, এত লোকের সামনে যদি তোমার লজ্জা করে, ঐ পাশের ঘরটায় চলো। ও ঘরে কেউ নেই।'

হাসিয়া ফেলিয়া সুহাসিনী বলিল, 'কি পাগল তুই বল দেখি! না না, চুমু খেতে হবে না। আমি এখন ঐ জন্যে উঠে যেতে পারব না।' তারপর তাহার ডালিম-ফুলের রঙের টকটকে লাল সিল্কের শাড়িখানায় দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'কি চমৎকার রঙ তোর শাড়িখানার! কবে কিনলি?'

চুম্বনের কথা ভুলিয়া করবী আহ্লাদিত হইয়া বলিল, 'বেশ রঙ—না? কিনি নি, বাবা প্রেজেণ্ট করেছেন। দাম বেশী নয় ভাই—পঁচাত্তর। তুমি যদি কেনো, বলে দিতে পারি কোন্ দোকানে পাওয়া যায়। আমি নিজে গিয়ে রঙ পছন্দ করে নিয়েছি কি না।'

সুহাসিনী বলিল, 'আমি এ রঙের কাপড় নিয়ে কি করব?'

'কেন, পরবে।'

সুহাসিনী হাসিল, 'দূর! আমাকে রক্ষেকালীর মত দেখাবে যে!'

মাথা নাড়িয়া করবী বলিল, 'কখ্খনো না, কখ্খনো না, চমৎকার দেখাবে। তুমি কি কালো?'

'না, আমি গোরাচাঁদ' বলিয়া সুহাস মুখে একটু হাসিল বটে, কিন্তু মনে তাহার সে হাসির ছায়া পড়িল না। এই আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত নিজের কালো রঙের জন্য কোনদিন তাহার মনে দুঃখ হয় নাই। কিন্তু ইদানীং কি জানি কেন, প্রায়ই নিজেকে কুরূপা মনে করিয়া সে ভারি বিষণ্ণ হইয়া পড়ে।

দরজার কাছে একটা শব্দ শুনিয়া দু'জনে একসঙ্গে চোখ তুলিয়া দেখিল, ঢিলা আস্তিনের পাঞ্জাবি গায়ে গৌরবর্ণ দীর্ঘায়তন একটি যুবা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চশমার উপর দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া হেমাঙ্গিনী সাদরে আহ্বান করিলেন, 'এসো বাবা, এসো।'

সুহাসিনীর গায়ে ঠেলা দিয়া চুপি চুপি করবী বলিল, 'কে ভাই, হাসিদি? তুমি চেনো?'

সুহাস কিন্তু উত্তর দিল না, প্রশ্নটা বোধ করি শুনিতেই পাইল না। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে একটা কালো পর্দা সরিয়া যাইতেছিল। আজিকার এই অনুষ্ঠানে যে কিশোর নিমন্ত্রিত হইতে পারে, ইহা তাহার অতিদূর কল্পনাতেও আসে নাই। অনুপমের সহিত কিশোরের যেরূপ আলাপ, তাহাকে আলাপ না বলিয়া বিরোধ বলিলেই ভাল হয়। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গেও মাত্র একদিনের দেখাশুনা, ইহারই মধ্যে এমন কিছু অন্তরঙ্গতা জন্মিতে পারে না—যাহাতে এই পরিবারিক ক্রিয়ায় কিশোরকে নিমন্ত্রণ না করিলেই নহে। অথচ তাহাকে ঐ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কিছুই আর সুহাসিনীর কাছে গোপন রহিল না। বিদ্যুৎ-বিকাশের মত এই ব্যাপারের সমগ্র নিগূঢ়তা তাহার অন্তরপটে প্রকট হইয়া পড়িল। সেদিন কিশোরের প্রতি হেমাঙ্গিনীর অযাচিত সহৃদয়তার আতিশয্য দেখিয়া সুহাসিনী কিছু বিস্মিত হইয়াছিল, আজ আর তাহার হেতু বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব হইল না।

মর্মভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কিন্তু সে তাহা বাহির হইতে দিল না। করবীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলছিলে?'

এবার করবীর নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। সুহাস দেখিল, সে সম্মুখ-দিকে একটু ঝুঁকিয়া বিভক্ত ওষ্ঠাধরে উৎসুক দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে চাহিয়া আছে।

এই সময় হেমাঙ্গিনী করবীর দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন, 'করবী, এ দিকে আয়। কিশোরের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।'

কিশোরও সঙ্গে সঙ্গে এ দিকে ফিরিয়াছিল, সুহাসিনীকে দেখিয়া স্মিতমুখে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

করবী সহাস্যমুখে চঞ্চলপদে উঠিয়া গেল; সুহাসিনী কিন্তু কিশোরের নমস্কার ফিরাইয়া দিতেও পারিল না, অব্যক্ত ব্যথার ভার বুকে লইয়া নতমুখে পাথরের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

হেমাঙ্গিনী বোধ হয় কিশোরের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবার তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া তকমা-আঁটা দু'জন বেয়ারা চায়ের পরাত ও রূপার ট্রেতে করিয়া কেক্, প্যাটি ইত্যাদি নানাবিধ খাবার লইয়া অতিথিদের দিতে লাগিল।

কিশোর ও করবী তখন ঘরের এক কোণে গল্প আরম্ভ করিয়াছিল, বেয়ারা উপস্থিত হইলে করবী একটা পেয়ালা তুলিয়া লইয়া কিশোরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'এই নিন, কিশোরবাবু।'

কিশোর লজ্জিতভাবে বলিল, 'ওটা আপনি নিন, আমি চা খাইনে।'

'চা খান না!' চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া করবী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিশোর হাসিয়া বলিল, 'ঘোর অসভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু চা খেলেই আমার মাথা ধরে।'

করবী আরও কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল, 'চা খান না, আপনি তো ভারি আশ্চর্য মানুষ। আমি দিনে অন্তত দশ পেয়ালা খাই। আচ্ছা, একটা কেক্ খান, নইলে পিসীমা দুঃখ করবেন।'

'তা বরং খাচ্ছি' বলিয়া কিশোর সন্তর্পণে ট্রে হইতে একটা মিষ্টান্ন তুলিয়া লইল।

করবী নিজের পেয়ালার কানায় একবার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি আগে কোথায় থাকতেন?'

মৃদু হাস্যে কিশোর বলিল, 'চা খাই না বলে নিশ্চয়ই আপনার সন্দেহ হচ্ছে আমি সম্প্রতি কোনও জঙ্গল-টঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছি, কেমন? সত্যি কিনা বলুন?'

করবী খুব হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না সে জন্যে নয়, আপনাকে আগে কখনও দেখিনি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

কিশোর বলিল, 'দেখেন নি, তার কারণ, ইতিপূর্বে আমি আপনাদের সমাজে মেশবার সুযোগ পাইনি, নইলে গত পাঁচ-সাত বছর থেকে আমি বরাবর কলকাতাতেই থাকি। মাত্র মাসখানেক হল বিনয়বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সেই সূত্রেই আপনাদের মত উন্নতিশীল লোকের সঙ্গে মেলামেশা; নচেৎ বস্তুত আমি একজন অতি সেকেলে পর্দানশীন নেটিব।'

করবী যেন হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, 'কিন্তু—কিন্তু আপনাকে দেখে—আপনার কথাবার্তায়—'

কিশোর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'আড়ষ্ট জড়সড় ভাব নেই— এই বলতে চান তো? ওটা আমার স্বভাব, কোনও অবস্থাতেই আমি আড়ষ্ট বা জড়সড় হয়ে থাকতে পারি না।'

ঘরের এক কোণে সুহাসের তখন চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে, শরীর এত খারাপ বোধ হইতেছে যে, ইচ্ছা হইতেছে কোথাও নিরিবিলি পাইলে বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়ে। এদিকে অনুপম কখন ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে এবং কতকগুলা অর্থহীন কথা অবিশ্রাম তাহার কানের কাছে বকিয়া যাইতেছে; তাহাতে শারীরিক ক্লান্তি যেন আরও দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে সাতটা; ভদ্রতা বাঁচাইয়া বিদায় লইতে হইলে অন্তত আরও একঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হয়। সে অধীরভাবে বিনয়বাবুর জন্য একবার চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল; দেখিল, তিনি একটা কোণে বসিয়া দীনবন্ধুবাবুর সহিত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া কি কথা কহিতেছেন।

অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা সম্ভব হইবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় অতি নিকটে কিশোরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, কিশোর ও করবী তাহার পশ্চাতে আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে।

কিশোর বলিল, 'আমার এবং এঁর পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত আর্জি আপনার কাছে পেশ করতে চাই।'

সুহাসিনী হাঁ-না কোনও উত্তর না দিয়া ফিরিয়া বসিল, তাহার মনের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। এতক্ষণ যে-শ্রান্তি তাহার দেহ-মনকে অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই যেন রূপান্তরিত হইয়া কিশোরের প্রতি দারুণ বিরক্তির আকার ধরিয়া দেখা দিল। কিশোরের এই সকৌতুক আবেদনের কোনও উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিশোর পুনশ্চ সহাস্যে আরম্ভ করিল, 'আমাদের বিনীত আর্জি হচ্ছে এই—'

'অনুপমবাবু, আমাকে এক গ্লাস জল এনে দিতে পারেন?'

'এই যে, এখনই দিচ্ছি'—বলিয়া অনুপম ব্যস্ত-সমস্তভাবে আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

কিশোর আবার বলিতে যাইতেছিল, সুহাসিনী বলিল, 'করবী আয়, আমার কাছে এসে বোস! কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'আর আমার আবেদন বুঝি কানেই তুলছেন না?' বলিয়া কিশোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিরক্তিপূর্ণ অবজ্ঞায় সুহাসিনী চোখ তুলিয়া বলিল, 'কী বলতে চান, সোজা করে বলুন।'

কিশোরের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে অপ্রস্তুতভাবে বলিল, 'একখানা গান গাইতে বলছিলুম।'

তাহার অদ্ভুত স্পর্ধায় সুহাসিনী যেন অবাক হইয়া গেল, ভ্রূ তুলিয়া শুধু একবার বলিল, 'গান?' তারপর গভীর বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পাশে উপবিষ্টা করবীর সহিত কথা কহিবার উদ্যোগ করিল।

কিশোর সুহাসিনীর কথার ধরন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমরা এতক্ষণ বলাবলি করছিলুম যে, আপনি যদি একখানা গান করেন—'

তড়িদ্বেগে তাহার দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ন অনুচ্চ-কণ্ঠে সুহাসিনী বলিল, 'আপনি কি মনে করেন, আমি পেশাদার গাইয়ে?'

কিশোর ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল; সুহাসিনীর কণ্ঠের যে সুরটা সে এতক্ষণ ধরিতে পারিতেছিল না, তাহা তীক্ষ্ন হইয়া তাহার কানে গিয়া বাজিতেই অপমানে তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সংযত স্বরে বলিল, 'আমায় মাপ করবেন। এ কথায় যে আপনি উত্ত্যক্ত হবেন তা আমি বুঝতে পারিনি।' বলিয়া আস্তে আস্তে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সুহাসিনীর মনে হইল, সে বুঝি এবার ভাঙিয়া পড়িবে। দুই হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া সে হেঁটমুখে ভাবিতে লাগিল—আজ তাহার কি হইয়াছে? কেন সে এমন সৃষ্টি-ছাড়া ব্যবহার করিয়া বসিল?

'এই নাও জল।'

অনুপমের কথায় মুখ তুলিয়া সুহাসিনী বলিল, 'জল? জল কি হবে?'

হতবুদ্ধি অনুপম বলিল, 'তুমি যে চাইলে?'

'ও—হ্যাঁ, আচ্ছা দিন' বলিয়া গ্লাস লইয়া এক নিশ্বাসে সব জলটুকু পান করিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিল।

অনুপম প্রস্থান করিলে সহসা করবীর তীব্র-কণ্ঠে সুহাসিনী চমকিয়া উঠিল। করবী সুন্দর মুখখানা রাঙা করিয়া বলিল, 'কিশোরবাবুকে অমন স্নাব করলে কেন বলো তো?'

ক্ষীণকণ্ঠে সুহাসিনী বলিল, 'কী করেছি?'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে করবী বলিল, 'অপমান করেছ। গান গাইতে বলে তোমার কী অসম্মানটা উনি করেছিলেন শুনি? আমার কথাতেই উনি তোমায় অনুরোধ করতে এসেছিলেন, নইলে আসতেন না।'

সুহাসিনীর ভয় হইল, সে এবার বিষম একটা কিছু করিয়া ফেলিবে। তাই ব্যগ্র-

ভাবে করবীর হাত চাপিয়া ধরিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, 'করবী, বাবাকে একবার বল তো, আমি এখনই বাড়ি যেতে চাই।'

সুহাসিনীর শুষ্ক শ্রীহীন মুখ দেখিয়া মুহূর্তে করবীর ক্রোধ গলিয়া জল হইয়া গেল, সে বিগলিত অনুশোচনার কণ্ঠে বলিল, 'আমি বুঝতে পারিনি, সুহাসদি, মাপ করো আমাকে। তোমার শরীর খারাপ হয়েছে! যে গরম এই ঘরটা—যেন অগ্নিকুণ্ড। চলো পাশের ঘরে, এখনই ঠিক হয়ে যাবে।' বলিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া এক-রকম টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গেল।

সেখানে ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া জোর করিয়া গায়ের জামা আল্গা করিয়া দিতে দিতে বলিল, 'হবে না? কি করে এটাকে বেঁধেছ বলো দেখি, একেবারে কেটে বসে গেছে যে!' তারপর তাহার মুখে-চোখে জল দিয়া হেলান-দেওয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া মাথার উপর পাখা খুলিয়া দিল।

মিনিট কুড়ি পরে সুহাস যখন করবীর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিল, তখন সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কি হইয়াছিল? বিনয়বাবু বিহ্বলভাবে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'সুহাস, কেমন আছিস মা?'

লজ্জিতমুখে সুহাসিনী বলিল, 'কিছুই তো হয়নি, বাবা। সামান্য একটু—'

বিনয়বাবুর পশ্চাতে কিশোর ও দীনবন্ধুবাবু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, করবী কিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল, 'অনেকক্ষণ থেকে সুহাসদির শরীরটা খারাপ মনে হচ্ছিল, তাই কথা কইতে ভাল লাগছিল না।'

তাহার কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া কিশোর তৎক্ষণাৎ সুহাসিনীর পাশে গিয়া বলিল, 'এখন আর শরীর তেমন মনে হচ্ছে না? বেশ ভাল বোধ হচ্ছে?'

সুহাসের মুখ সিঁদুরের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া কিশোরের কথার উত্তর দিল, চোখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে পারিল না।

দীনবন্ধু বলিলেন, 'তোমরা সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়িয়ে ওকে আরও অসুস্থ করে তুলবে দেখছি। সুহাস-মায়ী, তুমি আমার কাছে এসো, ঐ জানলাটার সামনে দাঁড়াবে চলো, বেশ হাওয়া পাওয়া যাবে।'

কিছুক্ষণ বাদে সাড়ে আটটা বাজিয়া যাইতেই অতিথিরা একে একে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। কিশোর উঠিবার উপক্রম করিতেই বিনয়বাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কিশোরবাবু, একলা পালাবেন না যেন, আমরা এক পাড়ার লোক, একসঙ্গেই যাব।' কিশোর সম্মতি জানাইয়া বসিয়া পড়িল।

করবী কিশোরের পাশে আসিয়া বলিল, 'আবার কবে আসছেন বলুন!'

কিশোর ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া করবী বলিল, 'না, সে হবে না, আসতে হবে। আমাদের বাড়িতেও যাওয়া চাই। কবে যাবেন বলুন। শীগ্‌গির না গেলে আমি কিন্তু আপনাদের বাড়ি গিয়ে উৎপাত আরম্ভ করব।'

কিশোর উৎসাহ দেখাইয়া বলিল, 'বেশ তো, বেশ তো। আমি ভারি খুশি হব আপনি এলে। বৌদিদিও খুশি হবেন।'

করবী বলিল, 'আচ্ছা বেশ, কিন্তু আগে আপনার যাওয়া চাই।'

কিশোর হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

ওদিকে হেমাঙ্গিনী সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে সুহাসিনীকে বলিতেছিলেন, 'হঠাৎ শরীর খারাপ হল, ভেতরে ভেতরে কোনও রোগ না জন্মে থাকে। তোমার বাবাকে বলি, এই বেলা ডাক্তার দেখানো হোক বাপু। এলাকাড়ি দিয়ে শেষে কী থেকে কী হয়ে

পড়বে!'

মাথা নাড়িয়া সুহাস বলিল, 'এমন কিছুই তো হয়নি মাসীমা, আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? ঘরটা গরম হয়ে উঠেছিল তাই—' নিজেকেও সে এই কথাটাই তখন হইতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

অনুপম বুকে হাত বাঁধিয়া গম্ভীর-চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, 'ও কোনও কাজের কথা নয়। আমার বিশ্বাস ও পাড়াটা তোমার সুট করছে না, একটু চেঞ্জ দরকার। আমি বলি, এই সময় যদি কিছুদিনের জন্যে শিমুলতলা বা দেওঘরে—'

সুহাসিনী হাসিয়া ফেলিল।

আর কেহ কিছু সন্দেহ না করিলেও হেমাঙ্গিনীর ন্যায় চতুরা নারী সুহাসিনীর আকস্মিক অসুস্থতার একটা হেতু বোধ হয় অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেকথা আভাসে ইঙ্গিতেও প্রকাশ পাইতে দিলেন না। শুধু বলিলেন, 'ভাল হলেই ভাল মা। কিন্তু শরীরের ওপর একটু নজর রেখো। আজ তোমার মা নেই, তাই আমায় বলতে হচ্ছে, তিনি থাকলে আমায় একটা কথাও বলতে হত না। আমার মত দশটা মেয়েমানুষের বলা-কওয়ার ভার তিনি একলাই নিতে পারতেন!'

স্বর্গীয়া বান্ধবীর প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তিনি একটি গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন।

বিনয়বাবুর জন্য ট্যাক্সি ডাকা হইয়াছিল।

দীনবন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনি নীচে নামিয়া গিয়াছিলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া সুহাস ও করবী কথা কহিতেছিল, কিশোর হেমাঙ্গিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে তখনও কয়েকজন অতিথি বসিয়া ছিলেন।

সুহাস বলিল, 'আচ্ছা, চললুম, ভাই। শীগ্‌গির একদিন যাস, নইলে ভারি রাগ করব—' বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

কিশোরের দিকে ফিরিয়া করবী বলিল, 'আপনাকেও আমার ঐ কথা, শীগ্‌গির যাবেন, নইলে ভারি রাগ করব!'

'আচ্ছা—নমস্কার।'

'গুড-নাইট' বলিয়া করবী হাত বাড়াইয়া দিল। হাসিতে হাসিতে শেক-হ্যান্ড করিয়া কিশোরও বলিল, 'গুড-নাইট।'

দু'ধারে দেয়াল দেওয়া সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি। কিশোর সিঁড়ির মোড় পর্যন্ত নামিয়া গিয়া দেখিল, বাঁকের নীচেই দেয়ালে ভর দিয়া সুহাস চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একলাফে তাহার কাছে গিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে?'

সুহাসের চোখের পাতা দু'বার কাঁপিয়া খুলিয়া গেল, ঠোঁট দুটিও কাঁপিতে লাগিল, সে অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিল, 'বুক বড় ধড়ফড় করছে আর পা কাঁপছে।'

'আমার হাত ধরুন' বলিয়া কিশোর নিজেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে নামতে পারবেন?'

নামিবে কি, কিশোরের হাত তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র সে থরথর করিয়া কাঁপিয়া সিঁড়ির উপরেই বসিয়া পড়িল। আজ জীবনে এই প্রথম কিশোরের স্পর্শ অনুভব করিয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন কত দিনের নিরুদ্ধ কান্নার বেগ গুমরিয়া উঠিল; এবং তাহার কুমারী-হৃদয়ের একান্ত অপরিচিত একটা দুর্দম বাসনা শরীরকে শিথিল অবশ করিয়া দিল। কিশোরের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া তাহার বুক ভিজাইয়া

দিবার বাসনা যে কতদূরে নিন্দনীয়, তাহা অনুভব করিয়া সে যেন অর্ধেক চৈতন্য হারাইয়া ফেলিল।

তাহাকে কাঁপিয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়া কিশোর আর দ্বিধা করিল না, দুই বাহু দিয়া স্বচ্ছন্দে শিশুর মত তাহাকে তুলিয়া লইল। মুহূর্তকাল এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। সুহাসের গলার আওয়াজ একেবারে বুজিয়া গিয়াছিল, তাই ওজর-আপত্তির একটা কথাও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না; সুখে আতঙ্কে হর্ষে শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া বেপমান বক্ষে কিশোরের বুকের উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

সিঁড়ির নীচে পৌঁছিয়া সুহাস চুপিচুপি বলিল, 'এবার নামিয়ে দিন।'

সন্তর্পণে তাহাকে নামাইয়া দিয়া কিশোর বলিল, 'এখন অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে, কেমন? বারান্দা পেরিয়ে গাড়িতে উঠতে পারবেন কি?'

'পারব।'

'আচ্ছা, তবে আমার হাত ধরে আসুন।'

কিশোরের হাত ধরিয়া স্বপ্নাবিষ্টার মত সুহাসিনী গাড়িতে গিয়া উঠিল। বিনয়বাবু গাড়িতে বসিয়া অপর দিকে দন্ডায়মান দীনবন্ধুবাবুর সহিত তখনও বাক্যালাপ চালাইতেছিলেন; সুহাসিনী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিতে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা দীনবন্ধু, তাহলে—'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল-পরশুর মধ্যে আমি যাব, তখন আবার কথা হবে।' দীনবন্ধুর গৃহ অন্যদিকে, তিনি 'আচ্ছা— চললুম' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিনয়বাবু বলিলেন, 'কিশোরবাবু, সামনে বসতে হবে না, এইখানেই আসুন। তিনজনের যথেষ্ট জায়গা হবে।'

সুহাসিনী সঙ্কুচিত হইয়া পিতার দিকে একটু সরিয়া বসিল, কিশোর তাহার পাশের খালি জায়গাটায় গিয়া উপবেশন করিল।

পথে যাইতে বেশী কথা হইল না, কিশোর একবার শুধু বলিল, 'এঁর স্বাস্থ্য বোধ হয় ডাক্তার দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করানো দরকার। রোগ কিছু আছে আমি মনে করি না—তবু—'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'দীনবন্ধুর সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিল। আমি তো আজ বড় ভয় পেয়ে গেছি। কখনও এমন হয় না— আজ হঠাৎ—না, কালই ডাক্তার ডাকব।'

সিঁড়ির ঘটনাটা কিশোর ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করিল না; বৃদ্ধ তাহাতে আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন কিন্তু লাভ কিছু হইবে না।

গাড়ি প্রায় বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন সময় কিশোর অনুভব করিল, গাড়ির ভিতরকার অন্ধকারে নরম একখানি হাত নিঃশব্দে আসিয়া তাহার হাতের মধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্য। এই নীরব কৃতজ্ঞতা ও অনুতাপের নিদর্শন স্বীকার করিয়া হাতে একটু সস্নেহ চাপ দিতেই হাতখানি ত্রস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সুহাসিনী আজিকার এই নূতন উপলব্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয় জাগ্রত করিয়া আস্বাদ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। বিস্ময়েরও যেমন তাহার অবধি ছিল না, মনের এই জাজ্বল্যমান অবস্থা সে যে এত দিন দেখিতে পায় নাই, সে জন্য ক্ষোভেরও তেমনই শেষ ছিল না। সুখ, বিস্ময়, কৌতুক, লজ্জা—কত রসই তাহার বুকের উপর দিয়া ঢেউয়ের মত বহিয়া গেল তাহার অন্ত নাই। নিজের অন্ধকার শীতল শয্যায় একা শুইয়া সে নির্লজ্জভাবে মনের রাশ ছাড়িয়া দিল।

তারপর অনেক রাত্রে নিবিড়ভাবে বালিশটা জড়াইয়া লইয়া যখন সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, তখন একজনের সুদৃঢ় বাহুবন্ধন ও করস্পর্শের স্মৃতি তাহার নিদ্রাকে আরও নিগূঢ় রসাপ্লুত করিয়া তুলিল।

১১

অনুপম প্রস্তাব করিবার পর হইতেই সুহাসিনীর বিবাহের কথাটা থাকিয়া থাকিয়া বিনয়বাবুর মনে তীক্ষ্মভাবে খোঁচা দিয়া যাইতেছিল। আর যে বিলম্ব করা উচিত নহে, সুহাসের জন্য একটি সৎপাত্র দেখা দরকার, এই চিন্তা একটা শারীরিক অস্বস্তির মত তাঁহার চেতনার পিছনে লাগিয়া ছিল। অথচ কী করিতে হইবে, কোথায় ভাল পাত্র পাওয়া যায়, এ সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান এতই সংকীর্ণ যে কার্যত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

দীনবন্ধুবাবু তাঁহার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু, কর্মস্থলে থাকা কালেই তাঁহার সহিত সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। কার্যোপলক্ষে দীনবন্ধুবাবুকে তখন মাঝে মাঝে ও অঞ্চলে যাইতে হইত; তিনি বিনয়বাবুর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিতেন। সুহাসিনী সেই সময় ফ্রক পরিয়া বাড়ির উঠানময় ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইত। তাহার 'সুহাস-মায়ী' নামটা সেই কালের।

চা-পার্টির রাত্রে দীনবন্ধুকে আড়ালে পাইয়া বিনয়বাবু নিজের সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কথা বন্ধুর কর্ণে ঢালিয়া দিলেন। দীনবন্ধুবাবুর কাছে তিনি কখনও কোন কথা গোপন করিতেন না। অনুপমের প্রস্তাব ও সুহাসিনীর প্রত্যাখ্যানের কথাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

সমস্ত শুনিয়া দীনবন্ধু বলিলেন, 'আপনি ঠিকই করেছেন। পাত্র নির্বাচন অবশ্য আমরাই করব। কিন্তু সুহাস-মায়ী এখন বড় হয়েছেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু হতে পারে না। কাজেই তিনি যাকে অপছন্দ করেছেন, অতিবড় সৎপাত্র হলেও তাকে ত্যাগ করতে হবে। সুহাস-মায়ী যে বিবাহের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন, তা আমিও লক্ষ্য করেছি; কিন্তু আমি আশা করেছিলুম খোঁজাখুঁজির দরকার হবে না, ও সমস্যাটার আপনিই সমাধান হয়ে যাব।' কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে, বিশেষ কাউকে মনে মনে পছন্দ করেন বলেই সুহাস-মায়ী সেদিন অনুপমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?'

বিনয়বাবু মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিলেন, 'না, আমার তো তা মনে হয় না। সে রকম ছেলে কে-ই বা আছে—যাকে সুহাস—; তবে আমি অন্যমনস্ক লোক, ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি, তাও হতে পারে।'

দীনবন্ধুবাবু অন্যমনস্ক লোক নহেন, তিনি ভাল করিয়াই চারিদিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আপাতত কিছু না বলিয়া সব দিক ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন বলিয়া বিনয়বাবুকে আশ্বাস দিলেন। সে-রাত্রে কথা এইখানেই স্থগিত রহিল।

পরদিন প্রাতে বিনয়বাবু চিঠি লিখিয়া দীনবন্ধুকে ডাকিয়া আনাইলেন। দীনবন্ধু আসিয়া শুনিলেন, একজন বিখ্যাত মহিলা-ডাক্তার ডাকা হইয়াছে, তিনি উপরের ঘরে সুহাসিনীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন।

অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার মিসেস সরকার নামিয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছে—এম. ডি. ডাক্তার; নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা সত্ত্বেও সুচিকিৎসার গুণে শহরের

সম্ভ্রান্ত ও অত্যাধুনিক সমাজে অনেক পুরুষ-ডাক্তার অপেক্ষাও অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বিনয়বাবুর উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'Nothing wrong, আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার মেয়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল। এমন clean-limbed healthy girl আমি খুব অল্পই দেখেছি, বিশেষত, আজকালকার এই সব tea-swelling cinema-mad modern মেয়েদের মধ্যে। She is a perfect innocent too!' ডাক্তার সরকার সকৌতুকে হাসিলেন, 'না, ওষুধ-বিষুধ দরকার নেই। কতকগুলো patent medicine গিলিয়ে ওর অমন সুন্দর system নষ্ট করে দিতে চাই না।'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'কিন্তু কাল রাত্রে—'

ডাঃ সরকার বলিলেন, 'ও কিছু নয়—momentary excitement, এ বয়সে এমন হয়ে থাকে। Girls will be girls, you know. কোন কারণে মানসিক উত্তেজনা হয়েছিল তাই she felt faint. You need n't worry about that,' আচ্ছা, উঠলুম তবে।' যন্ত্রপাতির ব্যাগটা লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'আর দেখুন, একটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে করবেন না। আপনারা হয়তো মেয়েকে পঁচিশ বছরের করে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু সব দিক দেখেশুনে, দেশের জলহাওয়া বিবেচনা করে আমার মনে হয়—সেটা মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অনাগত-যৌবনার বিবাহ দেওয়া যেমন ক্ষতিকর, বিগত-যৌবনারও তাই। সব জিনিসেরই দুটো extreme আছে মানেন তো?—আচ্ছা, Good bye! Gratuitous advice দেওয়া আমার একটা অভ্যাস —I hope you don't mind— নমস্কার!' বলিয়াই ভিজিট লইয়া সহাস্যমুখে তিনি প্রস্থান করিলেন।

বিনয়বাবু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, 'যাক, একটা দুর্ভাবনা দূর হল।' দীনবন্ধু বলিলেন, 'দুর্ভাবনা আপনারই হয়েছিল, আমার কস্মিন্ কালেও হয়নি। সে যাক, ডাক্তার সরকার বিবাহ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, সে-ও তো আমাদেরই মনের কথা. কালই এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। তাহলে ও বিষয়ে আর তর্ক নেই। এখন কথা হচ্ছে, সুহাস-মায়ীর জন্যে একটি ভাল বর দেখা দরকার।'

বিনয়বাবু চিন্তিতমুখে বলিলেন, 'সে তো বুঝেছি, কিন্তু তেমন পাত্র পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? তোমার জানাশুনোর মধ্যে এমন কোনও—'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'সে কথা পরে হবে। তার আগে কী রকম জামাইটি আপনার ঠিক চাই, সেই কথা আমাকে খোলসা করে বলুন তো।'

বিনয়বাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'কী রকম? বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান হবে, এই আর কি! ভদ্রঘরের ছেলে হবে, একেবারে দীন-দরিদ্র না হয়, আর কলকাতার মধ্যে হয়, তা হলেই ভাল,—মাঝে মাঝে মেয়েটাকে দেখতে পাব।' বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, 'শেষটাই আপনার আসল কথা, কী বলেন? কিন্তু এ-সব ছাড়াও আর একটা কথা আছে, সুহাস-মায়ীর পছন্দ হওয়া চাই।' ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, কিশোরকে আপনার কেমন মনে হয়?'

বিনয়বাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, 'কিশোর? কিশোর?'

সহাস্যে দীনবন্ধু কহিলেন, 'হ্যাঁ, কিশোর। চোখের বড্ড কাছে থাকে বলে নাকটাকে সহজে কেউ দেখতে পায় না। আমার গিন্নী আঁচলে চাবি বেঁধে প্রায়ই বাড়িময় চাবি খুঁজে বেড়ান এবং আমাকে সন্দেহ করেন। আপনারও তাই হয়েছে, পাশের বাড়ি বলে কিশোরকে লক্ষ্য করেননি।'

বস্তুত বিনয়বাবু এ দিক দিয়া কিশোরকে কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। ছেলেটিকে তাঁহার বড় ভাল লাগিয়া গিয়াছিল, যখন তখন তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া গল্পগুজবে অথবা জ্ঞানবিষয়ক আলোচনায় সময় কাটাইতেন। সুহাসিনীর সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগও কিশোর অন্যান্য পরিচিত বন্ধুদের মত সহজেই পাইয়াছিল। কিন্তু সুহাসিনীর স্বামী হিসাবে তাহার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা বিনয়বাবু কোন দিন বিচার করিয়া দেখেন নাই। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়া উঠিলেন 'সত্যিই তো! ঠিক তো! হ্যাঁ—এটা অ্যাদ্দিন চোখে পড়েনি! আর ঘরও যে আমাদের পালটি হে! সেদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বললে শাণ্ডিল্য গোত্র। চমৎকার ছেলে, দীনবন্ধু, খাসা ছেলে! যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই লেখা-পড়ায়, আর যার বড় নেই—কলকাতার বাসিন্দা।' বলিয়া তিনি উত্তেজনার ঝোঁকে হাঁপাইতে লাগিলেন। হঠাৎ এমন মনোমত পাত্র হাতের এত কাছে পাইয়া আনন্দে তিনি কন্যার বিবাহ দিবার মর্মগত অনিচ্ছাও ভুলিয়া গেলেন। সোৎসাহে আবার বলিলেন, 'হাতের কাছে এমন ছেলে রয়েছে, আর আমরা চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলুম! ব্যস্, আর দেরি নয়, দীনবন্ধু, তাহলে লাগিয়ে দাও। ছোকরাকে দেখে অবধি আমার যে কী ভাল লেগেছিল, তা আর তোমায় কি বলব। প্রথম থেকেই বুঝেছিলুম, অমন ছেলে আর হয় না।—তাহলে, কি বল দীনবন্ধু, বিবাহের প্রস্তাবটা ওর কাছে'—হঠাৎ তাঁহার উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হইল, থমকিয়া বলিলেন, 'কিন্তু সুহাস যদি কোনও গোল-মাল করে। তার যদি মত না হয়!'

দীনবন্ধুবাবু সকৌতুকে বিনয়বাবুর এই উত্তেজনা উপভোগ করিতেছিলেন. মৃদু-হাস্যে বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস সুহাস-মায়ীর অমত হবে না। আপনি বরং তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'সেই কথাই ভাল। সুহাসকে এইখানেই ডাকা যাক, কী বল? তার যা বলবার আছে আমাদের দু'জনের সামনেই বলুক।'

দীনবন্ধু হাসিলেন, 'দু'জনের সামনে বলতে হয়তো সে লজ্জা পাবে, তার চেয়ে আপনি বরং ও-ঘরে—'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'আচ্ছা বেশ, আমিই না হয় ওপরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে আসছি। আমার কাছে কিছু লুকোবে না, সেদিন অনুপম সম্বন্ধে তো বেশ পরিষ্কার-ভাবেই—'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'এ সব বিষয়ে 'না' বলা যত সহজ, 'হ্যাঁ' বলা তত সহজ নয়। কিন্তু আমি বলছিলুম আপনি বরং তাকে ডেকে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসুন, জিজ্ঞাসাবাদ যা করবার, আমিই করছি। আপনি যে রকম অস্থির হয়ে পড়েছেন, কি বলতে কি বলে বসে থাকবেন, তার ঠিকানা নেই।'

'না, না, তা বলব কেন? তা বলব কেন? এই সময় তোমার বৌদিদি যদি বেঁচে থাকতেন!—তা আচ্ছা, তুমিই ওকে প্রশ্ন করো, একই কথা—ও ঝি! সুহাসকে একবার এই ঘরে ডেকে দাও তো, বলো দীনবন্ধুবাবু ডাকছেন!—আমি তাহলে পাশের ঘরে রইলুম।'

কিছুক্ষণ পরে সুহাসিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকাবাবু, আমাকে ডাকছেন?'

দীনবন্ধু নতমুখে চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, 'হ্যাঁ, এসো সুহাস-মায়ী, আমার পাশে এসে বোসো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।' সুহাসিনী বিস্মিতভাবে তাঁহার পাশে গিয়া বসিল, বলিল, 'বাবা কোথায়?'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'তিনি ও-ঘরে আছেন।—সুহাস-মায়ী, তুমি যখন খুব ছোট্টটি ছিলে, পাজামা আর ফ্রক পরে একটা সেলুলয়েডের পুতুল বগলে করে বাড়িময় ছুটা-ছুটি করে বেড়াতে, তখন আমি মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়িতে যেতুম। মনে আছে?'

সুহাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আছে। আপনিই তো আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে আর মার্বেল খেলতে শিখিয়েছিলেন। তখন আমি ভারি দুরন্ত ছিলুম—না?'

দীনবন্ধু অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তা আমার মনে নেই। কিন্তু সন্ধ্যার পর আমার কোলের কাছটিতে বসে তুমি যে-সব গোপনীয় মনের কথা আমাকে বলতে, তা বেশ মনে আছে।'

সুহাসিনী কৌতূহলী হইয়া বলিল, 'আমার কিন্তু মনে নেই। কি সব মনের কথা বলতুম কাকাবাবু, বলুন না।'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'তোমার কি রকম ছেলে চাই, কটা মেয়ে চাই, কত বড় বাড়ি, ক'খানা মোটর না হলে একেবারেই চলবে না, এই সব গোপনীয় কথা আমাকে বলতে। বড় হয়ে আমার মত একটা ছেলে যে তোমার নিতান্ত দরকার, একথাও তখন বলেছিলে। সেই জন্যই তো তোমাকে সুহাস-মায়ী ছাড়া আর কিছু বলতে পারলুম না।'

'ছেলে সম্বন্ধে সে-মত আমার এখনও বদলায় নি, কাকাবাবু' বলিয়া সলজ্জহাস্যে সুহাসিনী চোখ নীচু করিল।

দীনবন্ধু বলিলেন, 'সে আমি জানি! কিন্তু একটা কথা তুমি তখন বলনি, বোধ হয় খেয়াল হয়নি। সেইটে আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

'কী কথা, কাকাবাবু?'

দীনবন্ধু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আমার মত ছেলে চাও বলেছিলে বটে, কিন্তু ছেলের বাপটি যে কি রকম চাই, তার আভাস দিতে তখন ভুলে গিয়েছিলে। আমারও জেনে নেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন যে সেটা জানা দরকার হয়ে পড়েছে, সুহাস-মায়ী।'

সুহাসিনীর মাথায় যেন লজ্জার পাহাড় ভাঙিয়া পড়িল। সে আরক্ত নতমুখে বসিয়া ঘামিতে লাগিল।

দীনবন্ধু পূর্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, 'ত্রুটি আমারই, তখনই এই বিষয় আমার সবিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। কিন্তু ভুল যখন হয়ে গেছে তখন তো আর উপায় নেই। মনে করো, আমরা আবার সেই আগেকার দিনে ফিরে গেছি; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার বাবাটি কি রকম হলে তোমার পছন্দ হয়? তুমিও সেদিনকার মত মন খুলে সরলভাবে উত্তর দাও দেখি।'

সুহাসের চক্ষু বুজিয়া আসিতেছিল, গলাও প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'আমি ও-সব কিছু জানি না।'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'জানো নিশ্চয়, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছ না। লজ্জা কি মা? তোমার মন না জেনে তো আমরা কিছু করতে পারি না। কিন্তু আর যে জামাই না হলে আমাদেরও চলছে না। নাও, মুখ তুলে আমার পানে চাও দেখি।' বলিয়া সস্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিতে গেলেন। প্রত্যুত্তরে সুহাস হেঁট হইয়া তাঁহার জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, 'না, আমি কিছু বলতে পারব না, কাকাবাবু।'

'পাগল মেয়ে। এত লজ্জা!' দীনবন্ধুবাবু মনে মনে খুশিই হইলেন। আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, কী রকম বর চাই, তা তোমাকে বলতে হবে না—আমিই না হয় বলছি—।— একটি ছেলেকে আমার আর তোমার বাবার দু'জনেরই খুব পছন্দ হয়েছে। তুমিও তাকে চেনো—'

সভয়ে সপ্রশ্ননেত্রে সুহাসিনী মুখ তুলিল।

'কিন্তু তার সম্বন্ধে তোমার মনের কথা কী, তা না জানা পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারছি না। ছেলেটির নাম কিশোর।'

বিদ্যুদ্‌বেগে আবার সুহাস তাঁহার জানুর মধ্যে মুখ লুকাইল।

দীনবন্ধুবাবু ভিতরে ভিতরে সবই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এই কন্যাপ্রতিম মেয়েটির প্রথম অনুরাগের সলজ্জ মধুটুকু উপভোগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। তাই এতক্ষণ নানা ছল চাতুর্যের অবতারণা করিয়া এই নবোন্মেষিত হৃদয়ের সরসোজ্জ্বল মাধুর্যটি নিজের পরিণত বয়সের রসোপলব্ধি দ্বারা সানন্দে আস্বাদন করিতেছিলেন। তিনি জোর করিয়া সুহাসের মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, 'এবার তো সুহাস-মায়ী, হ্যাঁ না যা-হোক একটা উত্তর দিতে হবে, আর তো চুপ করে থাকা চলবে না। কিশোরের সম্বন্ধে তোমার মনের কথাটি কী, আমাকে চুপি চুপি বলে ফেলো তো দেখি।'

সুহাস উত্তর দিল না, চক্ষু মুদিয়া রহিল।

'বলবে না? আচ্ছা, চোখ খুলে চাও। তাও না? তবে তো ভারি মুশকিল। কিশোর বেচারার ভাগ্য পরীক্ষা তাহলে হয় কি করে?' ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দীনবন্ধুবাবু যেন কী চিন্তা করিলেন, 'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। ছেলেবেলার সে-খেলা আমি এখনও ভুলিনি, তোমারও নিশ্চয় মনে আছে। এই আমি চোখ বুজে রইলুম, তোমার উত্তর যদি 'হাঁ' হয় তাহলে একটা চুমু খাবে, আর যদি 'না' হয় তাহলে হাতে একটা চিমটি কাটবে—কি—বলো? ব্যস, এইবার আমি চোখ বুজলুম।'

দীনবন্ধুবাবু সুহাসিনীকে ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। কিয়ৎকাল কিছুই হইল না, তারপর সহসা নিজের কপালে ওষ্ঠাধরের মৃদু স্পর্শে তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, সুহাস বিদ্যুতের মত ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

'সুহাস—সুহসা-মায়ী'—ডাকাডাকিতে কোনই ফল হইল না। সুহাস তখন নিজের ঘরে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

বিনয়বাবু লাইব্রেরি-ঘর হইতে শঙ্কিতভাবে গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হল?'

দীনবন্ধুবাবু পুনশ্চ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই, আপনি আসুন। আমার যতদূর মনে হল কিশোরকে বিয়ে করতে সুহাস-মায়ীর আপত্তি হবে না।'

বিনয়বাবু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'যাক, এ দিকে তাহলে আর কোনও গন্ডগোল নেই। এখন কিশোরের কাছে কথাটা তুলতে পারলে—'

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, 'সেটা আজ বিকেলবেলা করলেই হবে। আমার কলেজের বেলা হয়ে গেছে, আমি আর বসতে পারব না। উঠলুম। কলেজে অবশ্য তার সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু আমি তাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। আপনি মেয়ের বাপ, বলা-কওয়া আপনারই দরকার। যা হোক, বিকেলবেলা আমি আবার আসছি, তখন যথা-কর্তব্য স্থির করা যাবে।' বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

১২

পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে দীনবন্ধুবাবু আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতে কিশোরকে একটা ডাক দিয়া বিনয়বাবুর বাড়িতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় একখানা গাড়ি সম্মুখে আসিয়া থামিল। গাড়ি হইতে করবী, অনুপম ও হেমাঙ্গিনী

অবতরণ করিলেন। সকলের বেশভূষার কিছু অধিক পারিপাট্য দেখিয়া দীনবন্ধু বুঝিলেন, শুধু এখানে নয়, আর কোথাও যাইবার জন্য ইঁহারা প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়াছেন।

কথা কহিতে কহিতে সকলে একসঙ্গে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিশোরও আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাকে দেখিয়া করবী আনন্দে বলিয়া উঠিল, 'এই যে, কিশোরবাবুও এসে পড়েছেন— বেশ হয়েছে। আমরা সুহাসদিকে বায়োস্কোপে ধরে নিয়ে যাব বলে এসেছি। আপনিও চলুন।'

অনুপমের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু দূরদর্শিনী হেমাঙ্গিনী করবীর কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ—সেই বেশ হবে। করবীর সঙ্গে সারাক্ষণ কথা কইবার জন্য একজন চাই তো। বায়োস্কোপ দেখতে বসে রাজ্যের যত কথা ওর মনে আসে। আমি বাপু বুড়োমানুষ, ওর সঙ্গে বকতে পারব না। কিশোর, তুমি বাবা ওকে সামলে রেখো।'

হেমাঙ্গিনীর সুমিষ্ট কথার মধ্য হইতে ইঙ্গিতটা গোপন রহিল না যে, করবীকে সঙ্গদান করিবার জন্য কিশোরের বায়োস্কোপে যাওয়া চলিতে পারে এবং ইহার ফলে ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সুহাসিনীকে সঙ্গদান করিবার ভার বাধ্য হইয়া কাহার উপর পড়িবে তাহাও সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

এই সহজে অনুমেয় তত্ত্বটি যিনি সর্বাগ্রে বুঝিয়াছিলেন সেই দীনবন্ধুবাবু কিন্তু বাদ সাধিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'কিশোরকে আজ তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে, করবী। তোমাকে শ্যাপেরোন করবার সৌভাগ্য আজ ওর হল না। ওকে আমার একটু দরকার আছে।'

কী দরকার জিজ্ঞাসিত হইয়াও দীনবন্ধুবাবু কিছু ভাঙিলেন না, শুধু বলিলেন, 'জরুরী কাজ, তা না হলে আটকাতুম না। অনুপম বাবাজী একলা তিনটি মহিলাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়বেন বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় কি?'

করবী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, 'আপনি সব মাটি করে দিলেন। ভেবেছিলুম আজ বকে বকে কিশোরবাবুর মাথা ধরিয়ে দেব, তা আর হল না। যা হোক, আমার নিমন্ত্রণ পোঁছিয়ে গেল মাত্র, আর একদিন হবে,—কি বলেন কিশোরবাবু?'

কিশোর স্মিতমুখে সম্মতি জানাইল।

বায়োস্কোপে যাইবার তাড়াতাড়ি বিশেষ ছিল না, তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। তাই সকলে মিলিয়া সময় কাটাইবার জন্য গল্প-সল্প করিতে লাগিলেন। করবী ও সুহাসিনী ঘরের একটা কোণে গিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। তাহাদের মৃদু-কথিত গলার আওয়াজ ও মাঝে মাঝে করবীর হাসির শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী দীনবন্ধুবাবুকে পাকড়াও করিয়া কথাচ্ছলে বুঝাইতে লাগিলেন যে, বর্তমান যুগে স্ত্রীলোক হইয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার এবং কলিকাতা শহরে ভাড়াটে নামক অর্থপিশাচ জীবগুলোর নিকট হইতে মাসিক বাড়িভাড়া আদায় করা কী অমানুষিক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কাজ; দীনবন্ধু চক্ষু মুদিত করিয়া বোধ করি খুব মনোযোগ দিয়াই শুনিতে লাগিলেন।

দৈবক্রমে কিশোর, অনুপম ও বিনয়বাবু পরস্পর কাছাকাছি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও দল পাকাইয়া একটা কোন প্রসঙ্গের আলোচনা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন প্রসঙ্গই জমিতেছিল না। বিনয়বাবু বায়োস্কোপ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তার লইয়া একটা আলোচনা আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু গোড়া হইতেই উৎসাহ ও প্রেরণার অভাবে উহা

নির্জীব ভাব ধারণ করিয়া অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। চুপচাপ মুখোমুখি বসিয়া থাকার অপেক্ষা যাহা হউক কিছু বলা দরকার মনে করিয়া কিশোরও একবার একটা কথা উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোথায় এই তিনজনের মনের মধ্যে অনেকখানি সংকোচ ও কুণ্ঠা লুকাইয়া ছিল, অম্লরসের মত তাহা বারংবার তাহাদের ঘনীভূত জল্পনার সকল উদ্যোগই ছিঁড়িয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল।

অনুপম এইবার গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বলিল, 'আজ যশোর থেকে আমার এক বন্ধুর চিঠি পেলুম। তিনি কিশোরবাবুকে চেনেন।'

কিশোর বলিল, 'আমাকে চেনেন! কী নাম বলুন তো?'

'ধনপতি চৌধুরী—ডাক্তার।'

কিশোর চিন্তা করিয়া বলিল, 'কী জানি, আমি তো মনে করতে পারছি না। যশোরে আমি মাত্র একবার গিয়েছি, তাও এমন অবস্থায় যে—'

অনুপম মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আপনি না চিনতে পারেন; তবে যাঁকে আপনি বৌদিদি বলে নিজের কাছে রেখেছেন, তিনি বিলক্ষণ চেনেন।'

হঠাৎ ঘরের মধ্য দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কথাটা অনুপম ইচ্ছা করিয়াই বেশ জোর গলায় বলিয়াছিল, তাই সকলেই শুনিতে পাইলেন, এবং কথার অন্তর্নিহিত বক্রোক্তিটাও এতই সুস্পষ্ট যে কাহারও কর্ণকে ফাঁকি দিতে পারিল না। ঘরের কোণে করবী ও সুহাসিনীর বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল। দীনবন্ধুবাবু চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, বিনয়বাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া অনুপমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কেবল হেমাঙ্গিনী ক্ষণেকের জন্য নীরব হইয়া, যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাবে দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে আবার কথা কহিতে শুরু করিলেন।

কিশোর স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অনুপমকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, 'আপনি কী ইঙ্গিত করছেন, পরিষ্কার করে বলবেন কি?'

ভ্রূ তুলিয়া অনুপম বলিল, 'ইঙ্গিত? ইঙ্গিত তো কিছু করিনি! যাকে আপনি বৌদিদি বলে থাকেন—'

শান্তস্বরে কিশোর বলিল, 'অনুপমবাবু, সোজা কথাকে এত ঘুরিয়ে বলবার প্রয়োজন কী তা তো বুঝছি না। আমি স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসি।'

অনুপম বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'আমিও স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি এবং সেইজন্যেই বলছি যে স্ত্রীলোকটিকে আপনি বৌদি বলে প্রচার করে নিজের—'

কিশোরের অনুচ্চ অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ছুরির মত অনুপমের মুখের কথাকে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিল, 'ব্যস! আর না। আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আমি অনুমান করতেও চাই না। কিন্তু—আপনার ভালর জন্যেই বলছি—ভবিষ্যতে যখন ওঁর উল্লেখ করবেন তখন আমার বৌদিদি বলেই করবেন।'

কিশোরের কণ্ঠস্বর ও চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাহা অনুপম পূর্বে কখনও দেখে নাই। অনুপম আজ কিশোরকে নূতন করিয়া চিনিল। ইহাকে এমন অবহেলাভরে ঘাঁটানো যে নিরাপদ নহে, এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র সে চট করিয়া কথার ভঙ্গী বদলাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, 'কিন্তু—আমি তো অন্যায় কথা কিছুই বলিনি। ধনপতির চিঠি পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে উনি আপনার নিজের বৌদিদি নন, সেই কথাই বলছিলুম। কিন্তু—ধনপতি এমন কথা লিখলে কেন? সে আপনাদের বিষয় অনেক কথাই লিখেছে। এ কথাও লিখেছে যে তীর্থনাথ হালদার বলে কোনও এক মাস্টার—'

কিশোর শুষ্কস্বরে বলিল, 'আপনাদের বন্ধুটি সত্যি কথাই লিখেছেন। এবার তাঁকে

মনে পড়েছে,—ডাক্তারের ন্যায্য অধিকার লঙ্ঘন করে যাবার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কিন্তু কথাটা ঠিক, উনি আমার নিজের বৌদিদি নন, এমন কি মাসতুত-পিসতুতও না। উনি আমার এক বন্ধুর স্ত্রী। কিন্তু থাক, নিজের পারিবারিক কথা অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি ভালবাসি না। আপনাদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট যে, উনি আমার বৌদিদি।' বলিয়া কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া শুনিতেছিল, কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইতেই সে চোখ তুলিয়া তাহার মুখ দেখিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একদিনের একটা দৃশ্য তাহার চোখের উপর দিয়া কালো মেঘের মত ছায়া ফেলিয়া গেল—সেই যেদিন ছাদের উপর ভিজিতে ভিজিতে কিশোর ও বিমলাকে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া কিশোরের সত্রাস পলায়ন—ক্ষণকালের জন্য সেই ছবিটা অন্য এক রূপ ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে সব আলো মুছিয়া দিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। মুহূর্তমধ্যে সে এই অতি গর্হিত সন্দেহটাকে মন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিল, এবং নিজের ক্ষুদ্রতাকে ধিক্কার দিয়া দৃঢ়পদে উঠিয়া কিশোরের সম্মুখীন হইয়া বলিল, 'আজ আপনি আমাদের সঙ্গে বায়োস্কোপে যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতুম। কিন্তু যখন যাওয়া হল না, তখন আর একদিন আমি, আপনি, বাবা আর কাকাবাবু একসঙ্গে যাব—এই কথা রইল। আর আপনার বৌদিদি যদি আসেন—'

নিমেষমধ্যে কিশোরের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল, সে প্রফুল্ল হইয়া বলিল, 'আচ্ছা বেশ, বৌদিদিকেও যে-করে পারি ধরে নিয়ে যাব।'

করবী সুহাসিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, 'বা রে! আর আমি বুঝি বাদ? সে হবে না, আমিও যাব। কিশোরবাবু, মনে আছে তো আপনার সঙ্গে কী কন্‌ট্রাক্ট হয়েছে?'

দীনবন্ধু অতিশয় সরল মনে বলিলেন, 'বেশ কথা। সেদিন করবীর সমস্ত কথা শোনবার এবং তার উত্তর দেবার ভার আমি নিলুম।' বলিয়া নিরীহভাবে সপুত্র হেমাঙ্গিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

দীনবন্ধুর কথায় সুহাসিনীর চমক ভাঙিল। আজই সকালে, যাহাকে সে ভালবাসে বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে, তাহাকে পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের সম্মুখে এমনভাবে সম্বোধন করার বিসদৃশ নির্লজ্জতা চোখে পড়িবামাত্র সঙ্কোচে সে মাটির সহিত মিশিয়া গেল এবং কেন যে অকারণে এতগুলা কথা কিশোরকে বলিতে গেল, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া নিজের প্রগল্‌ভতার জন্য নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এই সময় হেমাঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীরসকণ্ঠে বলিলেন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুহাস, তোমার শ্লিপার জোড়া বদলে নাও। এর পর গেলে গোড়াটা দেখতে পাবে না।—অনুপম, একটা ট্যাক্সি।'

সুহাসিনী নিজের পায়ের দিকে একবার দৃষ্টি নামাইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

মিনিট পাঁচেক পরে বায়োস্কোপ-যাত্রীদের গাড়ি রওনা হইয়া গেলে অবশিষ্ট তিন-জন আবার ঘরে আসিয়া বসিলেন।

কিন্তু অনুপমের সঙ্গে ঐ অপ্রীতিকর চর্চাটা তিনজনকেই ভিতরে ভিতরে পীড়া দিয়া তাঁহাদের মনের সহজ শান্ত ভাব নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাই, যে কথা বলিবার জন্য কিশোরকে আটকাইয়া রাখা হইল, দুইজনের কেহই তাহা সহসা উত্থাপন করিতে

পারিলেন না। অসংলগ্ন অন্যমনস্ক ভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। প্রয়োজনীয় কথাটা কী, তাহা জানিবার জন্য কিশোরেরও কম কৌতূহল ছিল না, কিন্তু সে কোন প্রশ্ন করিল না। সময় উপস্থিত হইলে দীনবন্ধু আপনা হইতেই বলিবেন বুঝিয়া সে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

তারপর কখন অজানিতভাবে তিনজনের মধ্যে একটি প্রগাঢ় আলোচনা শুরু হইয়া তাঁহাদের এমনই অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইল যে, সময়ের দিকে কাহারও লক্ষ্য রহিল না। আধুনিক ও প্রাচীন ইংরাজী, ফরাসী, ইটালীয় ও জার্মান সাহিত্যের কাব্যের দিকটাতে বিনয়বাবুর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। দীনবন্ধুবাবুরও সকল বিষয়ে এমন একটি স্বাভাবিক সত্যদৃষ্টি ছিল যে, কাব্য-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও বোধ ও অনুভূতির ব্যাপকতা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে পারিতেন। কিশোরের শিক্ষার ধারা যদিও রসায়নের দিকেই গিয়াছিল, তথাপি তাহার উৎসুক মন রসশাস্ত্রকেও কোনও দিন অবহেলা করে নাই, বাংলা ও ইংরাজী কাব্যে তাহার ভাল রকম দখল ছিল। সুতরাং বিনয়বাবুর জ্ঞানপূর্ণ অথচ সরল কাব্যালোচনা সকলের হৃদয়ের মধ্যেই একটি সরস তন্ময়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিনয়বাবু পাশ্চাত্ত্য মহা-কাব্যের আদি পিতা হোমার হইতে আরম্ভ করিয়া ভার্জিল, দান্তে, টাসো, চসার, ফ্রাঁসোয়া, ভিঁল, গেটে, ভিক্টর হুগো, কীটস এবং সর্বশেষ রুপার্ট ব্রুক—সকলকে রসের একসূত্রে গ্রথিত করিয়া কাব্যের বংশানুক্রম দেখাইয়া যাইতেছিলেন, কিশোর ও দীনবন্ধু মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে দু' একটা কথার দ্বারা নিজ নিজ উপলব্ধির আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, এবং দু'জন শ্রোতারই মনে থাকিয়া থাকিয়া এই বিস্ময়টি খেলিয়া যাইতেছিল যে, সংসারী বিনয়বাবু ও অধ্যাপক বিনয়বাবুতে কী আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

ঠং করিয়া ঘড়ি বাজিতেই সকলে একসঙ্গে চোখ তুলিয়া দেখিলেন সাড়ে আটটা। বিনয়বাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'তাই তো হে, দু' ঘণ্টা ধরে বকে চলেছি। আর তোমরা চুপ করে বসে শুনছ? তোমাদের ধৈর্য তো কম নয়।'

দীনবন্ধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আরও দু'ঘণ্টা হলেও আমার ধৈর্য-চ্যুতি হত না।—কিন্তু সে যাক। এখন আপনি কিশোরকে কী বলতে চান তাই বলুন।'

বিনয়বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া একবার ঘরময় পায়চারি করিলেন, চুলের মধ্য দিয়া আঙুল চালাইয়া চুলগুলাকে অত্যন্ত এলোমেলো করিয়া তুলিলেন, তারপর বিস্মিত কিশোরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় ভগ্নস্বরে বলিলেন, 'বাবা কিশোর, আমার সুহাসকে আমি তোমার হাতে দিতে চাই—তাকে—' বলিয়া আরও কিছু বলিতে চাহিলেন কিন্তু আবেগের পূর্ণতা হেতু বলিতে পারিলেন না।

কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল। এত অপ্রত্যাশিত, এমনই অচিন্তনীয় এই প্রস্তাব যে, কিশোরের মাথা ঘুরিয়া গেল। হৃৎপিণ্ড গলার কাছে আসিয়া সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং মুহূর্তের জন্য ঘূর্ণমান পৃথিবীটা তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। কেবল সেই শূন্যতার কেন্দ্রস্থলে একখানি স্মিতসলজ্জ সুকুমার-সুন্দর মুখ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আনন্দের বন্যার মত এই অনুভূতি তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল যে, তাহার নিভৃত অন্তর্যামী এই বস্তুটিকেই এত দিন একান্তভাবে কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছিল। কিন্তু এত নিগূঢ় সে কামনা যে, কোনদিন তাহাকে নিজের মনেও স্পষ্ট করিয়া রূপ দিবার সাহস তাহার হয় নাই। সে নিজের কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল, 'কিন্তু তিনি কি—?'

দীনবন্ধুবাবু হাত বাড়াইয়া তাহার হাতে একটু চাপ দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। তাঁর

মত না নিয়ে কিছু করা হয়নি।' বলিয়া কিশোরের হাত আর একবার চাপিয়া দিলেন।

এইবার কিশোরের সমস্ত স্নায়ু শিরা পূর্ণ করিয়া অনির্বচনীয় সুখের একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সুহাস নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। সে তাহাকে চায়! হয়তো মনে মনে অনেক দিন হইতেই—। প্রেয়সী নারীর হৃদয় জয় করিবার যে গর্ব, তাহা কিশোরের মুখখানাকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সে সহাস্যে মুখ তুলিয়া বলিল, 'তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি আর কী বলব, আপনাদের ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ।'

বিনয়বাবু কম্পিতস্বরে বলিলেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও।'

কিশোর নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। দীনবন্ধুর পায়ের কাছে মাথা নোয়াইতে তিনি সবলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কিশোর, এত দিন তুমি আমার ছাত্র সহকর্মী ছিলে, এবার তোমার পদবী বদলে গেল। জান তো, সুহাস-মায়ী আমার মা।'

কিছুক্ষণ পরে দীনবন্ধু বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি কিছু নেই, শ্রাবণ মাস তো শেষ হয়ে এল। মাঝে অঘ্রাণ মাসও বাদ যাবে—সেই মাঘ-ফাল্গুনের আগে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু এ দিকে কাজকর্ম সব এগিয়ে রাখা ভাল। তোমার বাবাকে চিঠি লিখে, তারপর তাঁর কাছে গিয়ে সব ঠিক-ঠাক করতে হবে। সাহেবমেমের ব্যাপার তো নয় যে, শেষ বরাবর বাপকে একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র দিলেই চলবে। বলা যায় না, তোমার বাবা হয়তো বরপণ দাবি করতে পারেন। তোমরা কুলীন বটে তো হে?' বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কিশোরের নিকট হইতে কিন্তু এ হাসির জবাব আসিল না। সহসা তাহার মুখখানা অত্যন্ত শুষ্কভাব ধারণ করিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, 'বাবাকে জানানো কি আবশ্যক?'

দীনবন্ধু বিস্মিত হইলেন, কিশোরের মনের ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন যে, কিশোরের পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন ও প্রথম পক্ষের ছেলের প্রতি তাঁহার স্নেহ কিছু আলগা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহের সময় তাঁহাকে সংবাদ পর্যন্ত দেওয়া হইবে না, ইহাই বা কী করিয়া সম্ভব? তিনি বলিলেন, 'আবশ্যক নয়? বল কি হে? তিনি যে বরকর্তা, তিনি যত দিন আছেন তত-দিন তুমি যে কেউ নও। কথায় বলে—বর না চোর। তাঁর অনুমতি যে সর্বাগ্রে চাই। অবশ্য তুমি সাবালক স্বাধীন, বাপের গলগ্রহ নও, সে সব আমি জানি। কিন্তু আমাদের সমাজে এ প্রথাটা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে—না করলে তাঁকে অসম্মান করা হবে যে।'

'কিন্তু তিনি হয়তো—' কথা শেষ না করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল, দীনবন্ধুর দিকে ফিরিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'এ বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়, আপনারা যা ভাল বুঝবেন, করবেন।'

একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তাহার ছায়াচ্ছন্ন আশঙ্কাচিহ্নিত মুখ লক্ষ্য করিয়া দীনবন্ধু ভাবিলেন, কিশোরের বাপ বোধ হয় সেকেলে গোঁড়া হিন্দু, এত বড় মেয়ের সঙ্গে এরূপ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ঘরে বিবাহ দিতে রাজী না হইতে পারেন, এই চিন্তা কিশোরকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

অন্ধকার 'করিডর' পার হইয়া বাহিরের বারান্দায় পা দিতেই কিশোর দেখিল সুহাসিনী মোটর হইতে নামিয়া গাড়ির অন্যান্য আরোহীদের নিকট বিদায় লইয়া

বহির্দ্বারের সম্মুখীন হইল। মোটর চলিয়া গেল। বাড়ির দ্বার খোলাই ছিল, অস্ফুট-স্বরে একটা গানের কলি গুঞ্জন করিতে করিতে বারান্দায় প্রবেশ করিয়া সুহাসিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যদিও বারান্দায় আলো ছিল না, তবু রাস্তার একটা গ্যাসের আলো জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া বন্ধ বারান্দাটিকে ঈষৎ আলোকিত করিয়াছিল। অস্পষ্ট আলোতে সুহাস চিনিল, কিশোর দাঁড়াইয়া আছে।

দু'জনেই ক্ষণকাল পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া নীরব হইয়া রহিল, কাহারও মুখে সহসা কোন কথাই আসিল না। তারপর সুহাস মুখ নীচু করিয়া জড়িতস্বরে কী একটা বলিয়া পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। কিশোরও তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ ছাড়িয়া ছিল।

দরজা পার হইয়া সুহাস 'করিডরে' প্রবেশ করিয়াছে—

'সুহাস!'

সুহাসিনী চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্যাসের আলো সোজা আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, কিশোর তাহার কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, 'সুহাস, আজ তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে দান করতে চেয়েছেন। এ দান নেবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না; কিন্তু আমি নিয়েছি। দীনবন্ধুবাবু বললেন, তোমার অমত নেই। কিন্তু এই কথাটি আমি তোমার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই।'

সুহাসিনীর বুকের ভিতর যে ঝড় বহিয়া গেল, বাহিরে তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না, এমন কি তাহার সর্বশরীর যে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, তাহাও ক্ষীণালোকে ধরা পড়িল না। সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রুমালের খুঁট আঙুলে জড়াইতে লাগিল।

কিশোর বলিল, 'এই ক'দিনের জানাশোনায় তুমি যে আমাকে ভালবাসবে এ আমি কল্পনাও করতে পারি না—তবু—' কিশোর থামিল।

ঘরে আলো থাকিলে আজ সুহাস একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিত না, কিন্তু এই আবছায়া আধ-অন্ধকার তাহার লজ্জাকে আবৃত করিয়া দিল। সে মুখ তুলিয়া মৃদু-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'কেন কল্পনা করতে পারেন না?'

কিশোর তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আগ্রহস্পন্দিত স্বরে কহিল, 'সুহাস, সত্যিই কি—'

সুহাসের মনে হইল, তাহার দেহের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত দ্রব হইয়া তরল হইয়া গিয়াছে, আর বুঝি সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। হাতখানা সে সম্পূর্ণ কিশোরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আর এক হাতে নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

'সুহাস, সত্যিই কি তুমি আমাকে—? না, তুমি নিজের মুখে বল।' স্বপ্নের মত কিশোর শুনিতে পাইল, সুহাসিনী যেন বলিতেছে, 'হ্যাঁ! তুমি জানতে পারনি? আমিও আগে জানতে পারিনি। কাল রাত্রে যখন তুমি—' সুহাসের মুখের কথা মুখে মিলাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ দুইজনে এমনিভাবে হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অতি দীর্ঘ-নিশ্বাস পতনের শব্দে দু'জনেই মুখ তুলিয়া দেখিল তাহাদের মুখের চেহারা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। কিশোর বুভুক্ষুর মত সুহাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, 'সুহাস, আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে, আমার উপর মনপ্রাণ সব ছেড়ে দিয়ে নির্ভর করতে পারবে?'

কথাগুলার মধ্যে এমন একটা ব্যগ্র মিনতি ছিল যে, সুহাসের চোখে জল আসিয়া পড়িল। যাহার হাতে সর্বস্ব তুলিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিবে না? সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, 'পারব।'

দুই হাতে সুহাসের নরম হাতখানা একবার ধরিয়া কিশোর ছাড়িয়া দিল। তারপর

আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। প্রাপ্তির এই প্রথম উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনায় পাছে অধিকারের অতিরিক্ত কোন অসংযম প্রকাশ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে জোর করিয়া সে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

১৩

মনের সঙ্গে যখন পা দুটার সংযোগ থাকে না, তখন তাহারা স্বেচ্ছামত নিজের পরিচিত পথে চলে। বিনয়বাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই কী এক নেশায় বুঁদ হইয়া কিশোর পথ চলিয়াছিল; কোথায় যাইতেছে কোন খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সজাগ হইয়া দেখিল, তাহার কলেজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি দশটার সময় কলেজের অন্ধকার প্রকান্ড বাড়িখানার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাহার ভারি হাসি পাইল। নিজ মনে হাসিতে হাসিতে সে আবার বাড়ির দিকে ফিরিল।

যে আনন্দের সংবাদটা সমস্ত জগৎ ভুলাইয়া তাহাকে অকারণে অভ্যাসবশেই এতদূর টানিয়া আনিয়াছিল, বৌদিদির কাছে সেই কথাটি ব্যক্ত করিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। আজ একাদশী, তাই সে সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির মত আহারাদি শেষ করিয়া লইয়াছিল। বৌদিদি হয়তো এতক্ষণ উপবাসক্লিষ্ট দেহে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভাবিয়া সে জোরে জোরে পা চালাইয়া ছিল।

বৌদিদি কিছুই জানেন না, সন্দেহও করেন নাই। হঠাৎ অপূর্ব সংবাদ শুনিয়া তিনি কিরূপ চমকিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিবেন, উৎসুকভাবে কী কী প্রশ্ন করিবেন, সে তাহার কী কী উত্তর দিবে, এই সব ভাবিতে উল্লাসে উত্তেজনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মত ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর নাই; একদিকে বৌদিদির মত স্নেহপরায়ণা ভগিনী, আর একদিকে সুহাস। এমন ভাগ্য আর কাহারও হয়? সৌভাগ্যগর্বে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল।

কিন্তু—হঠাৎ কিশোর রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। বৌদিদি যদি সুহাসের সহিত বিবাহের সংবাদে সুখী না হন? তিনি কিশোরের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী, সুহাসকে তিনি জানেন না,—যদি কোনরূপ অমূলক আশঙ্কা করিয়া তিনি মনে কষ্ট পান? কিন্তু না, এ হইতেই পারে না। বৌদিদির সম্বন্ধে এরূপ স্বার্থপরতার কথা চিন্তা করাও অপরাধ। নিজের হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহ যিনি নিঃস্ব হইয়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার এত বড় সুখে তিনি অসুখী হইবেন, ইহা কল্পনা করাও মহাপাপ।

এই সঙ্গে আর একটা চিন্তা আসিয়া জুটিল। কিশোরের হৃদয়ের অভ্যন্তরে দুইটি মাত্র নারী প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল,—একটি বিমলা, অপরটি তাহার সদ্যোলব্ধ সুহাসিনী। ইহাদের একজনকে বাদ দিলেও তাহার জীবন পঙ্গু হইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত,—বিমলার স্নেহ বা সুহাসের ভালবাসা কোনটাই সে স্বেচ্ছায় ছাড়িতে পারিবে না। কিন্তু এই দুইটি রমণী যদি ভবিষ্যতে পরস্পরকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে না পারে? যদি সাংসারিক ক্ষুদ্রতা প্রবেশ করিয়া তাহার অকলঙ্ক জীবনযাত্রাকে লাঞ্ছিত করিয়া তোলে? তাহার প্রাণ দুরদুর করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া মনে মনে বলিল—না, বৌদিদি ও সুহাস কি সাধারণ সামান্য স্ত্রীলোক? সে যখন তাহাদের দুইজনকেই ভালবাসিয়াছে, তখন তাহারাও পরস্পরকে

ভালবাসিবেই। ইহাই মধ্যে কণামাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

বাড়ি পেঁছিয়া সোজা বিমলার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া সে ডাকিল, 'বৌদি, আসব?'

'এসো। এত দেরি যে, কোথায় ছিলে?'

কিশোর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, প্রদীপের সম্মুখে মেঝেয় বসিয়া বিমলা একখানা পুঁথি পড়িতেছিল, বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বৌদি, তাই দেরি হল।' বলিয়া কিশোর হাসিতে লাগিল।

ভুরু তুলিয়া বিমলা বলিল, 'এগারোটা বাজে, এত রাত্তিরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কোন সুখে বলো তো? '

জোর করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কিশোর বলিল, 'বলছি। কিন্তু তার আগে একবার তোমার পায়ের ধুলো নিই।' বলিয়া হেঁট হইয়া বিমলার পদধূলি গ্রহণ করিল।

বিমলা কিশোরের মাথায় হাত রাখিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে বলিল, 'বেঁচে থাকো। কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল?'

'কী? কী ঠিক হবে? কিসের কথাবার্তা?'

সে-কথার জবাব না দিয়া মৃদু হাস্যে বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, 'আর সুহাস কী বললে?'

বিস্মিত পুলকিত হইয়া কিশোর বিমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল! তারপর দুই হাত বাড়াইয়া বিমলার দুটা বাহু চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'অ্যাঁ—বৌদি, তুমি জানো?'

'না গো মশাই—তা কি আর জানি। তোমরা দু'জনেই কত সাবধানী।' বিমলা হাসিয়া ফেলিল, 'তবু তোমার মনের কথা আঁচে আন্দাজে বুঝতে হয়, সে ছুঁড়ীর মুখের দিকে একবার তাকালে আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। আচ্ছা ঠাকুরপো, এত লুকোচুরি কিসের? প্রেমিক-প্রেমিকাদের বুঝি খোলাখুলি কিছু করতে নেই। সবই মনে মনে গোপনে গোপনে? কিন্তু লুকিয়ে যখন রাখতেও পার না, তখন চেষ্টা করাই বা কেন? সেদিন সুহাসের কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক।'

সুহাসিনীর সহিত বিমলার পরিচয় হইয়াছে, এ খবর কিশোর জানিত না। সে আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'তার সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেছে? আমাকে বলনি কেন?'

'কেন বলব? তুমি আমার কাছে লুকোতে পার, আর আমি পারি না? আমার বুঝি রাগ হয় না? বলা নেই কওয়া নেই, হৃদয়খানি যে আর একজনকে দিয়ে এলে, বলি, বৌদিদির অনুমতি নিয়েছিলে কি?'

অদূরে তক্তপোশের উপর সাদা ধবধবে বিছানা পাতা ছিল, কিশোর তাহার উপর গিয়া বসিল। পাশের স্থানটা হাত দিয়া চাপড়াইয়া বলিল, 'বোসো এসে এখানে। এইবার বলো, কবে তোমাদের ভাব হল, কী কথা হল, এই সব।'

সম্মুখে গলির দিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বিমলা বিছানায় আসিয়া বসিল। গালে হাত দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'ঠাকুরপো, মাত্র দু'দিন সুহাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিন্তু এই দু'দিনের দেখাতেই বুঝতে পেরেছি যে, এমন জিনিসটি লাভ করা যে কোনও পুরুষমানুষের পক্ষে ভাগ্যের কথা। মনে আছে সেদিন ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলুম,— 'যে বিন্ধিবে লভিবে সে কৃষ্ণা গুণবতী?' তার একটা কথাও মিথ্যে নয়! অমন মেয়েকে স্বয়ম্বরসভায় লক্ষভেদ করে নিজের গুণপনা দেখিয়ে তবে লাভ করবার অধিকার জন্মায়।' ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিল,

'দেখ, আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, আঠারো-উনিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে দেখা আমার অভ্যাস নেই, এতদিন ও জিনিসটাকে মনের মধ্যে ঠিকভাবে নিতে পারতুম না। কিন্তু সুহাসের সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। শুচিতা কৌমার্য যে মনের সম্পদ, বয়সের নয়, তা বুঝতে পেরেছি। সুহাসের মধ্যে কী আছে জানি না, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে ওকে না ভালবেসে থাকা যায় না। বিদ্যাবুদ্ধির কথা বলছি না, সে তো আজকাল অনেক মেয়েরই আছে। কিন্তু সুহাসের মধ্যে সত্যিকারের ভাল আছে ঠাকুরপো,—সেই ভাল যা ভগবান নিজের হাতে দেন, যা চেষ্টা করে হওয়া যায় না। এত মিষ্টি নরম ওর স্বভাব, এমন লাজুক মন,...যেন রাত-দিন বুক দিয়ে ঘিরে রাখতে ইচ্ছা করে।'

কিশোর মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া শুনিতেছিল। তাহার তদ্গত মুখের দিকে স্নেহ-নিষিক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া বিমলা বলিল, 'কিন্তু তাও বলি, তোমার মত বর না হলে ও মেয়ের মর্যাদা আর কেউ বুঝত না। আমার মনে বড় ভয় ছিল ভাই, কী জানি তুমি এক-দিন কী রকম একটি বৌ ঘরে নিয়ে আসবে, হয়তো সে তোমাকে চিনতে পারবে না, আমাকেও ভুল বুঝবে—আর তোমার প্রাণের ঐ তপোবনের মত শান্তি ঘুচে যাবে! কিন্তু সে ভয় আর আমার নেই; যিনি আসছেন তাকে বিধাতা তোমারই মনের মত করে নির্জনে বসে গড়েছিলেন।'

কিশোর নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, একবার কী বলিতে ইচ্ছা করিল, তারপর আবার চুপ করিয়া বসিয়াই বৌদিদির অমৃতমধুর বাণী শুনিতে লাগিল।

বিমলা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কিন্তু আর না, বেশী প্রশংসা করলে তোমার আবার জাঁক হবে। তার চেয়ে সুহাসের কথাই বলি,—কেমন? সেদিন দুপুরবেলা আমি ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম, তারপর ও আর একদিন এ বাড়িতে এসেছিল।'

আনন্দে কণ্টকিত হইয়া কিশোর বলিল, 'সুহাস এসেছিল?'

'হ্যাঁ গো, এসেছিল। যদি তার রকম দেখতে, এখনও মনে হলে আমার হাসি পায়। এক পা করে এগোয় আর যেন চমকে চমকে ওঠে, মুখ এই লাল, এই ফ্যাকাসে—ঠিক যেন চুরি করতে ঢুকেছে, ধরা পড়বার ভয়েই জড়সড়। আমি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে তোমার বিছানার উপর বসিয়ে দিলুম।'

কিশোর রুদ্ধ নিশ্বাসে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, পাছে নড়িলে-চড়িলে বা নিশ্বাস ফেলিলে এই কাহিনীর সূক্ষ্ম সূত্রটি ছিন্ন হইয়া যায়। বিমলাও সেদিনকার কৌতুক-পূর্ণ স্মৃতিটা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে স্মিতমুখে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

'তারপর?'

হাসিয়া উঠিয়া বিমলা বলিল, 'তারপর আর কী? সব কথাই তোমাকে শুনতে হবে না কি?—কিন্তু ভারি মজার জিনিস একটি লক্ষ্য করলুম, তখনও সে নিজের মন বুঝতে পারেনি। তা যদি পারত, তাহলে আমার কাছে কথায় কথায় ধরা পড়ে যেত না।' একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কতকটা নিজ মনে বলিল, 'কী সুন্দর এই সময়টি।'

মিনতি করিয়া কিশোর বলিল, 'আমাকে আর পাগল করে দিও না, বৌদি। সুহাস আর কী করলে বলো।'

'কী আবার করবে? তোমার ল্যাবরেটরি দেখলে, বইগুলো ঘাঁটলে, টেবিলের এটা-ওটা নাড়লে, কলম দিয়ে লিখলে, তারপর বিছানায় বসে তোমার মাথার বালিশটা কোলে নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে তোমার কথা শুনতে লাগল। তোমার কথা শোনবার এত কী খিদে বাপু, কিছুতেই যেন মিটতে চায় না!—এ দিকে তোমারও তো সেই দশা

দেখছি। কিন্তু আর না, এবার ওঠো। আজ রাত্রে কী ঘুমোবার দরকার নেই?' বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাত ধরিয়া তাহাকে পুনরায় বসাইবার চেষ্টা করিয়া কিশোর বলিল, 'বোসো না বৌদি, তারপর—'

কৃত্রিম রোষে তর্জনী তুলিয়া বিমলা কহিল, 'আবার তারপর? সারারাত শুধু সুহাস-কথামৃত শুনবে—আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। আজ একাদশী তাও ভুলে গেলে?'

অনুতপ্ত কিশোর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল, লজ্জিত হইয়া বলিল, 'না না বৌদি, এবার তুমি শুয়ে পড়ো, আমি যাচ্ছি।'

বাইরে ঝিমঝিম করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, ঠাণ্ডা ভিজা বাতাস গায়ে লাগিতে-ছিল, বিমলা সম্মুখের জানালাটা আবার বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল।

কিশোর বলিল, 'আচ্ছা বৌদি, সেদিন—'

'আবার! আমি আর পারি না ঠাকুরপো, তোমার সুহাসের গল্প বলতে। ঐ শোনো, বারোটা বাজল। নাও ওঠো, আর আমি তোমার সঙ্গে রাত জাগতে পারব না। আসল জিনিসটা তো পেয়ে গেছ, এখন আর গল্প শুনে কী হবে? যাও, শুয়ে পড়োগে।'

কিশোর দ্বারের কাছে তবু একটু ইতস্তত করিয়া নিজের ঘরে সেই পরম পবিত্র শয্যার দিকে—যে শয্যার মাথার বালিশটি সুহাসের অঙ্গ-স্পর্শে ধন্য হইয়াছে—সেই বিছানার ক্রোড়ে রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে গেল।

নিজের ভালবাসা লইয়াই সুহাস তন্ময় হইয়া ছিল, এই নবাগত দেবতাটিকে লইয়া কী করিবে, কোথায় রাখিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না। অন্য পক্ষের মনের ভাব কিরূপ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার তাহার অবসর হয় নাই, সে-কথা মনে উদয়ও হয় নাই।

তাই, কিশোর যখন নিজের হৃদয়ের পরিচয় দিয়া তাহার হাত দুইটা একবার চাপিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল, তখন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর চন্দ্রোদয়ের মত তাহার অন্তর অপরিমিত আনন্দ-আবেগে মথিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এইটুকু হৃদয়ের মধ্যে বুঝি এতখানি সৌভাগ্যকে ধরিয়া রাখিবার স্থান নাই, এখনই উহা ভাঙিয়া শতখণ্ডে চুরমার হইয়া যাইবে।

পাশের ঘর হইতে দীনবন্ধু ও বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল, সুহাস পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন করিয়া যখন সে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন ঘরের স্বচ্ছ তরল অন্ধকার যেন বাহু বাড়াইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইল। আলো না জ্বালিয়াই সিঙার মেঝের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কাপড়-চোপড় ছাড়িতে লাগিল।

এমনই ভাবে সুখের স্বপ্নে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল সে জানিতেও পারে নাই; বাইরের বৃষ্টিপতনের শব্দে চেতনা হইল যে, ঘরের জানালাগুলা বন্ধ থাকায় একটু গরম বোধ হইতেছে। সে গিয়া গলির দিকের জানালাটা উন্মুক্ত করিয়া দিল।

বাহির দিকে চোখ পড়িতেই সে দেখিল, গলির অপর পারে খোলা জানালার সম্মুখে অস্পষ্ট আলোতে দুটি লোক বিছানার উপর বসিয়া আছে। ক্ষীণ আলো সত্ত্বেও চিনিতে কষ্ট হইল না যে, একজন কিশোর ও অন্যজন বিমলা। সুহাস তাড়াতাড়ি জানালা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পারিল না; কে যেন জোর করিয়া তাহাকে

ধরিয়া রাখিল। কিশোর ও বিমলার কথার গুঞ্জনটুকুই সে শুনিতে পাইতেছিল, একবার বিমলার অনুচ্চ একটুখানি হাসি তাহার কানে পৌঁছিল। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সুহাস বিহ্বলের মত সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিমলা জানালা বন্ধ করিতে উঠিলে তাহার দু'একটা অসংলগ্ন কথা তাহার কানে গেল—'...বারোটা বাজল—তোমার সঙ্গে রাত জাগতে...শুয়ে পড়ো—' জানালা বন্ধ হইয়া গেল!

সুহাস ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানায় বসিল। এতদিন যাহা সে অবহেলা করিয়াই লক্ষ্য করে নাই, সেই অজ্ঞাত বিষয়টি আজ সবেগে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল। ইহারা দুইজন স্ত্রীপুরুষ এক বাড়িতে থাকে, রাত্রিতে তৃতীয় ব্যক্তিটি পর্যন্ত নাই। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কী? বন্ধুর স্ত্রী, স্বামীর বন্ধু! দুইজনেরই যৌবনের মধ্যাহ্ন। স্ত্রীলোকটি বিধবা, অপূর্ব রূপসী! রাত্রি বারোটার সময় ইহারা এক বিছানায় ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া নিম্নকণ্ঠে হাসিগল্প করে, তারপর সাবধানে বাহিরের জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। কোন লৌকিক বাধাবিঘ্নের বালাই নাই।

আর একদিনের আর এক দৃশ্যের স্মৃতি এই সঙ্গে আজ দ্বিতীয়বার তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে-ও এমনই বাধা-বন্ধনহীন! এবং অনুপমের যে তীক্ষ্ণ কথা-গুলার অস্পষ্ট ইঙ্গিত অসভ্য বর্বরতা বলিয়াই আজ সন্ধ্যাবেলা সুহাসিনীকে কিশোরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, সেগুলা এখন একে একে মনে পড়িয়া বিষাক্ত কাঁটার মত তাহাকে বিঁধিতে লাগিল।

সুহাসিনীর সমস্ত দেহ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল, বুকের ভিতরটা যেন একেবারে খালি হইয়া গেল। যে অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এইভাবে পড়িয়া থাকিবার পর সে মাথা তুলিয়া আবার ভাবিতে লাগিল, দোষ কী? সে নিজের মনের ক্ষুদ্রতা দিয়াই ইহাকে বিকৃত করিয়া দেখিতেছে, নহিলে দুইজন স্ত্রীপুরুষের রাত্রিকালে নিভৃত আলাপ দূষণীয় কেন? সে নিজেও তো কত দিন অনুপমের সঙ্গে একাকিনী বসিয়া গল্প করিয়াছে! ইহাতে নিন্দনীয় কী আছে? তাহার মন মন্দ, তাই সে অন্যকে মন্দ দেখিতেছে, নিজের অন্তরের কলুষ অন্যের দেহে নিক্ষেপ করিতেছে। বিমলাকে সে জানে, বিমলার প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে—তিনি সর্বাংশে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য। আর কিশোর? তাহার মত নির্মল চরিত্র আর সে কোথায় দেখিয়াছে? তাহার চাহনি পর্যন্ত যে পবিত্র! তবে ইহাদের চরিত্রের তুলনায় কি আজিকার এই অবস্থা-সংযোগকেই বড় করিয়া দেখিতে হইবে? নিজের মনকে পঙ্কিল অশুচি বলিয়া সুহাসিনী বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিল।

এইভাবে নানা তর্কযুক্তির দ্বারা নিজের অবুঝ মনকে বুঝাইতে বুঝাইতে শেষ-রাত্রির দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার অচেতন দেহকে নিপীড়িত করিয়া অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত করিয়া দিল।

পরদিন সকালে দেরি করিয়া উঠিয়া ক্লান্ত-দেহে যখন সে নীচে নামিয়া গেল তখন নিজের মানসিক অবস্থা নিজেই সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। শুধু, গত রাত্রে তাহার অন্তর্লোকে দক্ষিণা বাতাস লাগিয়া যে আনন্দের ফুলটি ফুটিয়াছিল, তাহা যে অকালে শুকাইয়া মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

১৪

অনুপম ও হেমাঙ্গিনীর লক্ষ্য যদিও এক ও অভিন্ন ছিল, তথাপি মাতা-পুত্রের কার্যপ্রণালীতে বৈষম্য দেখা দিয়াছিল। অনুপম অত সূক্ষ্মভাবে সব দিক বাঁচাইয়া কাজ করিবার অর্থ বুঝিত না। কিশোরের উপর তাহার তীব্র বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, যে কোন উপায়ে তাহাকে অপদস্থ করিয়া নিজের কার্যসিদ্ধি করিতে পারিলে সে আর কিছু চাহে না।

হেমাঙ্গিনী কিন্তু অন্য পথে চলিয়াছেন। কিশোর যে লম্পট দুশ্চরিত্র নহে তিনি তাঁহার পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার দ্বারা মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার চরিত্রের প্রতি আক্রমণ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ফলপ্রদ হইবে কি না, এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এরূপ একটা অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে অপবাদ-কারীর প্রতি তাহার ফল যে শুভ হয় না, এ কথাও তাঁহার অজানিত ছিল না। তাই দুই-একটা লোভনীয় অর্ধ-প্রমাণ হাতের কাছে পাইয়াও তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। কিশোরের সহিত বিমলার সম্বন্ধটা বস্তুত নির্দোষ হইলেও সাধারণ পাঁচজনের দৃষ্টিতে যে অত্যন্ত সন্দেহজনক, তাহাতে সংশয় নাই। বাহিরের লোকের কাছে শুদ্ধমাত্র এই একত্র থাকাটা অতিশয় নিন্দনীয় সম্পর্কের দিকে ইংগিত করিতে থাকে, এবং অন্যের সম্বন্ধে মন্দ কথাটা নির্বিবাদে বিশ্বাস করিয়া লওয়ার দিকে মানুষের মনে এমন একটা সহজ প্রবণতা আছে যে, বেশী সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাইলেও, কেবল মাত্র একটা তুচ্ছ নৈতিক সাবধানতার বিধি লঙ্ঘন করার অপরাধে কাহারও বিরুদ্ধে অতিবড় ব্যভিচারের অভিযোগও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তিলমাত্র দ্বিধা হয় না।

হেমাঙ্গিনী কিন্তু এই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রটি কিশোরের বিরুদ্ধে আপাতত প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নিজের বুদ্ধি ও কার্য-নৈপুণ্যের প্রতি তাঁহার অসীম আস্থা ছিল। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়া যাহাতে তিনি সুহাসিনীর দিক হইতে কিশোরের চিত্তকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে পারেন, সেই চেষ্টাতেই নিজের সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আনিয়া রঙ্গস্থলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ও মনে মনে কামনা করিতে-ছিলেন— যাহাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে। করবীর স্বামী হিসাবে কিশোরকে কল্পনা করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, বরং ইহাই এ জটিল সমস্যার একমাত্র সু-সমাধান বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

অনুপম কিন্তু গোঁ-ভরে নিজের পথে চলিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর কূটনীতি তাহার মনঃপূত হইতেছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে মাতার বিরুদ্ধতা করিবার সাহসও তাহার ছিল না, তাই সে গোপনে গোপনে নিজের প্রবৃত্তিমত কাজ করিতে লাগিল। এক জাতীয় লোক আছে, নিজের স্বার্থের ব্যাঘাতকারীকে তাহারা নির্বিচারে দুষ্ট লোক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়, নিজের স্বার্থের ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না। অনুপম সেই শ্রেণীর লোক। সে নানা প্রকারে নানা দিক দিয়া কিশোরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং এই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিল যে, দুষ্টের দমন করিতে গেলে কোন অস্ত্রই পরিত্যাজ্য নয়। যুদ্ধে এবং প্রণয়ে অনুচিত কিছু নাই।

এ দিকে কিশোরের তপোভঙ্গ করিবার ভার যাহার উপর পড়িয়াছিল সেই নির্দোষ বিঘ্নকারিণীটি পরম আনন্দেই দিন কাটাইতেছিল। পিসীমার অভিসন্ধি টের পাইলে করবীর মত সরলমনা মেয়েও বোধ করি লজ্জায় ও ধিক্কারে এই অশোভন কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্র হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইত। এমন কি, সুহাসিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে তাহাকে

আসরে দাঁড়া করানো হইয়াছে, ইহা ঘৃণাক্ষরে সন্দেহ করিলে সে রাগারাগি চেঁচামেচি করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিত এবং হয়তো কিশোরের সম্মুখে সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দিতেও দ্বিধা করিত না। কিন্তু সে বেচারী এ-সব কিছুই জানিত না। নিতান্তই অন্ধকারে থাকিয়া সে কিশোরের প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছিল।

করবীর জীবনে অবশ্য প্রেমে পড়া এই প্রথম নহে, ইতিমধ্যে আরও দু'তিনবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনটাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

সেদিন বৈকালে করবী সাজগোজ করিয়া পিসীমার বাড়ি যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় কিশোর একগুচ্ছ করবীফুল হাতে লইয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া যাইবার পর কিশোর একবারমাত্র বিনয়বাবুর বাড়ি গিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সুহাসিনী যেরূপ লজ্জিতভাবে ঘর হইতে উঠিয়া গেল এবং সে থাকা পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসিল না, তাহাতে কিশোর নিজেও বড় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বাড়ি আসিয়া সে ভাবিয়া দেখিল যে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে সুহাসিনীর সহিত মেলামেশা করা তাহার উচিত হইবে না। বিলাতী কোর্টশিপ ব্যাপারের বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা মজ্জাগত বিরূপতা ছিল; এবং সুহাসও যে, যাহার সহিত বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, প্রকাশ্যভাবে নিত্য তাহার সাহচর্যকে কুণ্ঠার চোখে দেখে, তাহা বুঝিয়া সে বেশ তৃপ্তি পাইল। সে স্থির করিল আপাতত আর অকারণে বিনয়বাবুর বাড়ি যাইবে না।

কিন্তু প্রত্যহ কারণে অকারণে বিনয়বাবুর বাড়ি গিয়া এমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, সময় উপস্থিত হইলে মন ছটফট করিতে থাকিত। তাই দু'চার দিন বাড়িতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সে বৈকালে বেড়ানোর পূর্বতন অভ্যাসটা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা ব্যাপার ঘটিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইদানীং কলেজের ছাত্রমহলে তাহাকে লইয়া বিশেষ একটা আন্দোলন আলোচনা, এমন কি হাসি-মস্করা চলিতেছে, তাহার আভাস সে মাঝে মাঝে পাইতেছিল। একদিন ক্লাশে ঢুকিয়া হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল, বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—'বিমলা।' সেদিন সে ইহার ইঙ্গিতটা ধরিতে পারিল না, কিন্তু দ্বিতীয় দিন যখন ঐ নামটার সঙ্গে 'হাটে হাঁড়ি' এই দুটা শব্দ বোর্ডের উপর আরও বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখিল এবং ক্লাশের দিকে চক্ষু ফিরাইতেই দেখিল, দেড় শত ছেলের চোখের অনুসন্ধিৎসা তাহার মুখে অপরাধের চিহ্ন অন্বেষণ করিতেছে, তখন কিছুই তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। নিমেষমধ্যে তাহার মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া যথানিয়মে লেকচার দিয়া গেল, কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ঘণ্টা শেষ হইলে বিশ্রামঘরে গিয়া সে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কাহার কাজ? তাহার পারিবারিক জীবন লইয়া এমন প্রকাশ্যভাবে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে কে?

কিন্তু যে-ই হউক, কেবল ছাত্রমহলে একথা প্রচার করিয়াই যে সে-ব্যক্তি নিশ্চিন্ত নাই, তাহার প্রমাণ কিশোর অবিলম্বে পাইল। পরদিন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সে উপস্থিত হইলে নিঃশব্দে দেরাজ হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাহাকে পড়িতে দিলেন; বেনামী চিঠি পড়িতে পড়িতে কিশোরের রগের শিরগুলি ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল। সে যে একজন ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের সহিত প্রকাশ্যে সহবাস করিতেছে, অজ্ঞাত পত্রলেখক এই সংবাদটি প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের গোচর করিয়াছেন, এবং একজন অধ্যাপকের এইরূপ ব্যভিচারপূর্ণ জীবনযাত্রা ছাত্রদের

নৈতিক চরিত্রের পক্ষে কিরূপ হানিকর তদ্বিষয়ে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিয়া পত্র শেষ করিয়াছেন।

চিঠি প্রত্যর্পণ করিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এখন কী করতে চান?'

প্রিন্সিপ্যাল গম্ভীর-মুখে বলিলেন, 'বোসো। এ চিঠি কে লিখেছে, তোমার কিছু সন্দেহ হয়?'

'না!'

'তোমার কেউ শত্রু আছে?'

'থাকতে পারে—জানি না।'

'কিন্তু এরকম একটা দুর্নাম কে দিলে, কেনই বা দিলে, তার একটা নিরাকরণ হওয়া দরকার।'

কিশোর নীরবে বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার চোখ দু'টা অসহায় ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল।

প্রিন্সিপ্যাল চিঠিখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এর অভিযোগ সমস্তই মিথ্যা—কী বলো?'

কিশোর কঠিন স্বরে বলিল, 'আপনি কি আমার কৈফিয়ত তলব করছেন?'

ধীরভাবে প্রিন্সিপ্যাল বলিলেন, 'কলেজের কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কৈফিয়ত তলব করলেও সেটা অনুচিত হয় না। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি মাত্র।'

কিশোর আরও কঠিন হইয়া বলিল, 'আমায় মাপ করবেন, আমি কৈফিয়ত দিতে অক্ষম। দরকার হয়, আমি কর্মে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত আছি।'

প্রিন্সিপ্যাল প্রবীণ লোক, কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন, যুবক চরিত্রের অন্ধ্র-রন্ধ্র তাঁহার সুপরিচিত। বিশেষ, কিশোর তাঁহার কলেজেরই ছাত্র ছিল, তাহাকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতেন। শুধু অপরাধীই যে কৈফিয়ত দিতে ভয় পায় তাহা নহে, আত্ম-মর্যাদাশীল তেজস্বী ব্যক্তিও যে মিথ্যা দোষে অভিযুক্ত হইয়া নিজের সাফাই গাহিতে ঘৃণা বোধ করে, ইহাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি কিশোরের গায়ে হাত রাখিয়া বলিলেন, 'কিশোর, এ যে মিথ্যা অপবাদ, তা আমি জানি। কিন্তু তবু কলেজের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আমার অনুসন্ধান করা উচিত নয় কি—তুমিই বল? তা ছাড়া আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, আর কাউকে তো জিজ্ঞাসা করিনি—করবও না। আমি বন্ধুভাবে কেবল জানতে চেয়েছিলাম, কে তোমার এমন অনিষ্ট করতে চায় এবং কতটুকু সত্যকে ফেনিয়ে তুলে সে এই মিথ্যার সৃষ্টি করেছে! কিন্তু আজ থাক, আজ তোমার মন ভাল নেই। আর একদিন তোমার মাথা ঠাণ্ডা হলে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।' এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কিশোর এই ভক্তিভাজন গুরুতুল্য লোকের প্রতি অকারণ রূঢ়তা প্রকাশ করার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

সেদিন কিশোর সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনের অশান্তি দূর হইল না। এ এমনই কথা যে বৌদিদির কাছে বলিয়াও হৃদয়ভার লাঘব করা যায় না। ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ঐ কথাটাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মনকে উৎপীড়িত করিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থায় কী করিয়া এ অন্তর্দাহের হাত হইতে নিস্তার পাইবে স্থির করিতে না পারিয়া হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল করবীর কথা। করবী দুই-বার তাহাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এতদিন কেবল অবহেলা করিয়াই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয় নাই। কিশোর আর দ্বিধা না করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কালো-চিত বেশভূষা পরিয়া করবীর পিতৃভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

চৌরঙ্গীর দিকে সাহেব-পল্লীতে করবীদের বাড়ি। ধর্মতলার ট্রাম হইতে নামিয়া পথে হগ সাহেবের বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে একটা ফুলের দোকানে অনেক লাল ও সাদা করবীফুল দেখিয়া কিশোর একগুচ্ছ তাহাই কিনিয়া লইল।

কিশোরকে দেখিয়া করবী ভারি খুশি হইল, ছুটিয়া আনন্দিত কলকণ্ঠে তাহার অভ্যর্থনা করিল। ভিতরে গিয়া বসাইবার পর কিশোর তাহার সাজ-সজ্জার দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিল, 'আপনি কোথাও যাচ্ছিলেন, আমি এসে বিঘ্ন করলুম।'

করবী বলিল, 'তা হোক, কোথাও যাওয়ার চেয়ে আপনি এসেছেন, এতেই আমি বেশী খুশি হয়েছি।'

কিশোর হাতের ফুলগুলো করবীকে দিয়া বলিল, 'এই ফুলগুলো আপনার নামে আত্ম-প্রচার করে নিজেদের দর বাড়াবার চেষ্টা করছিল, তাই দেখে অপরাধীদের আপনার কাছে ধরে এনেছি।'

করবী একবার কিশোরের স্মিতমুখ ও একবার তাজা ফুলগুলি নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া উঠল, 'ওঃ! কিন্তু তা তো নয়! বরং আমিই ওদের নাম জাল করে নিজেকে ওদের নামে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।'

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কখনই না। আমি ঠিক জানি ফুলগুলো ঝুটো, আপনি সাচ্চা।'

করবী করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'আচ্ছা কিশোরবাবু, আপনি এমন সুন্দর সুন্দর কথা তৈরি করে বলেন কী করে? আমি তো একেবারেই পারি না, যা মুখে আসি বলে ফেলি!'

কিশোর বলিল, 'ভগবান আপনাকে অনেক গুণ দিয়েছেন, মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে একটুও কষ্ট হয় না। আমি হতভাগ্য—প্রাণের কথাটি বলতে হলে অনেক ভেবেচিন্তে ভাষাকে আয়ত্ত করে তবে বলতে হয়। সেই জন্যই বোধ হয় অমন ছাপার অক্ষরের মত শোনায়।'

করবী সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'আপনি অদ্ভুত লোক। এই ছুতো করে আবার একটা কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলেন। আপনার মত এমন কমপ্লিমেন্ট দেবার ক্ষমতা আমি কারুর দেখিনি—সাহেবদেরও না।'

কিশোর বলিল, 'যার কোনও গুণ নেই, বিনীতভাবে কথা বলবার ক্ষমতাও যদি তার না থাকে, তাহলে সে যে নিতান্তই অপাঙক্তেয় হয়ে পড়বে।'

করবী ঘরের চারিকোণে রুপার ফুলদানিতে ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিয়া, একটি সবৃন্ত লাল মঞ্জরী হাতে লইয়া কিশোরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'উঠুন। এইটে আমার চুলে পরিয়ে দিন তো!' বলিয়া কবরীবন্ধ মাথাটি কিশোরের দিকে ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

কিশোর মনে মনে ভারি কৌতুক অনুভব করিল। করবীর ছেলেমানুষের মত অস-ঙ্কোচ অনেক সময় শালীনতাকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। যাহার সঙ্গে মাত্র দু'দিনের পরিচয়, এরূপ যুবকের দ্বারা নিজের কবরী পুষ্পশোভিত করিয়া লইতে তাহার বাধে না, তাহার প্রাণের এই নির্মল নির্মুক্ততা অত্যন্ত মিঠাভাবেই কিশোরের হৃদয় স্পর্শ করিল। আজ তাহার প্রাণে অনেকখানি গ্লানি লুকাইয়া ছিল, করবীর এই বিশ্বাসপূর্ণ বন্ধুত্ব যেন তাহা মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেল। সে তাহার খোঁপার মধ্যে অপটু হস্তে ফুল গুঁজিয়া দিতে দিতে স্নেহার্দ্রমনে ভাবিতে লাগিল, আজ যদি তাহার করবীর মত একটি সহোদরা ভগিনী থাকিত, সেও বোধ করি এমনই অলজ্জিত অকুণ্ঠ অধিকারে দাদার সাহায্যে নিজের কুন্তল-শোভা বর্ধিত করিয়া লইত।

ফুল পরানো হইলে করবী চকিতের ন্যায় অদূরের একটা আয়নার দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া লইয়া সহাস্যমুখে কিশোরের দিকে ফিরিল; তারপর অঙ্গুলি দিয়া শাড়ির দু'পাশের দুই অংশ ধরিয়া পায়ের পিছনে পা দিয়া হাঁটু মুড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

কিশোর অবাক হইয়া বলিল, 'ও কী হল?'

করবী চঞ্চল চোখে চাহিয়া বলিল, 'ওকে ক্যর্টসি বলে—তাও জানেন না?—এখন চলুন, মা'র সঙ্গে দেখা করবেন। মা রোগা মানুষ, বেশী চলতে ফিরতে পারেন না, ওপরেই থাকেন। বাবা এখনও অফিস থেকে ফেরেননি, কিন্তু তিনিও এসে পড়লেন বলে। বাবা এলে সবাই মিলে চা খাওয়া যাবে। ওঃ—আপনি বুঝি আবার চা খান না। আচ্ছা, আপনার জন্য অন্য বন্দোবস্ত হবে অখন। ঘোলের সরবতে আপত্তি নেই তো?'

তারপর ঘণ্টা দুই কিশোরের ভারি আনন্দে কাটিয়া গেল। করবীর মা রুগ্না স্ত্রীলোক, বেশী নড়াচড়া করা ডাক্তারের নিষেধ। বাড়ি হইতে বাহির হইতে পান না, তাই বাহিরের কেহ দেখা করিতে আসিলে ভারি আহ্লাদিত হন। করবীর বাবা প্রমদাবাবু পুলিস হইলেও বেশ সজ্জন ব্যক্তি, পুলিস জীবনের নানা কৌতুকপ্রদ গল্প বলিয়া আসর জমাইয়া তুলিলেন। পুলিসের লোক যে এত মিশুক ও মজলিশী হইতে পারে, কিশোরের তাহা ধারণাই ছিল না।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় ইঁহাদের অপর্যাপ্ত প্রীতি ও আতিথেয়তা উপভোগ করিয়া, পুনরায় আসিবার অঙ্গীকার করিয়া কিশোর যখন বিদায় লইল, তখন সে তাহার চিরাভ্যস্ত প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইয়াছে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরিবারের কাছে আত্মীয়ের ন্যায় সমাদর পাইয়া এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ি ফিরিল যে, শত্রু তাহার যত শত্রুতাই করুক, যাঁহারা নিরপেক্ষ তাঁহাদের স্নেহ ও সম্মান আকর্ষণ করিবার মত গুণ তাহার আছে।

১৫

জন্মাষ্টমীর কয়েকদিন আগে হইতে বিনয়বাবু শরীর খারাপ যাইতেছিল। তাঁহার সাবেক হাঁপানির ব্যারাম আবার মাথা তুলিয়াছিল। যদিও গুরুতর কিছু নয়, তথাপি দুইদিনের জন্য বৃদ্ধকে বিছানায় পাড়িয়া ফেলিয়াছিল।

এই যন্ত্রণাদায়ক রোগ সারাইবার জন্য তিনি গত পনেরো বৎসর অনেক চিকিৎসা, এমন কি দৈব অবধূত পর্যন্ত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল পান নাই। অবশেষে একটা দামী বিলাতী পেটেন্ট ঔষধ সেবন করিয়া কিছু উপকার পাইয়াছিলেন। স্থায়িভাবে রোগ আরাম না হইলেও ঔষধ সেবন করিলে তখনকার মত উপশম হইত।

জন্মাষ্টমীর পরদিন তিনি অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুপুরবেলা তাঁহাকে বিছানার উপর পিঠে বালিশ দিয়া বসাইয়া হাতে একখানা বই দিয়া সুহাসিনী নিজের ঘরে সেলাই লইয়া বসিয়াছিল। নীচে লাইব্রেরি-ঘরে গিয়া বসিবার জন্য বিনয়বাবু আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ বৈকালে শরীর ভাল থাকিলে একবারটি নীচে যাইতে দিলেও দিতে পারে, সুহাসিনী এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিল।

আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া সেলাই করিতে করিতে সুহাসিনী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সুহাসিনী 'কে রে!' বলিয়া চমকাইয়া উঠিল, তারপর আঙুল দিয়া আগন্তুকের হাতে চুড়ি অনুভব করিয়া বলিল, 'করবী, চোখ ছাড়। কী চমকে দিতেই পারিস মানুষকে!'

চোখ ছাড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া করবী বলিল, 'কি ভাবছিলে ভাই হাসিদি তন্ময়

হয়ে? ঘরে ঢুকলুম—জানতেও পারলে না?'

সুহাস বলিল, 'কিছু নয়। দুপুরবেলা হঠাৎ এলি যে?'

করবী বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'জ্যেঠামশায়ের অসুখ জানতে পারিনি ভাই, আজ সকালে একজনের মুখে শুনতে পেয়ে খবর নিতে এলুম। কেমন আছেন তিনি?'

'আজ একটু ভাল আছেন।—পিসীমা কোথায় রে, তিনি একদিনও বাবাকে দেখতে এলেন না?'

'পিসীমা তো সাতদিন হল বহরমপুর গেছেন। তাঁর দেওরের সঙ্গে কী মামলা-মোকর্দমা হবে, বাবাকে কাগজ-পত্র দেখাচ্ছিলেন, তাই জানতে পারলুম। বড়দাও এখানে ছিলেন না, পিসীমা বহরমপুর যাবার পর তিনিও কোথায় গিয়েছিলেন, আজ সকালে ফিরে এসেছেন।—বড়দার একটা কী হয়েছে ভাই।'

বিস্মিত হইয়া সুহাসিনী বলিল, 'কী হয়েছে?'

'তা জানি না, কিন্তু যেন কেমন কেমন লাগল। আজ এসেই আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন, মা'র সঙ্গেও দেখা করলেন না। আমাকে বললেন, বিকেলে সুহাসদের বাড়ি যাস, ভারি মজা হবে। বলেই হঠাৎ চলে গেলেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। কী মজা হবে ভাই, হাসিদি?'

'কি জানি।' কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া বসিয়া থাকিয়া সুহাসিনী বলিল, 'তাই বুঝি তুই সকাল-সকাল এসে হাজির হয়েছিস মজা দেখবি বলে?'

করবী বলিল, 'দূর! মজা দেখবার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছিল না। আর বড়দার মজা, সে ভাই উনিই বোঝেন, আর কেউ বোঝে না। কেবল পরকে অপদস্থ করা, নয়তো ঝগড়া করা। সে ভাই আমার ভাল লাগে না।—আমি এলুম নিরিবিলি তোমার সঙ্গে দুটো গল্প করব বলে। বাড়িতে একলা কি মন লাগে?'

করবী শয্যায় উপুড় হইয়া দুই উত্থিত করতলে চিবুক রাখিয়া বলিল, 'কিন্তু অতদূরে বসে থাকলে কি গল্প হয়? এখানে এসে বোসো না ভাই।'

সুহাসিনী উঠিয়া বলিল, 'তা বসছি। কিন্তু খালি খালি চুমু খেয়ে যদি বিরক্ত করিস, তাহলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ও সব আদর আমি ভালবাসি না।'

করবী বলিল, 'ইঃ, ভালবাসি না। বল না কেন, আমি চুমু খেলেই ভাল লাগে না, আর কেউ যদি—'

'চুপ কর পোড়ারমুখী! মেয়েদের স্কুলে পড়ে ভারি ফাজিল হয়েছিস।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে শাসনচ্ছলে তাহার গাল টিপিয়া দিল।

সুহাস তাহার পাশে আসিয়া বসিলে করবী মুখ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'হাসিদি, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে, ভাই। কিন্তু সে ভারি গোপনীয় কথা, কাউকে বলবে না বলো।'

ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার করবীর গোপনীয় কথা সুহাসিনী শুনিয়াছে, সুতরাং কথাটা যে কী, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, 'কী কথা শুনি?'

করবী গলা ধরিয়া সুহাসের কান নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া ফিসফিস করিয়া গোপনীয় কথা বলিল।

শুনিয়া সুহাস হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'এই কথা! তা এবার নিয়ে কবার হল রে?'

কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া করবী সহাস্যে বলিল, 'চারবার; কিন্তু এবার ভাই সত্যি-সত্যি, খেলা নয়; একেবারে চিরজীবনের জন্য—for ever and ever!'

সুহাস বলিল, 'সে তো প্রত্যেকবারেই বলিস। হ্যাঁ রে, তোর কি দু'দিনের জন্যও মতি স্থির থাকে না? সত্যেনবাবু বেচারীর কী দশা হবে?'

করবী বিজ্ঞের মত চিন্তা করিয়া বলিল, 'তোমার কাছে সত্যি কথা বলছি ভাই হাসিদি, সত্যেনবাবু খুব ভাল টেনিস খেলতে পারেন বলে ওঁকে আমার ভারি পছন্দ হত, ভেবেছিলুম সত্যিই বুঝি তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু এখন দেখছি সে একেবারেই ছেলেমানুষী।'

হাসি চাপিয়া সুহাসিনী বলিল, 'আর নীতীশবাবু। তিনি কি অপরাধ করলেন?'

গলা ফুলাইয়া করবী বলিল, 'নীতীশবাবু ভাল লোক নয় ভাই।' গলা খাটো করিয়া বলিল, 'একদিন একলা পেয়ে আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করেছিল! আমি তার গালে এমন একটি চড় কষিয়ে দিয়েছিলুম যে, সেই থেকে আর আমার কাছে ঘেঁষে না।'

সুহাস খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

করবী বলিল, 'যাও, তুমি হাসছ—তাহলে বলব না।'

'না না, হাসব না, বল। লোকটি কে?'

সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া করবী বলিল, 'না, তুমি মুখ টিপে টিপে হাসছ। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি ভাই, এবার আর ঠাট্টা নয়, এবার জীবন-মরণের সমস্যা।'

'তাই তো জানতে চাইছি, জীবন-মরণের সমস্যাটি কে?'

করবী একটু মলিন হইয়া বলিল, 'আমার প্রাণের কথা বুঝতে যদি নিজে কখনো প্রেমে পড়তে। তখন আর হেসে ওড়াতে পারতে না।' একটু থামিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা হাসিদি, তুমি কখনো কারু প্রেমে পড়নি?'

'দূর! আমি কি তোর মত পাগল?' বলিয়া সুহাস কোলের উপর হইতে সেলাইটা তুলিয়া লইল।

উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া করবী বলিল, 'বলো না হাসিদি, লক্ষ্মীটি, পায়ে পড়ি।'

উৎসাহে দ্রুতবেগে ক্রুশকাঠি চালাইতে চালাইতে সুহাস বলিল, 'তুই নিজের কথা বল না বাপু, আমার কথা শুনে কী হবে?'

সেলাই কাড়িয়া লইয়া করবী বলল, 'না, তুমি বলো। বা রে! আমিই খালি বলব আর তুমি মুখ বুজে থাকবে—সে হবে না।'

অল্পকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটু লাল হইয়া সুহাস বলিল, 'যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে কী করিস?'

'তাহলে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাই।' তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়া আহ্লাদে করবী বলিল, 'কে ভাই তিনি? নিশ্চয় আমার জানা লোক—নয়? আচ্ছা, তিনিও তোমাকে ভালবাসেন?'

সুহাসিনী উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিল। করবী বলিয়া চলিল, 'নিশ্চয় বাসেন, তোমাকে না ভালবেসে কেউ থাকতে পারে? বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে, না? আচ্ছা, কি দুষ্টু তুমি, আমাকে একটি কথাও কি বলতে নেই? আমি কিন্তু ব্রাইডস্-মেড হব, তা এখন থেকে বলে দিচ্ছি।—কিন্তু আসল কথাটাই যে বললে না—কে ভাই তিনি —যিনি আমার হাসিদির মনটিকে হরণ করে নিয়েছেন?'

'বরের বুঝি নাম করতে আছে?'

'ইস্! এখনো তো বর হয়নি, এরি মধ্যে নাম করতে নেই? তুমি ভাই একদম সেকেলে!'

'আচ্ছা, কাছে আয়, কানে কানে বলছি!'

ইলেকট্রিক বাতির গোলকের মধ্যে হঠাৎ আলো নিভিয়া গেলে চোখের পর্দার

উপর তাহার প্রতিচ্ছবি যেমন ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া যায়, নাম শুনিয়া করবীর মুখের হাসিও তেমনিই করিয়া মিলাইয়া গেল। তাহার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ-খানা ছাইয়ের মত পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রক্তাভ করিয়া দিল। দৃষ্টিপথের সম্মুখস্থ কুয়াশার ভিতর দিয়া সে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

করবীর মুখের দিকে সুহাসের দৃষ্টি ছিল না, থাকিলে বোধকরি সকল কথা প্রকাশ হইয়া দু'জনের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না। সুহাস নিজ মনে হাসিয়া বলিল, 'দুধ-ভাত খেলেই বরের নাম করার দোষ কেটে যায়। আজ রাত্তিরে দুধ-ভাত খাব।'

এইবার করবী যেন ধাক্কা খাইয়া চেতনা ফিরিয়া পাইল। এ মুখের ভাব যে সুহাসকে কিছুতেই দেখাইলে চলিবে না, এ দুঃসহ লজ্জা যেমন করিয়া হউক গোপন করিতে হইবে, এই চিন্তা তাহার মুখখানাকে কাঠের মত শক্ত করিয়া দিল। একটা ফ্যাকাসে হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল, 'কিশোরবাবু? এত শীগ্গির—এই ক'দিনের মধ্যে—তাই কিছু জানতে পারিনি! আমি ভেবেছিলুম—' তারপর অনর্গল দশ মিনিট ধরিয়া সে যে কী বলিয়া গেল, তাহার মাথামুণ্ড নিজেই সে বুঝিতে পারিল না। সুহাসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ দেখিয়া সে থামিয়া গেল, খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'আবোল-তাবোল বকছি—না? খুব আমোদ হলে আমার ঐ রকম হয়, তখন আর কথার মানে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

সুহাস বলিল, 'এবার তুই বল, তোর তিনিটি কে?'

করবী বলিল, 'সে হবে 'খন। আগে এই খবরটা ভাল করে হজম করে নি। আচ্ছা হাসিদি, কিশোরবাবু তোমাকে খুব ভালবাসেন?'

'আমি জানি না। তাঁকে জিগ্যেস কর্‌গে যা।'

'জান না বৈকি! না জেনেই বুঝি এত হাবুডুবু খাচ্ছ?'

'হাবুডুবু খাচ্ছি কে বললে?'

বুক নিংড়াইয়া করবী হাসিল, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি! আচ্ছা হাসিদি, সত্যি করে বল না, ওঁকে কি রকম ভালবাস? খুব—খুব অনেক?'

তাহার গালে আঙুলের মৃদু টোকা মারিয়া লজ্জিত স্মিতমুখে সুহাস বলিল,—'অনেক!'

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। সুহাস বলিল, 'তুই বোস, বাবাকে ওষুধ খাইয়ে আসি।' বলিয়া উঠিয়া গেল।

সে ফিরিয়া আসিতেই করবী বলিয়া উঠিল, 'চল কিশোরবাবুর বাড়ি যাই, ওঁর বৌদিদির সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

সুহাস সংকুচিত হইয়া বলিল, 'তুই যা, আমি ভাই যেতে পারব না।'

'কেন, লজ্জা করবে?'

'বাবাকে একলা ফেলে যাব, যদি কিছু দরকার হয়? তুই যা না, ঝিকে সঙ্গে দিচ্ছি।'

যদি সুহাস পুরাতন প্রশ্নটা আবার করিয়া বসে, এই ভয়ে করবী কোন ছুতায় পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সে উঠিয়া বলিল, 'তাই যাই! কথা দিয়েছি, না গেলে অন্যায় হবে।'

'তা যা না, ওঁরা সব বাড়ি আছেন, জন্মাষ্টমীর ছুটি। দীনবন্ধুকাকাও এসেছেন, তাঁর আজ ওখানে নেমন্তন্ন।'

'ও—তবে থাক।' বলিয়া করবী বসিয়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া

বলিল, 'চল ভাই, জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে বসি। তিনি একলা রয়েছেন, রোগা মানুষ, আমরা কাছে বসে গল্প করলে খুশি হবেন।' বলিয়া সুহাসের মতামতের প্রতীক্ষা না করিয়া আগেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বেলা চারটা বাজিতে না বাজিতে অনুপমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। একেবারে বিনয়বাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া অযাচিত কৈফিয়ত দিয়া বলিল, 'ক'দিন কলকাতায় ছিলুম না, একটা জরুরী কাজে বাইতে যেতে হয়েছিল, তাই আসতে পারিনি। শরীর খারাপ হয়েছিল? ও কিছু নয়। এখন তো বেশ ভালই আছেন দেখছি, নীচে চলুন না—'

বিনয়বাবু বলিলেন, 'আমারও তো তাই ইচ্ছে, কিন্তু সুহাস—'

অধীরভাবে অনুপম বলিল, 'ওদের আপত্তি শুনতে গেলে কাজ চলে না। ক'দিন ধরে এ ঘরেই বন্ধ হয়ে আছেন, নীচে গেলে একটা চেঞ্জ হবে। উঠুন। একলা নামতে না পারেন, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন। সামান্য অসুখকে বড় করে তুলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া মেয়েদের একটা স্বভাব।'

অনুপমের মুরুব্বিয়ানায় সুহাসিনী মনে মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু পিতার আগ্রহ দেখিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। বিনয়বাবু অনুপমের সাহায্যে আস্তে আস্তে নামিয়া নীচে ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে অনুপম কৈফিয়তের জের টানিয়া বলিল, 'আজকাল অফিসে যে রকম কাজ পড়েছে, নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত পাই না। সীনিয়র তো কিছুই করেন না। বুড়ো হয়েছেন, নড়তেও পারেন না, বাইরের যত কাজ আমার ঘাড়ে ফেলে নিশ্চিন্দি। আর, আমি ছাড়া হয়ও না কারু দ্বারা। এই তো একটা ব্রীফ বোঝাতে পুরুলিয়া যেতে হল। যাক, একরকম মন্দ হল না, কাজকে কাজ, সেই সঙ্গে পরের পয়সায় বেড়ানো হল।'

কেহ কোন উত্তর করিল না। সুহাসিনী মাথা নীচু করিয়া বুনিতে লাগিল, করবী অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

অনুপম এবার কাজের কথা পাড়িল। কোন বিষয়েই সে সবুর করিতে পারে না, গলাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া বিনয়বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'একটা অপ্রীতিকর কাজ বাধ্য হয়ে আজ আমাকে করতে হবে। এতে আমার নিজের কোনও স্বার্থ আছে —আপনারা মনে করবেন না, দুনিয়ার অনেক পাজি লোক ভদ্রতার মুখোস পরে ঘুরে বেড়ায়, সকলকে ধরিয়ে দেওয়া আমার জীবনের ব্রত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কর্তব্যের অনুরোধে এ কাজ আমাকে করতে হচ্ছে।'

সকলের বিস্মিত দৃষ্টি অনুপমের উপর গিয়া পড়িল। সে পকেট হইতে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বাহির করিয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলিল, 'যাদের আমি বন্ধু বলে মনে করি, তাদের সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতে পারি না, এই আমার স্বভাব। বন্ধুত্বের খাতিরে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়, এমন কি, সময় সময় এমন কাজও করতে হয়— বন্ধুরা যাকে হয়তো অনধিকারচর্চা বলেও মনে করতে পারেন। কিন্তু ও সব সেন্টি-মেন্টকে আমি ডরাই না। যাঁদের ভালবাসি, অনিষ্টের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতে গিয়ে অপ্রিয় হতে আমার আপত্তি নেই।'

অস্থির হইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, 'কথাটা কী? তুমি যে খালি হেঁয়ালির সৃষ্টি করে চলেছ।'

অনুপম কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গাম্ভীর্যের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, 'আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, কিছু দিন পূর্বে কোনও একটি লোকের বিরুদ্ধে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলুম; প্রথম থেকেই বুঝে-

ছিলুম তিনি কি প্রকৃতির লোক এবং সে কথা প্রকাশ করে বলতেও দ্বিধা করিনি। এই জন্যে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে সে সব আমি গ্রাহ্য করিনি। আপনারা বিশ্বাস করে তাকে অন্তরঙ্গের মধ্যে স্থান দিয়েছেন, এমন কি, বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবকাশ দিয়েছেন, আমার নিষেধে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু এই লোকটা আপনাদের বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠতার কতদূর অযোগ্য, তার অকাট্য প্রমাণ আজ আমি দিতে পারি।'

বিনয়বাবু নির্বাক বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সুহাসিনী কথা কহিল, জ্বলন্ত দুই চক্ষু অনুপমের উপর নিবদ্ধ করিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, 'কার কথা আপনি বলছেন—কিশোরবাবুর?'

বিকৃতমুখে হাসিয়া অনুপম বলিল, 'হ্যাঁ—কিশোরবাবুর। যাঁকে আস্কারা দিয়ে তুমি মাথায় তুলেছ, যাঁর মত ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নেই। তিনি কী, তা জানো?'

তেমনই তীব্র অনুচ্চকণ্ঠে সুহাসিনী বলিল, 'জানি। কিন্তু আপনি তাঁর কী জানেন জিজ্ঞাসা করি?'

বিজ্ঞ হিতৈষীর ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া উগ্র কটুকণ্ঠে অনুপম বলিয়া উঠিল, 'লম্পট, দুশ্চরিত্র, স্কাউনড্রেল! আরও জানতে চাও? সমাজে একঘরে, বাপের ত্যাজ্য-পুত্তুর! কী জানি আমি! কী জানি না? জোচ্চোর বদমায়েস কোথাকার।'

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুহাসিনী বলিল, 'অনুপমবাবু, আপনি সাবধান হয়ে কথা বললেন। আপনি জানেন না তিনি—' বলিতে বলিতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া সে আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

বিনয়বাবু ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ছি ছি অনুপম, এ সব তুমি কি বলছ? বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে—কিশোরের মত ছেলে—তুমি কি পাগল হলে—'

'পাগল আমি হইনি, আপনারা হয়েছেন। আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না জানি। এর পূর্বে একবার আমি এই কথাই আপনাদের জানাতে চেয়েছিলুম। সেদিন চোখ রাঙিয়ে সে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল; আপনারাও তাতে মত দিয়েছিলেন। আজ তাই আমি প্রমাণ হাতে করে এসেছি—এই দেখুন।' বলিয়া অনুপম হাতের কাগজখানা বিনয়বাবুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

অভিভূতের ন্যায় বিনয়বাবু বলিলেন, 'কী এ? কিসের প্রমাণ?'

'পড়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন।' সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া বিজয়গর্বিত কণ্ঠে বলিল, 'কিশোরবাবুর বাপের চিঠি। গুণধর ছেলেকে বাপ কী সার্টিফিকেট দিয়েছেন, একবার পড়ে দেখ।'

পশুপতিনাথ চক্রবর্তী যে কিশোরের বাপের নাম, তাহা বিনয়বাবু কিশোরের কাছেই জানিয়া লইয়াছিলেন। এ চিঠি তাঁহারই লেখা। পাঠ করিবার পর বিনয়বাবুর অবশ হস্ত হইতে কাগজখানা পড়িয়া গেল। অনুপম সেটা কুড়াইয়া লইয়া সুহাসিনীকে খোঁচা দিয়া বলিল, 'তুমি বোধ হয় পড়তে চাও না। বিশ্বাসের জোর কমে যেতে পারে।'

সুহাসিনী উত্তর দিতে পারিল না, উত্তর দিল করবী। সে উঠিয়া আসিয়া অবজ্ঞা-পূর্ণ স্বরে বলিল, 'দেখি, কী চিঠি নিয়ে এত গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছ।' চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িয়া চাপা ক্রোধের কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'বড়দা, মিথ্যে কথা, সমস্ত মিথ্যে কথা। কোত্থেকে এ সব তৈরি করে নিয়ে এলে? আমি বিশ্বাস করি না!'

সে চিঠিখানা হাতে মুড়িয়া ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, সুহাসিনী ব্যগ্রভাবে বলিল, 'দেখি—দেখি করবী।'

করবী তাহার হাতে তাল-পাকানো কাগজখানা দিল। কম্পিত হস্তে সেটা সমান

করিয়া সুহাসিনী পড়িবার চেষ্টা করিল, প্রথমটা কিছুই পড়িতে পারিল না। তার-পর অক্ষরগুলো স্পষ্ট হইয়া উঠিলে, পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। যখন পড়া শেষ হইয়া গেল, তখনও সে কাগজখানা দু'হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া অন্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

চিঠিতে লেখা ছিল—

'আমার পুত্র কিশোরচন্দ্র চক্রবর্তীর নামে গত কয়েক মাসে নানা প্রকার কুৎসিত জনশ্রুতি শুনিয়া, স্বয়ং পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একদিন হঠাৎ কলিকাতায় গিয়া তাহার আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় উপস্থিত হই। দেখিলাম, সে এক বিধবা যুবতীকে ভ্রাতৃবধূ পরিচয় দিয়া তাহার সহিত ব্যভিচারীর জীবন যাপন করিতেছে। আমি তাহাকে সৎপথে আসিতে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে ঐ কুলটা স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না।

ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি এই কুলকলঙ্ক পুত্রের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছি; মৃত্যুর পর আমার সৎকার করিবার অধিকার পর্যন্ত তাহার থাকিবে না। এইরূপ পাপাচারী পুত্রের অগ্নি গ্রহণ করিলে পরকালে আমার সদ্‌গতি হইবে না।

শ্রীপশুপতিনাথ চক্রবর্তী।'

অনেকক্ষণ পরে মরার মত দুই চোখ তুলিয়া যখন সুহাসিনী সম্মুখে চাহিল, তখন দেখিল, কিশোর ও দীনবন্ধুবাবু পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

১৬

জন্মাষ্টমীর উপবাস করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত দীনবন্ধুবাবুকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া, দক্ষিণা দিয়া, গলায় আঁচল দিয়া প্রণামান্তে বিমলা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দীনবন্ধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্তরের সঙ্গেই বলিলেন, 'আশীর্বাদ করি মা, পুণ্যবতী হও। প্রাণ তোমার শুদ্ধশুচি হোক, নিষ্পাপ হোক।'

দুপুরবেলাটা কিশোরের ল্যাবরেটরি ঘরে তিনজনের খুব আনন্দে কাটিল। প্রথমটা বিমলা দীনবন্ধুর সঙ্গে কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমার কাছে লজ্জা করা বৃথা, কারণ, কাল থেকেই আমি তোমার কাছে ফলাহারের ন্যায্য দাবি নিয়ে প্রত্যহ বিকেলবেলা যাতায়াত শুরু করব। এতদিন জানতুম না বলেই ফাঁক পড়ে গেছে, কিন্তু আর ফাঁকি দিতে পারবে না। এখন শুধু লজ্জার জোরে লোলুপ ব্রাহ্মণকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।'

ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম সকল পরীক্ষা করিতে করিতে কিশোরকে বলিলেন, 'শিশি-বোতল তো সাজিয়েছ অনেক, কিছু কাজ করতে পারলে?'

মাথা নাড়িয়া কিশোর বলিল, 'না। আয়োজন দেখে মনে হয় বটে যে, উদ্যোগও ওর পিছনে বুঝি অনেকখানি আছে। কিন্তু সেটা ভ্রান্তি।'

'কেন, উদ্যোগ না থাকার কারণ কি?'

'কারণ কিছুই নেই—তবে—'

বিমলা মৃদুস্বরে বলিল, 'উদ্যোগ খুব আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। বলেন, দেশের বড় বড় লোক যা পারলে না, আমার দ্বারা কি তা হবে?'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিশোরের পানে চাহিয়া দীনবন্ধু বলিলেন, 'তাহলে বিশেষ একটা কিছু চেষ্টা করছ?'

কুণ্ঠিত হইয়া কিশোর বলিল, 'ঠিক যে চেষ্টা করছি, তা বলতে পারি না, তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, একটা কিছু করি। প্রকাণ্ড কিছু নয়, সে আমার শক্তির বাইরে—ছোটখাটোর মধ্যে এমন কিছু যা দেশের লোকের কাজে আসতে পারে।'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'এ তো ভাল কথা। বড় কাজ করবার লোক দেশে ঢের আছে, ছোট কাজের বেলাতেই লোকের অভাব হয়। কি চেষ্টা করছ শুনি?'

'একটা 'ফুড' বার করবার চেষ্টা করছি, যা বিদেশী মেলিন্স ফুড, হর্লিকস, ওভালটীন ইত্যাদির বদলে দেশের রোগী ও শিশুরা নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পারে।' একটু হাসিয়া বলিল, 'পারব কিনা জানি না, কিন্তু প্রশংসা যদি কারু প্রাপ্য হয় তো সে বৌদির। আগে আমার কোনও সংকল্পই ছিল না, খেয়ালমত এগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করতুম। উনিই দিনরাত আমার পেছনে লেগে থেকে এবং স্বহস্তে সাহায্য করে আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত করেছেন।'

'উনি তোমাকে সাহায্যও করেন?' বিস্মিত দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া করিয়া বিমলার বিজ্ঞান-প্রীতির বিষয় শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন, 'কিশোর যদি নূতন ফুড বার করতে পারে তো সে তোমারই গুণে পারবে। ওদিকে তোমার যে কৃতিত্ব কতদূর, সে তো আমি আজ টের পেয়েছি।'

বিমলা লজ্জিতমুখে বসিয়া থাকিয়া অল্পকাল পরে বালিশ বিছানা রৌদ্রে দিবার জন্য উঠিয়া গেল। তখন কিশোর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিমলার ইতিবৃত্ত দীনবন্ধুবাবুকে খুলিয়া বলিল। অনুপমের মুখে সেদিন যে দু'-চার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা দীনবন্ধু-বাবুর মনে কুহেলিকারই সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ সব কথা শুনিয়া তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল।

যৌবনে যখন অনেকে আদর্শের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সময় একদিন বোধ করি দীনবন্ধুবাবু এমনই একটি আদর্শের কল্পলোক সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করিয়া-ছিলেন, অনাত্মীয় দুটি নরনারীর নিষ্পাপ অথচ স্নেহঘনিষ্ঠ জীবনযাত্রার চিত্র কল্পনা করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন। নিজের জীবনে তাঁহার সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু আজ কিশোরের জীবনে সেই আদর্শ সফল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তাঁহার অন্তর গভীর প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, 'আমার যৌবনে যদি এ সুযোগ ঘটত, আমিও এমনি আগ্রহে তাকে গ্রহণ করতুম। কিন্তু কিশোর, একটা কথা ভুলো না, সাধারণে একে সহজভাবে নিতে পারবে না, অনেক যাচাই—অনেক পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত না-ও করতে পারে, সেজন্য প্রস্তুত থেকো।'

কিশোর চুপ করিয়া রহিল; পরীক্ষা যে অত্যন্ত কঠিনভাবেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহা আর বলিল না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, দীনবন্ধুবাবু উঠিয়া বলিলেন, 'চল, বিনয়বাবুর শরীর খারাপ, তাঁর কাছে গিয়ে খানিক বসা যাক।'

কিশোর এ কয়দিন প্রত্যহ দুইবেলা বিনয়বাবুর খোঁজ-খবর লইয়াছে; এই সূত্রে সুহাসিনীর সঙ্গেও দেখা হইয়াছে। বিনয়বাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে সুহাসিনী বিমর্ষ হেঁটমুখে দু'-একটি কথা বলিয়াছে মাত্র। বিনয়বাবু অনেকটা ভাল আছেন, তাহা কিশোর সকালে ও-বাড়ির চাকর-বাকরের কাছে জানিয়া লইয়াছিল, তাই তাহার আশা হইল সুহাসের দুর্ভাবনামুক্ত সহাস্য মুখখানি দেখিতে পাইবে। দীনবন্ধুবাবুর কথায় সে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাঁহার সঙ্গে বিনয়বাবুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মুক্ত বাতাস হইতে অন্ধকূপের বদ্ধবায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিলে যেমন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, এই ঘরে পদার্পণ করিবামাত্র ইঁহাদেরও ঠিক সেইরূপ মনে হইল। ঘরের বাতাস যেন কি এক অচিন্তনীয় বিপৎপাতে স্তম্ভিত ভারি হইয়া আছে। কেহ কথা কহিল না, সম্ভাষণ করিল না, চোখ তুলিয়া চাহিল না, নতমুখে চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল। যেন কোন বিষাক্ত ধূম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একসঙ্গে সকলকে হত-চেতন করিয়া দিয়াছে।

দীনবন্ধু উদ্বিগ্নভাবে একবারে সকলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'কি হয়েছে? সকলে অমন করে বসে যে?'

তাঁর কথায় সকলের যেন ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। অনুপম প্রথম কথা কহিল, কট-মট করিয়া কিছুকাল কিশোরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'দীনবন্ধুবাবু, যা হয়েছে তা এখনই শুনতে পাবেন, কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গীকে এখান থেকে যেতে বলুন। ও রকম লোক আমরা এখানে চাই না।'

ঘোর বিস্ময়ে দীনবন্ধু বলিলেন, 'তার মানে?'

বিনয়বাবু এতক্ষণ কেদারায় এলাইয়া পড়িয়াছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। দুর্বল শরীরের উপর অকস্মাৎ এই দারুণ আঘাত তাঁহার চিন্তাশক্তিতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। তিনি ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া অস্বাভাবিক উঁচু গলায় ঝোঁক দিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'না না দীনবন্ধু, তুমি ওকে যেতে বলো। দুনিয়ায় যে ভালমানুষ, সবাই তার ওপর জুলুম করে। কাউকে বিশ্বাস নেই! আমাকে দুর্বল পেয়ে,—আমার মেয়েকে —উঃ নির্লজ্জ! না না, সন্দেহ করবার আর স্থান নেই—বাপের চিঠি। আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না। আর যদি কখনও আমার ব্যড়িতে মাথা গলায়'—উত্তেজনার প্রবল ঝোঁকে দাঁড়াইয়া উঠিতেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, একলাফে কিশোরই গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। সাবধানে তাঁহাকে আবার চেয়ারে বসাইয়া দিয়া, অনুপমের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'অনুপমবাবু, আমার বিরুদ্ধে আপনার কী অভিযোগ, এইবার খুলে বলুন দেখি।'

অনুপম রূঢ়ভাবে বলিল, 'অভিযোগ আমার নয়—তোমার বাবার; কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার নেই—তুমি যেতে পার।' বলিয়া অঙ্গুলি-নির্দেশে দরজা দেখাইয়া দিল।

কিশোরের চোখে-মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে কঠিন বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'অনুপমবাবু, তোমার অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি, কিন্তু যতই সহ্য করছি, অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে তুমি আমার নামে বেনামী চিঠি দিয়েছিলে, আজ আমার আত্মীয়তুল্য বন্ধুদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছ। এই সব মিথ্যা কলঙ্ক রটানোর শাস্তি এখনই আমি তোমাকে দিতুম—যদি না এ ঘরে দুটি মহিলা এবং একটি পীড়িত লোক থাকতেন। কিন্তু আমি খোলসা করে জানতে চাই, কী তোমার অভিযোগ এবং কিসের জোরে তুমি আমার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করে বেড়াচ্ছ? এর নিষ্পত্তি আজই আমি করব।'

পরিপূর্ণ অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া অনুপম দীনবন্ধুকে বলিল, 'কৈফিয়ত আমি দিই না! তবে আপনি যদি জানতে চান, তাহলে দেখাতে পারি, কিসের জোরে আমি এই এই সত্য কথা প্রচার করছি।' বলিয়া চিঠিখানি দুই আঙুলে তুলিয়া ধরিল।

দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, 'বটে? কি ওটা দেখি।'

চিঠিখানি দুই-তিনবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দীনবন্ধুবাবু মুখ তুলিলেন, কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এ চিঠি পেলে কোথায়?'

চিঠি পাওয়ার ইতিহাস বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। বিনয়বাবু যে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ধূর্ত শিকারী ও তাঁহার কন্যা অন্যের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী উন্নতিশীলা কুমারী, ট্রেনভাড়া দিয়া অযাচিতভাবে এই সংবাদ পশুপতিবাবুকে জানাইতে যাইবার নিঃস্বার্থ পরোপকার-স্পৃহা এবং তৎপরে পশুপতিবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া সর্ব-সাধারণের কল্যাণের জন্য তাঁহার নিকট হইতে এই চিঠি আদায়ের ইতিবৃত্ত খুলিয়া বলিবার এ স্থান নহে। তাই উদ্ধতভাবে অনুপম বলিল, 'যেখানে পাই, সে খবরে আপনার দরকার নেই।'

'দরকার আছে। এ চিঠি যে তুমি জাল করে আনোনি, তা আমরা কী করে জানব?'

অনুপম থতমত খাইয়া গেল, 'জাল করে এনেছি? আমি? আমার স্বার্থ কি?'

ক্রুদ্ধস্বরে দীনবন্ধু বলিলেন, 'তোমার কি স্বার্থ, তা আমরা সবাই জানি। তুমি কি চরিত্রের লোক, তাও আমার অজ্ঞাত নেই। আমি বলছি, এ চিঠি জাল, তুমি তৈয়ারি করেছ। নইলে কিশোরের বাবা তোমাকে চিঠি লিখবেন কোন্ পরিচয়ে জিজ্ঞাসা করি? তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?'

দীনবন্ধুবাবুর সুতীব্র প্রশ্নে অনুপম হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'কি, জাল করেছি আপনি বলেন? আপনার এতদূর স্পর্ধা?—আচ্ছা বেশ, ও নিজে বলুক, ওর বাপের লেখা নয়, দেখি ওর কত বড় সাহস। তারপর আমি দেখে নেব।'

কিশোর গর্জন করিয়া উঠিল, 'চুলোয় যাক চিঠি, আমি দেখতে চাই না।' তারপর সুহাসিনীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া গলা নামাইয়া বলিল, 'আমি শুধু জানতে চাই, তুমি আমায় বিশ্বাস কর কিনা। আর যে যা বলুক, ভাবুক, কিছু আসে যায় না।'

দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া সুহাস বসিয়া রহিল, সাড়া দিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, এইবার তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে, আর বুঝি সে নিশ্বাস লইতে পারিবে না।

কিশোর বলিল, 'সুহাস, যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে কোনো সম্বন্ধই টিকতে পারে না। যদি আমার চরিত্রে তোমার বিশ্বাস না থাকে, বলে দাও, আর আমি কখনো তোমার ছায়া মাড়াব না।'

প্রাণপণ চেষ্টায় সুহাসিনী মুখ তুলিল। হয়তো সকল যুক্তিতর্ক লঙ্ঘন করিয়া কোন আশ্বাসের কথা বলিতে চাহিল। কিন্তু তাহার নীরস কণ্ঠ হইতে এই সন্দেহ-সঙ্কুল উক্তি বাহির হইয়া আসিল, 'ও চিঠি কি আপনার বাবার লেখা?'

ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিশোর দীনবন্ধুবাবুর কাছে ফিরিয়া গেল। চিঠিখানা লইয়া তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া মুখ তুলিতেই দেখিল, সুহাসিনী একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে—সমস্ত প্রাণ যেন তাহার চোখের উপর আসিয়া উদ্গ্রীব আশায় কাঁপিতেছে। কিশোরের বুকের ভিতরটা একবার মুচড়াইয়া উঠিল। কিন্তু সে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'হ্যাঁ, চিঠি আমার বাবার লেখাই বটে।'

দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস টানিয়া সুহাসিনী আবার দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

অনুপম মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া দীনবন্ধুকে বলিল, 'হল তো? জাল করেছি! এবার কি বলবেন শুনি? বোধহয় বলবেন, বাপ মিথ্যেবাদী আর ছেলেটি একটি যুধিষ্ঠির!'

কথাগুলি কিশোরের কানেও গেল না। সে সুহাসিনীর আনত মস্তকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তোমার যখন আমার উপর বিশ্বাস নেই, তখন

আমারো তোমার ওপর কোন দাবি রইল না। বাবার চিঠি আমি মিথ্যে বলতে পারব না, সুতরাং যত লাঞ্ছনাই তোমরা আমাকে দাও সবই আমার প্রাপ্য। অস্বীকার করবার আমার আর পথ নেই।' একটু চুপ করিয়া পুনরায় কহিল, 'মানুষকে চিনতে সময় লাগে; হয়তো কোন দিন মনে হতে পারে আমাকে ভুল বুঝেছ। কিন্তু সেটা অনিশ্চিত, উপস্থিতটাই সত্য।—যাক, চললুম। আমার দুর্ভাগ্য, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল অনর্থেরই সৃষ্টি করে গেলুম।' বলিয়া হেঁটমুখে অন্ধকারপ্রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সুহাসিনী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া যে দ্বার দিয়া কিশোর চলিয়া গেল, সেই দিকে ডান হাতখানা বাড়াইয়া যেন চীৎকার করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার অবরুদ্ধ কণ্ঠে একটা কথাও ফুটিল না। অর্ধব্যক্ত একটা কাতরোক্তি করিয়া সে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

করবী ছুটিয়া আসিয়া যখন তাহার লুণ্ঠিত মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল, তখন তাহারও দুই চক্ষু বাহিয়া প্রবল অশ্রুর ধারা নামিয়াছে।

১৭

বড়দিনের ছুটির আর বিলম্ব নাই। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এবং দোকানদার মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শীত-প্রভাতের কাঁচা সোনালী রৌদ্র কলের চিমনির ধূমকুজ্ঝটি কাটাইয়া কলিকাতা শহরকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। পথের ধারের নির্জীব গাছগুলার পাতায় একটা শিশির-সজল চাকচিক্য দেখা যাইতেছে। বাতাসে বেশ একটু কামড় আছে। বেলা যত বাড়িতেছে, রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার দ্রুত যাতায়াত ও পথিকের সংখ্যা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। নানারঙের শাল র‍্যাপার ও মাঝে মাঝে দু-একখানা বেগুনি রঙের বালা-পোশ পথচারীদের অঙ্গে থাকিয়া পথের রবিকরোজ্জ্বল দৃশ্যটাকে বেশ বর্ণ-বহুল করিয়া তুলিয়াছে।

ছাদের অনুচ্চ আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে বিমলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। কিশোর ভোরবেলাই বাহির হইয়া গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। আজ সে কলেজে যাইবে না, তাই রান্নারও বিশেষ তাড়া নাই।

পাশের বাড়িখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতে বিমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। প্রায় চার মাস হইল বিনয়বাবুরা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, তাহা বোধ করি দীনবন্ধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিত কিন্তু বিমলা কি কিশোর কেহই জিজ্ঞাসা করে নাই। তবে একেবারে বাস তুলিয়া দিয়া যে যান নাই, তাহা প্রশ্ন না করিয়াও জানা যায়। বেশীর ভাগ আসবাবপত্রই বাড়িতে পড়িয়া আছে। শুধু কয়েকটা বিছানা ও বাক্স লইয়া বাড়িতে তালা লাগাইয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।

এই শূন্য বাড়িটার সঙ্গে একটা মর্মান্তিক বেদনার স্মৃতি বিমলার মনে জড়াইয়া গিয়াছিল। কিশোরের মনের ভাব কী তাহা বিমলা জানিত না, কিন্তু তাহা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নহে। কিশোরের অন্তররাজ্যে যখন এই বিষম ওলট-পালট ঘটিয়া গেল, তখনও সে বাহিরে কিছুই প্রকাশ করে নাই, কেবল বিমলার পুনঃপুনঃ প্রশ্নের উত্তরে ম্লান হাসিয়া বলিয়াছিল, 'থাক বৌদি, ও কথায় আর কাজ নেই। ওদের সঙ্গে আমাদের সব সম্বন্ধ চুকে গেছে।' তাহার এই ব্যথিত নীরবতার হেতু বিমলা বুঝিয়া-

ছিল এবং কেন যে উহাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ নিঃশেষে চুকিয়া গেল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও বিলম্ব হয় নাই।

তাই, যে সমস্যাটাকে একদিন বিমলা হঠকারিতার দ্বারাই নিষ্পন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাহা আবার দ্বিগুণ জটিল হইয়া দেখা দিল। তাহাকে লইয়া বাপের সহিত কিশোরের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, ইহা না হয় সে সত্যের মুখ চাহিয়া, ন্যায়ের দিক দিয়া সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এমনই করিয়া বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই যদি কিশোরের ছাড়াছাড়ি হইতে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত সে দাঁড়াইবে কাহাকে ভর করিয়া? কিশোরের সমস্ত ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি বিমলার সংসর্গ-দোষেই এমনভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়, তবে শুধু ন্যায়-ধর্মের দোহাই দিয়া বিমলা কোন্ মুখে কিশোরের গলায় পাথর হইয়া ঝুলিয়া থাকিবে? সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়া কিশোরের এমন মূল্যবান জীবন নষ্ট করিয়া দিবার অধিকার তাহার আছে কি?

সেদিন বিমলা কিশোরকে গিয়া বলিয়াছিল, 'ঠাকুরপো, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, এখানে আমার মন টিকছে না। মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও, তাহলেই আমার চলে যাবে।' কিশোর জবাব দিয়াছিল, 'তা হয় না, বৌদি। তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি, কিন্তু আজ যদি তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাও, তাহলে মিথ্যাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে।—কাশীতে থাকতে চাও, বেশ চল, আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।'

কথাটা এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখের মাত্রা এক বিন্দুও লাঘব হয় নাই।

বিমলার যখনই ঐ জানালা-দরজা-বন্ধ বাড়িটার প্রতি নজর পড়িত, তখনই অপরিসীম ব্যাথার সহিত মনে হইত, কেন মানুষ মানুষকে এত ভুল বোঝে? এত বন্ধুত্ব, এত প্রণয় তাহার মধ্যেও কি সত্যকার পরিচয় হয় না? এ ব্যবধান কি কখনও সরিবে না? মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়া লওয়া কি অসম্ভব? সুহাসকে সে তো চিনিয়াছিল, তবে সুহাস তাহাকে চিনিল না কেন? আর সকলের উপর সুহাস যাহাকে এত ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে এমন করিয়া অবিশ্বাস করিল কি করিয়া?

কিশোরের নিগ্রহের পালা যে শেষ হয় নাই, তাহার ইঙ্গিতও বিমলা মাঝে মাঝে পাইত। কলেজ হইতে ফিরিবার পর এক-একদিন তাহার ক্লিষ্ট নির্যাতন-চিহ্নিত মুখের প্রতি চাহিয়া বিমলা নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকিত। কিন্তু আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন মুখের উপর জাজ্বল্যমান দেখিয়াও, কে আঘাত করিল, কেন আঘাত করিল, জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। দুইজনের মাঝখানে অব্যক্ত ব্যথার ভার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত। যে বেদনার ভাগ লইবার কেহ নাই, সহানুভূতির দ্বারা সরল করিবারও উপায় নাই, তেমন দুর্বহ ব্যথা পৃথিবীতে বুঝি অল্পই আছে।

কিশোরের বাহ্য ব্যবহারে কোনও পরিবর্তন লক্ষিত হইল না বটে, কিন্তু তাহার স্বচ্ছ আনন্দময় দর্পণের মত উজ্জ্বল প্রাণের উপর যেন একপুরু ধুলার পর্দা পড়িয়া গিয়াছিল, পূর্বের হাসি আমোদ কিছুই ছিল না। জোর করিয়া সমস্ত মন প্রাণ সে ল্যাবরেটরির কাজে ঢালিয়া দিয়াছিল। যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত ল্যাবরেটরিতেই থাকিত, বিমলাও নির্বাক ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিয়া যাইত। পূর্বের মত এই সংযুক্ত কর্মের সময়টি রহস্যালাপের দ্বারা সরস হইয়া উঠিত না। নেহাত যখন অসহ্য হইয়া পড়িত, তখন কিশোর বলিত, 'আর পারি না। চল বৌদি, ও ঘরে বসে নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো গল্প করি গে।'

পাশের ঘরে গিয়া উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া প্রথমটা গল্প বেশ সতেজেই আরম্ভ

হইত, কিন্তু ক্রমে ভগ্নোদ্যম হইয়া অবশেষে অর্ধপথে নীরব হইয়া যাইত। জোর করিয়া বাজে কথার জের টানিয়া চলা আর কিছুতেই সম্ভব হইত না।

এমনই করিয়া প্রায় নিঃসঙ্গভাবে এই দুইটি নরনারীর জীবন বহিয়া চলিয়াছিল। পরিচিতদের মধ্যে কেবল দীনবন্ধুবাবু আসিয়া মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর লইয়া পূর্ব-সম্বন্ধ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এই দুটি আত্ম-সমাহিত ব্যক্তির গম্ভীর স্বাতন্ত্র্য ভেদ করিতে পারিতেন না। ইহাদের দুর্জয় অভিমান যেন দুর্গম্বার রোধ করিয়া তাঁহাকেও বাহিরে ফেলিয়া রাখিত।

সাড়ে ন'টার সময় বহির্দ্বারে কিশোরের গলা শুনিয়া বিমলা শুষ্কপ্রায় এলো চুল জড়াইতে জড়াইতে তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া আসিল।

কিশোর গায়ের শালখানা নামাইয়া রাখিয়া পকেট হইতে পুরু লম্বা গোছের একটা বন্ধ লেফাপা বাহির করিয়া বিমলার হাতে দিয়া বলিল, 'সব হয়ে গেল। নাও, এটাকে যত্ন করে রেখে দাও।'

লেফাপা হাতে লইয়া বিমলা দেখিল, তাহার উপর বড় বড় অক্ষরে তাহার নাম লেখা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'কী এ?'

'ওতে তোমার পেটেন্টের কাগজপত্র আর বিক্রি কন্ট্রাক্টের দলিল আছে। উকিল-বাড়ি থেকে নিয়ে এলুম। টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা করে দিতে বলে এসেছি। অত টাকা ঘরে ফেলে রেখে কোনও লাভ নেই, ব্যাঙ্কে থাকলে মোটা রকম সুদ পাবে।'

বিমলা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকায় বিক্রি হল? কারা কিনলে?'

'চৌদ্দ হাজার টাকা নগদ আর শতকরা পঁচিশ টাকা রয়ালটি। সত্যি কথা বলতে কি, বৌদি, এত দাম যে পাওয়া যাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বেঙ্গল কেমিক্যালকে দিলুম, ওদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশী দর পাওয়া গেল।' হাসিমুখে বলিল, 'আর আমার টাকার দুঃখ রইল না বৌদি, এবার এই হতভাগা চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে তোমার অন্ন ধ্বংস করব।'

বিমলা নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, 'টাকার দুঃখ তোমার রইল না, সে যেন বুঝলুম, কিন্তু আমার অন্ন ধ্বংস করবে তার মানে কি?'

কিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পেটেন্ট তোমার নামে নিয়েছি কিনা, আর টাকা-টাও ব্যাঙ্কে তোমার নামেই জমা হবে।'

'কেন?'

'কেন, তোমার জিনিস—তোমার টাকা, তোমার নামে থাকবে না তো কার নামে থাকবে?'

ভীতভাবে বিমলা বলিল, 'এ কী করলে, ঠাকুরপো! এ কেন করতে গেলে?'

'কেন, অন্যায়টা কী করেছি?'

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমলা বলিল, 'তোমার টাকা আমার নামে থাকলে কোনও ক্ষতি নেই,—সে থাক। কিন্তু ঠাকুরপো, যে জিনিস এত পরিশ্রম করে আবিষ্কার করলে, তার সঙ্গে নিজের নামটা সংযুক্ত করে রাখতেও কি তোমার ইচ্ছে হল না?'

'আবিষ্কার যদি আমি করতুম, তাহলে আলবত সে ইচ্ছে হত। কিন্তু আবিষ্কার তো আমি করিনি বৌদি, তুমি করেছ। আমি তো শুধু কলের মত কাজ করে গেছি, নিজের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে বুদ্ধির যন্ত্রে ফেলে মজুরের মত চাকা ঘুরিয়েছি। আসল যা প্রাণ—প্রেরণা, অধ্যবসায়—সে সবই তো তোমার। পাছে কেউ ভুল করে, কিংবা আমিই কোনদিন বুদ্ধির দোষে ওটাকে নিজের আবিষ্কার বলে মনে করে বসি, তাই ওর নাম কি দিয়েছি জানো, বৌদি?'

বিমলা ক্ষীণস্বরে বলিল, 'কি?'

'বিমলা-সুধা। ঠিক হয়নি? তুমি মাথা নাড়বে জানি, কিন্তু এ আমি জোর করে বলতে পারি বৌদি, ওর যদি সত্যিকার কোনও গুণ না-ও থাকে, তবুও শুধু তোমার নামের পুণ্যে বাংলাদেশের রুগ্ন শিশুদের কাছে অমৃততুল্য হয়ে উঠবে।'

ক্ষুব্ধস্বরে বিমলা বলিয়া উঠিল, 'না না ঠাকুরপো, এ তুমি ভাল করনি। টাকা তুমি যাকে ইচ্ছে দিতে পার, কিন্তু ভালবাসার খাতিরেও নিজের ন্যায্য খ্যাতি বিলিয়ে দেবার অধিকার তোমার নেই। না, আমাকেও না। এ তুমি ভারি অন্যায় করেছ ভাই।'

কিশোর মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি খ্যাতির কাঙাল নই, বৌদি!'

ব্যাকুল হইয়া বিমলা বলিল, 'কিন্তু আমি যে তোমার খ্যাতির কাঙাল। আমি যে চাই সকলে জানুক দেখুক যে, তুমি ছোট নও, সামান্য নও—যারা দূরে সরে গিয়ে তোমার বিচার করতে চায়, তাদের চেয়ে তুমি অনেক উঁচু। তুমি যে আমার কত বড় গর্ব, কত বড় অহঙ্কার, তা আমি তাদের কি করে দেখাব, ঠাকুরপো? আমার সেই অহঙ্কারে তুমি বাদ সাধলে?' বলিতে বলিতে তাহার স্বর কান্নার ভারে ভাঙিয়া পড়িল।

কিশোরও মনে মনে বিচলিত হইল, কিন্তু মুখে হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা মেনে নিচ্ছি বৌদি, অপরাধ হয়েছে, বারদিগর আর এমন হবে না। তোমার অহঙ্কারের কথাটা ভেবে দেখিনি। এবার থেকে নিজের নামই জাহির করব।'

চোখ মুছিয়া বিমলা বলিল, 'পরের কথা পরে হবে। এখন একে শোধরাবার কোনও উপায় নেই?'

কিশোর মাথা নাড়িল, 'না, যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু ও কথা এখন থাক।'

'থাক কেন?'

'আর একটা ভারি দরকারী কথা কদিন থেকে তোমায় বলব মনে করছি, কিন্তু হয়ে ওঠে নি।—সামনেই ছুটি, চল কিছুদিন কোথাও ঘুরে আসা যাক। কলকাতা আর ভাল লাগছে না।'

'কোথায় যাবে?'

'কোথাও তো বেশী দিন থাকা চলবে না, মাত্র দশ-বারো দিনের ছুটি।—শুধু ঘুরে বেড়ানো, তা কাশী থেকে আগ্রা হয়ে বৃন্দাবন বেড়িয়ে ফিরে আসা যাক—কি বল? তোমার তীর্থদর্শন আর আমার তাজ-দর্শন দুই হবে।'

একটু ভাবিয়া বিমলা বলিল, 'বেশ, চল।'

কিশোর খুশি হইয়া বলিল, 'তাহলে হাজারখানেক টাকা ও-থেকে রাখি, কেমন? ব্যাঙ্কে জমা দেবার পর আবার বার করা মুশকিল হবে। তোমার হাতে বোধ হয় কিছুই নেই?'

বিমলা বলিল, 'সামান্যই আছে, তাতে চলবে না। কিন্তু হাজার টাকার দরকার নেই, পাঁচশ হলেই যথেষ্ট হবে।'

কিশোর হাসিয়া বলিল, 'বেশ, তোমার টাকা, তুমি যদি পাঁচশর বেশী খরচ করতে না চাও, তাহলে তাই সই।'

বিমলাও হাসিল, বলিল, 'তা তো বটেই। নিজের টাকা বলেই তো আমার অত দরদ, নইলে তোমার টাকায় কি আমার মায়া আছে?'

চাবি দিয়া আলমারী খুলিয়া দলিলের লেফাপাখানা সযত্নে রাখিয়া দিয়া বিমলা বলিল, 'আর আমি দাঁড়াব না, এখনও রান্না চড়াই নি। তোমাকে তো আবার খেয়ে বেরুতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

১৮

পাঞ্জাব মেল হাওড়া ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে কিশোর বিমলাকে লইয়া স্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিল প্লাটফর্মের উপর বিরাট জনতা,—দেশী ও বিলাতী বহুবিধ ভদ্রশ্রেণীর যাত্রীর ভিড়ে কোথাও তিল ফেলিবার স্থান নাই। কিশোর আগে হইতে দুইখানি প্রথম শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল, তাই গাড়িতে জায়গা পাওয়া সম্বন্ধে তাহার কোন দুর্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেক গাড়ির সম্মুখস্থ তালিকায় নিজের নাম খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে নির্দিষ্ট গাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল। বিমলাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় গাড়ির ভিতর হইতে একজনের পরিচিত সকৌতুক কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, 'এ কি কিশোরবাবু, আপনি কোথায় চলেছেন?'

কিশোর মুখ তুলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল,—সম্মুখের বেঞ্চির গদির উপর বসিয়া যে মেয়েটি হাসিমুখে তাহার পানে তাকাইয়া আছে সে যে করবী হইতে পারে, তাহা যেন কিশোর সহসা বিশ্বাস করিতেই পারিল না।

করবী হাসিয়া বলিল, 'স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে! চিনতে পারছেন তো?'

কিশোর হাঁ-না কোন কথাই বলিতে পারিল না। যে দিন সন্ধ্যাবেলা বিনয়বাবুর বাড়িতে সেই কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, সেদিন করবী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল; উপস্থিত না থাকিলেও সে ব্যাপার তাহার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইত না। কিশোর বুঝিয়াছিল, ইহার পর করবীদের সহিত তাহার নব-স্থাপিত বন্ধুত্বের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আবার দেখা হইবার সম্ভাবনাও সে কল্পনা করে নাই, এবং যদি দৈবাৎ দেখা হয় তাহা হইলে দুই পক্ষই যে দূর হইতে অপরিচিতের মত সরিয়া যাইবে, ইহাই সে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিল। অনুপম করবীর পিসতুত ভাই, তাহার উপস্থাপিত অভিযোগ যে করবী শেষ পর্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া কিশোরের সংসর্গ বর্জন করিবে, ইহাই তো সঙ্গত!

কিন্তু এ কি অচিন্তনীয় ব্যাপার! করবীর এই একান্ত বন্ধুভাবে সম্ভাষণের সহিত নিজের অন্তরঙ্গ বদ্ধমূল ধারণার আপোস করিতেই কিশোরের খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তারপর নিজের বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত করিয়া সে ভাবিয়া দেখিল, করবী ছেলেমানুষ, হয়তো সব দিক না ভাবিয়াই তাহার সম্বন্ধে এতটা সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার অভিভাবকরা জানিতে পারিলে নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হইবেন। এবং একথা ভাবাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে যে, কিশোরই গায়ে পড়িয়া তাঁহাদের সহিত পুনশ্চ ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।

কিশোরের একবার ইচ্ছা হইল, এ গাড়ি ছাড়িয়া অন্য কোন খালি গাড়ি খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে গিয়া উঠে; কিন্তু এখন সে পথও বন্ধ, কুলিরা ইতিমধ্যে মোটঘাট লইয়া এই গাড়িতে রাখিয়াছে, বৌদিদিও গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আবার মোটঘাট তুলিয়া লইয়া অন্যত্র যাইবার চেষ্টাও যে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইবে, তাহা বুঝিয়া কিশোর সেই গাড়িতেই উঠিয়া পড়িল এবং সংযতভাবে করবীকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল, 'আমরা কাশী যাচ্ছি।'

করবী করতালি দিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, 'আমরাও কাশী যাচ্ছি, বেশ হল, একসঙ্গে যাব। ইনি আপনার বৌদিদি তো? দেখেই চিনতে পেরেছি। আসুন বৌদি, এখানে এসে বসুন। আপনাদের সঙ্গে ট্রেনে এমনভাবে দেখা হবে তা ভাবিও নি—ভারি আশ্চর্য নয়? আচ্ছা, আপনারা কাশী যাচ্ছেন, আগে আমাদের একটা খবর দেননি

কেন? জানা থাকলে কত সুবিধে হত।'

কিশোর নির্বাক হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার সঙ্গে তো কাউকে দেখছি না, আপনি কি—?'

করবী হাসিয়া বলিল, 'না, একলা যাচ্ছি না, বাবা সঙ্গে আছেন। মা আজ দু'মাস হল কাশীতেই রয়েছেন কিনা—তাঁকেই আনতে যাচ্ছি। মা'র শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছিল, তাই মামা এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মামার বাড়ি কাশীতে, আপনি জানতেন না বুঝি?'

কিশোর মাথা নাড়িয়া নিঃশব্দে বেঞ্চের এক কোণে গিয়া বসিল। কুলিগুলো মজুরির জন্য দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের ভাড়া চুকাইয়া দিতে দিতে ক্ষুব্ধমনে ভাবিতে লাগিল, এ কোন্ দৈবী দুষ্টবুদ্ধি সারা রাত্রির জন্য তাহাকে এই অনীপ্সিত সাহচর্যের মধ্যে ফেলিয়া দিল?

বিমলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, করবী উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, 'কিশোরবাবু তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না, নিজেই নিজের পরিচয় দিই। আমি করবী—বোধ হয় ওঁর কাছে নাম শুনে থাকবেন।'

বিমলা হাসিয়া বলিল, 'শুধু নাম নয়, অনেক প্রশংসাও শুনেছি।'

সুস্মিতমুখে কিশোরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া করবী বলিল, 'সত্যি? এ তো আমার ভারি সৌভাগ্যের কথা। আমি জানতুম, উনি কেবল মুখের ওপর কম্প্লিমেণ্ট দিতে পারেন। যা হোক, আড়ালেও আমার সুখ্যাতি করেছেন, এ আমার পক্ষে কম গৌরব নয়!' বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই প্রমদাবাবু হন্তদন্ত হইয়া কোথা হইতে আসিয়া গাড়িতে চড়িয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই নানাবিধ চীৎকার ও হুড়াহুড়ি সহযোগে গাড়ি ধীরে ধীরে আলোকদীপ্ত প্লাটফর্ম ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

অপরিচিত একটি স্ত্রীলোকের সহিত মুখোমুখি বসিয়া করবী কথা কহিতেছে দেখিয়া প্রমদাবাবু প্রথমটা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিলেন, তারপর কিশোরের দিকে ফিরিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে কিশোরবাবু যে!' কিশোরের পাশে গিয়া বসিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল। কে সি চক্রবর্তী আর মিসেস হালদারের নামে রিজার্ভ-কার্ড দেখে ভয় হচ্ছিল, বুঝি একজোড়া বাঙালী মেম-সাহেব বড়দিন করতে চলেছে—সারাটা পথ জ্বালাতে জ্বালাতে যাবে। তারপর, এখন যাওয়া হচ্ছে কদ্দুর? মোগলসরাই পর্যন্ত রিজার্ভ করেছেন দেখছি—কাশী চলেছেন নাকি?'

কিশোর বলিল, 'হ্যাঁ—আপাতত কাশী যাচ্ছি।'

প্রমদাবাবু বলিলেন, 'তার মানে বেড়াতে চলেছেন। বেশ বেশ, বড়দিনের ছুটিতে একটা কিছু করা চাই তো!—এই দেখুন না, আমি গেঁতো মানুষ, কলকাতা ছেড়ে এক পা যেতে মন সরে না, আমাকেও বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। বুড়ো বয়সে শ্বশুরবাড়ি চলেছি।'

করবী বলিল, 'বাবা, ইনি কিশোরবাবুর বৌদিদি। ইনি বলছেন, কিশোরবাবু এঁর কাছে আমার খুব প্রশংসা করেছেন। কিশোরবাবু ভারি ভাল লোক, নয়?'

প্রমদাবাবু বলিলেন, 'তোমার প্রশংসা করলেই যদি ভাল লোক হওয়া যায়, তাহলে ভাল লোক হওয়া সহজ বলতে হবে। কিন্তু আমি এত সহজে কিশোরবাবুকে ভাল লোক বলতে রাজী নই। উনি আসব বলে কথা দিয়ে সেই একবার বই আমাদের বাড়িতে আর আসেননি।' বিমলাকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'মা লক্ষ্মীকেও সঙ্গে আনবার কথা ছিল, তাও আনলেন না। আমি পুলিসের লোক, এই সব নানা রকম প্রমাণ থেকে স্পষ্ট

বুঝতে পারছি, উনি একজন নিতান্ত বদলোক। এমন কি ওঁকে বোমাবাজ বিপ্লবী বলেও সন্দেহ করা যেতে পারে।'

প্রমদাবাবুর কথায় সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। কিশোরের বুক হইতে একটা ভারি বোঝা নামিয়া গিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন প্রফুল্লতা সে বহুদিন অনুভব করে নাই। তাহার অকৃত অপরাধের জন্য সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন সে একঘরে হইয়াছিল; সংসার তাহার প্রতি অন্যায় বিচার করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে; এই অভিমানে সে নিজেই পৃথক হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিল। আজ প্রমদাবাবু হাত ধরিয়া যেন তাহাকে সেই পরিচিত সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিলেন। তিনি যেন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, 'তোমার নামে কে কী কুৎসা রটনা করিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে চাহি না। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ যতই গুরু হোক, আমরা জানি তুমি নির্দোষ, তোমার দ্বারা এত বড় অপরাধ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি—ভালবাসি। তুমি আমাদেরই একজন।'

কৃতজ্ঞতার এক অপূর্ব আবেগে কিশোরের কণ্ঠ পর্যন্ত বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে বলিল, 'আমায় মাপ করুন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। একটা কাজে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, সময় করে উঠতে পারিনি। সত্যি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করুন।'

ইহার পর তাহাদের মধ্যে কথাবার্তায় আর কোন সঙ্কোচ রহিল না। ট্রেন রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল; দীর্ঘ ব্যবধানে এক-একবার ক্ষণকালের জন্য গতি সংহত করে, আমার সগর্জনে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহির হইয়া পড়ে। স্থিতিকে স্থায়ী হইতে দিবে না, এই যেন তাহার পণ।

আর, সেই দীপালোকিত ক্ষুদ্র দারু-কক্ষটির মধ্যে এই চারিটি প্রাণী যেন সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ এক ইন্দ্রিয়াতীত মন্ত্রকুহকে পরস্পরের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িলেন। মনের আড়াল যখন একবার ঘুচিয়া যায়, তখন বুঝি এমনই হয়। যে কথা অন্য সময় অতি অন্তরঙ্গের কাছেও প্রকাশ পাইত না, তাহা সহজে স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া আসিল। কৃত্রিম ব্যবধান যেখানে নাই, সেখানে কথারও অন্ত থাকে না। আনন্দের, দুঃখের, আকাঙ্ক্ষার কত কাহিনীই যে বিনিময় হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

শুধু একটা প্রসঙ্গ সকলেই সাবধানে এড়াইয়া গেলেন, সুহাসিনী সম্বন্ধে কোন কথা হইল না।

গল্প-গুজবে যখন অনেক রাত্রি হইয়া গেল, তখন প্রমদাবাবু এক রকম জোর করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন এবং বিছানাপত্র পাতিয়া শয়নের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

কিশোর তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রমদাবাবুর হোল্ড্-অল খুলিয়া তোশক, বালিশ, লেপ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল। কিছুক্ষণ বাগ্বিতণ্ডার পর স্থির হইল, বিমলা ও করবী দুই পাশের বেঞ্চিতে শয়ন করিবে, প্রমদাবাবু ও কিশোর মেঝের স্বল্পপরিসর স্থানে বিছানা পাতিয়া শুইবেন। পথের জন্য বিমলা সামান্য একটা বিছানা জড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাতে নিজের জন্য একটা মোটা ভুটিয়া কম্বল এবং কিশোরের জন্য লেপ বালিশ তোশক ছিল। কিশোর সেটা খুলিয়া বিছানা পাতিতে লাগিয়া গেল। প্রমদা-বাবুকে বলিল, 'আপনি বসুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

প্রথমে দুই বেঞ্চির উপর দুটা তোশক পাট করিয়া পাতিয়া তাহার উপর বালাপোশ বিছাইয়া বালিশের জন্য প্রমদাবাবুর বিছানার স্তূপ খুঁজিতে খুঁজিতে দুটি ছোট ছোট অতি সুন্দর চিকনের কাজকরা বালিশ বাহির হইয়া পড়িল। কিশোর সহাস্যমুখে করবীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ দুটি বুঝি আপনার?'

করবী বিব্রত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ছেড়ে দিন, আমরা বিছানা

পেতে নিচ্ছি।'

কিশোর বলিল, 'আমাকে কি এতই অপদার্থ মনে করেন, বিছানা পাতবারও ক্ষমতা নেই?'

বিমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া করবীকে বলিল, 'ওঁকে কিছু বোলো না, ঝি-চাকরের কাজ করতে উনি বড্ড ভালবাসেন।'

কৃত্রিম কোপে চোখ পাকাইয়া কিশোর বলিল, 'ঝি-চাকরের কাজ—আচ্ছা বেশ'— শয্যা প্রস্তুত শেষ করিয়া বলিল, 'এবার শুয়ে দেখুন, ঝি-চাকরের চেয়ে ভাল হয়েছে কিনা।'

প্রমদাবাবু শুইয়া পড়িলেন, আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আঃ দিব্যি হয়েছে! এবার আলোর উপর পর্দাটা টেনে দিয়ে যে যার ঘুমিয়ে পড়ো।'

বিমলা নিজের নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'ঠাকুরপো, কম্বলটা আমায় দাও, নইলে সারারাত্ গা কুটকুট করবে, ঘুমোতে পারবে না।'

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'নাঃ, ওতে আমার কোনও কষ্ট হবে না।'

বিমলা বলিল, 'আমি বলছি লক্ষ্মীটি, তুমি লেপ নাও। কম্বলে আমার অভ্যেস আছে, তুমি লেপ না হলে ঘুমুতে পার না।'

কিশোর বলিল, 'কম্বলটি নিজেব জন্যে নেওয়া হর্যেছিল, আমি তা বুঝতে পারিনি। তা তোমার বুঝি গা কুটকুট করতে নেই?'

বিমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, কম্বল নিজে নিযে লেপটি আমার ঘাড়ে চাপাবে। এমন একগুঁয়ে মানুষও যদি কোথাও দেখা যায়।'

করবীও শুইয়া পড়িয়াছিল; লেপের ভিতর হইতে এতক্ষণ দু'জনের তর্কাতর্কি শুনিতেছিল, এবার ঘাড় তুলিয়া বলিল, 'কিশোরবাবু, আপনার মাথায় বালিশ দেখছি না?'

কিশোর বলিল, 'নিষ্প্রয়োজন। বালিশ না থাকলেও আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। বাহুই আমার শ্রেষ্ঠ উপাধান।'

বিমলা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, 'আর বড়াই করতে হবে না। এই দেখ না, নিজের বালিশটি আমাকে দান করা হয়েছে। আমার বালিশের দরকার হয় না, তাই ওঁর জন্যে একটা বালিশ নিয়েছিলুম—'

কিশোর আলো দুটি ঢাকা দিয়া কম্বলের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, 'বৌদি, এত রাত্তিরে যদি তর্ক আরম্ভ কব তাহলে ঘুম চটে যাবে। আর নয়, এবার চটপট ঘুমিয়ে পড়া যাক।'

আবরিত বাতির ক্ষীণ প্রভায় কক্ষটি চমৎকার ছায়াময হইয়াছিল; তাহার ভিতর হইতে ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে কববী বলিল, 'কিন্তু আমার তো দুটো বালিশ বযেছে, আপনি একটা নিন না, কিশোরবাবু।'

'না, না, তার দরকার নেই।'

করবী ঝুপ করিয়া একটা বালিশ কিশোরেব মাথার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'এই নিন।'

কিশোর নরম বালিশটা নাড়িয়া-চাড়িয়া সযত্নে মাথার তলায় দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'অন্যায় করলেন। ভেবেছিলুম যখন তীর্থযাত্রা করেছি, তখন পথেই কৃচ্ছ্রসাধন শুধু করে দেব—তা আব আপনারা হতে দিলেন না।'

কিছুক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। প্রমদাবাবুর নাসানিঃসৃত শব্দ ঘোষণা করিতে লাগিল যে, তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে। গাড়ি অন্ধকারের বুক চিরিয়া উল্কার

বেগে ছুটিয়াছে, বন্ধ কাচের শার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্য কিছু দেখা যায় না। ভিতরে কক্ষটি স্বপ্নদৃষ্ট মায়া-লোকের মত অস্পষ্ট মোলায়েম হইয়া আছে।

অনেকক্ষণ পরে করবী মৃদুস্বরে বলিল, 'মনে হচ্ছে, আমরা যেন কোন নিরুদ্দেশের যাত্রী। এমনি ভাবে গাড়ি যদি চিরকাল চলতে থাকত, কি সুন্দর হত?'

কেহ তাহার কথায় উত্তর দিল না, কিন্তু কিশোর ও বিমলার মনে সে কথার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল!—জীবনটা যদি এমনই নিশ্চিন্ত নিরবচ্ছিন্ন একটি যাত্রা হইত! এমনই নিরুদ্বেগ ছায়াময় রাজ্যের ভিতর দিয়া, সহযাত্রীদের সঙ্গে নিবিড় স্নেহ-বন্ধনে বন্ধ হইয়া এই যাত্রাপথ যদি কখনও শেষ না হইত!

১৯

পরদিন সকালে চা জলযোগ ইত্যাদি সমাপ্ত হইবার পর সকলে অলসভাবে বসিয়া মোগলসরাই স্টেশনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মোগলসরাই পেঁছিতে আর বিলম্ব নাই। স্থির ছিল, প্রমদাবাবুরা কাশী পর্যন্ত ট্রেনে না গিযা এইখানেই নামিয়া যাইবেন এবং মোটরে কাশী পেঁছিবেন। আগে হইতে যানবাহনের বন্দোবস্তও করিয়া রাখা হইয়াছিল।

করবী ও বিমলা গাড়ির একটা কোণে বসিয়া ছিল, কখনও নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিল, কখনও বা বাহিরের শীত-প্রভাতের শিশির-ঝলমল দৃশ্য নীরবে দেখিতেছিল। করবী তাহার স্বভাবসুলভ ছেলেমানুষী ও অকপট সরলতার দ্বারা সহজেই বিমলার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল; তাহাদের পরিচয় এই অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন একটা স্তরে গিয়া পেঁছিয়াছিল—যেখানে পাশাপাশি বসিয়াও নিরবচ্ছিন্ন বাক্যালাপের প্রয়োজন হয় না।

গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা কঙ্করময় স্টেশনকে দলিত বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল। প্রমদাবাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'আর কুড়ি মিনিট। ঠিক টাইমে যাচ্ছে।'

কিশোর উঠিয়া পড়িল; রাত্রির ব্যবহৃত বিছানাপত্র তখনও ইতস্তত ছড়ানো ছিল, গোছগাছ করা হয় নাই। কিশোর সেগুলিকেও গুছাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই প্রমদাবাবু বলিলেন, 'থাক না হে, অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি? পাশের গাড়িতে আমার আর্দালী আছে, গাড়ি থামলে সে-ই ঠিকঠাক করে নেবে অখন।'

কিশোর বলিল, 'তা হোক। তাড়াতাড়িতে সে হয়তো পেবে উঠবে না, আমিই ঠিক করে নিচ্ছি।'

করবী বিমলার গা টিপিয়া বলিল, 'আপনি ঠিক বলেছিলেন, বৌদি।' বিমলা হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

কিশোর তাহাদের কথা শুনিযাও শুনিল না, গম্ভীর মুখে কাজ করিতে লাগিল। সকলে সকৌতুকে দেখিতে লাগিলেন।

প্রমদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল কথা, তোমবা কাশীতে উঠছ কোথায শুনলুম না তো। কোন আত্মীয় আছেন বুঝি?'

কিশোর মুখ তুলিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল. 'না, আত্মীয় কেউ নেই। কোথায় উঠব এখনও কিছু ঠিক করিনি। যেখানে হোক ওঠা যাবে, দিন তিন-চাব বৈ তো নয়। শুনেছি, এ দিকের ধর্মশালাগুলো বেশ ভাল।'

প্রমদাবাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, 'বল কি হে! সঙ্গে স্ত্রীলোক রয়েছেন, ধর্মশালায় উঠবে কি? আমি ভেবেছিলুম তোমার বুঝি একটা আস্তানা আছে—তাই এতক্ষণ খোঁজ করিনি। বেশ যা হোক।'

উৎসুক গলা বাড়াইয়া করবী বলিয়া উঠিল, 'বাবা, তাহলে—'

প্রমদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে! এক জায়গাতেই সকলে মিলে ওঠা যাবে। কিন্তু কি ছেলেমানুষী বল দেখি! ভ্যাগ্যিস জিজ্ঞাসা করেছিলুম, নইলে তো ধর্ম-শালাতেই গিয়ে উঠতে!'

কিশোর অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'না না, সে আপনাদের বড় কষ্ট হবে। আমরা যেখানে হোক—'

প্রমদাবাবু বলিলেন, 'বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের? আমার শালাদের প্রকাণ্ড বাড়ি, দু'জন অতিথি বেশী হলে তাদের কোনও কষ্ট হবে না। তা ছাড়া করবীর মা যদি শোনেন যে, তোমাদের ধর্মশালায় পাঠিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ি এসেছি, তাহলে আমাদেরও হয়তো সেই ব্যবস্থা করতে বলবেন। তাঁর ভায়েদের বাড়ি—বুঝছ না?' বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

করবী বলিল, 'কিশোরবাবু, কোনও আপত্তি শোনা হবে না। আপনাদের যেতে হবে।'

কিশোর বিমলার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বৌদি, কিন্তু এটা কি উচিত হবে?'

করবী বিমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আপনি কিন্তু অমত করতে পারবেন না. তা বলে দিচ্ছি।'

বিমলা সহাস্যে বলিল, 'অমত করব কেন—বেশ তো। এ তো বরং ভালই হল। আর অসুবিধে যদি হয়, সে তো আমাদের হবে না, তোমাদেরই হবে। তা সে অসুবিধে যখন তোমরা স্বীকার করে নিচ্ছ, তখন আর আমাদের আপত্তি কি?'

নিজের জন্য যতটা নয়, বিমলার কথা ভাবিয়াই কিশোর করবীদের বাড়ি আতিথ্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছিল। বিমলা শুদ্ধাচারে থাকে, তাহার জপতপ স্নানা-হারের নানা হাঙ্গামা আছে, পরের বাড়িতে উঠিয়া হয়তো এ সকলের কোন সুব্যবস্থা হইবে না; হয়তো তাঁহারা সাহেব লোক, একঘড়া গঙ্গাজলও তাঁহাদের বাড়িতে পাওয়া যাইবে না;—বিমলা হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিলেও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাইবে, এই সব নানা কথা ভাবিয়া কিশোরের মন কিছুতেই এ প্রস্তাবে সায় দিতেছিল না। কিন্তু বিমলা যখন কোন অনিচ্ছাই প্রকাশ করিল না, বরং সহজেই রাজী হইয়া গেল তখন কিশোরের নিজের পক্ষ হইতে একটা অজ্ঞাতনামা আপত্তি মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল। প্রমদাবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সংসর্গ অপ্রীতিকর নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তবু অন্ধকার রাত্রিতে অজানা পথে চলিতে চলিতে গভীর খাদের কিনা-রায় আসিয়া পড়িলে অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেমন ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া হইয়া উঠে, তেমনই একটা নামহীন দুর্দৈবের পূর্বাভাস কিশোরের মনটাকে যেন শঙ্কায় কণ্টকিত করিয়া তুলিল এবং মনে হইল ইঁহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া পলাইতে পারিলেই যেন সব দিক দিয়া ভাল হয়।

অথচ এরূপ সহৃদয় নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া শহরের পান্থ-নিবাসে আশ্রয় লওয়ার মত অশিষ্টতা অতি অল্পই আছে; তাই কুণ্ঠিতভাবে রাজী হওয়া ছাড়া তাহার আর গতি রহিল না। প্রমদাবাবু ও করবী অকপটভাবে খুশি হইয়াছেন বুঝিয়াও সে মনের মধ্যে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না। বাকী পথটা একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়া প্রায় নীরবেই কাটিয়া গেল।

যথাসময়ে মোগলসরাই স্টেশনে নামিয়া সকলে মোটর-যোগে কাশী পেঁাছিলেন। কাশীতে করবীর মামার বাড়ি দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটেই। তাঁহারা মোটেই সাহেব নহেন, বরঞ্চ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হিন্দু দেখিয়া কিশোর বিমলার বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। করবীর মা আগন্তুকদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বিমলাকে হাত ধরিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। বেলা হইয়াছিল, অল্প দুই-চারিটা কথাবার্তার পর বিমলা গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই স্নান সারিয়া পূজার ঘরে ঢুকিল।

পূজা শেষ করিয়া যখন সে বাহির হইল, বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ির মেয়েরা সকলেই তাহার জন্য অভুক্ত রহিয়াছেন দেখিয়া সে লজ্জিত হইয়া বলিল, 'কেন আমার জন্য আপনারা কষ্ট করলেন? আমি তো বিশ্বনাথ দর্শন না করে মুখে জল দিতে পারব না। আমারই অন্যায় হয়েছে, আগে বলা উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা আর দেরি করবেন না, খেয়ে-দেয়ে নিন। আর যদি সুবিধা হয়, একজন লোক আমার সঙ্গে দিয়ে আমাকে বিশ্বনাথ মন্দিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিতে পারতুম, কিন্তু সমস্ত রাত গাড়িতে এসে তিনি ক্লান্ত হয়েছেন।'

করবী বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আর আপনার শরীরে বুঝি ক্লান্তি নেই? কাল গাড়িতে ওঠার পর থেকে আজ এই বেলা পর্যন্ত আপনাকে মুখে এক ফোঁটা জল দিতে দেখলুম না! ক্ষিদের কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু তেষ্টাও কি আপনার পায় না, বৌদি?'

বাড়িতে অন্য কোন বিধবা ছিলেন না, তাই বিমলার জন্য আলাদা হবিষ্য রাঁধিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। করবীর বড় মামী বলিলেন, 'আপনার রান্নার উয্যুগ সব আমি করে রেখেছি, শুধু আমাদের হাতে খাবেন কিনা তাই রান্না চড়াতে পারিনি।'

বিমলা হাসিয়া বলিল, 'সে কি কথা, খাব বৈকি।'

বড় মামী বলিলেন, 'তাহলে আপনার রান্না আমিই চড়িয়ে দিই; বিশ্বনাথ তো কাছেই, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন। করবী, দুবেকে ডেকে বলে দে তো মা, মোটরকারে করে এঁকে যেন বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনে। আর সুরেনের তো স্কুল নেই, সে সঙ্গে যাক—'

করবী বলিল, 'কিন্তু খেয়ে-দেয়ে গেলেই তো ভাল হত।'

বিমলা জিভ কাটিয়া বলিল, 'তা কি হয় ভাই, কাশীতে এসে বিশ্বনাথের মাথায় জল না দিয়ে কি খেতে আছে?'

করবী বলিল, 'কেন খেতে নেই। আমি তো এসেই চা-হালুয়া খেয়েছি।'

বিমলা হাসিয়া উঠিল, 'শোন কথা। তুমি আর আমি কি সমান? তা ছাড়া উপোস করতে আমাদের কষ্ট হয় না—'

করবী রাগিয়া উঠিয়া কী একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, তাহার বড় মামী বাধা দিয়া বলিলেন, 'তর্ক করিস নি, করবী। দ্যাখ সুরেন কোথায়, সে আবার এখনই হয়তো কোথাও বেরিয়ে যাবে। আর গাড়ি সামনে আনতে বলে দে।'

করবী চলিয়া গেলে বিমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'একেবারে ছেলেমানুষ।'

গাড়ি অন্দরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাতে উঠিতে উঠিতে বিমলা বাড়ির বধূদের অনুনয় করিয়া বলিল, 'দোহাই, আপনারা আমার জন্যে যেন আর না খেয়ে বসে থাকবেন না—তাতে কেবল আমার অপরাধ বাড়বে। বরং খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমার জন্যে দুটো আলোচাল ফুটিয়ে রাখবেন; আমার ফিরতে আজ তিনটে বাজবে।'

বিমলা চলিয়া গেল। এই অপরূপ সুন্দরী বিধবাকে দেখিয়া বাড়ির মেয়েরা সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এত অল্পবয়সে তাহার এই কঠিন নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল, যেন হিন্দু-বিধবার অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধানের সীমা কঠোর তপস্যার বলে সে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যথায় তাঁহাদের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

সেদিন বিকালবেলাটা ক্লান্তিবিনোদনেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর বাড়ির পুরুষরা বৈঠকখানায় আসর জমাইয়া তুলিলেন। করবীর অনেকগুলি মামা। যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি প্রায় প্রমদাবাবুর সমবয়স্ক—বহুদিন পরে শালা ও ভগিনীপতির সাক্ষাতে হাসি-তামাশা ও বাক্য-বাণের অবাধ বিনিময় চলিতে লাগিল। বাহিরের লোক কিশোর ছাড়া আর কেহ ছিল না, তাই করবীও এক সময় তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিল। মামার বাড়ির পর্দাপ্রথা করবী মানিত না; মামারা যদিও ইহা পছন্দ করিতেন না, তথাপি আদরিণী ভাগিনেয়ীকে কিছু না বলিয়া ভগিনীপতির উপর ঝাল ঝাড়িতেন। শ্বশুরবাড়িতে প্রমদাবাবুর 'সাহেব' ডাকনাম শ্লেষ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছিল।

বৈঠকের লক্ষ্যহীন আলোচনা প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে একটা জটিল আইনের প্রশ্নে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিশোর নীরবে বসিয়া শুনিতেছিল। করবী কিছুক্ষণ মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়া শেষে কিশোরের দিকে একটু সরিয়া আসিয়া চুপিচুপি বলিল, 'কিশোরবাবু, কাল খাওয়া-দাওয়া করে সারনাথ দেখতে যাব ঠিক হয়েছে। আমি, আপনি আর বৌদি—আর কেউ নয়।'

কিশোর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'আচ্ছা।'

করবী আর কিছু না বলিয়া এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিয়া গেল। তাহার আগমন ও প্রস্থানে বৈঠকের আলোচনা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না বটে, কিন্তু কিশোরের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া চুপিচুপি কথা কহিয়া উঠিয়া যাইবার দৃশ্যটা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

রাত্রিতে আহারাদির পর করবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল প্রমদাবাবুকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাহেব, মেয়ের বিয়ের কী করছ?'

'কিছুই তো এখনও করিনি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু করার সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে। করবীর বয়স কত হল—সতেরো? বাঙালীর ঘরের মেয়ে, আর বেশী দিন ঘরে রাখা তো চলবে না। মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে আরম্ভ করো।'

'সে হবে এখন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

'দেখো, ঐ কথাগুলো আমার ভাল লাগে না। মেয়ের সতেরো বছর বয়স হল, এখনও তাড়াতাড়ি কিসের? অন্য বিষয়ে সাহেবিয়ানা করো ক্ষতি নেই, কিন্তু এ দিকে যা রয় সয় তাই ভাল। তুমি না পার, আমিই পাত্র দেখছি।'

'আরে অত চটছ কেন? মনের মত পাত্রও তো পাওয়া চাই।'

'অপাত্রে মেয়ে দিতে তো বলছি না। কিন্তু মনের মত পাত্রও জগতে দুর্লভ নয়—খুঁজলে পাওয়া যায়।'

প্রমদাবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। বড় মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এই কিশোর ছোকরার সঙ্গে তোমাদের কদ্দিনের আলাপ?'

'বেশী দিন নয়,—মাস চার-পাঁচ।'

'ওর সঙ্গে আজ কথা কইছিলুম—বেশ ছেলে, তোমাদের পালটি ঘর। ওর কথা

কখনও ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি। সব দিক দিয়েই সুপাত্র। কিন্তু করবীর মনের ভাব না বুঝে তো স্থির করা যায় না।'

'সাহেব, সে আমি জানি। মেয়েকে যখন ইংরাজী স্কুলে পড়িয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছ, তখন তার অমতে কিছু হবে না। কিন্তু একদিন দেখেই আমার যা ধারণা হয়েছে, তাতে করবীর বিশেষ অমত হবে বলে বোধ হয় না, বরং খুব বেশী রকম মত হবে বলেই আন্দাজ হচ্ছে। তুমি তো অনেক দিন ধরেই দেখছ, তোমার কিছু সন্দেহ হয় না?'

'ভাই, এ সব আঁচ-আন্দাজের কথা নয়, পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। বুঝছ না, আমাদের আন্দাজ ভুলও হতে পারে।'

'বেশ, সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেই দেখো না?'

'তা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কিন্তু তাতে অনিষ্ট হতে পারে। এখন কিছু না বলাই ভাল, সময় উপস্থিত হলে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার হবে না।'

'দেখো, আমি সেকেলে লোক, এই সব মেলামেশা পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, ও জিনিসটাকে বিনা বাধায় অগ্রসর হতে দিলেই অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমার এ একটুও ভাল বোধ হচ্ছে না। শেষকালে হয়তো এমন জট পাকিয়ে যাবে যে, জট ছাড়াতেই প্রাণান্ত হয়ে পড়বে।'

অতঃপর আর কোন কথা হইল না। রাত্রিতে শয়ন-কালে প্রমদাবাবু অন্যান্য কথার পর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিশোর সম্বন্ধে করবীর মনে কিছু আছে তোমার মনে হয়?' করবীর মা বলিলেন—'হয়। করবী আগে অনেক ছেলেমানুষী করেছে, কিন্তু এবার বোধ হয় সত্যি সত্যি—'

'সুহাসিনীর বিষয়ে সব কথাই তো সে জানে?'

'জানে। তার মুখেই তো আমরা শুনেছি।'

'হুঁ' বলিয়া প্রমদাবাবু পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিলেন। নিদ্রা সহসা আসিল না, ঘুরিয়া-ফিরিয়া শ্যালকের সুস্পষ্ট আশঙ্কার কথাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। কিশোরের সহিত অবাধে করবীকে মিশিতে দিয়া ভুল করিয়াছেন কিনা, ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

২০

পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর বাহির হইতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল।

বিমলা, করবী ও কিশোর এই তিনজনেরই যাওয়া স্থির ছিল, কিন্তু যাত্রা করিবার সময় সুরেন আসিয়া গাড়িতে চাপিয়া বসিল। তাহার বয়স তেরো-চৌদ্দ বছর, এই একদিনেই সে বিমলার বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িয়াছে।

করবী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, 'তুই আবার কোথায় যাবি? তুই তো অনেক-বার দেখেছিস।'

সুরেন বয়সে এবং অন্তরে ছেলেমানুষ হইলেও কথাবার্তায় বেশ পরিপক্ক, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'দেখলেই বা! আবার বুঝি দেখতে নেই?'

করবী অধীর হইয়া বলিল, 'না না, তুই ব্যাডমিণ্টন খেল গে যা না বাপু!'

সুরেনও গরম হইয়া বলিল, 'ব্যাডমিণ্টন তুই খেল গে যা, ও তো মেয়েমানুষের খেলা। আমি আজকাল টেনিস খেলি—জানিস?'

করবী চোখ পাকাইয়া বলিল, 'অ্যাঁ—আমাকে তুই বলা! আমি না তোর দিদি! দাঁড়া তো—' বলিয়া কানের দিকে হাত বাড়াইল।

সুরেন দুই হাতে নিজের কান চাপিয়া ধরিয়া তর্জন করিয়া কহিল, 'খবরদার করি-দি, কানে হাত দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—দেখুন তো, বৌদি—'

বিমলা তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'আহা চলুক না ও, আমাদের দেখাতে-শোনাতে পারবে।'

সুরেন উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ আলবত। করি-দি সারনাথের জানে কী? কলা। মিউজিয়মে যে অ্যাত্তবড় হাঁড়ি আছে, দেখেছিস? কত দিনের পুরানো বল দেখি?'

'তোর অ্যাত্তবড় হাঁড়ি আমি দেখতে চাই না।'

দুই ভাইবোনে সারাটা পথ ঝগড়া করিতে করিতে চলিল।

সারনাথের ধ্বংসস্তূপে পৌঁছিয়া সকলে মোটর হইতে নামিল। আর একখানা শূন্য ট্যাক্সি মোড়ের উপর দাঁড়াইয়া ছিল; এ সময়ে প্রত্যহই দুই-চারিজন দর্শক মৃগদাবের লুপ্ত গৌরবের চিহ্নগুলি পরিদর্শন করিতে আসিতেন। নিকটেই মিউজিয়ম—তাহাতে খননোদ্ধৃত মূর্তি প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। অদূরে একটি বৌদ্ধ মঠ, তাহাতে কতকগুলি মুণ্ডিতশির শ্রমণ বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা অধিকাংশই সিংহলী বা ব্রহ্মদেশীয়; বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও দুই-একজন ছিলেন।

সম্মুখেই মহাচৈত্যের বিরাট দেহ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে। উৎসাহী সুরেনের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া সকলে প্রথমে সেই দিকে চলিল। কোথায় চৈনিক পরিব্রাজক পাথরের উপর সোনা বসাইয়া গিয়াছে, হাজার বছরেও তাহা মুছিয়া যায় নাই; কোনখানটা মেরামত করিতে গিয়া ইংরাজ গভর্নমেণ্ট চৈত্যের শিল্প-শোভা কুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে; কোন লৌহশৃঙ্খল অবলম্বনে চৈত্যের উপরে উঠিয়া দীপালী সাজাইবার নিয়ম ছিল, এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দর্শন শেষ হইলে সংঘারামের খনিত ভূমির উপরে সকলে উপস্থিত হইল। স্থানটা বহু বিস্তৃত, কোথাও প্রকাণ্ড দরদালানের স্তম্ভের পীঠিকাগুলি রহিয়াছে, আর সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কোথাও সারি সারি ক্ষুদ্র কুঠুরির ছাদহীন নগ্ন দেওয়ালগুলি সেকালের ছাত্রদের কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের পরিচয় দিতেছে; কোথাও বা সংকীর্ণ গুপ্ত সুড়ঙ্গ এখনও অটুট অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিতে দেখিতে অতীতের অসংলগ্ন স্বপ্নে মন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

বিমলা সুরেনের মুখে এই সব স্মৃতি-চিহ্নের সত্য-অসত্য ইতিহাস শুনিতে শুনিতে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। কিশোর বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা অনুভব করিতেছিল; যেন তাহার নিজেরই অতীত জীবনের ইতিহাস এইখানে ছিন্ন হইয়া কালের চরণতলে দলিত পিষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে, ইহার মর্মকাহিনী চিরদিন এমনই অনাদৃত অপঠিত রহিয়া যাইবে। করবীও ইহাদের দু'জনের দেখাদেখি গম্ভীর হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা এই সব মৃত অতীতের স্মৃতির সঙ্গে ঠিক সুর মিলাইতে পারিতেছিল না। তাহার সতেরো বছর বয়স, আজ না জানি কি কারণে তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল, চোখে যেন কিসের ঘোর লাগিয়াছিল। তাহার সমস্ত দেহটা সুরবাঁধা সেতারের মত বিনা কারণেই রণিয়া রণিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। শুষ্ক নীরস অতীতের কথায় তাহার প্রয়োজন ছিল না। তাহার কি আসে যায় কবে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কোন রানী সংঘের জন্য কোন অলিন্দ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া?

এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে করবী ও কিশোর অজ্ঞাতসারে আলাদা হইয়া বিমলা

ও সুরেনের নিকট হইতে দূরে পড়িয়া গিয়াছিল, হঠাৎ কিশোর একবার চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, 'বৌদি কোন দিকে গেলেন?'

করবী বলিল, 'সুরেন বোধ হয় কোথাও বসে তাঁকে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে শুরু করে দিয়েছে। চলুন, ঐ স্তম্ভটা দেখে আসি।' স্তম্ভের দিকে যাইতে যাইতে করবী আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'দেখুন, আমাদের মত আরও কারা বেড়াতে এসেছে।'

কিশোর চাহিয়া দেখিল, একজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া এক-জন ভিক্ষুর সহিত কথা কহিতেছেন। ভিক্ষু অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাঁহাদের এটা ওটা দেখাইয়া কী কথা বলিতেছেন, শুনা গেল না। কিশোর নিরুৎসুকভাবে বলিল, 'বাঙালী মনে হচ্ছে।'

করবী কৌতূহলভরে সেই দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিল।

আধঘণ্টা পরে স্তম্ভ দেখিয়া ফিরিবার সময় হঠাৎ কোন্ দিক দিয়া যেন কী হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মনের কথা, যাহা সহজে প্রকাশ হইবার নয়,—অচিন্তিতপূর্ব অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাহা দমকা হাওয়ায় বন্ধ জানালার মত খুলিয়া একেবারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। কোথাও এতটুকু আড়াল বা আবরণ রহিল না।

প্রাচীন ইষ্টকের দেওয়াল দিয়া ঘেরা চৌবাচ্চার মত একটা স্থানে এক খণ্ড প্রস্তরলিপি দেখিয়া কিশোর সেটা পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে নামিয়া পড়িয়াছিল। চারি-ধারের দেওয়াল হইতে স্থানটা পাঁচ-ছয় ফুট নীচু, নামিবারও কোন পথ ছিল না, কিশোর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। করবী সেখানে নামিবার কোন সহজ উপায় না দেখিয়া উপরেই দাঁড়াইয়া ছিল।

নিবিষ্টমনে শিলালিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে করিতে কিশোর এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিল,—করবী হঠাৎ কি মনে করিয়া পাঁচিলের মত দেওয়ালের উপর দিয়া পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কয়েক পদ গিয়া আর যাইতে পারিতেছে না, মাঝ-খানে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পা দু'টা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দেয়ালটা মাত্র হাতখানেক চওড়া, তাহার দুই দিকেই একমানুষ প্রমাণ গর্ত, কিশোর ভীতভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সাবধান!'

কিন্তু সাবধান হইবার মত অবস্থা করবীর ছিল না, সার্কাসে তারের উপর খেলা দেখাইতে দেখাইতে মেয়েরা যেমন দুলিতে থাকে, সেও তেমনই একবার এদিক একবার ওদিক দুলিতেছিল। তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। কিশোরের দিকে না চাহিয়াই সে ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল, 'আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

করবী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া তাহার নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া কিশোর বলিল, 'বসে পড়ো। ঐখানে বসে পড়ো। আমি তোমাকে তুলে আনছি!'

কিশোরের কথামত বসিতে গিয়া করবী আর তাল সামলাইতে পারিল না, অস্ফুট চীৎকার করিয়া যেদিকে কিশোর ছিল, সেই দিকে ঢলিয়া পড়িল।

তাহার পতনোন্মুখ দেহ কিশোর অর্ধপথে ধরিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু করবীর হাই হীল জুতাসুদ্ধ পা দু'টা সজোরে মাটিতে ঠুকিয়া গেল। পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণপণে কিশোরের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, মাথাটাও কিশোরের বুকের উপর পড়িয়াছিল। সেই ভাবেই দুইজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। করবীর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হাতুড়ির মত কিশোরের বুকে আঘাত করিতে লাগিল।

পাঁচ সেকেণ্ড এইভাবে থাকিবার পর কিশোর চমকিয়া করবীকে ছাড়িয়া দিল। কি সর্বনাশ! এই অবস্থায় যদি কেহ তাহাদের দেখিয়া ফেলে।

করবী কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না, বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেই সে

ভীত শিশুর মত আরও জোরে তাহার গলা আঁকড়াইয়া ধরিল। চক্ষু মুদিতই ছিল, কেবল তাহার বুক হইতে একটি কম্পিত নিশ্বাস বাহির হইল মাত্র।

কিশোর ত্রস্ত ও বিব্রত হইয়া বলিল, 'কোথাও লাগেনি তো?'

করবী সাড়া দিল না। দুশ্চিন্তায় কিশোরের গলা শুকাইয়া গেল—তবে কি করবী মূর্ছা গেল নাকি?

সে ভীতকণ্ঠে ডাকিল, 'করবী!'

করবী একবার চোখ খুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।

যাক, তবু ভাল, মূর্ছা নহে, কিশোর অস্বস্তিপূর্ণ দেহে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া পুনরায় বলিল, 'তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

করবী মাথা নাড়িয়া জানাইল, 'না।'

কিশোর সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, 'তাহলে—তাহলে এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে হত না?'

করবীর মুখে আবার রক্তসঞ্চার হইয়াছিল, সে ঠোঁট টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, 'কেন, আমি তো বেশ আছি। তোমার কি আমাকে বড্ড ভারী বোধ হচ্ছে।'

দারুণ শীতেও কিশোরের কপাল ঘামিয়া উঠিল। করবী আঘাত পায় নাই, মূর্ছাও যায় নাই—অথচ তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। অনেক সময় ভয় পাইলে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, দাঁড়াইতে পারে না—ইহা সম্ভবপর বটে, কিন্তু তাহার মুখে এ কি রকম কথা! কিশোরের মনে ভীষণ একটা সন্দেহ মাথা তুলিতে লাগিল। তবে কি—

না, না, এ সম্ভব নহে, তাহারই বুঝিবার ভুল! সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু কেউ যদি আমাদের এ-ভাবে দেখতে পায়— মনে করবে—'

'মনে করুক গে—'

কিশোর পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর সন্দেহ করিবার তিলমাত্র স্থান নাই। করবীর কণ্ঠস্বর, তাহার সিন্দুরবর্ণ মুখ, মুদিত চক্ষু কেবল একটি কথার সাক্ষ্য দিতেছে। কিশোরের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এ কী হইল! ইহা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই! কিন্তু করবীর এ ভাব তো আকস্মিক নহে, ইহার পশ্চাতে বহুদিনের রুদ্ধ নিগৃহীত আবেগ সঞ্চিত হইয়া আছে। আজ নাড়া পাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে মাত্র। কিন্তু কেন এমন হইল!

হাওড়া স্টেশনে করবীর সহিত প্রথম চোখাচোখির সময় ইহারই পূর্বাভাস বুঝি সে পাইযাছিল! কেন তখন সে সাবধান হয় নাই? কেন করবীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া অন্য গাড়িতে গিয়া উঠে নাই? এখন এই অপরিসীম লজ্জার বোঝা লইয়া সে কী করিবে? করবীর এই অনাহূত ভালবাসা কেমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে?

কিন্ত—

করবী যদি সত্যই তাহাকে ভালবাসে, তবে কেন সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে? করবীকে ভালবাসিবে না কেন? সে তো মুক্ত, তাহার কোনও বন্ধন নাই। সারাজীবন কেন সে উদাসীর মত কাটাইয়া দিবে? করবীকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইতে পারে না? করবীর মত মেয়ে এ সংসারে কয়টা পাওয়া যায়? করবীকে বিবাহ করিয়া তাহার বুকের শূন্য গহবর কি ভরিয়া উঠিবে না?

কিশোরের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। অন্তর্যামীর কাছে তো

ছলনা চলে না। নহিলে, এই যে একটি পূর্ণযৌবনা নারী তাহার বুকের উপর পড়িয়া যথাসাধ্য সরল ভাষায় তাহাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে, ইহা তাহার অন্তরে অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি করিতে পারিল না কেন? করবী যে পাষাণমূর্তি নয়, বেপমানা স্পন্দমানা নারীমূর্তি,—এ কথা, তাহার মন তো দূরের কথা, শরীরের তপ্ত রক্তস্রোতও স্বীকার করিতে পারিল না কেন? না,—করবীকে দিবার মত তাহার কিছু নাই। আর এক-জন তাহার হৃদয় বলিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা লুটিয়া-পুটিয়া নিঃশেষ করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। শূন্য হৃদয় লইয়া করবীর প্রেম সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। দু'দিন পরে এই নিঃস্ব অন্তঃসারশূন্যতা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখনকার ভয়াবহ জীবন-যাত্রার কথা কল্পনা করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। না, করবীকে সে ঠকাইতে পারিবে না।

কিন্তু তবু করবীর প্রতি স্নেহে করুণায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। তাহার উপর, কি দুর্বিষহ লজ্জা যে এখনই করবীকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিবে তাহা ভাবিয়া সে নিজেও লজ্জায় মরিয়া গেল। কী করিবে, কেমন করিয়া এই দুর্নিবার লজ্জার হাত হইতে করবীকে রক্ষা করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া সে করবীর চুলের উপর মৃদু অঙ্গুলিস্পর্শে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'করবী, তুমি তো জান—'

এই পর্যন্ত বলিয়া কিশোর হঠাৎ থামিয়া গেল। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়া-ছিল, ঠিক এই সময় কাহার সুদীর্ঘ ছায়া তাহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িতেই কিশোর চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। করবী চোখ বুজিয়া ছিল বলিয়া কিছু দেখিতে পাইল না। কিন্তু বৈকালী সূর্যের পশ্চাৎপটের সম্মুখে এক অতিপরিচিত নারীমূর্তি দেখিয়া কিশোরের মনে হইল, সে একটা অসম্ভব অবান্তর স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্ষণকাল অভি-ভূতের মত থাকিয়া সে সবলে রূঢ়ভাবে নিজেকে করবীর বাহুমুক্ত করিয়া লইল।

কিন্তু উপর হইতে সেই ক্ষণিক-মূর্তি তখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

এই সময় দূর হইতে সুরেনের বালক-কণ্ঠের ডাক আসিল, 'করি-দিদি! কিশোরবাবু!'

কিশোর নীরস নিস্তেজ স্বরে কহিল, 'চলুন! ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

আর কোনও কথা হইল না, কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিল না, নিঃশব্দে দুই-জনে ফিরিয়া গিয়া বিমলা ও সুরেনের সহিত যোগ দিল।

বিমলা একবার দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিল,—কিছু একটা ঘটিয়াছে। কিন্তু কী ঘটিয়াছে তাহা এই দুটি শুষ্ক পাংশু পীড়িত মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল না এবং অনুমান করিতে সাহসী হইল না।

অন্তরের দুঃসহ বেদনা চাপিয়া যাহাদের মুখে হাসিতে হয় তাহাদের মত হতভাগা অল্পই আছে। কিশোর ও করবী আরও দুই ঘণ্টা, যেন কিছুই ঘটে নাই এমনি অভিনয় করিয়া, সমস্ত দ্রষ্টব্য বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য মোটরে উঠিল, তখন হৃদয়-ভারাক্রান্ত অবসাদে কিশোরের সর্বশরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে এবং করবীর মনে হইতেছে আরও খানিকক্ষণ এইরূপ করিতে হইলে সে আর পারিবে না, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে। তাই বাড়ি যাইবার পথে এই বৃথা-ভিনয়ের চেষ্টা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চলন্ত গাড়ির মধ্যে সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেনের অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সেও বাক্যব্যয় করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে রাজী হইল না।

বাড়ি আসিয়া নামিবার উপক্রম করিতেই প্রমদাবাবুর ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, বিনয়বাবু ও সুহাসিনী দেখা করিতে আসিয়াছেন।

করবী তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

মোটর-ড্রাইভারকে গাড়ি গ্যারেজে তুলিতে নিষেধ করিয়া কিশোর দ্রুতপদে গিয়া প্রমদাবাবুর নিকট উপস্থিত হইল। ভাগ্যক্রমে প্রমদাবাবু একাকী ছিলেন, কিশোর কোন প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিল, 'এখনই আমি বৌদিকে নিয়ে স্টেশনে রওনা হব। শুনেছি, আটটার সময় একটা পশ্চিমের ট্রেন আছে।—কিছু মনে করবেন না—আপনারা তো সব জানেন।'

তাহার ক্লান্তিক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া প্রমদাবাবু কী যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু বলিবার পূর্বেই কিশোর নত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, 'থাকতে অনুরোধ করে আমার লজ্জা আর বাড়াবেন না। আপনাদের সংসর্গে এলেই আমি অপরাধ করে ফেলি, এই আমার ভাগ্য। দয়া করে একটা চাকরকে বলে দিন, আমাদের জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে তুলে দিক। বৌদি গাড়িতেই বসে আছেন।'

২১

সংক্রামক ব্যাধির বিষাক্ত আবহাওয়া ছাড়িয়া ভয়ার্ত মানুষ যেমন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করে, বিনয়বাবুও তেমনি কন্যাকে লইয়া কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই, কেবল এই বাড়িটার দূষিত স্মৃতি হইতে সুহাসিনীকে দূরে লইয়া যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথাটাই অঙ্কুশের মত তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া অনিশ্চিত ও নিরুদ্দেশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

সুহাসিনীও বাধা দেয় নাই। তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার শক্তি ছিল না। তা ছাড়া পাশেব বাড়িটার দুঃসহ সামীপ্য তাহার অবসন্ন মনকে তুষানলের মত অহরহ দগ্ধ করিতেছিল। ওই বাড়িটার দিকে চোখ পড়িলেই তাহার বুকের ভিতর হু হু করিযা উঠিত, অথচ চোখে না পড়িয়াও উপায় নাই। তাই পিতাব প্রস্তাবে সে আগ্রহের সঙ্গেই সম্মতি জানাইয়াছিল।

কিন্তু বিনয়বাবু যখন কলিকাতার বাস একেবারে তুলিয়া দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন সুহাসিনী জোরের সহিত বলিল, 'না, তা হতে পারে না। বাড়ি ছাড়া হবে না।' কাহারও অত্যাচারে দেশত্যাগী হইয়াছে, এ অপমানের গ্লানি এত বড় দুঃখের পরও সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

সুহাসিনীর মনের ভাব বিনয়বাবু বুঝিলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। বাড়িওয়ালাকে ছয় মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়া দরজায় তালা লাগাইয়া একদিন অপরাহ্ণে পিতাপুত্রী বাহির হইয়া পড়িলেন।

মধুপুর ও দেওঘরে কিছুদিন কাটিল। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার জলহাওয়ায় সুহাসিনীর শরীর আরও ক্ষীণ ও দুর্বল হইতেছে দেখিয়া ˉীত বিনয়বাবু সাঁওতাল পরগণা ত্যাগ করিয়া বেহার-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। .তাঁ নিজের শরীরও ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। সংসারের ভাবনা ভাবা ধ।.।র কখনও অভ্যাস ছিল না, বৃদ্ধবয়সে এই দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও দুঃখের গুরুভার তাঁহার দেহ-মনকে যেন জাঁতায় পিষিয়া গুঁড়ো করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার পুরাতন হাঁপানির রোগ পুনঃপুনঃ দেখা

দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তিনি নিজের দেহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সুহাসিনীর কথা ভাবিয়া তাহাকে কি করিয়া একটু সুস্থ দেখিবেন, এই চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া রহিলেন।

এইরূপ উদ্দেশ্যহীনভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মাস তিন-চার কাটিয়া গেল। দশ-পনেরো দিনের বেশী কোথাও মন টিকে না, তাই নূতন নূতন স্থানের সন্ধানে ইঁহারা প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে সমস্ত উত্তর ভারতটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যে বস্তুর সন্ধানে ফিরিতেছিলেন, সেই শান্তির দর্শন পাওয়া তো দূরের কথা, এই অবিশ্রাম যাযাবর-বৃত্তি তাঁহাদের মনকে আরও অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সুহাসিনীর মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু সে হাসি এতই নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ যে তাহা দেখিয়া বিনয়বাবুর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িত। সুহাসিনী যে তাঁহাকে খুশি করিবার জন্যই হাসিবার চেষ্টা করিতেছে এ কথা সরলচিত্ত বিনয়বাবুর কাছেও গোপন থাকিত না।

মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া যাহারা দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে বিদেশে অজ্ঞাতবাস হয়তো শান্তিদায়ক হইতে পারে, কিন্তু নিজের মনের নিকট হইতে যাহারা পালাইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে নিঃসঙ্গতা যে কিরূপ ভয়াবহ অবস্থা তাহা যাহারা ভোগ করিয়াছে তাহারাই জানে।

শারদীয়া পূজা কখন আসিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, সুদূর প্রবাসে বিনয়বাবু ও সুহাসিনী তাহা ভাল করিয়া জানিতেও পারিলেন না। হেমন্ত শেষ হইয়া শীত আসিল। তখন একদিন সুহাসিনী হঠাৎ বলিল, 'চল বাবা, দেশে ফিরি।'

বিনয়বাবু ব্যাকুলভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'যাবি মা? তবে তাই চল,—এ আর ভাল লাগছে না।'

পিতার শীর্ণ মুখের এই আর্ত আগ্রহ দেখিয়া সুহাসিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, 'ঘুরে ঘুরে তোমার শরীরে যে কিছু নেই বাবা, চল বাড়ি যাই।'

বিনয়বাবু নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিলেন, 'না না, আমার শরীরের জন্য তো ভাবনা নয়, তোকে সারাতে পারলুম না, এই দুঃখ। ভেবেছিলুম, নানা দেশ দেখে বেড়ালে তোর শরীরটাও ভাল হবে—'

চোখ মুছিয়া সুহাসিনী বলিল, 'না, বাবা, আর পালিয়ে বেড়াব না। বাড়ি গেলে তোমারও শরীর ভাল হবে, আমিও ভাল থাকব। সেখানে করবী আছে—দীনবন্ধুকাকা আছেন—'

দীনবন্ধুর কথায় বিনয়বাবু বলিলেন, 'ভাল কথা, কাল দীনবন্ধুর একখানা চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানা অনেক জায়গা ঘুরে কাল এসে পৌঁছেছে।'

'কী লিখেছেন কাকাবাবু?'

'লিখেছে বড়দিনের ছুটিতে সে কাশী আসবে, আমরাও যদি যাই তাহলে দেখা হতে পারে।'

'তবে তাই চল বাবা, কাশী হয়ে বাড়ি যাওয়া যাক। আজ তো ডিসেম্বর মাসের তেইশে।'

সেইদিন যাত্রা করিয়া দুইজনে যথাসময়ে কাশী পৌঁছিলেন। কাশীতে পরিচিত লোকের অভাব ছিল না—একজন বন্ধুর বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। দীনবন্ধুরও সেই-খানেই উঠিবার কথা, কিন্তু জানিতে পারা গেল যে অকস্মাৎ স্ত্রী পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি আসিতে পারিলেন না।

বন্ধুর উপরোধে বিনয়বাবুকে দু'-তিন দিন কাশীতে থাকিয়া যাইতে হইল।

কাশী ছাড়িবার আগের দিন দুপুরবেলা তিনি সুহাসিনীকে লইয়া সারনাথ দেখিতে গেলেন। সেখানে যাহা ঘটিল পূর্ব অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

কিশোর ও করবীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিবার পর সুহাসিনী যখন টলিতে টলিতে বিনয়বাবুর কাছে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া বিনয়বাবু ভয় পাইয়া গেলেন। কিন্তু কোনও কথা উত্থাপন করিবার পূর্বেই সুহাসিনী ক্লিষ্ট-স্বরে বলিল, 'বাবা, ভারি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে—ফিরে চল।'

সমস্ত পথটা বিনয়বাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিতে করিতে ও দুর্বল সুহাসিনীকে এইখানে টানিয়া আনার জন্য পরিতাপ করিতে করিতে গেলেন। সুহাসিনী কিন্তু কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, পিতার সব কথা তাহার কানেও গেল না। আজ এই অজ্ঞাত স্থানে কিশোর ও করবীর সঙ্গে এমনভাবে দেখা হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? তাহারা দুজনে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একটিমাত্র অর্থ হয়, দ্বিতীয় অর্থের অবকাশ নাই। কিন্তু সাধারণের সহজগম্য প্রকাশ্য স্থানে এরূপ কদর্য নির্লজ্জতা কিশোরের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, করবী তাহাতে যোগ দিল কী করিয়া? ঘৃণায় সুহাসিনীর শরীর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ব্যভিচারীরা কি স্থান অস্থান বিচার করে না? তাহাদের প্রবৃত্তি কি এতই প্রবল যে, দুর্নীতির আচরণে সাধারণ লোকলজ্জাও তাহারা স্বচ্ছন্দে বিসর্জন দিতে পারে?

কিন্তু করবী? করবীকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে। বিলাতী স্কুলে পড়ার ফলে সে একটু চটুলস্বভাব ও ফাজিল হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু মন্দ সে তো নহে! তবে কি তাহার সরল প্রকৃতির সুযোগ বুঝিয়া এক বিবেকহীন লম্পট তাহার সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে? করবী ও কিশোরের বাহুবন্ধ যুগ্মমূর্তির চিত্র তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। উঃ, কি নির্ভরশীলতাই করবীর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! আর কিশোরের মুখে কোন্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল! নিষ্ঠুর শিকারী এমনই কপট উৎকণ্ঠার ভাব দেখাইয়া বুঝি নির্বোধ নারীকে নিজের ফাঁদে টানিয়া আনে।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সুহাসিনী বাসায় গিয়া পৌঁছিল এবং একেবারে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া সে মন হইতে এই চিন্তাটাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রক্তপায়ী জোঁকের মত তাহারই মর্মরুধিরে স্ফীত হইয়া চিন্তাটা তাহার মনে জুড়িয়া রহিল; যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল,—কেন এমন হয়? যাহার সহিত চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে, যাহাকে সে দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রহীন বলিয়া জানে, তাহাকে অন্য স্ত্রীলোকের সহিত দেখিয়া তাহার অন্তর্দাহ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে কেন? যে লম্পট, সে যদি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করে তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে? এবং তাহারই বা কী আসে যায়? এমন তো পৃথিবীতে কত হইতেছে। তবে কি শুধু করবীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই তাহার এই অন্তর্দাহ?

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে সঙ্কল্প করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। করবীকে সাবধান করা দরকার। মুখে চোখে জল দিয়া বেশভূষার সামান্য পরিবর্তন করিয়া বিনয়বাবুর কাছে গিযা বলিল, 'চল বাবা, করবীর মামার বাড়ি বেড়িয়ে আসি! কাল তো আর দেখা করবার সময় হবে না। হয়তো করবীরাও এসে থাকবে।'

সুহাসিনীর শরীর লক্ষ্য করিয়া বিনযবাবু দু'-একবার আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া শেষে গাড়ি ডাকাইয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলেন। করবীর মামাব ঠিকানা পূর্ব হইতেই জানা ছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, করবী ও প্রমদাবাবু সম্প্রতি আসিয়াছেন। প্রমদাবাবু বাড়ি আছেন বটে কিন্তু করবী

সারনাথ দেখিতে গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। বিস্মিত আনন্দিত বিনয়বাবু বৈঠকখানায় প্রমদাবাবুর সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, সুহাসিনী অন্দরমহলে গেল। করবীর মা তাহাকে হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। করবীর মামীদের সঙ্গে সুহাসিনীর পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের সঙ্গেও আলাপ হইল। করবীর মা সুহাসিনীর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া গভীর সমবেদনার সহিত বলিলেন, 'শরীরে যে তোর কিছুই নেই, সুহাস। এত দেশ বেড়ালি, তবু শরীর সারল না?'

ম্লান হাসিয়া সুহাসিনী শুধু ঘাড় নাড়িল। করবীর মা ভিতরের সব কথাই জানিতেন, তাই কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিশোর ও বিমলা যে এখানে আছে, তাহা সুহাসিনী জানে না; তাহারা ফিরিলে অন্তত বিমলার সহিত সুহাসিনীর সাক্ষাৎ অনিবার্য। তখন কী ঘটিবে, এই ভাবিয়া তাঁহার মন সঙ্কোচে ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল, পরক্ষণেই করবী দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন পরে দুই সখীতে দেখা কিন্তু কেহই সহজভাবে সম্ভাষণ করিতে পারিল না, কোথায় যেন বাধিয়া গেল। অপ্রতিভ ও ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর করবী জোর করিয়া হাসিয়া সুহাসিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'হাসিদি,—কদ্দিন পরে তোমাকে দেখলুম, ভাই! মনে হচ্ছে যেন পাঁচ বছর।'

সুহাসিনী অল্প হাসিল, কিন্তু করবীর কথাগুলা যে সহজ এবং স্বচ্ছন্দ নয়, বরং জোর করিয়া সহৃদয়তা দেখাইবার চেষ্টা, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়া সুহাসিনীর বুকের ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল। তবু সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক সুরে বলিল, 'সারনাথ দেখতে গিয়েছিলি, আগে দেখিস নি বুঝি? কেমন দেখলি?'

'বেশ ভাল। চল এখন আমার ঘরে।' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে নিজের ঘরে লইয়া চলিল।

নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সুহাসিনীকে খাটের উপর বসাইয়া করবী অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে একটা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ধন্যি মেয়ে তুমি! এস, একটু পায়ের ধুলো নি।' বলিয়া সত্য সত্যই হাত বাড়াইয়া সুহাসিনীর পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল।

বিস্মিত হইয়া সুহাসিনী বলিল, 'ও আবার কী! ও কী করছিস?'

করবী পূর্বের মত আবার জোর করিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, 'কিছু না। তোমার পায়ে ধুলো নিলে পুণ্যি হয়, তাই একটু নিলুম। বোসো, এই কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলি ভাই।'

করবী কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, সুহাসিনী চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অন্তরের সত্যকার কথাটা গোপন রাখিবার জন্যই করবী এত বাজে বকিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই,—কিন্তু তবুও সুহাসিনীর মনে একটা খটকা বাজিতে লাগিল। সে যাহা সন্দেহ করিয়াছে তাহা নহে, করবী যেন অন্য কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে!

নিঃসংশয় হইবার উদ্দেশ্যে সুহাসিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, 'একলা সারনাথে গিয়েছিলি, না সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

করবীর মুখখানা হঠাৎ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। সে একটা গরম জামা পরিয়া তাহার বুকের বোতাম লাগাইতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'এ দিকের শীত

কী বিশ্রী দেখেছিস ভাই, যেন হাড় পর্যন্ত কালিয়ে দেয়। কলকাতায় শীত অন্য রকম —বেশ মোলায়েম। তুই যাই বলিস, আমার কিন্তু এত শীত ভাল লাগে না। ভাল জামা-কাপড় পরবার জো নেই; দেখ না, এই মোটা গরম জামাটা গায়ে দিলেও শীত ভাঙে না'—বলিতে বলিতে সে যেন সুহাসিনীর প্রশ্নটা শুনিতেই পায় নাই এমনিভাবে তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

সুহাসিনী স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'কী হয়েছে তোর?'

'কী হবে আবার! কিছু না'—করবী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্য একটা প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা করিল। কিন্তু সুহাসিনী হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিল, 'কিছু না তবে অমন করছিস কেন? আমার পানে চোখ তুলে তাকা দেখি।'

করবী চোখ তুলিয়া তাকাইল বটে, কিন্তু সুহাসিনীর চোখের সহিত বেশীক্ষণ চোখ মিলাইয়া রাখিতে পারিল না। চোখ আপনি নত হইয়া পড়িল। পরমুহূর্তেই সে হঠাৎ সুহাসের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আত্মনিগ্রহ এবং পরকে প্রতারণা একসঙ্গে আর তাহার দ্বারা সম্ভব হইল না।

সুহাস দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'কী হয়েছে আমায় বল।'

উঠিয়া করবী ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া ভারী গলায় বলিল, 'হাসিদি, পুরুষের হাতে তুমিও কম লাঞ্ছনা সহ্য করনি, কিন্তু আমার লজ্জা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ভিক্ষে চাইবার দুর্মতি তো তোমার কখনও হয়নি!'

সুহাসিনীর মুখ সাদা হইয়া গেল সে দুই হাতে করবীর হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, 'কী বলছিস, স্পষ্ট করে বল।'

করবী তিক্ত হাসিয়া বলিল, 'একজনের কাছে যেচে ভালবাসা চাইতে গিয়েছিলুম। সে তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, ভিক্ষে যে চাইলেই পাওয়া যায় না, তা বুঝিয়ে দিযেছে।—হাসিদি, আজ আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে, কেন আমার এ দুর্বুদ্ধি হল? আমি যেচে নিজেকে তার পায়ে ফেলে দিলুম আর সে আমাকে নিলে না! আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতো হাসিদি, সত্যিই কি আমি ফেলে দেবার মতন? কিছু কি আমার নেই?' অশ্রুসিক্ত মুখখানা করবী সুহাসিনীর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

সুহাসিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে ভাল দেখিতে পাইল না। কিশোর করবীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই লজ্জাই করবী এতক্ষণ লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তবে সারনাথের সেই যুগ্মমূর্তির সে যে অর্থ করিয়াছিল, তাহা ভুল! কিশোর করবীকে প্রলুব্ধ করে নাই! কিন্তু তবু সংশয় দূর হইল না, সে ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে—কে সে, করবী,—যে তোকে নিলে না?'

করবী বলিল, 'মরে গেলেও তার নাম বলতে পারব না। তুমি কখনও জানতে চেয়ো না, হাসিদি! আমার ওপর যদি তোমার এতটুকু দয়া থাকে, ঐ লজ্জা থেকে আমাকে রেহাই দিও।'

কিন্তু রেহাই পাওয়া করবীর ভাগ্যে ছিল না। এই সময় সুরেন দ্বার ঠেলিয়া বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিল, 'করিদি, কিশোরবাবু চলে গেলেন, বৌদিদিও চলে গেলেন। এখান থেকে সটান আগ্রা যাবেন। কিশোরবাবু বললেন—ওঃ—' আর একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক করবীর নিকট বসিয়া আছে দেখিয়া সুরেন থামিয়া গেল।

অপ্রস্তুতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

একবার নিমেষের জন্য সুহাসিনীর সঙ্গে করবীর চোখাচোখি হইল। তারপর করবী বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অসহ্য রোদনোচ্ছ্বাস দমন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

মৃন্ময়মূর্তির মত সুহাসিনী বসিয়া রহিল। আর একদিনের কথা তাহার স্মরণ হইল, যেদিন কলিকাতায় ড্রয়িংরুমে মূর্ছা ভাঙিয়া সে দেখিয়াছিল—করবী তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিয়া আছে। অবস্থার আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু সুহাসিনী একটা হাত নাড়িয়াও সেদিনকার ঋণ শোধ দিতে পারিল না। তাহার মুখ হইতে সান্ত্বনা বা সুহানুভূতির বাণী যে বিদ্রূপের চাবুকের মত করবীর গায়ে বাজিবে, তাহা বুঝিয়া সে নির্বাক বেদনায় পাংশু রক্তহীন মুখে বসিয়া রহিল। কেবল তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

২২

শুক্তির অন্তরস্থিত মুক্তার লোভে সমুদ্রে ডুব দিয়া যাহারা শূন্য ঝিনুকটা হাতে করিয়া কূলে ফিরিয়া আসে, অনুপমচন্দ্রের অবস্থাটা প্রায় তাহাদের মত হইয়াছিল। কিশোরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজিত ভূমি দখল করিতে গিয়া সে দেখিল, দখল করিবার মত কিছুই নাই,—যাহা ছিল, যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অনুপম ভাবিয়াছিল, ধাক্কা খাইয়া সুহাসিনীর মন তাহার দিকেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা যখন হইল না, বরঞ্চ বিপরীত ফলই দেখা গেল, তাহার প্রতি সুহাসিনীর চিত্তের বিরূপতা আরও গভীর ও অন্তর্মুখী হইয়া অস্থিমজ্জায় আশ্রয় লইল, তখন ব্যর্থ ও ক্রোধান্ধ অনুপমও তাহাকে যে কোন প্রকারে পাইবার জন্য মনে মনে জিদ ধরিয়া বসিল! যতই মনে হইতে লাগিল, সুহাসিনীর মন সে কোন দিন পাইবে না, পাইবার আকাঙ্ক্ষা ততই তাহার উগ্র ও দুর্নিবার হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে অনুপমের জননী হেমাঙ্গিনী কিন্তু উল্টা সুর ধরিলেন। এতদিন তিনি অনুপমের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ ঘটাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, সে জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু যে মেয়ে আর একজনকে ভালবাসে বলিয়া জানাজানি হইয়া গিয়াছে এবং যাহাকে লইয়া এত বড় একটা প্রকাশ্য সামাজিক কেলেঙ্কারি ঘটিয়া গেল, তাহাকে পুত্রবধূরূপে কোন বর্ষীয়সী রমণীই কামনা করেন না—তা সে অন্য দিক দিয়া যতই লোভনীয় হউক। অন্য পুরুষের হৃদয়হীন বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা করিয়া যে কুমারী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বধূরূপে ঘরে আনিবার মত উদারতা হেমাঙ্গিনীর ছিল না। তিনি একদিন এই কথাটাই ইঙ্গিতে অনুপমকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অনুপমচন্দ্র মাতার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের পথে চলিতে লাগিল। তখন হেমাঙ্গিনী তাহাকে স্পষ্ট করিয়া, ধমক দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে পরের পরিত্যক্তা কন্যার পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার মত নির্লজ্জ নির্বুদ্ধিতা অতি অল্পই আছে; ভাবিয়া দেখিতে গেলে সুহাসিনীকে পুনর্ভূ বলিলেও অন্যায় বলা হয় না এবং এত সত্ত্বেও সে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে অন্তত তিনি কখনই এরূপ বধূকে ঘরে স্থান দিতে পারিবেন না, অনুপম যেন অন্য

ব্যবস্থা করে।

অনুপম তাহার পুরুষ-স্বভাব মাতাকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাই ভিতরে গর্জন করিতে থাকিলেও মুখে কোন কথা না বলিয়া মাতার অনুশাসন একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইল।

তারপর বিনয়বাবু কন্যাকে লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন, কিছুকাল আর তাঁহাদের কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না।

চারিমাস পরে হঠাৎ একদিন অনুপম সংবাদ পাইল, বিনয়বাবু সকন্যা দেশে ফিরিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে ছুটিল।

মাত্র আগের দিন বিনয়বাবু আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; বাসার আসবাবপত্র তখনও ভাল করিয়া গোছানো হয় নাই। অনুপম ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দীনবন্ধুবাবুও রহিয়াছেন।

বিনয়বাবু শীর্ণ অসুস্থ মুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'এস, অনুপম।'

অদূরে আর একটা চেয়ারে সুহাসিনী বসিয়া ছিল, সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল। দীনবন্ধু কটমট করিয়া একবার অনুপমের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ঘরের আবহাওয়া অনুকূল নহে বুঝিয়া অনুপম যতদূর সম্ভব সপ্রতিভভাবে আসন গ্রহণ করিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একবার সুহাসিনীকেও বোধ করি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুহাসের দিকে চাহিয়া প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। মামুলিভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। ও পক্ষ হইতে বিনয়বাবুই কেবল কথা কহিলেন, ঘরের আর দুইজন মুখ টিপিয়া বসিয়া রহিলেন।

এলোমেলোভাবে প্রায় মিনিট পনেরো আলাপ চলিবার পর বিনয়বাবু ক্লান্ত হইয়া থামিয়া গেলেন। তখন অনুপম একলাই বাক্যালাপের চেষ্টাকে প্রাণপণে ঠেলিয়া লইয়া চলিল, কিন্তু পাঁচজনের সম্মিলিত উদ্যমে যাহা স্বচ্ছন্দে চলে, একাকী তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নহে। অনিচ্ছুক তিনজন শ্রোতাকে অনুপম তাহার জীবনে গত চার-মাসে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশই একটানাভাবে বলিয়া গেল। কিন্তু কোন দিক হইতে লেশমাত্র উৎসাহ বা অনুমোদন না পাইয়া শেষ পর্যন্ত দম ফুরাইয়া-যাওয়া কলের ইঞ্জিনের মত তাহাকে চুপ করিতে হইল।

দীনবন্ধু ও সুহাসিনীর যত্নকৃত কঠিন নীরবতা অনুপমকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু এমন একটা আলোচনার বিষয়ও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না যাহার মধ্যে এই দুইজনকে আকর্ষণ করিয়া আনা যাইতে পারে। মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ একটা নূতন প্রসঙ্গের সূত্র পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, 'পাশের বাড়ির দরজায় তালা লাগানো দেখছি। মহাপ্রভু গেলেন কোথায়? বাসা ছেড়ে দিয়েছেন না কি?'

বলিয়া ফেলিয়াই অনুপমকে অনুতাপ করিতে হইল। এ প্রসঙ্গ এরূপ সময় উত্থাপন করা যে ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে, কিশোর বা তৎসম্পর্কীয় কোন কথা না বলাই যে সর্বদিক দিয়া শোভন ও নিরাপদ হইত, তাহা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিল। কিন্তু অনুভব করিলেও কথাটা ফিরাইয়া লইবার তখন আর উপায় ছিল না। সুহাসের মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতেছিল। দীনবন্ধুবাবু গভীর-তর ভ্রূকুটি করিয়া নিজের মোটা লাঠিটার মুঠের দিকে চাহিয়া ছিলেন, বিনয়বাবুর শীর্ণ মুখখানা যেন আরও পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তবু অনুপম চুপ করিয়া যাইতে পারিল না, সে মরিয়াভাবে ভুলের পথেই অগ্রসর হইয়া চলিল। পিছু হটিবার স্থান

যেখানে সংকীর্ণ, সেখানে একজাতীয় লোক বিপদ জানিয়াও গোঁ-ভরে সম্মুখদিকে চলে, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। অনুপমও কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া মুখখানাকে হাসি-হাসি করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'পালিয়েছে নাকি? যাক, তবু ভাল, ভদ্রলোকের পাড়ায় যে ও-সব চলে না সেটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু গেল কোথায়?'

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে সুহাস হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুপমের মুখখানা নিজের অজ্ঞাতসারে কালো হইয়া উঠিয়াছিল, সুহাস চলিয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ হিংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে দীনবন্ধু-বাবুর দিকে ফিরিল, মনের সমস্ত বিষ তাঁহার মাথার উপর উদ্‌গিরণ করিয়া দিয়া বলিল, 'আপনার সঙ্গে তো ভারি প্রণয় ছিল, রাত নেই দিন নেই যাতায়াত করতেন! আপনি জানেন, ভাজটিকে নিয়ে গেল কোথায়? বস্তি-টস্তিতে গিয়ে উঠেছে না কি?'

এবার দীনবন্ধুবাবু একেবারে অগ্নিকাণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠিলেন, 'চোপরাও বেয়াদব নচ্ছার কোথাকার! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।—বেরোও—বেরোও তুমি এখনি এ বাড়ি থেকে, নইলে দারোয়ান ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দেব।' বলিয়া তিনি হাতের স্থূল যষ্টিটা সজোরে মাটিতে ঠুকিতে লাগিলেন।

অনুপম চেয়ার হইতে ছিটকাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, 'কি! আমাকে আপনি বেরিয়ে যেতে বলেন! আপনি কে—হু আর ইউ? এই বাড়ি আপনার নয়, বিনয়-বাবুর, সে কথা মনে রাখবেন।'

দীনবন্ধু লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন, 'এ বাড়ি আমার, এখানে আমি যা বলব, তাই হবে। তুমি এই দণ্ডে এখান থেকে বেরোও, ছোকরা। ফের যদি কখনও মাথা গলাবার চেষ্টা করেছ, তাহলে তোমাকে চাবকে লাল করে দেব। যাও।'

বিনয়বাবু অসহায়ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়াছিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে কেবল বলিলেন, 'দীনবন্ধু! দীনবন্ধু।'

দীনবন্ধু ধমক দিয়া বলিলেন, 'আপনি চুপ করুন। এই শয়তানটাই যত নষ্টের গোড়া। শুরু থেকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে পাকিয়ে আজ আপনাদের এমন অবস্থা করেছে —damned villain। আপনার যদি এতটুকু মনের জোর থাকত অনেক আগেই এটাকে দূর করে দিতেন। কিন্তু তা যখন আপনি পারবেন না, তখন আমাকেই এ কাজ করতে হবে।—যাও, বিদেয় হও এখন।' বলিয়া অনুপমকে লাঠি দিয়া দরজা নির্দেশ করিয়া দিলেন।

অনুপম তথাপি কী একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া তিনি একেবারে হুঙ্কার ছাড়িলেন, 'যাবে না? ভাল কথার কেউ নয় বটে। দারোয়ান! ইধার আও।'

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া অনুপম বলিল, 'আচ্ছা—এ অপমান আমি ভুলব না—আমিও দেখে নেব'—বলিতে বলিতে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

দীনবন্ধু বলিলেন, 'আজ আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হল। সেই দিন থেকে আমি আক্রোশ পুষে রেখেছিলুম—যেদিন ও কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে সুহাস-মায়ীর মন ভেঙে দিয়েছিল।'

বিনয়বাবু মাথা তুলিয়া বলিলেন, 'মিথ্যে কথা, দীনবন্ধু? তুমি বলতে চাও মিথ্যে কথা—?'

'হ্যাঁ, মিথ্যে কথা, ওর এক বর্ণ সত্যি নয়। আর মিথ্যে কথা বলে এতখানি অনিষ্ট বোধ হয় আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।'

'কিন্তু তার বাপের চিঠি—'

'বাপের ছেড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের চিঠি যদি থাকত, তবুও কথা মিথ্যে হত। কিন্তু সে ভেবে আর কী হবে বলুন, এখন তো আর কোন উপায় নেই।'

বিনয়বাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, কিছুক্ষণ দু'জনে মৌন হইয়া রহিলেন।

শেষে আর একটা শ্রান্তিভারাক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, 'দেখ দীনবন্ধু, আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি। কিন্তু সে জন্য তো ভাবি না, শুধু এই ভয় হয়, মেয়েটার কোন বিধি-ব্যবস্থা না করেই যদি মরে যাই। তুমি দেখো দীনবন্ধু। জান তো. তুমি ছাড়া আমার আপনার বলবার কেউ নেই।'

মৃদু তিরস্কারের সুরে দীনবন্ধু বলিলেন, 'এ সব আপনি কী যা তা বলছেন! শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে, তারপর মানসিক ক্লেশেরও অভাব নেই, তাই যত সব বাজে কথা মনে আসছে। ও চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন— এখনও দীর্ঘ জীবন আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে—আমি তো ও সব ভাবনা এখনও মনে আনতে পারি না, আর আপনি আমার চেয়ে কতই বা বড় হবেন? বড় জোর দু'-তিন বছরের! এরি মধ্যে ও সব দুশ্চিন্তা কেন? শুধু রেলে ঘুরে ঘুরে শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছে বৈ তো নয়, দু'দিন পরে আবার দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।'

বিনয়বাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তাই হবে বোধ হয়। ঘুরে বেড়ানোও তা কম হয়নি। তার ওপর সুহাসের জন্য মনটা সর্বদাই—'

'মৃত্যুর কথা ভাবলেই মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনা হয়। ও সব কথা যাক। আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজ আর কাজ নেই, কাল থেকে আবার আমাদের পুরনো ঈভনিং ওয়াক আরম্ভ করা যাবে। এখন বরঞ্চ আপনি কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করে নিন গে।' বলিয়া দীনবন্ধু সুহাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুহাস আসিলে বিনয়বাবু তাহার সঙ্গে দোতলায় নিজের শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলেন।

দীনবন্ধু আরও কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিলেন, তারপর লাঠিটা তুলিয়া লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই মৃদু কণ্ঠের 'কাকাবাবু' শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী কখন নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'সুহাস-মায়ী! কী মা?'

সুহাসিনী তাঁহার চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল দেখা গেল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে যেন কথাগুলা গুনিয়া গুনিয়া বলিল, 'কাকাবাবু, আপনার কি মনে হয় আমি ভুল করেছি?'

প্রথমে দীনবন্ধু প্রশ্নটা ঠিক ধরিতে পারিলেন না, তারপর বুঝিতে পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ মা, ভুল করেছ। বড্ড ভুল করেছ।'

সুহাসের নিকট হইতে অস্ফুট শব্দ আসিল, 'কিন্তু—'

দীনবন্ধু বলিলেন, 'ওর মধ্যে কিন্তু নেই, সুহাস। ভালবাসা আর বিশ্বাস—এ দুটো জিনিস আলাদা করা যায় না। তুমি আলাদা করবার চেষ্টা করেছিলে, তাই আজ এত কষ্ট পাচ্ছ। ভেবে দেখ, আমরা তো আদালত নই যে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তবে যাকে ভালবাসি তাকে বিশ্বাস করব। আর, ওর বিরুদ্ধে তুমি যে প্রমাণ পেয়েছিলে. আমিও তো তাই পেয়েছিলুম। কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না কেন?'

সুহাসিনী রুদ্ধনিশ্বাসে নীরব হইয়া রহিল।

দীনবন্ধু বলিতে লাগিলেন, 'আমি জানি, কিশোর কখনও ও কাজ করতে পারে না, তাই হাজার প্রমাণেও আমাকে টলাতে পারেনি। মা, তুমি ছেলেমানুষ, কিন্তু আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে, জীবনের অভিজ্ঞতাও কম সঞ্চয় করিনি। আমি জানি মানুষের চেয়েও তার বিরুদ্ধে প্রমাণকে যারা বিশ্বাস করে, শেষ পর্যন্ত তাদের ঠকতে হয়। কিশোরকে আমি চিনি, তাই যদি তাকে স্বচক্ষে ব্যভিচার করতে দেখি, তবু আমি আমার চোখকেই অবিশ্বাস করব, তাকে অবিশ্বাস করতে পারব না।'

'কিন্তু কাকা—'

দীনবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'থাক সুহাস, আর নয়। বিশ্বাস কাউকে জোর করে করানো যায় না, আমিও সে চেষ্টা করব না; আমি শুধু নিজের বিশ্বাসের কথা তোমায় বললুম। কিশোরকে আমি ভালবাসি, তাই আমি তাকে বিশ্বাস করি। আর ঐ মেয়েটি —বিমলা, ওকেও আমি ভালবাসতে শিখেছি। আমি জানি ওদের ভিতরের সম্বন্ধ ভাই-বোনের মত পবিত্র। না, তার চেয়েও বেশী, কারণ ওদের মধ্যে সত্যিকারের কোন সম্বন্ধ নেই। যে যাই বলুক, ওদের বিষয়ে কোনও কুৎসাই আমি কোন দিন বিশ্বাস করতে পারব না।'

একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'ওদের ওপর আমার কতখানি আস্থা তা তোমাকে বোঝানো শক্ত। আমার যদি নিজের মেয়ে থাকত, আমি তাকে কিশোরের হাতে দিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতুম।' এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দীনবন্ধুবাবুর শেষ কথাগুলির মধ্যে যে কতখানি অভিমান নিহিত ছিল তাহা সুহাসিনী বুঝিল। তাহার বুক ছিঁড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। দু'হাতে মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া সে দীনবন্ধুবাবুর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কাশীতে করবীর সহিত দেখা হইবার পর তাহার নিম্নাভিমুখী মন ধাক্কা খাইয়া ভিন্ন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সন্দেহের বিষ এমনই মারাত্মক বস্তু যে, একবার কোনক্রমে মনকে আশ্রয় করিলে সেখান হইতে তাহাকে তাড়ানো অতিবড় চিত্তবলশালী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তাই দীনবন্ধুবাবুর কুণ্ঠাহীন বিচারহীন বিশ্বাসের কথা শুনিয়াও তাহার মন শান্তি পাইল না, বরঞ্চ অনিশ্চয়তার যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

২৩

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন সকালে কিশোর বিমলাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল।

গাড়িতে সারারাত্রি বসিয়া আসিতে হইয়াছে। হাওড়া স্টেশনেও দারুণ ভিড়; মানুষ ও মোটঘাট ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেই দীনবন্ধুবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি ট্রেন ধরিবার জন্য লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে ছুটিতেছিলেন, কিশোরকে দেখিতে পাইয়া দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'কি হে, খবর সব ভাল তো?—বর্ধমান যাচ্ছি, আর সময় নেই, টিকিট কিনতে হবে—তোমাদের ওদিকটাতে গোলমাল বেধেছে, সাবধানে থেকো—'

কিশোর চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসের গোলমাল?'

'কাগজে পড়নি?—দাঙ্গা—সাবধানে থেকো, আমি চললুম, সময় নেই—কাল সকালেই ফিরব—' বলিতে বলিতে তিনি প্রবহমান জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া

গেলেন।

কিশোর ব্যাপারটা ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, গত কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়িবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। সে চিন্তিতমুখে ট্যাক্সিতে উঠিল। পথে হ্যারিসন রোডের মোড়ের উপর একখানা বাঙলা দৈনিক কিনিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতে বড় বড় অক্ষরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ চোখে পড়িল। গত তিন দিন ধরিয়া এই নৃশংস আত্মঘাতী অনুষ্ঠান চলিতেছে, মেছুয়াবাজার ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের চৌমাথাকে কেন্দ্র করিয়া শহরের ঐ প্রান্তটাতেই ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেল্লা হইতে মিলিটারি আসিয়া মেশিনগান ইত্যাদির সাহায্যে মোড়ে মোড়ে পাহারা দিতেছে বটে, কিন্তু খুন-জখম তাহাতে কিছুমাত্র কমে নাই। কাগজে উভয় সম্প্রদায়ের হতাহত ব্যক্তির দীর্ঘ তালিকা বাহির হইয়াছে।

বিমলা গলা বাড়াইয়া কাগজখানা দেখিতেছিল, সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো, এ জিনিস তো বাঙলা দেশে কখনও ছিল না।'

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ইংরেজ বাহাদুর স্বায়ত্ত শাসনের যে প্রথম কিস্তি আমাদের দিয়েছেন, এটা তারই অনিবার্য ফল।'

বাড়ি পেঁছিয়া তাহারা দেখিল, পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ। বেলা প্রায় আটটা বাজে, কিন্তু এখনও রাস্তায় জনমানব নাই। কিশোরের বাসার সম্মুখে কিছুদূরে একটা চায়ের দোকান ছিল—প্রত্যহ সন্ধ্যায় সকালে সেখানে বহুলোকের সমাগম হইত—সেটার দরজায় তালা লাগানো। আশেপাশেব বাড়িগুলো যতদূর দেখা গেল, সব দরজা জানালা বন্ধ। একটা আশঙ্কাপূর্ণ থমথমে ভাব যেন চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

ক্রমে বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, নিকটে দূরে চারিদিক হইতে একটা সোরগোল ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক এক দল উন্মত্তপ্রায় লোক চীৎকার করিতে করিতে লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া রাস্তাব একদিক হইতে অন্যদিকে ছুটিয়া গিয়া—বোধ করি গোরার তাড়া খাইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে আবার ফিরিয়া পলাইতেছে। অনতিদূরে ফুটপাথের উপর একটা স্থানে খানিকটা রক্ত জমিয়া শুকাইয়া ছিল; বোধ হয় আগের দিন কোন হতভাগ্য ছুরির আঘাতে ঐখানে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। জনহীন পথের উপর ঐ দাগটি যেন ধরিত্রীর বুকের উপর একটা দগদগে ক্ষতের মত দেখাইতেছে। কিশোর দোতলার জানালায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমলা এক হাতে একখানা আসন ও অন্য হাতে রেকাবিতে করিয়া খানিকটা গরম হালুয়া আনিয়া কিশোরের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, 'তোমাকে আজ যে কী খেতে দেব তা জানি না। ঝিও আসেনি।'

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'ঘরে কি কিছু নেই?'

'শুধু চাল আর ডাল।'

'ওতেই হবে।—যে রকম কাণ্ড দেখছি, বাজার-হাট কিছুই বসবে না। তা ছাড়া বাড়ি থেকে বার হওয়াও তো অসম্ভব।'

'না, না, বাড়ি থেকে বার হবে আবার কী! কোনও রকমে প্রাণে প্রাণে এসে পেঁছতে পেরেছি, এই ঢের। খাও—জল আনি।'

কিশোর খাইতে বসিল। জলের গেলাস আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বিমলাও মাটিতে বসিল। আস্তে আস্তে বলিল, 'ওঁরাও এসেছেন।'

'কারা?'—কিশোর চমকিয়া মুখ তুলিল।

বিমলা আঙুল দিয়া পাশের বাড়ির দিকে দেখাইয়া বলিল, 'ওপরের ঘরের জানালা একটা খোলা ছিল, তাই জানতে পারলুম। কিন্তু সাড়া-শব্দ কিছু পেলুম না।'

কিশোর কোন কথা বলিল না, মুখ গুঁজিয়া আহার করিতে লাগিল। বিমলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'কেমন আছে সব কে জানে।'

দ্বিপ্রহরে নামমাত্র আহার করিয়া কিশোর নিজের ল্যাবরেটরি ঘরটার ধুলো ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কাজে তাহার মন বসিতেছিল না, পাশের বাড়িতে উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে এই কথাটাই বার বার মনে পড়িয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া দিতেছিল। এমন সময় বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো, বিনয়বাবুর বোধ হয় খুব অসুখ।'

কিশোর একবার চকিতের জন্য মুখ ফিরাইয়া আবার ঝাড়ন দিয়া একটি কাচের যন্ত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, 'কী করে জানলে?'

'নীচের ঘরে সুহাস দারোয়ানটাকে ওষুধ আনতে দিচ্ছিল—শুনতে পেলুম। কিন্তু দারোয়ানটা কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। সব কথা তো ভাল শোনা গেল না, শুধু সুহাস মিনতি করে বলছিল—'একবারটি যাও, তোমায় দশ টাকা বকশিশ দেব, ওষুধ না এলে বাবুকে বাঁচানো যাবে না।' দারোয়ানটা কেবলই 'নেহি মাইজী' 'নেহি মাইজী' বলছিল—'

'বাড়িতে কি আর কেউ নেই?'

'কী জানি, আর তো কারুর গলা পেলুম না।'

কিছুক্ষণ কিশোর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাতের ঝাড়নটা ফেলিয়া দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। উৎকণ্ঠিত বিমলা বলিল, 'ও কি, কোথায় চললে, ঠাকুরপো?'

'দেখি যদি কিছু করতে পারি—' বলিয়া কিশোর নামিয়া গেল।

সদর-দরজা খুলিয়া বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় বিমলা পশ্চাৎ হইতে বলিল, 'একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো, আমিও যাচ্ছি।'

সে সময় রাস্তা খালি ছিল, দু'জনে বিনয়বাবুর বাড়ির সম্মুখে গিয়া কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া গেল। দারোয়ানটার পাশ কাটাইয়া বিমলা আগে প্রবেশ করিল, কিশোর তাহার পশ্চাতে ঢুকিল।

সুহাসিনী কালিমালিপ্ত মুখে নির্জীবের মত ঘরের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া কী ভাবিতেছিল, দু'জনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যেন ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিল। বিমলা দ্রুতপদে তাহার দিকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হয়েছে, সুহাস? বাবার অসুখ করেছে?'

বুদ্ধিভ্রষ্টের মত সুহাস নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

বিমলা বলিল, 'কোথায় আছেন তিনি?—ওপরে?'

সুহাস হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া নিকটের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল। বিমলা তাহার পাশে বসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'কেঁদো না। কী হয়েছে আগে আমাদেব ভাল করে বলো।'

সুহাস চক্ষু মার্জনা করিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, 'কাল থেকে বাবার হাঁপানির ব্যথা উঠেছে, কিছুতেই কমছে না। ডাক্তারের কাছে খবর পাঠাতে পারছি না। আমি একলা, বাড়িতে দুটো চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। যে ওষুধটা খেলে বাবার হাঁপানির ব্যথা কমে, সেটাও কাল রাত্তিরে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কেউ ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে রাজী হচ্ছে না—' সুহাসিনী আঁচলে চোখ মুছিল।

কিশোর দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, নিমেষের জন্য বিমলার সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। বিমলা তাড়াতাড়ি সুহাসের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কিন্তু ওষুধ না আনলেই যখন নয়, তখন দারোয়ান যাবে না কেন? মরণ-বাঁচনের কথা—আর ডাক্তার-খানাও তো বেশী দূরে নয়—'

সুহাসিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ওরা যেতে চাচ্ছে না—বলছে বাড়ি থেকে বেরুলেই ওদের ছুরি মারবে।'

বিমলা আর কিছু বলিতে পারিল না; নিজে প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ বাঁচাইতে যদি কেহ রাজী না হয়, তাহাকে কী বলা যাইতে পারে!

কিশোর এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, 'ওষুধের নামটা কী?'

সুহাসিনী অদূরে টী-পাইয়ের উপর একটা খালি শিশি দেখাইয়া বিড়বিড় স্বরে কহিল, 'ওর গায়ে লেখা আছে, পেটেন্ট ওষুধ।'

কিশোর শিশিটা তুলিয়া লইয়া বিমলাকে বলিল, 'বৌদি, তুমি বোসো আমি এখনই আসছি।'

বিবর্ণ মুখে বিমলা বলিয়া উঠিল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, ঠাকুরপো—'

'এখনই ফিরব। কাছেই ডিস্‌পেন্সারি—কোনও ভয় নেই।' বলিয়া কিশোর নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দুজনে চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর সুহাসিনী জলে মজ্জমান ব্যক্তির মত সজোরে বিমলার একটা হাত চাপিয়া ধরিল। এইভাবে প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

বাহির হইতে কখনও অখণ্ড নিস্তব্ধতা, কখনও বা বহুকণ্ঠের দূরাগত চীৎকার আসিতে লাগিল। অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল।

একবার সুহাসিনী কম্পিত অধরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার ভয় করছে না?'

বিমলা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিল, 'আমার ভয় করছে বৈকি, সুহাস। গেলে যে আমারই যাবে, আর তো কারুর যাবে না।'

তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় কঠিন শুনাইল। সুহাসিনী নতমুখে বসিয়া রহিল, আর কোন কথা বলিল না।

হঠাৎ বাহিরের দরজার উপর একটা গুরুভার পতনের শব্দে চমকিয়া দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল; তারপর বিমলা ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া ধরিল, সুহাসিনীও তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়া কিশোর বসিয়া ছিল, দরজা খুলিতেই ঢলিয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল। জামার বুকে রক্ত, মুখে রক্ত, মাথার চুলে রক্ত মাখামাখি—কিশোরকে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া বিমলা কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার এই সর্বনাশ করতেই কি তুমি বেরিয়েছিলে, ঠাকুরপো?'

বিমলার কণ্ঠস্বরে কিশোর চোখ মেলিয়া চাহিল, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, 'ওষুধ এনেছি' বলিয়া শিশিসুদ্ধ একটা কম্পমান হাত তুলিয়া ধরিল।

দুটি নারী তখন বহুকষ্টে বুকভাঙা শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার অবসন্ন দেহটা টানিয়া আনিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। জামা খুলিয়া, মাথা-মুখ ধুইয়া দিবার পর দেখা গেল, মাথায় চোট লাগিয়াছে, ঠিক মূর্ধার উপর প্রায় তিন ইঞ্চি স্থান কাটিয়া গিয়া হাড় পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। হাড়টা ভাঙিয়াছে কিনা বুঝা গেল না, কিন্তু রক্তস্রাব তখনও বন্ধ হয় নাই। বিমলা আঁচল ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিবার পর কিশোরের আচ্ছন্ন ভাব একটু কমিয়াছিল, সে সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অস্পষ্টস্বরে

বলিল, 'পেছন থেকে মাথায় লাঠি মারলে—যাবার সময় কিছু হয়নি, কিন্তু ফিরে আসবার সময়—ডিস্‌পেন্সারি থেকে বেরুতেই—মারলে। হঠাৎ—পড়ে গেলুম—তারপর এই পথটা ছুটে আসতে হাঁপিয়ে পড়লুম, নইলে লাগেনি বোধ হয় বেশী—'

ঘরের এককোণে দেয়ালে কপাল ঠেকাইয়া সুহাসিনী কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দেহটা বারবার শিহরিয়া উঠিল। বিমলা চোখ মুছিতে মুছিতে কেবল ভগবানকে মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—ঠাকুর, বুক চিরে রক্ত দেব, ভাল করে দাও।

কিশোর ক্লান্তভাবে ঘাড়টা নত করিয়া বলিল, 'মনে হচ্ছে একটু শুতে পেলে ভাল হত—'

সুহাসিনী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। একবার বুঝি একটু ইতস্তত করিল, তারপর বিমলাকে বলিল, 'আপনি ওঁকে নিয়ে ওপরে আসুন—দারোয়ান আর বদরী সাহায্য করবে। আমি বিছানা ঠিক করে রাখছি।'

সুহাসিনীর ঘরে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর বলিল, 'আঃ, এখন বেশ স্বস্তি পাচ্ছি!' শিয়রের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল, খাটের বাজু দু'হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া সুহাসিনী দাঁড়াইয়া আছে। কিশোর ম্লান হাসিয়া বলিল, 'আপনাদের কষ্ট আর অসুবিধাই ঘটালুম।'

সুহাসিনীর নিমীলিত চক্ষু দিয়া ধারার ন্যায় অশ্রু নামিয়া বুকের কাপড় ভিজা-ইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু কিশোর তাহা দেখিতে পাইল না।

'বৌদি।'

'ভাই!' নিজের আঁচল দিয়া কিশোরের কপাল ও ঘাড় হইতে রক্তের দাগ মুছিয়া লইয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বিমলা বলিল, 'কী বলছ, ঠাকুরপো?'

'মাথার হাড়টা বোধ হয় ফ্রাক্‌চার হয়নি।'

'ঠাকুর করুন, তাই যেন হয়।'

'বিনয়বাবুকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে? কেমন আছেন তিনি?'

'ভাল আছেন—এখন ঘুমুচ্ছেন।'

'আমারও যেন ঘুম পাচ্ছে—'

বিমলার বুকের ভিতরটা আবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আর একদিন স্বামীর মাথা কোলে লইয়া সে এমনই ভাবে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সেদিন তিনিও এমনি ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান! সেই পরীক্ষা কি আবার নূতন করিয়া পাঠাইয়া দিলে?

ব্যাকুলভাবে সুহাসের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, 'একটা ডাক্তার—একটা ডাক্তারও কি পাওয়া যায় না, সুহাস?'

কিশোর বলিল, 'ডাক্তারের দরকার নেই, বৌদি। বেশী রক্ত বার হয়েছে বলে একটু অবসন্ন বোধ হচ্ছে, ঘুমুলেই সেটা কেটে যাবে। ডাক্তারের চেয়ে তোমার পায়ের ধুলো একটু মাথায় দাও— ঢের বেশী কাজ হবে—'

নিমীলিত নেত্রে কিশোর একটু হাসিল।

'সত্যি বলছ ঠাকুরপো, কোন ভয় নেই? পোড়া মেয়েমানুষ—কিছুই যে বুঝতে পারি না, ভাই! কিন্তু তুমি ঠিক বুঝতে পারছ, কোন ভয় নেই?'

'বুঝতে পারছি—কোন ভয় নেই।'

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বিমলা তাহার কপালে বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তবে ঘুমোও। আমরা কাছেই রইলুম।'

'তোমরা বরং বিনয়বাবুর কাছে যাও—'

কিছুক্ষণ পরে কিশোরের নিশ্বাসের শব্দে বিমলা বুঝিল সে ঘুমাইয়াছে, তখন তাহার বুক পর্যন্ত ঢাকা দিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

শীতের বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে। অস্তম্লান সূর্যের দিকে তাকাইয়া জোড় করে বিমলা বোধ করি প্রাণের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাই দিনদেবকে নিবেদন করিতেছিল, হঠাৎ মুখ নামাইয়া দেখিল, সুহাসিনী একেবারে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

'সুহাস!'

'বৌদি!' বলিয়া সুহাসিনী তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছি ছি সুহাস, ওঠো।'

অবরুদ্ধ অশ্রুবিকৃত স্বরে সুহাস বলল, 'বৌদি, আমাকে কি তোমরা ক্ষমা করতে পারবে? আমার পাপেই আজ—' আর বলিতে পারিল না, তাহার দেহ অদমনীয় বাষ্পোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

বিমলা জোর করিয়া তাহাকে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'সুহাস, দোষ তুমি ওঁর কাছে অনেক করেছ, তাই বুঝি ভগবান আজ এই শাস্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুঃখ তুমি কম পাওনি জানি, কিন্তু ভগবানের চোখে হয়তো এখনও তোমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি। শুধু তোমার নয়, আমাদের সকলেরই আজ পরীক্ষার দিন। ক্ষমা তোমাকে করব কী সুহাস, শুধু প্রার্থনা করি তোমার ভালবাসার জোরে ওঁকে যেন যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পার।'

সুহাসের হাত ধরিয়া ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'যাও, লজ্জা কোরো না, ওঁর কাছে গিয়ে বোসো গে, ঐখানেই তোমার স্থান। আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বসছি।' বলিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল।

এক ঘণ্টা পরে বিমলা বিনয়বাবুর ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কিশোর তখনও তেমনিই পড়িয়া ঘুমাইতেছে এবং সুহাস খাটের পাশে হাঁটু গাড়িয়া কিশোরের একটা হাতের মধ্যে নিজের মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে।

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া বিমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বিনয়বাবু মারা গিয়াছেন। সে ধাক্কা সামলাইয়া গেলেও তাঁহার শরীর ভিতরে ভিতরে একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; সুহাসিনীর বিবাহের মাস কয়েক পরে তিনি কয়েক দিন মাত্র অসুখে ভুগিয়া হঠাৎ পরলোকযাত্রা করিলেন। ইদানীং তাঁহার প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিয়া জীবন উপভোগ করিবার ইচ্ছাও জাগিয়াছিল। কিন্তু যাঁহার অমোঘ আদেশের উপর আপীল চলে না, তিনি একদিন কাহাকেও কোন কৈফিয়ত না দিয়া বিনয়বাবুকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। কন্যা, জামাতা, বন্ধুবান্ধবের অসীম স্নেহ ও শুশ্রূষা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রাণোপম সুহৃদের বিয়োগে দীনবন্ধুবাবু বড়ই বেদনা পাইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কিশোর বিমলার টাকায় কাশীপুরের দিকে নূতন বাড়ি কিনিয়া সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেল। অধ্যাপকের চাকরি সে পূর্বেই ছাড়িয়া

দিয়াছিল, সেই অবধি বাড়িতে মস্ত বড় ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাল কাটাইতেছে।

রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর দুটো বড় বড় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া কিশোর ল্যাবরেটরিতে বসিয়া একমনে কাজ করিতেছিল। সুহাসিনী ঘরময় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং এটা-ওটা নাড়াচাড়া করিতেছিল। একবার কয়েকটা কাচের ছিপিযুক্ত শিশি হইতে খানিকটা তরল পদার্থ একটা টেস্টটিউবে ঢালিল, তারপর কী ভাবিয়া সেটা রাখিয়া দিল। বুনসেন বার্ণার জ্বালিয়া সেটা খুব কমাইয়া দিয়া আবার ঘরময় বেড়াইতে লাগিল। কিশোরের দিকে তাকাইয়া দেখিল সে গভীর মনঃসংযোগে কী লিখিতেছে।

তখন চুড়িগুলার শব্দ করিয়া, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া টানিয়া আবার সশব্দে পিঠে ফেলিয়া সে বলিল, 'আজ করবীর একখানা চিঠি এসেছে।'

কিশোর চিন্তা-নিমগ্ন চক্ষু একবার তুলিয়া আবার লেখার উপর নিবদ্ধ করিল। সম্ভবত কথার অর্থ তাহার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছিল না। করবীর নামোল্লেখেও তাহার মনের চটকা ভাঙিল না।

সুহাস বলিল, 'করবী লিখেছে যে, সে বরের সঙ্গে বিলেত চলল—এখন কিছুকাল সেখানেই থাকবে।'

এবার অন্যমনস্ক কিশোর চক্ষু তুলিয়া বলিল, 'ও!'

সুহাস জোরে হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'আমার একটা কথাও তোমার কানে যায়নি। কী বললুম বলো তো?'

তখন সচেতন হইয়া কিশোরও হাসিয়া বলিল, 'সত্যিই শুনতে পাইনি। কী বলছিলে?'

'কিছু না।' একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

আজ বহুদিন পরে করবীর পত্র পাইয়া তাহার মনটা অকারণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আবার তেমনিই অকারণে তাহা শান্ত হইয়া গেল।

বুনসেন বার্ণার উস্কাইয়া দিয়া সে টেস্টটিউবের তরল পদার্থটা গরম করিতে লাগিল, সেটা ফুটিয়া উঠিতেই আলোর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'ওগো দেখ, কী সুন্দর রঙ!'

কিশোর কাজ ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, 'এই হচ্ছে বুঝি! নিজেও কাজ করবে না, আমাকেও করতে দেবে না?'

সুহাস বলিল, 'যথেষ্ট কাজ হয়েছে মশায়, রাত এগারোটা বাজে, এবার শুতে চলুন।'

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার অন্য অ্যাসিস্টাণ্টটি কোথায়?'

'দিদির আজ একাদশী, তিনি শুয়ে পড়েছেন। সত্যি চল,অনেক রাত হয়ে গেল—'

'কিন্তু—তুমি বরঞ্চ এগোও,—আমি এই কাজটা সেরে নিয়েই—'

'সেটি হচ্ছে না মশায়। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি সমস্ত রাতই কাজ করে কাটিয়ে দেবে—' বলিয়া সুহাস তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ঘরের আলো নিভাইয়া দু'জনে উপরে উঠিয়া গেল। শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নাইটল্যাম্প জ্বলিতেছে, কিন্তু খোকা বিছানায় নাই।

দু'জনের একবার চোখাচোখি হইল, তারপর আবার তাহারা ঘর হইতে বাহির হইল। তেতলায় একটিমাত্র ঘর—সেটিতে বিমলা শয়ন করে। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা উপরে

গিয়া ভেজানো দরজায় কান পাতিয়া শুনিল, অস্পষ্ট কথার গুঞ্জন আসিতেছে। তখন দ্বার ঠেলিয়া দু'জনে ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে কেবল পিলসুজের উপর তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, তাহাতে দুইটি মাথা অত্যন্ত কাছাকাছি দেখা যাইতেছে।

সুহাস বলিল, 'বিদ্যুৎ! তোমার চোখে কি ঘুম নেই?'

বিদ্যুৎ চকিতে বড়মা'র গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, 'ঐ সুহাস এল, বড়মা। এখুনি আমাকে নিয়ে যাবে।'

বিমলা বলিল, 'সুহাস, ও আজ আমার কাছে শোবে।'

সুহাস বলিল, 'শুলে তো কোন কথা ছিল না দিদি, কিন্তু বকিয়ে বকিয়ে যে তোমায় পাগল করে দিলে! নে বিদ্যুৎ, ওঠ—কাল আবার গল্প শুনিস।'

বিদ্যুৎ কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, 'বড়মা—'

বিমলা বিদ্যুৎকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'না, আজ ও আমার কাছে থাক। তুই যা সুহাস, গল্প শেষ না হলে ছেলে ঘুমুবে না।'

'না, আজ একাদশী—কিছুতেই আমি তোমাকে বকতে দেব না। আর এগারোটা বাজতে চলল, ঘুমও কি ওর চোখে আসে না? বিদ্যুৎ, আয় শীগ্গির!'

বিদ্যুৎ আরও জোরে বড়মা'র গলা জড়াইয়া ধরিল। বিমলা বলিল, 'বড় জ্বালাতন করিস তুই সুহাস, গল্প শেষ না হলে যাবে কি করে শুনি? তোরা শুগে যা না বাপু!'

তক্তপোশের পাশে বসিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ গল্পটা হচ্ছে? সেই যেটাতে খোকাবাবু কালো ঘোড়ায় চড়ে বাঘ শিকার করতে যাবেন—সেইটে?'

বিমলার বুকের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া বিদ্যুৎ বলিল, 'না, সেটা নয়, তোমার বিয়ের গল্প।'

কিশোর আঁতকাইয়া উঠিল, 'অ্যাঁ—সে আবার কী!' সুহাসও তক্তপোশের অন্যদিকে বসিয়া সকৌতুকে বলিল, 'তবে আমিও একটু শুনি।'

আর ভয় নাই দেখিয়া বিদ্যুৎ সোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'আচ্ছা বড়মা, এই বাড়িটা তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছ, না?'

বিমলা বলিল, 'হ্যাঁ—তারপর শোন্—'

'আর বাবার ঘরে যে ঘড়িটা আছে—টিং—টিং করে বাজে—সেটাও আমার—না?'

'হ্যাঁ—সেটাও তোর।'

'আর সুহাসের ঘরে যে গ্রামোফোন—সেটাও আমার?'

'সেটাও তোর—সব তোর।'

বিদ্যুৎ নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া বলিল, 'এবার বলো।'

বিমলা তাহার ক্ষুদ্র দেহটি কাছে টানিয়া লইয়া আরম্ভ করিল, 'তারপর বুঝেছিস বিদ্যুৎ, আমি আর সুহাস তোর বাবাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিলুম। তোর বাবার গায়ে রক্ত, মাথায় রক্ত,—তাই দেখে তোর মা কাঁদতে লাগল, আমিও খুব কাঁদতে লাগলুম। তারপর তোর মা'র বিছানায় নিয়ে গিয়ে তোর বাবাকে শুইয়ে দিতেই তোর বাবা ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত সে ঘুম ভাঙল না, আর তোর মা সমস্ত রাত একলাটি জেগে বসে রইল—'

লুকাইয়া চোখের জল মুছিয়া সুহাস আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির মাথার কাছে দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ পরে কিশোর তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে সজল-নয়নে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নিজের মাথাটা তাহার বুকের উপর রাখিল,

একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'উঃ, কী দিনই গিয়েছে—ভাবলে যেন জ্ঞান থাকে না।'

কিশোর দুই বাহু দিয়া সজোরে তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া ধরিল। তারপর দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নীরবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

ডিটেকটিভ

চরিত্র

অনন্ত চৌধুরী	...	তরুণ জমিদার
বলাই	...	অনন্তর কর্মচারী
জগদীশ	...	জমিদার; অনন্তর পিতৃবন্ধু
সমরেশ নাগ	...	তোতলা যুবক; নলিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
হীরেন্দ্র	...	ব্রাহ্ম ভদ্রলোক

ভদ্রলোক, কয়েকজন বেদে, কাবুলীওয়ালা

বিমলা	...	অনন্তর মাতা
সুরমা	...	অনন্তর সধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী
কেয়া	...	হীরেন্দ্রের পালিতা কন্যা
নলিনী	...	কেয়ার সমবয়স্কা সখী
হিরণ্ময়ী	...	হীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী

বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, কয়েকজন বেদেনী

প্রস্তাবনা

একটি সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুম। বেলা আন্দাজ চারিটা। খোলা জানালা দিয়া গ্রাম্য বহিঃপ্রকৃতি দেখা যাইতেছে। গ্রামের জমিদার এবং এই গৃহের মালিক শ্রীমান অনন্ত চৌধুরী জানালার ধারে একটা কৌচে বক্রভাবে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে উত্তেজিতভাবে হাত ছুঁড়িতেছে। তাহার চেহারা ভাল, গোঁফদাড়ি কামানো; বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর। একটা নির্বাপিত পাইপ তাহার ঠোঁটের কোণ হইতে ঝুলিতেছে।

ঘরের অন্য কোণে দুইটি চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া বিমলা দেবী ও সুরমা মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছেন। সুরমার হাতে সেলাই

সুরমা। এবার অন্তুর বিয়ে দাও মা। এম. এ. পাস করলে, চব্বিশ বছর বয়স হল, আর কি! আমাদের ঘরে অতবড় আইবুড়ো ছেলে মানায় না। লোকে নানান কথা কইতে আরম্ভ করবে। উনি বলছিলেন, জমিদার-বংশের ছেলে, তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলে কোন্ দিন কি করে বসবে।

বিমলা। আমি কি তা বুঝি না মা! কিন্তু হলে হবে কি, ছেলে যে আস্ত পাগল, বিয়ের কথা তুললেই হাত-পা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। জানিস তো ওকে।

সুরমা। কি, বলে কি? বিয়ে করবে নাই বা কেন?

বিমলা। কি যে বলে, তার আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। বলে, জীবনে কাজ আছে, শুধু বিয়ে করলেই চলে না। আমি তো বুঝি না মা, এত কাজই বা কিসের! পড়াশুনো করবার ইচ্ছে ছিল, বেশ তো, এম. এ. পাস করলি, এবার বিয়ে-থা কর, বাপ-পিতমোর সম্পত্তি ভোগ-জাত কর। তা নয়—কাজ! আর কি কাজ করবি, তাও না হয় খুলে বল। তা বলবে না, কেবল ঐ বইগুলো রাতদিন মুখ গুঁজে পড়বে। কি যে ওতে আছে আমার পিণ্ডি!

সুরমা। ওগুলো তো ডিটেকটিভ উপন্যাস, কেবল খুনজখম জালজোচ্চুরি—এই সব। আজকাল বাংলাতেও বেরিয়েছে। ছাই, আমার একটুও ভাল লাগে না।

অনন্ত। (নিজমনে উত্তেজিত কণ্ঠে) সাবধান, এক পা যদি এগিয়েছ—

বিমলা। ওই শোন, নিজের মনেই বকছে। শেষে ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে না তো?

সুরমা। না মা, বই পড়ে কি তা হয়! অন্তু ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম একটুতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, একেবারে ছেলেমানুষ তো। কিন্তু এবার ওর বিয়ে দেওয়া দরকার, তা আমি বলে দিলুম বাপু।

বিমলা। তা কি আমার অসাধ? জয়নগরের জমিদার শশী হালদার তো মেয়ে নিয়ে মুকিয়ে বসে আছে, মুখের কথা খসাতে যা দেরি, কিন্তু ছেলে যে ও কথায় কানই দেবে না।

অনন্ত। (হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া) খবরদার! দিদি, হ্যাণ্ড্স আপ।

সুরমা। সে আবার কি?

অনন্ত। কোন কথা নয়, মাথার ওপর হাত তোল, নইলে এখুনি গুলি ছুঁড়ব।

(পাইপ দিয়া বন্দুকের মত নির্দেশ করিল)

সুরমা। পাগলামি করিসনি অন্তু।

অনন্ত। পাগলামি নয়, শিগ্‌গির মাথার ওপর হাত রাখ, নইলে নিশ্চয় মৃত্যু। রাখলে না? তবে গেল—গেল, ওয়ান—টু—

সুরমা। নে বাপু, পারি না তোর জ্বালায়। (মাথায় হস্ত রাখিয়া) কি হল এতে?

অনন্ত। এবার সত্যি কথা বল, কি ষড়যন্ত্র করছিলে আমার বিরুদ্ধে?

সুরমা। ষড়যন্ত্র আবার কি! তোর এবার বিয়ে দেব, তারই ব্যবস্থা করছিলুম। বিয়ে না দিলে তুই সত্যিই পাগল হয়ে যাবি।

অনন্ত। বিয়ে! (হাস্য) এবার হাত নামাতে পার। দিদি, আজ পর্যন্ত কখনও দেখেছ, ডিটেকটিভ বিয়ে করেছে? জগতের কোনও ভাল ডিটেকটিভ কখনও বিয়ে করেনি, তারা চিরকুমার।

সুরমা। তা হোক না তারা চিরকুমার। তুই তো আর ডিটেকটিভ ন'স, তুই বিয়ে করবি না কেন?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিভ নই? দিদি, তুমি জান না, আমার মত দিগ্বিজয়ী ডিটেকটিভ বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই। বলে দেব, কি দিয়ে আজ তুমি ভাত খেয়েছ? তবে শোন—মুগের ডাল, এঁচড়ের ডালনা, রুইমাছ ভাজা, কৈমাছের ঝাল—

সুরমা। আহা, কি শক্ত কথাই বললেন! নিজে যা দিয়ে ভাত খেয়েছিস, সেগুলো আউড়ে গেলি।

অনন্ত। আচ্ছা বেশ, তুমি কোন্ তেল মেখে চুল বেঁধেছ বলে দেব? (মস্তক আঘ্রাণ-পূর্বক) জবাকুসুম। কেমন, এবার হয়েছে? মা, আমি কি কাজ করব, ঠিক করে ফেলেছি।

বিমলা। কি কাজ করবি?

অনন্ত। আমি ডিটেকটিভ হব, কলকাতায় মস্ত আপিস করব।

সুরমা। আ পোড়া কপাল! এত লেখাপড়া শিখে শেষে এই কাজ করবি? লোকে হাসবে যে।

অনন্ত। (চক্ষু পাকাইয়া) হাসবে! হাসুক তো দেখি কার কতখানি ক্ষমতা! (পরিক্রমণ করিয়া) বলাই! বলাই!

(বলাই প্রবেশ করিল। সে অনন্তর অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয়পাত্র।
বয়ঃক্রম চল্লিশ, মোটা বেঁটে, মুখ ভাবলেশহীন)

বলাই। আজ্ঞে।

অনন্ত। (কটমট করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া) বলাই, আমি ডিটেকটিভ হব, তোমার হাসি পাচ্ছে?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে একটুও হাসি পাচ্ছে না।

অনন্ত। ডিটেকটিভের কাজ হচ্ছে মানুষের দুঃখ দূর করা। আমি সেই কাজ করতে যাচ্ছি, বুঝতে পারছ?

বলাই। আজ্ঞে, পারছি।'

অনন্ত। হাসি পাচ্ছে না?

বলাই। আজ্ঞে, উঁহু।

(মস্তক সঞ্চালন)

অনন্ত। বেশ, যাও।

(বলাইয়ের প্রস্থান)

দিদি দেখলে?

সুরমা। যা ইচ্ছে কর বাপু, আমি আর তোর সঙ্গে পাগলামি করতে পারি না।

(গমনোদ্যতা)

অনন্ত। হুঁ হুঁ দাঁড়াও, তুমি কার জন্যে জামা তৈরি করছ বলে দেব? এক কথায় বলে দিতে পারি। ডিডাক্‌শন—বুঝলে—ডিডাক্‌শন।

সুরমা। আচ্ছা, বল তো দেখি।

অনন্ত। (কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিল, নিজ মস্তকে টোকা মারিল) জামাই-বাবুর জন্যে। ঠিক বলেছি কি না?

সুরমা। (অর্ধসমাপ্ত লাল রঙের ফ্রক তুলিয়া ধরিয়া) যা বলেছিস, তোর জামাইবাবুর এখন লাল ফ্রক পরারই তো বয়স।

(হাস্য)

অনন্ত। (বিস্মিতভাবে) অ্যাঁ! ওটা ফ্রক নাকি! সেই জন্যেই মন খুঁতখুঁত করছিল। আচ্ছা, এবার বলে দিচ্ছি—

(বাহিরে মোটরের শব্দ শুনা গেল)

সুরমা। আর বলতে হবে না। কে বুঝি এল। মা, চল, আমরা ভেতরে যাই।

অনন্ত। দাঁড়াও, যেতে হবে না। কে এসেছে, আমি শুধু মোটরের শব্দ শুনে বলে দিচ্ছি।

(চক্ষু মুদিয়া নিজ মনে)

দিদি, জামাইবাবু তোমাকে দেখতে এসেছেন।

(বৃদ্ধ জগদীশবাবু প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে বলাই)

(চক্ষু মুদিয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক) আসুন জামাইবাবু।

সুরমা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া অনন্তকে ঠেলা দিয়া) দূর হতভাগা! চোখ খুলে দেখ। আসুন কাকাবাবু।

(আগন্তুককে প্রণাম করিল। বিমলা ঘোমটা দিয়া প্রস্থান করিলেন)

অনন্ত। (চক্ষু খুলিয়া) এ হে হে, ভারি ভুল হয়ে গেছে। তাই মনটা খুঁতখুঁত করছিল। বসুন কাকাবাবু।

(প্রণাম করিল। জগদীশবাবু উপবিষ্ট হইলেন)

সুরমা। কতদিন পরে কাকাবাবুকে দেখলুম। শরীর বেশ ভাল আছে? কাকিমা ভাল আছেন?

জগদীশ। আর মা, আমাদের আবার ভাল থাকা! আমি তো তবু উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি, তোমার কাকিমা একেবারে শয্যা নিয়েছেন। জান তো সবই তোমরা।

সুরমা। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জানি বইকি কাকাবাবু।

(কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ রহিলেন)

জগদীশ। অনন্ত এম. এ. পাস করেছে খবরটা পেয়ে অনেক দিনের একটা পুরোনো স্মৃতি আজ মনে জেগে উঠল, তাই ছুটে এলাম, যদি তোমাদের দেখে প্রাণে একটু সান্ত্বনা পাই।

সুরমা। কি কথা কাকাবাবু?

জগদীশ। তোমরা তো জান না মা, তোমাদের বাবার সঙ্গে আমার কি রকম অসাধারণ সম্প্রীতি ছিল। শুধু যে মুখে তাঁকে 'দাদা' বলে ডাকতুম তা নয়, সত্যিই অগ্রজের মত ভক্তি করতুম। লোকে আমাদের দেখে বলত, আর-জন্মে এঁরা সহোদর ছিলেন।

অনন্ত। সেটা বলা একেবারেই অসম্ভব। আর-জন্মে আপনারা সহোদর ভাই ছিলেন কিংবা ইয়ে শালা-ভগ্নীপতি ছিলেন—এ কথা স্বয়ং শার্লক হোম্‌সও বলতে

পারতেন না।

সুরমা। অন্তু, থাম তুই।

অনন্ত। আর আমি যে একটা বিশ্ববিজয়ী ডিটেকটিভ, আমিও পারি না।

সুরমা। তুই থামবি কি না? তারপর বলুন কাকাবাবু।

জগদীশ। তোমার বাবার আর আমার দু'জনেরই ইচ্ছে ছিল, আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে সত্যিকারের একটা সম্বন্ধ ঘটে। মহামায়া আমার কোথায় চলে গেছে; কিন্তু যেদিন সে জন্মাল সেদিন দুই পরিবারে উৎসবের ঘটা পড়ে গেল। অনন্তর বয়স তখন ছ-সাত বছর, ঠিক হল অনন্ত এম. এ. পাস করার পর প্রথম লগ্নে ওদের বিয়ে হবে।

অনন্ত। আমার বিয়ে? ডিটেকটিভের বিয়ে?

জগদীশ। তারপর মহামায়ার যখন চার বছর বয়স, তখন তাকে হারালাম, আর বছর দুই যেতে না যেতেই দাদাও স্বর্গে গেলেন।

(তাঁহার কণ্ঠস্বর গভীর হতাশার মধ্যে মিলাইয়া গেল)

সুরমা। মহামায়ার কোনও খবরই কি পাওয়া গেল না?

জগদীশ। না মা, কোনও খবরই পাওয়া গেল না। সে ম'রে গেছে এ খবরটাও যদি পেতুম, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।

সুরমা। ও কথা বলবেন না কাকাবাবু, মহামায়া নিশ্চয় বেঁচে আছে, হয়তো ভাল-ভাবেই আছে।

জগদীশ। সেইটেই যে ভরসা করতে পারছি না মা। যদি বেঁচে থাকে, হয়তো এমন অবস্থায় আছে যে বাপ হয়ে সে কথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। তার চেয়ে তার ম'রে যাওয়াই ভাল।

সুরমা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) ভগবান কি এমনই করবেন?

জগদীশ। সেই কথাই মাঝে মাঝে ভাবি। জ্ঞানত কখনও কোনও পাপ কাজ করিনি; তবে ভগবান আমাকে এমন শাস্তি দেবেন কেন? খোঁজবারও তো ত্রুটি করিনি, দেশ তোলপাড় করে ফেলেছি। যে আমার মেয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে বিশ হাজার টাকা দেব বলে ঘোষণা করেছি।

অনন্ত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না?

জগদীশ। না বাবা, কিছুতেই কিছু হল না। চোদ্দ বছরের প্রাণপণ চেষ্টা—

অনন্ত। নিষ্ফল। হ'তেই হবে, এ তো জানা কথা কাকাবাবু। বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলে যদি মেয়ে পাওয়া যেত, তাহলে শার্লক হোম্‌স, রবার্ট ব্লেক, অনন্ত চৌধুরী—এদের জন্মাবার দরকার হত না। তা হয় না কাকাবাবু, তা হয় না। যার কাজ তাকে দিতে হবে, অর্থাৎ যার কর্ম তারে সাজে—এ° এ°— বলাই!

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে অন্যালোকের লাঠি বাজে।

অনন্ত। ঠিক, ঐ কথাটা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। (বলাইকে) তুমি এখন বাইরে যাও।

(বলাইয়ের প্রস্থান)

হ্যাঁ, তারপর কি কথা হচ্ছিল? আপনার মেয়ে হারিয়ে গেছে, আর তাকে খুঁজে বার করতে পারছেন না। বেশ, এখন আমি যে প্রস্তাব করছি শুনুন। আমি ডিটেকটিভ, আমি আপনার মেয়ে মহামায়াকে খুঁজে বার করে দেব।

জগদীশ। (কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিবার পর) অনন্ত, তুমি তোমার

বংশের উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু এখন আর তা পারবে না বাবা। আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করিনি, এতদিন পরে আর তাকে খুঁজে বার করা যাবে না। তুমি ছেলে-মানুষ, তোমার প্রাণে উদ্দীপনা আছে—

অনন্ত। পারব পারব পারব। জানেন, আমি জীবনের ব্রত গ্রহণ করেছি—ডিটেকটিভ হব। তিন মাসের মধ্যে আমি তাকে খুঁজে বার করব, এই প্রতিজ্ঞা করলুম। যদি না পারি, তাহলে—তাহলে—আমার জমিদারী আমি বিলিয়ে দেব।

জগদীশ। অনন্ত, কি বলছিস তুই?

অনন্ত। মরদকা বাত হাঁথীকা দাঁত। কথার নড়চড় হবে না, তিন মাসের মধ্যে আপনি মেয়ে ফিরে পাবেন—লিখে রেখে দিন।

জগদীশ। অনন্ত, তুই যে আমার প্রাণে আবার আশা জাগিয়ে তুলছিস।

অনন্ত। আলবৎ তুলছি, একশোবার তুলছি, এবং শেষ পর্যন্ত খাড়া করে রাখব।

জগদীশ। অনন্ত, বাবা—(ক্রন্দন)

অনন্ত। না না, কান্নাকাটি নয়। আমি ডিটেকটিভ, আপনি আমার মক্কেল। স্ট্রিক্‌টলি বিজ্‌নেস, এর মধ্যে কান্নাকাটি করলে চলবে না। দিদি, অশ্রু সম্বরণ কর।

জগদীশ। সুরমা, ও কি সত্যিই পারবে?

সুরমা। পারবে কাকাবাবু। (সগর্বে) অন্তু আজ পর্যন্ত কোন কাজেই ফেল হয়নি।

জগদীশ। যদি পারিস অনন্ত, কি আর বলব, আমার যা আছে সব তোর।

অনন্ত। ও চলবে না। বিজ্‌নেস ইজ বিজ্‌নেস। বিশ হাজার টাকার এক কানাকড়ি বেশী নয়। আচ্ছা, এবার তবে কাজের কথা আরম্ভ হোক। মহামায়া যখন হারিয়ে যায় তখন আমার বয়স কম, সব কথা ভাল মনে নেই। আপনি গোড়া থেকে সমস্ত ইতিহাস আর একবার বলুন।

(নোটবুক ও পেন্সিল বাহির করিয়া বসিল। জগদীশবাবু কপালের উপর দিয়া একবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন।)

জগদীশ। বলার আর আছে কি? ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। অর্ধোদয় যোগে কলকাতায় গিয়েছিলুম—আমি, আমার স্ত্রী আর মহামায়া। স্নানের দিন ঘাটে স্নান করতে গেলুম—

অনন্ত। একটা কথা। কতদিন আগে?

জগদীশ। আজ থেকে পনেরো বছর।

অনন্ত। মহামায়ার তখন বয়স কত?

জগদীশ। চার বছর।

অনন্ত। তাহলে এখন তার বয়স—পনেরো আর চারে উনিশ বছর।

জগদীশ। হ্যাঁ, যদি সে বেঁচে থাকে।

অনন্ত। নির্ঘাত বেঁচে আছে। আচ্ছা, বলুন দেখি, মহামায়া দেখতে কেমন ছিল।

জগদীশ। খুব সুন্দর ছিল। আমার দুর্গাপ্রতিমার মত মেয়ে।

অনন্ত। দুর্গাপ্রতিমা? (নোট করিয়া) আচ্ছা বেশ, তার গায়ে কি কি ছিল? বুঝছেন না? এসব দরকার। ভাল ডিটেকটিভ কেবল একটু চুলের ডগা দেখে বলে দিতে পারে। কি বলতে পারে—বলাই! বলাই!

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে বলে দিতে পারে, মাথায় চুল আছে।

(প্রস্থান)

অনন্ত। হ্যাঁ, আমি ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। আরও অনেক জিনিস বলতে পারে,

কিন্তু সে থাক। এখন বলুন কাকাবাবু।

জগদীশ। তার গায়ে ছিল—একটি গোলাপী সিল্কের ফ্রক, হাতে চুড়ি, গলায় হার, পায়ে মল।

অনন্ত। আর কিছু?

সুরমা। আর কপালে টিপ, পায়ে আলতা, চুলে ফিতে। বোকা কোথাকার! মহামায়া এখনও তোর জন্যে সেই গোলাপী ফ্রক পরে বসে আছে?

অনন্ত। না না দিদি, ফ্রক পরে বসে থাকবে কেন? ফ্রক পরার বয়স বোধ হয় তার আর নেই। কিন্তু ডিটেকটিভের সব জানা দরকার।

(বলাই জানালা হইতে মুখ বাড়াইল)

বলাই। দিদিমণি, বোঁ বোঁ শব্দে মা আপনাকে ডাকছেন।

সুরমা। আচ্ছা। আমি আসছি কাকাবাবু।

(সুরমার প্রস্থান)

অনন্ত। আচ্ছা, এবার বলুন দেখি কাকাবাবু, মহামায়ার গায়ে কোনও স্থায়ী চিহ্ন ছিল কি না? অর্থাৎ—

(বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। এই ধরুন, একটা কান কাটা, কিংবা নাকটা—যা দেখে তাকে চিনতে পারা যায়।

জগদীশ। চিহ্ন? হ্যাঁ, ছিল। তার বাঁ পায়ের চেটোর ওপর একটা আধুলির মত লাল জড়ুল ছিল—ঠিক যেন সিঁদুরের টিপ।

অনন্ত। (নোটবুক বন্ধ করিয়া) বাস্‌, হয়ে গেছে। এবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি, তারপর তিন মাসের মধ্যে মহামায়াকে আবিষ্কার করব।

জগদীশ। অনন্ত, যদি পারিস বাবা, তাহলে আমার যথাসর্বস্ব—

অনন্ত। বাস্‌ বাস্‌, ও কথা আর নয়। বিশ হাজার টাকা। বিজ্‌নেস। তাহলে কাকাবাবু, আপনি এখন আসুন গিয়ে, আমি ইতিমধ্যে প্ল্যান অব ক্যাম্পেনটা ঠিক করে ফেলি।

(জগদীশের প্রস্থান)

(গভীর ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। সব ডিটেকটিভেরই একজন গণেশ থাকে, যে তার কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করে। আমার গণেশ কই? ঠিক হয়েছে। বলাই! বলাই!

(বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। আজ্ঞে, বিরাজপুরের হুজুর বোঁ বোঁ শব্দে চলে গেলেন।

অনন্ত। বেশ করেছেন। এখন শোন, তুমি আমার গণেশ।

বলাই। (বুঝিতে না পারিয়া) আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। কাল তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছ। সেখানে মস্ত আপিস খুলে বসব, তার নাম 'অনন্ত দুর্দর্শালয়'। আমি হব শার্লক হোম্‌স, আর তুমি হবে আমার ওয়াট্‌সন, বুঝেছ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে আমি কি হব?

অনন্ত। ওয়াট্‌সন। অর্থাৎ আমি হব রবার্ট ব্লেক, তুমি হবে আমার স্মিথ, বুঝেছ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে কি বললেন?

অনন্ত। তুমি একটা গাধা।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে বুঝেছি।

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতায় অনন্তর অফিস—'অনন্ত দুর্দর্শালয়'। আধুনিক নূতন আসবাব দ্বারা সজ্জিত। দুইটি কোচও আছে। ঘরের এক পাশে ছোট টেবিলে টাইপ-রাইটার। মধ্যস্থলে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে অনন্ত আসীন। সময় অপরাহ্ণ। অনন্ত মুখোশ লইয়া পরিধান করিল ও খুলিয়া ফেলিল

অনন্ত। নাঃ, মুখোশ চলবে না। নাক টিপে ধরে, দম আটকে আসে। তা ছাড়া এ প'রে রাস্তায় বেরুলে কুকুরে তাড়া করবে। বলাই, বলাই! ওঃ, বলাইকে তো পাঠিয়েছি আমার কুকুর, মানে টাইগারকে আনবার জন্যে, কারণ চোর-ছ্যাঁচোড়কে খুঁজে বার করার জন্যে ব্লেকের টাইগারই ছিল মহাস্ত্র।

(বলাইয়ের দ্রুত প্রবেশ)

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে টাইগারকে নিয়ে এসেছি।

অনন্ত। এনেছ বলাই? কোথায়?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে এই যে।

(পকেট হইতে কুকুর বাহির করিল)

অনন্ত। (হাসিয়া) বাইরে ফেলে দাও। যাও বলাই, তোমার মাথায় একেবারে গোবর পোরা। টাইগার নেংটি কুকুর নয়। রিয়্যাল, মানে রীতিমত ব্লাডহাউন্ড, মানে এত বড় কুকুর। যাও, একে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে তাই নিয়ে এসগে।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তবে তাই আনছি।

অনন্ত। আর বলাই, আমার জন্যে ব্রেক্‌ফাস্ট, মানে চা টোস্ট ডিম নিয়ে আসবে. বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে। আর দেখ, টাইগারকে নীচে বেঁধে রেখে এস। খবরদার, দরজার কাছে বেঁধো না।

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে তাই রেখে আসব।

(প্রস্থান)

অনন্ত। (পাইপ ভরিতে ভরিতে চারিদিকে তাকাইয়া) আপিস-ঘরটি দিব্যি হয়েছে। চারিদিক খোলা, বাইরে প্রকান্ড সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছি—'অনন্ত দুর্দর্শালয়'। মক্কেল যদিও এখনও একটিও আসেনি, কিন্তু এবার আসতে আরম্ভ করল বলে। তখন যত জটিল রহস্য আছে, সব একেবারে হুড়োহুড়ি বাধিয়ে দেবে। টাইপিস্ট-সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। বলাই, বলাই! ওঃ, বলাইকে তো পাঠিয়েছি আমার ব্রেক্‌ফাস্ট আনতে। (বেহালা বাজাইতে লাগিল) শার্লক হোম্‌সের যখনই কিছু আটকাত, অমনই তিনি বেহালা বাজাতেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান। কিন্তু আমি বেহালা বাজাচ্ছি কেন? আমার তো একটি সমস্যাও সমাধান করবার নেই। এখনও একটাও খদ্দের আসেনি। সমস্যা নেইই বা কেন? এই যে বলাই ব্রেক্‌ফাস্ট আনতে দেরি করছে, এটাও তো একটা সমস্যা। কোথায় গেল বলাই? তাকে কি কেউ গুমখুন করেছে? নাঃ, বলাইকে গুমখুন করা সহজ নয়। তবে কেউ কি তাকে নিয়ে ইলোপ করেছে? নাঃ, বলাইয়ের যা চেহারা, তাকে নিয়ে ইলোপ করবে বাংলা দেশে এমন কেউ নেই। তবে বলাইয়ের হল কি? এ যে

দেখছি জটিল সমস্যা।

(অনন্ত বেহালা বাজাইতে লাগিল। বলাইয়ের দ্রুত প্রবেশ)

বলাই। আজ্ঞে কত্তা, বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। এই যে বলাই। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, তোমায় আর ফিরে পাব না।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তারই দাখিল হয়ে আসছিল; কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু কত্তা, চা টোস্ট ডিম কিছুই আনতে পারলাম না।

অনন্ত। কলকাতা শহরে চা টোস্ট পেলে না? ব'কো না বলাই, যাও, শিগ্গির নিয়ে এস, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

বলাই। আজ্ঞে, যতবার আনছি, কেড়ে নিয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে।

অনন্ত। মানে?

বলাই। মানে, বোঁ বোঁ শব্দে একবার জানলা দিয়ে দেখুন না!

(জানালা দিয়া দেখিল বাহিরে অগুনতি লোক ভিড় করিয়া আছে)

অনন্ত। অ্যাঁ বলাই, এ যে একেবারে লোকারণ্য! সিনেমার টিকিটঘরের সামনেও তো এত ভিড় হয় না। ব্যাপার কি বলাই? ওঃ, বুঝেছি, ওরা সব আমার খদ্দের। (বসিবার পর) দেখেছ বলাই, দেশের লোক গুণের কদর বোঝে। যেই জানতে পেরেছে যে অনন্ত ডিটেকটিভ শহরে এসে বসেছে, অমনই পঙ্গপালের মত এসে জুটেছে।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। যাও, ওদের একে একে ডেকে নিয়ে এস।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে ওরা, সেজন্যে আসেনি।

অনন্ত। অ্যাঁ, সে কি? তবে কি জন্যে এসেছে?

বলাই। আজ্ঞে, আপনি বাড়ির সামনে ওই যে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন 'অনন্ত দুর্দশালয়', তাই দেখে শহরের যত অন্নকষ্টের দল বোঁ বোঁ শব্দে মনে করেছে— আপনি বোঁ বোঁ শব্দে অনাথালয় কিংবা সদাব্রত খুলেছেন।

অনন্ত। বল কি বলাই? (পুনরায় দেখিয়া) তাই তো, ভিড় বাড়ছে!

বলাই। আজ্ঞে, আর কিছুক্ষণ পরে ওরা বোঁ বোঁ শব্দে এই ঘরে ঢুকে টেবিল-চেয়ারে কামড় মারবে।

অনন্ত। তাই তো, এ তো ভারি ভয়ানক কথা বলাই, কি করা যায় বল তো! দাঁড়াও, একটু বেহালা বাজাই। এইবার প্ল্যান মাথায় আসবে।

(বেহালা বাজাইতে লাগিল)

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে একটা কাজ করলে হয় না?

অনন্ত। কি কাজ?

বলাই। আজ্ঞে, আপনি বোঁ বোঁ শব্দে ওই মুখোশটা পরে বসে থাকুন, আর আমি ওদের মধ্যে চার-পাঁচজনকে ডেকে আনি। ওরা এলেই আপনি বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। আমি ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। তুমি যাও, চট করে ওদের ডেকে নিয়ে এস।

(বাহিরে গণ্ডগোল চলিতেছে)

বলাই। আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

অনন্ত। নাঃ, এ চলবে না। বলাই, বলাই!

(বলাইয়ের প্রবেশ)

দেখ, তুমি এক কাজ কর বলাই। ওই টাইগারটাকে ওদের কাছে ছেড়ে দাও।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তাই ছেড়ে দিচ্ছি।

(বলাই চলিয়া গেলে অনন্ত দরজা দিল। ভিতরে ভীষণ কোলাহল চলিতে লাগিল, যেন কতকগুলো লোক পলাইতেছে। কিছু পরে বাহির হইতে বলাই দরজার কড়া নাড়িল। অনন্ত দরজা খুলিয়া দিল।)

অনন্ত। বলাই, গিয়েছে সব?

বলাই। আজ্ঞে, পালাচ্ছে, বোঁ বোঁ শব্দে ছুটছে।

অনন্ত। যাও তাহলে, আমার চা নিয়ে এস।

বলাই। আজ্ঞে।

(প্রস্থানোদ্যত)

অনন্ত। আর দেখ বলাই, একটা কথা আমি ক'দিন থেকে ভাবছি। সেটা করলে শার্লক হোম্‌সের ওপরেও টেক্কা দেওয়া হবে।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে কি ভেবেছেন?

অনন্ত। আমার একটা সেক্রেটারি চাই, টাইপিস্ট-সেক্রেটারি, আপিসে ছাপার কাজ করবে, বেশ দেখতে হবে, বেশ জমবে। কিন্তু পুরুষমানুষ হলে চলবে না। মহিলা-সেক্রেটারি চাই।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে তা বেশ তো।

অনন্ত। কিন্তু কি করে জোগাড় করা যায়?

বলাই। আজ্ঞে, তার আর ভাবনা কি? ঢে'টরা পিটিয়ে দিন।

অনন্ত। বলাই, তুমি একেবারে একটি গবেট। এ কি জমিদারি নিলেম হচ্ছে যে ঢে'টরা দেবে? কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে।

বলাই। আজ্ঞে, তবে বোঁ বোঁ শব্দে তাই দিন।

অনন্ত। আচ্ছা, তুমি চা আন, আমি ততক্ষণ বিজ্ঞাপনটা লিখে ফেলি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতার একটি বাসাবাড়ির অভ্যন্তর। বাড়িটি ক্ষুদ্র, কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত; প্রতি ভাগে একটি ব্রাহ্মপরিবার বাস করেন। মধ্যে যাতায়াতের পথ আছে। দুই বাড়ির কন্যা কেয়া ও নলিনীর মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব।

কেয়ার বসিবার ঘর। ঘরের আসবাব দামী নয়, কিন্তু বেশ নিপুণভাবে সাজানো। কেয়া একটা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে। নলিনী উদাসভাবে টেবিল-হারেমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিতেছে। বেলা আন্দাজ সাড়ে-তিনটা

—গান—

অন্ধকার! হে করুণ অন্ধকার!
ঘুচাও আলোর অরুণ অহংকার।
চঞ্চল আঁখি-খঞ্জনে, হে তিমির,

বাঁধো অঞ্জনে সুনিবিড়—
সুপ্তি—ফুল-সমীর ঢালুক গন্ধভার।
দাও বিরাম, হে অভিরাম, কোমল অন্ধকার।

কেয়া। (কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) কি যে তুই গান গাস নলি, আমার একটুও ভাল লাগে না। অন্ধকার—খালি অন্ধকার! তুই দেখাতে চাস যে তোর প্রাণে ভারি দুঃখ। ওটা তোর একটা পোজ।

নলিনী। (উদাস চক্ষু ফিরাইয়া) পোজ! কেয়া, তুই এই কথা বললি? আমার প্রাণের ব্যথা তুইও বুঝলি না?

কেয়া। ব্যথাটা কি শুনি?

নলিনী। ব্যথা কি বলে বোঝানো যায়? গানে তার স্পর্শ লেগে থাকে, দীর্ঘশ্বাসে তার মূর্তি ফুটে ওঠে। পৃথিবীতে ব্যথা ছাড়া আর কি আছে? ভেবে দেখ, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? দু'দিন পরে আবার কোথায় চলে যাব? জীবনের অনুচ্চারিত আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই হয়তো অতৃপ্ত থেকে যাবে।

কেয়া। থাকবে না গো, থাকবে না। তোমার কি হয়েছে আমি বুঝেছি।

নলিনী। কি হয়েছে?

কেয়া। তুই মনে মনে প্রেমে পড়েছিস।

নলিনী। প্রেম! (দীর্ঘশ্বাস) কার সঙ্গে?

কেয়া। যিনি এখনই আসবেন, সেই সমরেশবাবুর সঙ্গে।

নলিনী। (করুণ হাস্য) সমরেশবাবুর সঙ্গে! কেয়া, তোতলার সঙ্গে কখনও প্রেম হয়?

কেয়া। কেন হবে না? তোতলা কি মানুষ নয়? সমরেশবাবুর মত অমন চমৎকার চেহারা কটা দেখেছিস? আর অমন বিদ্বানই বা কটা পাওয়া যায়? তুই কি মনে করিস, তোতলা বলে উনি তোর যোগ্য নন? উনি তোকে কি ভীষণ ভালবাসেন তা জানিস?

নলিনী। কি করে জানব? আস্ত কথা তো কখনও শুনিনি।

কেয়া। কথাই বুঝি সব? এই না বলছিলি—মনের ব্যথা কথায় বোঝানো যায় না। ওঁর মনের কথা ভাবে-ইঙ্গিতে বোঝা যায়।

নলিনী। তুই ওঁর ভাব-ইঙ্গিত সব বুঝে নিয়েছিস দেখছি। তা এতই যখন বুঝেছিস, তখন তুইই সমরেশবাবুকে নে না।

কেয়া। মুখে বলছিস, কিন্তু আমি সমরেশবাবুর দিকে হাত বাড়ালে তুই কি আর রক্ষে রাখবি? হয়তো আমার গলা টিপেই শেষ করে দিবি।

নলিনী। কিছু করব না। তোতলায় আমার দরকার নেই!

কেয়া। ইঃ, দরকার নেই! কি বলব নলি, তুই আমার প্রাণের বন্ধু, আর সমরেশবাবুর ওপর আমার একটুও লোভ নেই; তা নইলে তোকে মজা টের পাইয়ে দিতুম।

নলিনী। তোর বুঝি সমরেশবাবুর ওপর লোভ নেই?

কেয়া। নাঃ, আমার এখন খালি টাকার লোভ। কি করে টাকা রোজগার করব, সেই হয়েছে আমার ধ্যান-জ্ঞান।

নলিনী। টাকা রোজগার করে কি করবি?

কেয়া। মা-বাবাকে সাহায্য করব। এখন বড় হয়েছি, মা-বাবাকে সাহায্য করব না?

নলিনী। (একটু ইতস্তত করিয়া) কেয়া, বাড়িতে কি টাকার টানাটানি হয়েছে?

কেয়া। টানাটানি নয়। কিন্তু মা-বাবা দু'জনেরই বয়স হচ্ছে। আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতুম, তাহলে তো এতদিনে সংসারের ভার আমাকেই নিতে হত। তাই ঠিক

করেছি, চাকরি নেব। তবু তো মা-বাবা বিশ্রাম পাবেন।
নলিনী। কি চাকরি করবি?
কেয়া। তুই তো জানিস শর্টহ্যান্ড টাইপিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছি। কোনও কোম্পানি বা আপিসে সেক্রেটারির কাজ স্বচ্ছন্দে করতে পারব।
নলিনী। কিন্তু চাকরি পাবি কোথায়? আজকাল পুরুষেরাই চাকরি পাচ্ছে না।
কেয়া। সেইজন্যেই তো রাতদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছি। এই দেখ না, 'কালকেতু'তে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—একজন ডিটেকটিভের আপিসে টাইপিস্ট চাই। ভাবছি, কাল গিয়ে দেখা করব।
নলিনী। ডিটেকটিভের আপিসে চাকরি করবি?
কেয়া। তাতে কি হয়েছে, ডিটেকটিভ কি আমায় খেয়ে ফেলবে?
নলিনী। না, তবে ডিটেকটিভ শুনলেই কেমন গা শিরশির করে।
কেয়া। তোর সবতাতেই ওই, সব জিনিসের খারাপ দিকটাই দেখতে পাস। প্রেমে পড়েছিস, তাও হা-হুতাশ করছিস।
নলিনী। কে প্রেমে পড়েছে?
কেয়া। তুই, আবার কে?
নলিনী। কেয়া, তুই হাসালি। তোতলার সঙ্গে আবার প্রেম!
নলিনী। ন্যাকামি করিসনি নলি, এমন চুল ধরে টেনে দেব যে টের পাবি। নে, সমরেশবাবুর আসবার সময় হল, এবার একটা মিষ্টি দেখে গান ধর, তিনি যেন এসে শুনতে পান।
নলিনী। (উঠিয়া) আমি পারব না।
কেয়া। পারবি না? ও, লজ্জা করছে বুঝি? আচ্ছা, তোর হয়ে আমিই না হয় গেয়ে দিচ্ছি।

(হারমোনিয়মের সম্মুখে গিয়া বসিল; মৃদু স্পর্শে চাবির উপর হাত চালাইয়া)

কি গাইব? আচ্ছা, একটা মিলন-সংগীত গাই।

—গান—

বঁধুয়া মধু-রাতে
এলে নন্দন-মধু হাতে।
চম্পকবন গন্ধে বন-বেতসী রন্ধ্রে
সুর কুহরে বাতে—মধু রাতে!
পরশে তব শিহরে তনুখানি,
শিথিল বেণী শরমে অনুমানি,
কণ্ঠে বিবশ বাণী,
তন্দ্রা আঁখি-পাতে।
—মধু-রাতে।

(গান শেষ হইবার পর সমরেশ প্রবেশ করিল)

সমরেশ। নননননমস্কার।
কেয়া। আসুন সমরেশবাবু। বসুন, ওই চেয়ারটাতে বসুন না।

(নলিনীর পাশের চেয়ার নির্দেশ করিল)

সমরেশ। হ্যাঁ, এএই যে।

(চেয়ারের প্রান্তে উপবেশন করিয়া গলা খাঁকারি দিল)

কেয়া। আপনার শরীর বেশ ভাল আছে তো?

সমরেশ। আমার শরীর তো বরাবরই ভাল থাকে। এই সেদিনও একটা গোরাকে মুমুমুষ্টিযুদ্ধে কাত করেছি; কাজেই স্বাস্থ্য এক রকম ভালই বববলতে হবে। গাগান শুনতে পাচ্ছিলুম সিঁড়িতে উঠতে উঠতে, তাই ভাভাবলুম আপনারা এই-খানেই আছেন। নননর্নলিনী দেবী, আপনি গাগাইছিলেন বুঝি?

কেয়া। (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ। আমি বাজাচ্ছিলুম আর ও গাইছিল। কেমন শুনলেন?

সমরেশ। চচচমৎকার। এমন গলা কককখনও শুনিনি।

(কেয়া মুখে কাপড় দিল)

নলিনী। (হঠাৎ উঠিয়া) আমি যাই।

কেয়া। (জনান্তিকে) খবরদার নলি, মেরে ফেলব একেবারে। এত হিংসুটে তুই, আমার প্রশংসাও সহ্য হয় না?

(নলিনী আবার বসিয়া পড়িল)

সমরেশবাবু, আমরা শুনেছি আপনি খুব ভাল গাইতে জানেন, একেবারে ওস্তাদি গান। আজ আপনার গান আমাদের শোনাতে হবে।

সমরেশ। (ভীতভাবে) আমি গাগাগান গাইব? তার চেয়ে আমার গলায় ছুছুছুছুরি দিন না।

কেয়া। সত্যি গাইতে জানেন না?

সমরেশ। কখনও চেচেচেষ্টা করিনি। কককককথা কওয়াটাই আমার পক্ষে এমন শশশক্ত ব্যাপার যে—

(হতাশে হস্ত সঞ্চালন)

কেয়া। কেন, আপনি তো চমৎকার কথা বলেন!

সমরেশ। বববলি নাকি? কই, আআমি তো তা লক্ষ্য করিনি। নলিনী দেবী, আপনি ললক্ষ্য করেছেন?

(নলিনী নিরুত্তর)

ওই দেখুন, নলিনী দেবী মমনের কথাটি পষ্ট করে বববলতে পারছেন না।

কেয়া। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) নলিনী দেবী মনের কথা লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসেন। তবে সময় উপস্থিত হলে সত্যি কথা আপনি বেরিয়ে পড়বে। সে যাক, আপনি যে আমাদের একদিন বেড়াতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, তার কি হল, ভুলে গেলেন নাকি?

সমরেশ। ভুভুলি নি। তবে উপযুক্ত সাসাহসের অভাবে কথাটা পাড়তে পারছিলুম না। (সাগ্রহে নলিনীকে) যাযাবেন আজকে? চচচলুন না?

নলিনী। কেয়া, তুই যা, আমার আজ শরীরটা—

কেয়া। বা রে! উনি আমাকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করলেন না, আমি যাব; আর তোমাকে সাধাসাধি করছেন, তুমি যাবে না? বেশ ব্যবস্থা তো!

সমরেশ। না না, আমি দুদুজনকেই সাদরে আহ্বান করছি। মামানে—অর্থাৎ—আপনাবা দুজনে না গেলে আমি ববড়ই দুঃখিত হব।

কেয়া। নলিনী একলা গেলেও দুঃখিত হবেন?

সমরেশ। মামানে (মাথা চুলকাইয়া) দুদুঃখ একটু হবে বইকি।

কেয়া। (হাসিয়া উঠিল) ওটা লোক-দেখানো দুঃখ। তাহলে নলি যা, শিগ্গির কাপড় পরে আয়।

নালনী। (উদাসভাবে) আচ্ছা।

(প্রস্থান)

কেয়া। কোথায় যাওয়া হবে?

(নলিনীর চেয়ারে বসিল)

সমরেশ। যেখানে আপনারা ববলবেন। জ্ববিলি পার্কের ধারে খাখাখানিক বেড়িয়ে তারপর সন্ধ্যের সময় সিসিসিনেমা দেখে—

কেয়া। না, সন্ধ্যের পর বাইরে থাকা মা-বাবা পছন্দ করেন না। সন্ধ্যের আগেই ফিরব।

সমরেশ। বেশ। (কেয়ার দিকে ঝুঁকিয়া) দেখুন, কেকেয়া দেবী, আপনি বোধ হয় আমার মমনের ভাব বুঝতে পেরেছেন, মামানে নলিনী দেবীকে আমি—(গলা খাঁকারি দিয়া রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল) আপনার কাকাকাছ থেকে আমি কিকিছু সাহায্য পেপেপেতে পারি না? অর্থাৎ আপনি যদি মামাঝে মাঝে—

কেয়া। ওই বোধ হয় নলি আসছে। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে পরে কথা হবে, কি বলেন? আজই বেড়াতে বেড়াতে হয়তো সুযোগ হবে।

(সাজসজ্জা করিয়া নলিনী প্রবেশ কবিল)

চলুন তাহলে, আর দেরি করে কাজ নেই।

(সকলেব প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পার্কেব এক অংশ। সমবেশ ও কেয়া পাশাপাশি বেড়াইতেছে

কেয়া। নলি কোথায় গেল?

সমবেশ। তিনি ওই গাগাছের নীচে বেঞ্চিতে বসেছেন। মিমিস কেয়া, এই অবকাশে আমার ববক্তব্যটা বলে নিই। দেখুন, আমার অবস্থা বড়ই কাকাহিল হয়ে পড়েছে, ননলিনী দেবী ছাড়া আর কিছু ভাভাবতেই পারি না। রাত্রে ঘুঘুম নেই, সাবারাত প্যাটপ্যাট করে চেয়ে থাকি। অথচ তিনি আমার কথা একেবারেই ভাবেন না। অর্থাৎ আমাকে বোবোধ হয় তিনি ঘৃঘৃণা করেন। আপনি আমাকে ঘৃঘৃণা করেন না, কিন্তু তিনি—

কেয়া। নলিনী আপনাকে ঘৃণা করে, এটা কি করে বুঝলেন?

সমরেশ। মামানে আমাকে দেখলেই তিনি মুখেব ভাব এমন উউদাস কবে ফেলেন, এত ককম কথা কন যে—

কেয়া। (সহাস্যে) ও দেখে ভয় পাবেন না, নলির ওই স্বভাব; ও যে জিনিসটি চায়, তার প্রতি এমন ভাব দেখায় যেন সেটা ওর দু' চক্ষের বিষ।

সমরেশ। তাতাই নাকি? তাতাহলে কি আমার প্রতি উনি—

কেয়া। মোটেই বিরূপ নন। কিন্তু আপনারও উচিত মনের ভাব আবও স্পষ্ট কবে জানানো।

সমরেশ। (হতাশভাবে) কিকি করব মিস কেয়া, আমার বাক্‌যন্ত্রটা এমন বেয়াড়া যে যযতই প্রাণে আবেগ উপস্থিত হয়, ককথা ততই বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে।

কেয়া। বাক্‌যন্ত্র ছাড়া পুরুষের অনুরাগ জানাবার আর কি কোনও রাস্তা জানা নেই?

সমরেশ। আর কি করব বললুন?

কেয়া। ওকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করুন; সেকালে নাইটরা কি করত? সমরেশ-বাবু, আপনি এত বুদ্ধিমান, এত বড় ইঞ্জিনীয়ার, আর এই সামান্য বিঘ্ন উত্তীর্ণ হতে পারছেন না?

সমরেশ। আপনার কাছে যেটা সাসামান্য বোধ হচ্ছে, সেটা আমার কাছে যে ব্যাব্যাব্যা-বিলনের হ্যাহ্যাহ্যাঙ্গিং গার্ডেন তৈরি করার চেয়েও শক্ত। ওই যে বিপদ থেকে উদ্ধারের কথা বললেন, বিপদ কোথায় যে উদ্ধার করব? একটা সুসুসুবিধেমত বিপদও যদি ঘটত! কিন্তু কলকাতা শহরে হঠাৎ বিপদই বা পাওয়া যায় কোথায়? নর্নালিনী কোথায় গেলেন? চলুন দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বেদে-বেদেনীব দল প্রবেশ কবিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল)

—গান—

গলি গলিমে প্রীত নাগরকী
চলে চলুঙ্গী প্যারে (মেরে)।
সব খিলেগা প্রেম শীতারা
সাথ রহে না প্যারে (মেরে)।
আও প্যারী, বোল প্যারী,
সাথ রহনা তুম হামারী,
সবসে দেখা লুট গই ম্যায়
লুট গই ম্যায় প্যারে।
দিলসে দিলকে তব মিলানা
প্রীতকী রোশনী তুম দিখানা
বাহ ডরে গলে তোম্‌হারে
চলে চলুঙ্গী প্যারে মেরে।

(লেকের অন্য অংশ। রাস্তাব ধারে অনন্তব মোটর দাঁড়াইয়া আছে। অনন্ত গাড়ি হইতে নামিল)

অনন্ত। দেখ বলাই, এই হচ্ছে আমাব ব্রহ্মাস্ত্র। এই দেখ, চেহারা বদলে গেছে কিনা।

(দাড়ি গোঁফ টুপি ও নীল চশমা পরিধান)

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে আপনাকে ঠিক বুড়ো কত্তাবাবুর মত দেখাচ্ছে। তাঁরও অমনই গোঁফ-দাড়ি ছিল।

অনন্ত। কেমন, বেশ ভারিক্কি গোছের দেখাচ্ছে তো?

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে তিরিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

অনন্ত। বেশ, আজ এই বেশেই মহামায়ার অনুসন্ধান করব। আজ তাকে না ধরে ছাড়ছি না। বলাই, তুমি ওই গাছটার আড়ালে বসে থাক, আমি অন্বেষণে বেরুচ্ছি।

বলাই। যে আজ্ঞে।

অনন্ত। আর দেখ, তুমিও রাস্তার দিকে নজর রেখো, দুর্গাপ্রতিমার মত কেউ যায় কিনা লক্ষ্য করো।

বলাই। যে আজ্ঞে।

বলাই। উনিশ বছর বয়স হওয়া চাই, মনে থাকে যেন।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে যদি কুড়ি বছর বয়স হয়?

অনন্ত। তাহলে লক্ষ্য করবার দরকার নেই।

বলাই। কত্তা, নাচতে নাচতে কে একটি এদিকে আসছেন। বোঁ বোঁ শব্দে উনিশ বছর বলেই তো মনে হচ্ছে।

অনন্ত। সত্যিই তো, বেদেনী বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছু বলা যায় না, মহামায়াকে বেদেরা চুরি করে থাকতে পারে। ওর পায়ের দিকে লক্ষ্য কর বলাই, লাল জড়ুল আছে কিনা।

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে আপনি যখন বলছেন তখন পায়ের দিকেই তাকিয়ে থাকব।

(পুনরায় বেদে-বেদেনীর দল নাচ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল। অনন্ত ও বলাই তাহাদের পায়ের দিক লক্ষ্য করিতে লাগিল। ইত্যবসরে তাহাদের একজন অনন্তর পকেট হইতে মনিব্যাগ উঠাইয়া লইল ও পরে সকলে চলিয়া গেল)

বোঁ বোঁ শব্দে কি দেখছেন?

অনন্ত। বলাই, কি রকম মনে হল?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে জগদীশবাবুর মেয়ে বলে তো মনে হয় না।

অনন্ত। কিন্তু বলা যায় না বলাই, বনের বিহঙ্গিনী ওরা, পাখা মেলে উড়ে বেড়ানোই ওদের স্বভাব। ভেবে দেখ, মহামায়া যদি ওদের সঙ্গে থেকে মুক্ত-পাখা বনবিহঙ্গিনী হয়ে গিয়ে থাকে, সেটা কি খুব আশ্চর্য? অ্যাঁ, আমার মনিব্যাগটা কোথায়?

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে পাচ্ছেন না?

অনন্ত। না, কোথাও পড়ে গেল নাকি?

বলাই। আজ্ঞে না, বনের বিহঙ্গিনী বোঁ বোঁ শব্দে মনিব্যাগটা নিয়ে পাখা মেলে উড়েছে।

অনন্ত। বল কি বলাই, তাও কি সম্ভব?

বলাই। কিছু অসম্ভব নয়। বোঁ বোঁ শব্দে তিনি যেমন আপনার গায়ে লেপ্টে লেপ্টে যাচ্ছিলেন, তাতে কিছুই অসম্ভব নয়।

অনন্ত। কি আস্পর্দ্ধা বল তো বলাই, ডিটেকটিভের পকেট মেরে দিলে, এমন ঘটনা ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। এখন কি আর তাকে ধরা যাবে?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে বনের বিহঙ্গিনীকে কি আর ধরা যায়? তার চেয়ে বরঞ্চ মহামায়াকে খোঁজ করলে—

অনন্ত। ঠিক বলেছ। মনিব্যাগের শোকে কর্তব্য ভুললে চলবে না। মনিব্যাগের চেয়ে কর্তব্য বড়। তুমি গাছের আড়ালে যাও।

(প্রস্থান)

(লেকের অন্য অংশ। নির্জন বৃক্ষতলে নলিনী একাকিনী বেঞ্চিতে বসিয়া আছে)

নলিনী। দুজনে কথা কইতেই মত্ত। (দীর্ঘশ্বাস) আমার না এলেই ভাল হত। একা, একা, পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। আত্মীয় বন্ধু কেউ নেই। বন্ধুত্ব— সে তো ছলনা। ভালবাসা—সে তো প্রতারণা।

(পিছনে অনন্তর আবির্ভাব)

এ পৃথিবী একটা প্রাণহীন মরুভূমি। বাপ নেই, মা নেই—

অনন্ত। সব আছে।

(অনন্ত বেঞ্চিতে আসিয়া বসিল। নলিনী চমকিতভাবে একবার তাকাইয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল)

বাপ মা সব আছে, শুধু কোথায় আছে জানেন না। সে খবর আমি দিতে পারি।

(নিজ বক্ষে টোকা মারিল)

নলিনী। (শঙ্কিতভাবে) কে আপনি? কি চান?

অনন্ত। কিছু চাই না। আপনি কে, আমি জানি। আপনার নাম মহামায়া।

নলিনী। আমার নাম মহামায়া নয়, আপনি ভুল করেছেন।

অনন্ত। ভুল! (হাসিয়া) ভুল আমি করি না। আপনার বয়স উনিশ বছর কিনা?

(নলিনী ব্যাকুলভাবে চারিদিকে তাকাইল)

ভুল হবার জো নেই, একেবারে ঠিক ধরেছি। এখন আপনার বাঁ পায়ের জুতো খুলুন তো দেখি।

নলিনী। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভয়ার্তস্বরে) অ্যাঁ! সমরেশবাবু! কোথা গেলেন, সমরেশ-বাবু!

সমরেশ। (দূর হইতে) যাচ্ছি।

অনন্ত। তাই তো। গোলমাল ঠেকছে। পুলিস ডাকবে নাকি?

(ছুটিতে ছুটিতে সমরেশ ও কেয়ার প্রবেশ)

সমরেশ। কিকি হয়েছে?

নলিনী। (সমরেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া) ওই লোকটা আমাকে জুতো খুলতে বলছে।

সমরেশ। (মুষ্টি পাকাইয়া সগর্জনে) কিকি—

(অনন্ত পলায়ন করিল)

আজ ব্যাব্যাব্যাটাকে খুনই করব।

(পশ্চাদ্ধাবন)

নলিনী। সমরেশবাবু যে চলে গেলেন কেয়া।

কেয়া। চল, আমরাও ওঁর পেছনে পেছনে যাই।

(উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া দৌড়াইয়া প্রস্থান করিল)

(পার্কের অন্য অংশ। অনন্তর মোটর। ফুটবোর্ডে বলাই বসিয়া আছে)

বলাই। উনিশ বছরের দুর্গাপ্রতিমা তো এ অঞ্চলে একটিও নেই দেখছি। পঞ্চান্ন বছরের একখানি রক্ষেকালীর প্রতিমা একবার গেলেন, তারপর থেকে বোঁ বোঁ শব্দে তো মশার কামড়ই খাচ্ছি।

(দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনন্তর প্রবেশ)

অনন্ত। বলাই, শিগ্গির গাড়ি স্টার্ট দাও। তাড়া করেছে।

বলাই। কে, দুর্গাপ্রতিমা?

অনন্ত। শুধু দুর্গাপ্রতিমা নয়, সঙ্গে প্রকাণ্ড এক মহাদেব আছেন, গদার মত দুই বাহু ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে আসছেন।

বলাই। তাই তো। তাহলে বোঁ বোঁ শব্দে—

(মোটরের হ্যান্ডেল ঘুরাইয়া স্টার্ট দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গাড়ি স্টার্ট লইল না)

অনন্ত। ওই রে, মহাদেব এসে পড়ল! আজ দক্ষযজ্ঞ বাধালে দেখছি। নাঃ, বিনা রণে আর নিস্তার নেই।

বলাই। কত্তা, আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে।

অনন্ত। কি বুদ্ধি চটপট বল, মহাদেব এসে পড়ল।

বলাই। গোঁফ-দাড়ি আমায় দিন, তাহলে আর বোঁ বোঁ শব্দে আপনাকে চিনতে পারবে না।

অনন্ত। ঠিক বলেছ।

(গোঁফ-দাড়ি খুলিয়া বলাইকে দিল। বলাই উহা পরিধান করিল। বেগে সমরেশ প্রবেশ করিল, পশ্চাতে নলিনী ও কেয়া)

সমরেশ। কোকোন্ দিকে গেল দেখেছেন?

অনন্ত। কি হয়েছে মশায়?

সমরেশ। একটা লোক—লম্বা গোঁফ, চোখে নীল চশমা, এদিক দিয়ে যেযেতে দেখেছেন?

অনন্ত। কই না, এদিকে তো ও রকম কেউ আসেনি।

সমরেশ। ততবে গেল কোথায়?

অনন্ত। তা তো বলতে পারি না। আপনার সঙ্গে মেয়েরা রয়েছেন দেখছি, কোন বিপদ হয়নি তো?

সরবেশ। বিবিপদ হয়নি, কিন্তু শিগ্গির হবে—সেই লোকটার।

(চারিদিক পরিক্রমণ করিতে লাগিল)

নলিনী। (কেয়াকে) দেখ ভাই, ওই লোকটার গোঁফ ঠিক সেই রকম। (বলাইকে নির্দেশ)

অনন্ত। (নিকটে গিয়া নমস্কারপূর্বক) অপরাধ নেবেন না। কিন্তু আপনারা কি আমার শোফারকে সন্দেহ করছেন?

কেয়া। ইনি বলছেন যে ওর গোঁফ ঠিক সেই রকম।

অনন্ত। বলাই, তোমার গোঁফ সেই রকম কেন?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে আমার গোঁফ কি রকম?

অনন্ত। (ধমক দিয়া) যে রকমই হোক, তোমার গোঁফ দেখে এঁদের সন্দেহ হয়েছে।

বলাই। আজ্ঞে, সন্দেহের কোনও কাজই তো বোঁ বোঁ শব্দে আমার গোঁফ করেনি।

অনন্ত। না করুক, কিন্তু দুটি ভদ্রমহিলার যখন সন্দেহ হয়েছে তখন ও গোঁফ আর রাখা চলবে না। আজই গিয়ে কামিয়ে ফেলবে।

বলাই। যে আজ্ঞে।

(কেয়া ও নলিনীর সকৌতুক হাস্য)

সমরেশ। (ফিরিয়া আসিয়া) নানাঃ, পাপালিয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাযাবে কোথায়! যেখানে পাই, খুঁখুঁজে বার করব। তারপর—চলুন। (অনন্তকে) আপনি তো তাহলে দেদেখেননি?

অনন্ত। না।

সমরেশ। ননমস্কার।

(কেয়া ও নলিনীকে লইয়া সমরেশ প্রস্থান করিল। অনন্ত সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

চতুর্থ দৃশ্য

অনন্তর অফিস। বেলা আন্দাজ দশটা। অনন্ত একাকী পরিক্রমণ করিতেছে

অনন্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই মেয়েটাই মহামায়া। নইলে জুতো খুললে না কেন? ভেতরে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। আর সেই মেয়েটি! কি সুন্দর দুষ্টুমিভরা মুখ! কি মিষ্টি হাসি। পরিচয় জানা হল না। সঙ্গে যে দৈত্য ছিল, ভাল করে কথা কইবার ফুরসৎ দিলে না। নাঃ, পরিচয় খুঁজে বার করতেই হবে। আমি একজন ডিটেকটিভ, সামান্য একটা ঠিকানা বার করতে পারব না। আলবৎ পারব।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলাই। আজ্ঞে, তিনি এসেছেন।

অনন্ত। তিনি? তিনি কে?

বলাই। আজ্ঞে, কালকের সেই তোতলা তিনি।

অনন্ত। তোতলা তিনি! ওঃ, সেই মহাদেব?

(বলাই সবেগে ঘাড় নাড়িল)

কি সর্বনাশ! কি, কি চায় গুন্ডাটা?

বলাই। তা তো বোঁ বোঁ শব্দে কিছু বললে না। আমাকে দেখেই চিনেছে। গোঁফ নেই দেখে কটমট করে তাকিয়ে বললে, তোমার গোঁফ কই? আমি বললুম, মা-ঠাকরুণদের সন্দেহ হয়েছিল, তাই কামিয়ে ফেলেছি।

অনন্ত। তবে কি বুঝেছে নাকি? বলাই, তুমি বলে দাও, আমি বাড়ি নেই কিংবা ঘুমুচ্ছি কিংবা মারা গেছি—যা হোক একটা বলে তাকে তাড়াও।

বলাই। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থানোদ্যত)

অনন্ত। কিন্তু লোকটার কাছে সেই মেয়েটির খবর পাওয়া যেত। দেখাই যাক না। যদি চিনে থাকে তাতেই বা কি? বলাই, তাকে ডেকে নিয়ে এস।

বলাই। (ইতস্তত করিয়া) আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে—

অনন্ত। হ্যাঁ, তাকে বোঁ বোঁ শব্দে এখানে হাজির কর।

(বলাই প্রস্থান করিল)

লোকটা হয়তো সেই মেয়েটির কোনও আত্মীয়। হয়তো ভাই। ভাই? না, ভাইয়ের মত চেহারা তো নয়। তবে কি—

(সমরেশ প্রবেশ করিল)

সমরেশ। ননমস্কার।

অনন্ত। নমস্কার। আসুন।

সমরেশ। আপনি যে ডিডিডিডিটেকটিভ, তা কাল বলেননি কেন?

(বলাই চেয়ার আগাইয়া দিতে সমরেশ বসিল)

অনন্ত। অল্পক্ষণের আলাপ, তাই দরকার মনে করিনি। আপনিও তো নিজের পরিচয় দেননি।

সমরেশ। হুঁ, আমিও দদদরকার মনে করিনি।

অনন্ত। আপনি বোধ হয় সেই মহিলাটির ভাই। না?

সমরেশ। কোকোন মহিলার আমি ভাই নই। ওদের মধ্যে এএকজন আমার—যাকগে, আমি আপনার কাছে কাকাজে এসেছি। আপনি 'অনন্ত দুর্দশা' ডিটেক্‌টিভ তো?

অনন্ত। হ্যাঁ।

সমরেশ। তাতাহলে শুনুন। আমি কাল দুটি মহিলাকে নিয়ে পাপাপার্কে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা লোক—শাশালা বদমায়েস—একটি মহিলার জুতো খুলে নিতে চেয়েছিল, তাকে আমি চাই। আপনি খুঁখুঁজে বার করতে পারবেন?

অনন্ত। (চিন্তা করিতে করিতে) তাহলে যে মহিলাটি একলা ছিলেন, অর্থাৎ যাঁর জুতো খুলে নেবার চেষ্টা হয়েছিল, তিনিই আপনার ইয়ে?

সমরেশ। সেসে খবরে আপনার দরকার কি?

অনন্ত। না না, আমি অমনই জিজ্ঞাসা করছিলুম। ডিটেক্‌টিভদের সব জানা দরকার তো। আর অন্য মহিলাটি, যিনি ফিরোজা রঙের শাড়ি পরে ছিলেন?

সমরেশ। দেদেখুন, মহিলাদের কথা আপনাকে শোশোনাবার জন্যে আসিনি। আমি সেই র‍্যার‍্যার‍্যাস্‌কেলটাকে চাই। আপনি তাকে খুঁজে বার করতে পারবেন কিনা স্পষ্ট করে বলুন।

অনন্ত। (গম্ভীরভাবে) দেখুন মিঃ—

সমরেশ। নানাগ। সমরেশ নাগ।

অনন্ত। দেখুন মিঃ নাগ, এই জুতো চুরি-টুরির মত সামান্য ব্যাপার আমি হাতে নিই না।

সমরেশ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সাসামান্য ব্যাপার! একটি মমহিলাকে অপমান--সাসামান্য ব্যাপার! আপনি কি রকম ভভদ্রলোক?

অনন্ত। আচ্ছা, মনে করুন, তাকে খুঁজে বার করলাম, কিন্তু তাকে নিয়ে আর আপনি করবেন কি?

সমরেশ। কিকি কবব? প্রপ্রথমে তার নানাকে একটি ঘুষি মেরে নাক থেবড়ে দেব; তারপর তার পেপেটে একটি লালাথি মারব। তারপর চুল ধরে হিড়হিড় কবে টানতে টানতে থাথানায় নিয়ে যাব।

অনন্ত। (দৃঢ়স্বরে) এসব নৃশংস ব্যাপারে আমি নেই। মাফ করবেন, আমি আপনাব কাজ করতে পারব না।

সমরেশ। পাপাপারবেন না?

অনন্ত। না।

সমরেশ। ততবে তুমি কককচু ডিটেক্‌টিভ।

অনন্ত। দেখুন, অপমান করবেন না। আপনি ভাবছেন, আপনাব গাযে জোর আছে—

সমরেশ। তুমি চোচৌকিদার।

(ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান)

অনন্ত। (কিছুক্ষণ পাদচারণপূর্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া) এর মধ্যে একটা গভীর রহস্য রয়েছে। ওই তোতলাটা হচ্ছে পালেব গোদা। নইলে মেয়েদেব পবিচয় দিলে না কেন? মহামায়াকে ও বিয়ে করতে চায়, জগদীশবাবুব জমিদারিটা হাতাবার ফন্দি। উঃ! কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! কিন্তু মহামায়ার ঠিকানা তো জানা হল না; তোতলা শয়তানটা ওদিক দিয়েই গেল না। সেই মেয়েটির সন্ধানও যদি পেতুম।

(বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। আজ্ঞে, তিনি এসেছেন।

অনন্ত। আবার এসেছে?

বলাই। আজ্ঞে, তিনি নন। তাঁর সঙ্গে যে দুটি মা-ঠাকরুণ ছিলেন, তাঁদেরই একটি।

অনন্ত। কোন্‌টি?

বলাই। আজ্ঞে, যেটির বেশ মিষ্টি মিষ্টি হাসি—তিনিই। বললেন, চাকরির জন্যে এসেছেন।

অনন্ত। অ্যাঁ! তাই নাকি! যাও, এখনই নিয়ে এস।

(বলাইয়ের প্রস্থান)

এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! সেই মেয়েটি এসেছে চাকরির জন্যে! কিন্তু এর মধ্যে তোতলার কারসাজি নেই তো? যা হোক, সাবধান হওয়া দরকার।

(গম্ভীরভাবে উপবেশন করিয়া কাগজপত্র নাড়িতে লাগিল কেয়া প্রবেশ করিল)

কেয়া। নমস্কার। একি!

(অনন্তকে দেখিয়া বিস্মিত)

অনন্ত। নমস্কার। বসুন।

(কাগজপত্র দেখিতে ব্যস্ত)

কেয়া। আপনিই কি ডিটেকটিভ অনন্ত চৌধুরী?

অনন্ত। হ্যাঁ। (কাগজপত্র ভুলিয়া গিয়া) আপনার নামটি কি?

কেয়া। আমার নাম কেয়া মিত্র। মাফ করবেন। কিন্তু আপনিই কি কাল—

অনন্ত। পার্কের ধারে। ঠিক ধরেছেন। কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার পরই আপনারা হঠাৎ চলে গেলেন, ভাল করে আলাপ করা হল না। (সামলাইয়া লইয়া) হ্যাঁ, আমি বড় ব্যস্ত। আপনার কি দরকার সেটা—

কেয়া। আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন একজন সেক্রেটারি চাই, তাই—

অনন্ত। ওঃ, ঠিক কথা। মনেই ছিল না। তা—আপনি কি সেক্রেটারির কাজ করতে চান?

কেয়া। যদি আপনি যোগ্য মনে করেন।

অনন্ত। যোগ্য! বলেন কি? আপনার মত সেক্রেটারি পাওয়া তো—(সামলাইয়া) বেশ, আপনি যখন কাজ করতে চান তখন আমার আপত্তি নেই। থাকুন। কাজ বিশেষ শক্ত নয়, বেলা দশটা থেকে—

কেয়া। তবে কি আমাকে বাহাল করলেন?

অনন্ত। হ্যাঁ, নিশ্চয়। যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

কেয়া। (হাসিয়া) আপত্তি থাকলে আমি আসব কেন? কিন্তু আমার কোয়ালিফিকেশন সম্বন্ধে কিছুই তো জিজ্ঞাসা করলেন না?

অনন্ত। সেটা এখুনি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম। (গম্ভীরভাবে) আপনি লেখাপড়া জানেন?

কেয়া। জানি কিছু কিছু, আই. এ. পাস করেছি।

অনন্ত। বলেন কি? এত অল্প বয়সে? আপনার তো দেখছি অসাধারণ মেধা!

(সপ্রশংসভাবে চাহিয়া রহিল)

কেয়া। (হেঁট মুখে) মেধা আর কি এমন বেশী?

অনন্ত। বেশী নয়! আপনার বয়সে আমি তো ম্যাট্রিক-ক্লাসে রগড়াচ্ছিলুম। (সামলাইয়া) হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল? ও, আপনি তাহলে লেখাপড়া জানেন? আচ্ছা, (মাথা-চুলকাইয়া) সেলাই, রান্নাবান্না জানা আছে তো? গান গাইতে—

কেয়া। (সবিস্ময়ে) কিন্তু আপনার আপিসে কাজ করতে হলে কি এসব কোয়ালি-

ফিকেশনও দরকার?

অনন্ত। না না। মানে আমি ডিটেকটিভ, সব খবর নেওয়া চাই তো। তাহলে আপনি--

কেয়া। শর্টহ্যান্ড টাইপ-রাইটিং জানি।

অনন্ত। (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া) আপনি—আপনি তো তাহলে বড় আশ্চর্য মেয়ে! আপনাকে যতই দেখছি ততই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে! আপনি একটি ক্ষণজন্মা মহিলা!

বলাই। (দ্বারপথে গলা বাড়াইয়া) এক পাল দিশী-বিলিতী মা-ঠাকরুণ বোঁ বোঁ শব্দে এসে হাজির হয়েছেন।

অনন্ত। তাঁদের বোঁ বোঁ শব্দে বলে দাও যে সেক্রেটারি পাওয়া গেছে, আর দরকার নেই।

বলাই। যে আজ্ঞে।

(মুণ্ড টানিয়া লইল)

অনন্ত। হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল? আপনি তাহলে আজ থেকে সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন। আপনার মাইনেটা অবশ্য—সেটা আমি বিবেচনা করে পরে আপনাকে জানাব।

কেয়া। মাইনে ষাট টাকা—বিজ্ঞাপনেই তো লেখা আছে।

অনন্ত। ষাট টাকা? অসম্ভব। যা হোক, ওসব বাজে কথা থাক। আপনি বুঝি প্রায়ই পার্কে বেড়াতে যান?

কেয়া। না। কাল সমরেশবাবু আমাকে আর আমার একটি বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অনন্ত। ওঃ, তা সমরেশবাবু আপনার কে?

কেয়া। কেউ নন—বন্ধু। আমায় কি কাজ করতে হবে, তা বুঝিয়ে দিলে ভাল হত না?

অনন্ত। কাজ? কাজ কিছুই নয়, দু একটা চিঠি টাইপ করা—এই আর কি। আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি হিন্দু তো?

কেয়া। আমরা ব্রাহ্ম।

অনন্ত। (একটু নীরব থাকিয়া) আমি হিন্দু। হিন্দু আর ব্রাহ্মতে যে কি তফাত, তা এখনও বুঝে উঠতে পারলুম না।

কেয়া। আমিও না।

(উভয়ের হাস্য)

বলাই। (গলা বাড়াইয়া) কত্তা, সব্বাইকে বোঁ বোঁ শব্দে তাড়িয়েছি।

অনন্ত। বেশ। এখন বাইরে পাহারা দাও, আবার কেউ না আসে।

(বলাই অদৃশ্য হইল)

কেয়া। আজ তাহলে উঠি, কাল থেকে কাজে যোগ দেব।

অনন্ত। উঠবেন? তা—আচ্ছা। কাল নিশ্চয় আসবেন তো?

কেয়া। আসব বইকি, ঠিক দশটার সময় আসব।

অনন্ত। না না, যদি কষ্ট হয়, অত তাড়াতাড়ি আসবার দরকার নেই। এগারোটা বারোটা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা যখন সুবিধে হবে আসবেন।

কেয়া। সে কি কথা? সময়েই আসব। কর্তব্যে ত্রুটি করব কেন? (উঠিয়া) আজ চললুম, নমস্কার।

অনন্ত। নমস্কার। নিতান্তই যাচ্ছেন তাহলে?

কেয়া। হ্যাঁ, আজ আসি।

(প্রস্থান)

অনন্ত। কি সুন্দর মেয়ে। কি চমৎকার কথা! আমাদের দেশে এরকম মেয়ে জন্মায়, আমি জানতুমই না। কিন্তু ওই তোতলাটার সঙ্গে মেলামেশা করে কেন? যার তার

সঙ্গে মেয়েদের—। বন্ধু! পুরুষমানুষের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব কেন? বলাই! বলাই!

বলাই। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে মহামায়ার সন্ধান পেলেন?

অনন্ত। মহামায়ার সন্ধান? যাঃ, কথাটা মনেই ছিল না। আচ্ছা, পরে হবে এখন। বলাই, ঘরটা কি বিশ্রী হয়ে আছে দেখছ? ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেল। আর বাজার থেকে কিছু ফুলের তোড়া নিয়ে এস। অর্থাৎ নতুন সেক্রেটারির যাতে ভাল লাগে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। (টাইপিস্টের চেয়ার টিপিয়া) চেয়ারটা শক্ত; একটা গদিমোড়া চেয়ার আনবে, আর গোটা দুই মখমলের কুশন, বুঝেছ?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে বুঝেছি।

পঞ্চম দৃশ্য

নলিনীর বসিবার কক্ষ। বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টা। নলিনী গান গাহিতেছে

—গান—

যদি হাতে হাতে ছোঁয়া লাগে,
(ওগো) মরমে শিহর জাগে।
যদি নয়নে নয়নে চায়
পরাণ গলিয়া যায়।
আঁখির মিনতি-বাণী
মধুর পরশ মাগে;
শুধু হৃদয় দুলিয়ে যাওয়া
ক্ষণিকের অনুরাগে।

(কেয়ার প্রবেশ)

নলিনী। এই যে কেয়া, কি খবর? তারপর এতদিন চাকরি করছিস, তোর ডিটেকটিভ মনিবের কথা একবারও বলিস না কেন?

কেয়া। কি বলব? বলবার কিছু নেই।

নলিনী। তবু—বয়স কত হবে?

কেয়া। হবে পঞ্চাশ-ষাট।

নলিনী। সত্যি? দেখতে কেমন?

কেয়া। ভূতের মত।

নলিনী। ঠাট্টা করছিস?

কেয়া। বিশ্বাস না হয়, একদিন গিয়ে দেখে আসিস।

নলিনী। আমার দরকার নেই। তুই যখন বলবি না, তখন আমি শুনতেও চাই না।

(মুখ ফিরাইয়া বসিল)

কেয়া। অমনই রাগ হল? একটু ঠাট্টাও করব না? আচ্ছা, সত্যি কথা বলছি। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখতে মন্দ নয়—সাধারণ ভদ্রলোকের মত। নাকটি বেশ টিকলো—

নলিনী। (ফিরিয়া) তোর সঙ্গে কি রকম কথাবার্তা হয়?

কেয়া। কথাবার্তা হয় না। তিনিও কাজ করেন, আমিও কাজ করি।
নলিনী। একেবারেই কথা হয় না?
কেয়া। একেবারেই না।
নলিনী। লোকটা বুঝি গোমড়া-মুখো?
কেয়া। হুঁ, ঠিক প্যাঁচার মত।
নলিনী। তুই কথা না কয়ে থাকতে পারিস?
কেয়া। কেন পারব না? আমি আজকাল গম্ভীর হয়েছি।
নলিনী। (কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) সত্যি কেয়া, তুই আজকাল কেমন যেন বদলে গেছিস।
কেয়া। কেন বদলাব না? আজকাল কি আর ছেলেমানুষ আছি? বড় হয়েছি, চাকরি করছি, কত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। (নিজ মনে হাসিল) এখন তোর খবর কি? সমরেশবাবুর সঙ্গে ভালবাসা কত দূর?
নলিনী। ভালবাসা আবার কিসের?
কেয়া। তবে বুঝি প্রেম? আজকাল তোদের মধ্যে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, কিছুই জানতে পারি না। সারাদিন আপিসে থাকি, সমরেশবাবু কত দূর এগুলেন, খবরই পেলুম না। তুই তো আর বলবি না।
নলিনী। বলবার কিছু নেই। প্রেম একটা মরীচিকা, পিপাসার্ত নরনারী ছুটে যায়; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে কিছুই নেই, ধু-ধু বালি—
কেয়া। তুই যদি ফিলজফি আরম্ভ করিস, তাহলে আমি চললুম।
নলিনী। চললি? আচ্ছা কেয়া, তুই কখনও প্রেমে পড়িসনি? প্রেম কি রকম বলতে পারিস না?
কেয়া। না। চললুম, আমার আপিসের সময় হল।

(প্রস্থান)

নলিনী। কেয়া হঠাৎ ওরকম হয়ে গেল কেন? ওর কি একটা হয়েছে। সত্যিই প্রেমে পড়ল নাকি? জানি না, মানুষ মানুষকে ভালবাসে কেন? চেহারা দেখে কি ভালবাসা হয়? কথা শুনে কি ভালবাসা হয়? কিন্তু সমরেশবাবু কি আমাকে ভালবাসেন? বোধ হয় বাসেন। সেদিন পার্কের ধারে ওই ব্যাপার হল, ওঁর চেহারা দেখে আমারই ভয় করতে লাগল। উনি বোধ হয় খুব রাগী।

(চিন্তামগ্ন অবস্থায় ঈষৎ হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সমরেশ প্রবেশ করিল)

সমরেশ। ননমস্কার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম একবার দেখা করে যাই।
নলিনী। বসুন।
সমরেশ। ববসব না, এখনই এক জায়গায় যেতে হবে। সেই লোলোলোকটার খবর পাবার সম্ভাবনা আছে।
নলিনী। কোন্ লোকটার?
সমরেশ। সেই যে সেসেদিন আপনাকে জুতো খুলতে বলেছিল। তাতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার নানাক যতক্ষণ না থ্যাবড়া করে দিচ্ছি ততক্ষণ আমার প্রাণে শাশান্তি নেই। চললুম—নমস্কার। আপনি সাসাবধানে থাকবেন।

(প্রস্থান)

নলিনী। আশ্চর্য মানুষ! ভালবাসা কি এই রকম হয়? কিন্তু তোতলা যে!

ষষ্ঠ দৃশ্য

অনন্তর অফিস। অনন্ত বসিয়া আছে। বেলা আন্দাজ দশটা

অনন্ত। নাঃ, কর্তব্যে বড় অবহেলা হচ্ছে। এ কদিন মহামায়ার কোনও খোঁজই নেওয়া হয়নি। আজ মিস মিত্রকে জিজ্ঞাসা করব, তাঁর বন্ধুর পায়ে লাল জড়ুল আছে কিনা? নাঃ, উনি হয়তো মনে করবেন, আমি ওঁর বন্ধুর প্রতি—। কিন্তু মহামায়া সম্বন্ধে একটা কিছু করা দরকার। (মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া) কি করি? তিনি আজ এত দেরি করছেন কেন? (ঘড়ি দেখিয়া) দশটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে, কালও দু মিনিট দেরি করেছিলেন। ভারি অন্যায়! দেরি করবেন কেন? আপিসের ডিসিপ্লিনের দিকে একটু নজর নেই।

(কেয়া প্রবেশ করিল)

কেয়া। (হাসিমুখে) নমস্কার।

অনন্ত। (গম্ভীর মুখে) নমস্কার। পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে।

কেয়া। (নিজের হাত-ঘড়ি দেখিয়া) না, বরং তিন মিনিট আগে এসেছি। আপনার ঘড়ি ফাস্ট।

অনন্ত। কখখনো নয়। কই, দেখি আপনার ঘড়ি!

কেয়া। (কাছে গিয়া) এই দেখুন।

(অনন্ত কেয়ার হাত ধরিয়া কিয়ৎকাল একাগ্র দৃষ্টিতে ঘড়ি দেখিল;
তারপর তাহার হাতসুদ্ধ ঘড়িটা কানের কাছে ধরিয়া রাখিল)

অনন্ত। তাই তো! আপনার ঘড়ি তো চলছে দেখছি।

কেয়া। হাত ছাড়ুন।

অনন্ত। (হাত ছাড়িয়া দিয়া) ও, আপনার হাতটা যে ধরে আছি তা মনেই ছিল না। কি একটা ভাবছিলুম।

কেয়া। (নিজ স্থানে গিয়া টাইপ-রাইটার ইত্যাদি খুলিতে খুলিতে) আপনি বড্ড ভাবেন। অত ভাবা কিন্তু ভাল নয়।

অনন্ত। না ভেবে উপায় কি? ডিটেকটিভদের সদা-সর্বদাই ভাবতে হয়।

(কেয়া কাজ আরম্ভ করিল। অনন্ত মুগ্ধভাবে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।
দুই মিনিট কাটিয়া গেল)

মিস মিত্র!

কেয়া। (মুখ তুলিয়া) কি?

অনন্ত। আপনি ওটা কি ছাপছেন?

কেয়া। 'ফুটবল রহস্য' কেসের রিপোর্ট তৈরি করছি।

অনন্ত। কোন্‌টা?

কেয়া। ওই যে যাতে হরিহর বসাক নামে একজন লোক ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, ভিড়ের মধ্যে তার পকেট থেকে ন' আনা তিন পয়সা চুরি যায়—সেই কেসটা

অনন্ত। ও, মনে পড়েছে।

(কেয়া আবার ছাপিয়া চলিল)

মিস মিত্র!

কেয়া। কি বলছেন?

অনন্ত। আমার লাল-নীল পেন্সিলটা কোথায় গেল? কেউ কিছু দেখবে না—বড় মুশকিল হয়েছে।

কেয়া। (উঠিয়া গিয়া) এই তো সামনে রয়েছে। চোখে কি দেখতেও পান না।

অনন্ত। ও! (পেন্সিল তুলিয়া ধরিয়া) আরে, এই তো লাল-নীল পেন্সিল। কি ভুল দেখুন তো! চোখ দুটো অন্য দিকে ছিল কিনা, তাই দেখতে পাইনি।

কেয়া। পেন্সিল যখন খুঁজবেন তখন টেবিলের দিকে তাকালেই পারেন। কোথায় ছিল চোখ—কড়িকাঠের দিকে?

অনন্ত। না, অন্যমনস্কভাবে আপনার ওই টাইপ-রাইটারের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। দেখে মনে হচ্ছিল, টাইপ-রাইটারের চাবিগুলো যেন আপনার আঙুলের স্পর্শ পেয়ে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

(গম্ভীর মুখে কেয়া নিজ আসনে গিয়া বসিল ও টাইপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল)

মিস মিত্র!

কেয়া। আবার কি হল? আমাকে কি কাজ করতে দেবেন না?

অনন্ত। কি আশ্চর্য! কাজ আপনি করুন না। আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হল, তাই—

কেয়া। কি প্রশ্ন উদয় হল?

অনন্ত। আচ্ছা, সেদিন পার্কের ধারে আপনার সঙ্গে আর একটি মহিলা ছিলেন না, তাঁর নামটি কি?

কেয়া। তার নাম নলিনী।

অনন্ত। নলিনী? মহামায়া নয়?

কেয়া। (সবিস্ময়ে চাহিয়া) মহামায়া হতে যাবে কেন?

অনন্ত। না না, তার চেহারাটা ঠিক দুর্গাপ্রতিমার মত কিনা তাই ভাবছিলাম, হয়তো তাঁর নাম মহামায়া। তিনি আপনার খুব বন্ধু, না?

কেয়া। (শুষ্কস্বরে) কেন বলুন দেখি?

অনন্ত। এমনিই, সামান্য কৌতূহল আর কি।

কেয়া। ও, আমি ভেবেছিলুম, তার দুর্গাপ্রতিমার মত চেহারা দেখে বুঝি তাকে ভুলতে পারছেন না।

অনন্ত। কি মুশকিল! সেজন্যে নয় মিস মিত্র—আমি—অর্থাৎ—

(কেয়া সবেগে টাইপ করিতে লাগিল)

(আবার কিছুক্ষণ পর) মিস মিত্র!

(কেয়া উঠিয়া গিয়া অনন্তর সম্মুখে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল)

কেয়া। এবার বলুন। আপনার যত প্রশ্ন আছে, সব শেষ করে নিন।

অনন্ত। আমি ভাবছিলুম—আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আমার কত দিন হল আলাপ হয়েছে?

কেয়া। (আঙুলে গুনিয়া) ঠিক এক মাস তিন দিন।

অনন্ত। তাই নাকি? ও, ভাল কথা মনে পড়ল—আপনার মাইনেটা তো দেওয়া হয়নি।

(দেরাজ হইতে নোট বাহির করিয়া)

এই নিন।

কেয়া। এখন রাখুন, যাবার সময় দেবেন।

অনন্ত। না না, এখুনি নিয়ে রাখুন। আমার বড় ভুলো মন, হয়তো যাবার সময় মনে থাকবে না।

কেয়া। বেশ, দিন। (নোট লইয়া) এ কি, কত দিলেন?

অনন্ত। তিনশো টাকা।

কেয়া। তিনশো টাকা! সে কি? মাইনে তো ষাট টাকা।

অনন্ত। কে বললে? ষাট টাকা! হুঃ, অসম্ভব।

কেয়া। কিন্তু বিজ্ঞাপনে যে ষাট টাকা লেখা ছিল।

অনন্ত। ও ছাপার ভুল। খবরের কাগজে কি রকম ছাপার ভুল করে, জানেন তো?

কেয়া। না মিঃ চৌধুরী, আমি ষাট টাকার বেশী নিতে পারব না।

অনন্ত। কি বিপদ! বলছি ছাপার ভুল।

কেয়া। ছাপার ভুল নয়, কেন মিছে কথা বলছেন? ষাট টাকার বেশী এক পয়সা নিলে আমি মনে শান্তি পাব না। এই নিন।

(কতকগুলি নোট ফেরত দিল)

অনন্ত। নেবেন না তাহলে?

কেয়া। না।

অনন্ত। নেবেন না?

কেয়া। না।

অনন্ত। বেশ, যা ইচ্ছে করুন। আমার আপিসে আমার হুকুম কেউ মানে না। বেশ তো, এই যদি আপনার ধর্ম হয়, করুন।

(উদাসভাবে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল। কেয়া নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়া কাজ করিতে লাগিল)

(ঊর্ধ্ব দিকে চাহিয়া) পুরুষমানুষের হাতে বেশী টাকা থাকলে নানান দুর্বুদ্ধি মাথায় আসে। হয়তো কোন্ দিন মদ খাবার ইচ্ছে হবে। হয়তো রেস খেলেই সর্বস্ব উড়িয়ে দেব। সংযত করে রাখে এমন বন্ধু তো কেউ নেই।

কেয়া। (অশ্রুপূর্ণ চোখে) মিঃ চৌধুরী আমাকে মাফ করুন, ওসব কথা বলবেন না। কিন্তু ষাট টাকায় বেশী আমি কিছুতেই নিতে পারব না; তাহলে আমার আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগবে।

অনন্ত। না, তা করবার দরকার কি? আপনার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে, এমন কাজ আমি করতেই বা বলব কেন?

(উদাস গম্ভীর মুখে ভিতরের দিকে প্রস্থান করিল)

কেয়া। কি যে ওঁর মনের ভাব, কিছুই বুঝতে পারি না। এই দিব্যি সহজ মানুষ, হেসে কথা কইছেন; এই একেবারে রেগে টং। পুরুষমানুষের মন পাওয়া ভার। কিন্তু নলিনীর সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন? সেই একবার আধ মিনিটের জন্যে দেখে-ছিলেন, আর ভুলতে পারছেন না? তা বেশ তো, তাই যদি হয় তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু উনি হিন্দু, নলিনী ব্রাহ্ম; কি করে কি হবে? যাক গে, ওসব কথা ভেবে আমার লাভ কি? আমি নিজের কর্তব্য করে যাব; আর, ন্যায্য মাইনের বেশী এক পয়সাও নিতে পারব না। উনি বড়মানুষ, শখ করে ডিটেকটিভ সেজেছেন, পয়সা বেশী থাকে অন্য লোককে বিলিয়ে দিন, আমি নেব কেন?

(কেয়া দৃঢ়ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে অনন্ত আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল)

অনন্ত। মিস মিত্র!

কেয়া। আজ্ঞে।

অনন্ত। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে বেশী টাকা দিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা হয়েছে।

কেয়া। না, ধৃষ্টতা আর কি! আপনি তো ভাল ভেবেই—

অনন্ত। (কেয়ার স্কন্ধে হাত রাখিয়া) বলুন, আমাকে ক্ষমা করলেন?

কেয়া। (উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত স্বরে) বেশ, ক্ষমা করলুম।

অনন্ত। আপনি এখনও রাগ করে আছেন।

কেয়া। রাগ আমি করিনি মিঃ চৌধুরী।

অনন্ত। তবে হাসছেন না কেন?

কেয়া। (অল্প হাসিয়া) এই তো হাসছি।

অনন্ত। (সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া) আসুন, ভাব করে ফেলুন; আর রাগারাগি নয়।

(অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর হাত বাড়াইয়া অনন্তর প্রসারিত দুই হস্ত গ্রহণ করিল)

চলুন, আজ একটা কিছু করা যাক। আপিসে আর ভাল লাগছে না।

কেয়া। কি করবেন?

অনন্ত। চলুন, আজ স্টীমারে করে বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়িয়ে আসা যাক।

কেয়া। না না, সে যে বড্ড দেরি হবে।

অনন্ত। কিছু দেরি হবে না। আমি ঠিক চারটের সময় আপনাকে আপনার বাড়ির দোরে পেঁছে দেব।

(কেয়া তথাপি অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

যদি না যান, বুঝব আমাকে এখনও ক্ষমা করেননি।

কেয়া। (ক্ষীণ কণ্ঠে) বেশ, চলুন।

সপ্তম দৃশ্য

কেয়ার শয়নকক্ষ। শয্যার পাশে গালে হাত দিযা কেয়া একাকিনী বসিয়া আছে। বেলা দশটা

কেয়া। কি করি আমি এখন? ওঁর মনের আসল কথাটি বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট করে তো কিছু বলেনও না। এ অবস্থায় আমি কোন্ পথে চলব? কেন ছাই চাকরি করতে গেলুম? চাকরি ছেড়ে দেব? না, তা হয় না, মা তাহলে বিশ্রাম পাবেন না।

নেপথ্যে হিরণ্ময়ী। কেয়া, খাবি আয়।

কেয়া। যাই মা। কি চান উনি? সত্যিই কি আমাকে? না, নলিনীকে? নলিনীর কথা মাঝে মাঝে আচম্‌কা জিজ্ঞাসা করেন। (অধর দংশন করিয়া) ওঁর মনে কি আছে উনিই জানেন; কিন্তু এদিকে আমার যে মরণ হয়েছে। জানি, মানুষে মানুষে কোন তফাত নেই—ব্রাহ্ম হিন্দু সব এক, তবু—। নাঃ, মনকে আমি শক্ত কবব। ছি, এত চপল আমার মন। ওঁর সঙ্গে আর হেসে কথা কইব না; আপিসে সাধারণ কর্মচারীর মত কাজ করে যাব। উনি মনিব, আমি ওঁর অধীনে কাজ কবি; এ ছাড়া আমাদের

সম্বন্ধ কি?

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। কি হচ্ছে?

কেয়া। কিছু না। দেখতেই তো পাচ্ছিস, বসে আছি।

নলিনী। তা তো দেখছি। আজ আপিস যাবি না?

কেয়া। যাব বোধ হয়।

নলিনী। বোধ হয় কি রে? কি হয়েছে বল তো? চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিস না কি?

কেয়া। চাকরি ছেড়ে দেব কেন?

নলিনী। তবে? ও, বুঝেছি, মনিবের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।

কেয়া। দূর!

(কেয়া মুখ ফিরাইল)

নলিনী। দেখি তোর মুখ। মুখের ভাব তো ভাল নয়। কি হয়েছে কেয়া? শেষে প্রেমে পড়লি না তো?

কেয়া। প্রেম আবার কিসের?

নলিনী। তবে বুঝি ভালবাসা? না, সত্যি বল কেয়া, অমন মন-মরা হয়ে আছিস কেন? আমাকে তো সমরেশবাবুর নাম করে খুব রাগাতিস, এখন বুঝি নিজেরই সেই দশা হয়েছে?

কেয়া। তোর সমরেশবাবু আছে, তাই রাগাতুম। আমার কে আছে?

নলিনী। তোর কে আছে? দাঁড়া, ভেবে দেখি। অমরবাবু? উহুঁ। হরেনবাবু? উহুঁ। কিশোরবাবু? না, তাও নয়। তবে? বুঝেছি ভাই, তুই তোর ডিটেকটিভ মনিবের প্রেমে পড়েছিস।

কেয়া। আঃ নলি, চুপ কর, ওই মা আসছেন।

(হিরণ্ময়ীর প্রবেশ)

হিরণ্ময়ী। হ্যাঁরে, আজ কি আপিস যাবি না? দশটা যে কখন বেজে গেছে।

কেয়া। (উঠিয়া) এই যে যাই মা।

হিরণ্ময়ী। তোর আজকাল কি হয়েছে কেয়া? কদিন থেকে দেখছি মুখ শুকনো। কাজ কি ভাল লাগছে না? ভাল না লাগে ছেড়ে দে।

কেয়া। সে কি মা, কাজ ভাল লাগে বইকি।

হিরণ্ময়ী। তবে? ইদানীং রোজই প্রায় আপিসে যেতে দেরি করিস। আপিস-মাস্টার হয়তো অসন্তুষ্ট হয়।

কেয়া। হোক গে অসন্তুষ্ট।

হিরণ্ময়ী। ও আবার কি কথা? কাজ যতদিন করবি ভাল করেই করবি; কর্তব্যে এলাকাড়ি দিতে নেই। নে আয়, ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে। উনিশ বছর বয়স হতে চলল, এখনও মেয়েব ছেলেমানুষী গেল না।

কেয়া। চল।

(হিরণ্ময়ীর প্রস্থান)

উনিশ বছর বয়স হল; না, আর আমার ছেলেমানুষী শোভা পায় না।

(কেয়ার প্রস্থান)

নলিনী। কেয়া মরেছে। এমন মরা মরেও সুখ। কার পায়ের শব্দ? সমরেশবাবু আসছেন। আজকাল আমার কি হয়েছে, সমরেশবাবুর পায়ের শব্দ পেলেই বুঝতে

পারি।

(ভালভাবে বসিল। পিছনে ফুলের তোড়া লুকাইয়া সমরেশের প্রবেশ)

সমরেশ। এই যে ননলিনী দেবী, আপনি একা আছেন।

সমরেশ। হ্যাঁ, আসুন।

সমরেশ। (নিকটে গিয়া) মানে নলিনী দেবী, আপনি যদি কিছু মনে না করেন—

নলিনী। কি হয়েছে? পেছনে হাত দিয়ে রয়েছেন কেন? দেখি?

(নলিনী যত দেখিতে চেষ্টা করিল, সমরেশও ততই লুকাইতে লাগিল)

সমরেশ। আপনি আগে বলুন, রাগ করবেন না।

নলিনী। রাগ করব কেন? কি এনেছেন, দেখি না!

(সমরেশ পিছন হইতে ফুলের তোড়া বাহির করিয়া নলিনীকে দিল)

সমরেশ। ফুলের তোড়া। নিউ মার্কেটে কিনেছিলাম, ভাবলুম নিয়ে যাই; আপনার হয়তো পছন্দ হবে। আপনি রাগ করেননি তো?

নলিনী। এতে রাগ করবার কি আছে? আঃ, কি চমৎকার গন্ধ!

সমরেশ। ননলিনী দেবী, আমি হতভাগ্য। মুখে মনের কথা প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই, তাই ওই ফুলের সাহায্যে আমার মনের কথা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। মানে আমি আর কি বলব? আপনি তো সবই বুঝতে পারছেন।

নলিনী। সমরেশবাবু, ফুলের সাহায্যে আপনি কি সকলের কাছে মনের কথা প্রকাশ করেন?

সমরেশ। না না, একটা লোক আছে যার কাছে মনের কথা প্রকাশ করব এই ঘুষির সাহায্যে। কিন্তু সে যাক। ননলিনী দেবী, আপনার উত্তর কি পাব না?

নলিনী। আপনি তো কোনও প্রশ্ন করেননি, তবে কিসের উত্তর দেব?

সমরেশ। কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন? বলুন।

নলিনী। কি বলব?

সমরেশ। আপনার মনের কথা।

নলিনী। আমার মনের কথা শুনবেন? আচ্ছা।

(নলিনী সমরেশের কানে কানে কি বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। সমরেশ লাফাইয়া হাসিতে হাসিতে 'ননলিনী দেবী, ননলিনী দেবী' বলিতে বলিতে তাহার অনুসরণ করিল)

অষ্টম দৃশ্য

অনন্তর অফিস। বেলা সাড়ে দশটা

অনন্ত। বলাই, কত দিন হল আমরা কলকাতায় এসেছি?

বলাই। তিন মাস হতে আর দু-তিন দিন বাকি আছে।

অনন্ত। অ্যাঁ, বল কি? এখনও যে মহামায়ার সম্বন্ধে কিছুই করা হল না। নাঃ, আর তো দেরি করা চলে না, এবার যা হয় একটা করা নিতান্ত দরকার। পায়ের জড়ুলটা

সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া যায় কি করে? আজকালকার মেয়েরা সর্বদাই জুতো পরে আছে। মহা মুশকিল!

(জনৈক প্রতিবেশী কেরানী-শ্রেণীর লোকের প্রবেশ)

কি চান?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, আপনার নাম শুনে আসছিলাম।

অনন্ত। বেশ বেশ, আপনার কোনও বিপদ ঘটেছে কি?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, তা বিপদ বইকি।

অনন্ত। বসুন বসুন। বলাই, বলাই, চেয়ার দাও।

(বলাই চেয়ার দিলে ঐ ব্যক্তি বসিল)

এবার আপনার কেস বলুন।

ব্যক্তি। আজ্ঞে, পরশু বিকেলবেলা হাওড়া পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখি—

অনন্ত। অ্যাঁ, কি দেখলেন? আপনার স্ত্রীর জন্যে জুয়েলারির দোকান থেকে অন ইন্সপেক্শন যে গয়না নিয়ে যাচ্ছিলেন সেটা চুরি গেছে, কেমন?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, গয়না নয়।

অনন্ত। গয়না নয়? তবে কি?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, একটা নস্যির কৌটো।

অনন্ত। নস্যির কৌটো? বুঝেছি, সোনার নস্যির কৌটো, যেটা আপনার ঠাকুরদার আমল থেকে বংশের একটা স্মৃতি হিসেবে চলে আসছে, কেমন?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, সোনার নয়। কিন্তু আমার কাছে সোনার চেয়েও মূল্যবান। সাত বছর ধরে সেটা ব্যবহার করছিলাম, বড় মায়া জন্মেছিল।

অনন্ত। সোনার চেয়েও দামী? তবে কি প্ল্যাটিনামের?

ব্যক্তি। আজ্ঞে না, জার্মান সিল্ভারের। সাত পয়সা দিয়ে রাধাবাজারে কিনেছিলাম।

অনন্ত। কি? তুমি সাত পয়সার নস্যির কৌটোর জন্যে আমার কাছে এসেছ?

ব্যক্তি। আজ্ঞে, আপনি ডিটেকটিভ কিনা, বিনা পয়সায় পরের উপকার করেন শুনেছিলাম, তাই।

অনন্ত। বলাই, ওকে সাতটা পয়সা দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দাও। দেখ, ফের যদি নস্যির ডিবে হারাবে তাহলে কিন্তু ভাল হবে না।

ব্যক্তি। আজ্ঞে, আর হারাবে না।

(বলাই লোকটিকে বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল,

বলাই। কত্তা, বোঁ বোঁ শব্দে একটা বুড়ী আসছে।

অনন্ত। বুড়ী? কি রকম বুড়ী?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে নিজের কানেই শুনুন না।

(একটি বুড়ীর প্রবেশ)

বুড়ী। ও বাবা, আমার সর্বনাশ হয়েছে বাবা।

অনন্ত। কি হয়েছে, কি হয়েছে বুড়ী?

বুড়ী। আমার আঁধার ঘরের মানিক, শিবরাত্তিরের সলতে তুমি খুঁজে বার করে দাও বাবা, ভগবান তোমায় রাজা করবেন।

অনন্ত। নিশ্চয় খুঁজে বার করব। কিন্তু কে হারিয়েছে সেটা জানতে হবে তো।

বুড়ী। আমার একটা রামছাগল ছিল বাবা, কাঁঠালপাতা খাইয়ে ছেলের মত করে মানুষ করেছিলুম। কাল সন্ধ্যে থেকে আমার রামধনকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

দোহাই বাবা, তুমি আমার রামধনকে বার করে দাও।

অনন্ত। বটে! আমি এখন তোমার ছাগল খুঁজে বেড়াব? বলাই, বুড়ীটাকে নিয়ে কি করি বল তো? ওর রামধনের একটা ব্যবস্থা কর।

বলাই। কিছু করতে হবে না কত্তা, বোঁ বোঁ শব্দে আমি ব্যবস্থা করছি। এই বুড়ী, আয়।

বুড়ী। ও বাবা, আমার রামধনকে খুঁজে দেবে না বাবা?

বলাই। ওরে বুড়ী, তোর রামধন কি এখনও আছে? বোঁ বোঁ শব্দে হজম হয়ে গেছে।

বুড়ী। অমন অলুক্ষুণে কথা বলো না বাবা। আমার শিবরাত্তিরের সলতে, আমার রামধন রে—

(বুড়ীকে লইয়া বলাইয়ের প্রস্থান। অনন্ত ঘাম মুছিয়া বসিল। বলাই পুনরায় প্রবেশ করিল)

অনন্ত। বলাই, দেখেছ, সাড়ে দশটা বেজে গেল, এখনও সেক্রেটারির দেখা নেই; এই জন্যেই তো কিছু হচ্ছে না। (দ্বারের নিকট শব্দ) ওই বোধ হয় এলেন।

(একটি কাবুলীওয়ালা প্রবেশ করিল)

এ আবার কে?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে প্রকাণ্ড কাবুলীওয়ালা।

অনন্ত। ক্যা মাংতা? আমার এখন শাল দরকার নেই।

(কাবুলী নিজ ভাষায় অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিল। অনন্ত কেবল 'গোয়েন্দা' কথাটা বুঝিতে পারিল)

গোয়েন্দা? হাম গোয়েন্দা হ্যায়। ক্যা মাংতা?

কাবুলী। (নিজ ভাষায় খানিকটা কথা বলিয়া) বিবি বাগ গিয়া।

অনন্ত। (বলাইকে) কি বলছে?

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

অনন্ত। এই মিয়া, কি বলবে স্পষ্ট করে বল, নয় তো ভাগো।

কাবুলী। (স্পষ্টভাবে) বিবি বাগ গিয়া, খুপসুরৎ বিবি বাগ গিয়া।

অনন্ত। ও, একজন মেয়েমানুষ তোমাকে ফেলে ভাগ গিয়া।

(কাবুলী সবেগে মস্তক সঞ্চালন করিল)

বুঝেছি। টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে? রুপিয়া লেকে ভাগ গিয়া?

কাবুলী। নেহি, দিল জান কলিজা।

(বুকে হাত রাখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল)

বলাই। টাকা নয় কত্তা, একজন স্ত্রীলোক ওর মন চুরি করে নিয়ে বোঁ বোঁ শব্দে পালিয়েছে।

অনন্ত। তা আমি কি করব?

(কাবুলী আবেগভরে কিছুক্ষণ নিজ ভাষায় বক্তৃতা দিল)

নাঃ, ব্যাপারটা বড্ড বেশী রহস্যময় হয়ে পড়ছে। একটা কথাও বুঝতে পারছি না। মিয়া সাহেব, হাম আভি বড় ব্যস্ত হ্যায়, তোমার প্রাণের লোক খুঁজে বেড়াবার আমার সময় নেই। তুমি পুলিসে যাও।

কাবুলী। পুলিস?

(লাঠি ঠুকিয়া কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ বক্তৃতা দিল, তারপর পদদাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল)

অনন্ত। নাঃ, মিছে পণ্ডশ্রম, তিন মাস ধরে আপিস খুলে বসে আছি, একটা ভাল কেস

হাতে এল না। কোথায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে কার পকেট কাটা গেছে, কোথায় কাবুলীওয়ালার মন চুরি করে কে পালিয়েছে—এই তদন্ত করে বেড়াও। আর ভাল লাগছে না। বলাই, এবার পাততাড়ি গুটোতে হবে। কিন্তু তার আগে মহামায়ার, অর্থাৎ নলিনীর—

(কেয়া প্রবেশ করিল)

কেয়া। (শুষ্কস্বরে) নমস্কার। একটু দেরি হয়ে গেছে, মাফ করবেন। কাল থেকে ঠিক সময়ে আসব।

(নিজ স্থানে গিয়া বসিল)

অনন্ত। বলাই, তুমি নীচে গিয়ে বস; কাবুলীওয়ালার মত মক্কেল যদি আর আসে, নীচে থেকেই তাড়াবে।

বলাই। আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

অনন্ত। মিস মিত্র, আজ আপনার মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কেয়া। ও কিছু নয়।

অনন্ত। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। (বেহালা বাজাইল) আপনার বন্ধু নলিনীর সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছে, না?

কেয়া। (সবেগে মাথা নাড়িয়া) না।

অনন্ত। তবে কি হয়েছে?

কেয়া। কিছু হয়নি। মিঃ চৌধুরী, আমাকে কাজ করতে দিন।

অনন্ত। ও, বেশ তো। (কিছুক্ষণ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল) মিস মিত্র, আজ একজন প্রেমিক কাবুলীওয়ালা এসেছিল।

কেয়া। কাবুলীওয়ালা?

অনন্ত। প্রেমে পড়ে বেচারা কাবুলীওয়ালার যে রকম দুরবস্থা হয়েছে, তা দেখলে বুক ফেটে যায়। ভাবছি, প্রেম জিনিসটা কি ভয়ানক, কারুর রক্ষে নেই।

(কেয়া সাড়া দিল না, অনন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আড়চোখে দেখিয়া)

আমি ডিটেকটিভের কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। আর ভাল লাগছে না।

কেয়া। (চমকিয়া তাকাইল, পরে নিরুৎসুক কণ্ঠে) তা বেশ। কবে থেকে ছেড়ে দেবেন?

অনন্ত। আর দু-তিন দিন আপিস খোলা থাকবে, তারপরই বন্ধ করে দেব।

কেয়া। তবে আমাকে আগে জানালেন না কেন? আমি অন্যত্র চাকরি খুঁজে নিতুম। কেন আমার ক্ষতি করলেন?

(কেয়ার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল)

অনন্ত। (কেয়ার পিছনে গিয়া) কেয়া, আমি তোমাকে—, আমি তোমাকে অন্যত্র চাকরি করতে দেব না। তুমি আমার কাছে—

(স্কন্ধে হস্ত রাখিল)

কেয়া। (বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া) আমার গায়ে হাত দেবেন না।

অনন্ত। কেয়া, আমি তোমাকে—

কেয়া। চুপ। মনে রাখবেন, আমি মহিলা। কোন্ অধিকারে আপনি আমায় অপমান করেন?

অনন্ত। (স্তম্ভিতভাবে) অপমান!

কেয়া। অপমান নয়তো কি? আপনি মনে মনে একজনকে—উঃ, এত ছলনা আপনার

মনে? আমি আপনার অধীনে চাকরি করি বলে—

(কাঁদিয়া ফেলিল)

অনন্ত। কেয়া, আমি শপথ করে বলছি, আমার মনে কোনও ছলনা নেই।

কেয়া। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনাকে আমি চিনেছি। অসহায়া স্ত্রীলোককে অপমান করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আমি অসহায় নই।

অনন্ত। কি বলেছি আমি যে তুমি ওরকম করছ?

কেয়া। কি বলেছেন? আপনি আমাকে যে অপমান করেছেন, তার চেয়ে বড় অপমান মেয়েমানুষের পক্ষে আর হতে পারে না। (চক্ষু মুছিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে) আমি আর এখানে থাকব না।

অনন্ত। কেয়া, শোন কেয়া।

কেয়া। না, আমি থাকব না, আমি থাকতে পারব না। আপনি আমার কাছে আসবেন না।

(কেয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। অনন্ত মূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল)

অনন্ত। কি হল, অপমান কখন করলুম? (কিছুক্ষণ চিন্তা) ও, বুঝেছি, প্রস্তাব করাটাই অপমান। উনি ব্রাহ্ম মহিলা আর আমি হিন্দু। (অভিভূতভাবে) এতখানি ব্যবধান ভেতরে ভেতরে ছিল। আমাকে মনে মনে ঘৃণা করে। কিছু বুঝতে পারিনি। নিজের মুখেই বলেছে, হিন্দু ব্রাহ্ম সমান; মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকতে পারে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাক, সব চুকে-বুকে গেল। মিথ্যে স্বপ্নের ইমারত তৈরি করেছিলুম। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফেরা যাক, আর কি! বলাই!

(বলাই প্রবেশ করিল)

দেখ, আজ রাত্তিরে জগদীশবাবু আসছেন, চিঠি পেয়েছি। আজ রাত্তিরে অনন্ত ডিটেকটিভের শেষ এক্সপ্লয়েট। রাত্তিরে নলিনী যখন ঘুমোবে তখন তার পা নিশ্চয় খোলা থাকবে, সেই সময় চুপি চুপি ঘরে গিয়ে দেখব, পায়ে জড়ুল আছে কিনা। থাকে ভালই, না থাকে জগদীশবাবুকে বলে দেব—পারলুম না।

বলাই। আজ্ঞে, বোঁ বোঁ শব্দে রাত্তিরে বাড়ি ঢুকবেন? যদি চোর বলে ধরে?

অনন্ত। তাহলে বোঁ বোঁ শব্দে তুমি জেলে চলে যাবে।

বলাই। শেষে বোঁ বোঁ শব্দে আমি?

নবম দৃশ্য

রাত্রি। কেয়ার শয়নকক্ষ। কেয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে। তাহার হস্তে তাহার পিতামাতার বিবাহের সার্টিফিকেট

কেয়া। এর মানে কি? এই তো সার্টিফিকেটে লেখা রয়েছে, মা-বাবার বিয়ে হয়েছে সাতাশে জানুয়ারী ১৯১৯, অর্থাৎ আজ থেকে সতেরো বছর আগে। অথচ আমার বয়স উনিশ বছর! কি করে হল? সার্টিফিকেট তো মিথ্যে নয়, ওই পুরানো দেরাজের মধ্যে ছিল। আর ভাবতে পারি না। তবে কি আমি—উঃ ভগবান, একসঙ্গে কি এত

যন্ত্রণা দিতে হয়! আর যে আমি পারি না। অপমান আর লাঞ্ছনা—পৃথিবীসুদ্ধ আমাকে অপমান আর লাঞ্ছনা করছে। আমার মা বাবা—তাঁরাও জন্মাবধি আমার মুখে এমন করে চুন-কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন কি করব? কোথায় যাব?

(মাথায় হাত রাখিয়া অবস্থান। খোলা জানালা দিয়া নিঃশব্দে অনন্ত প্রবেশ করিল)

(মুখ তুলিয়া সভয়ে) এ কি! কে তুমি?

অনন্ত। অ্যাঁ! কেয়া! আমি ভেবেছিলুম—

কেয়া। তুমি? এ সময় আমার ঘরে কেন?

অনন্ত। আমি ভুল করে—আমি ভেবেছিলুম এটা নলিনীর ঘর।

কেয়া। নলিনীর ঘর মনে করে তুমি আমার ঘরে ঢুকেছিলে? (বিভ্রান্তভাবে তাকাইয়া থাকিয়া) তার ঘরে তোমার কি দরকার?

(অনন্ত নীরব হইয়া রহিল)

ও, বুঝেছি। তুমি যে তাকে ভালবাস।

অনন্ত। (ব্যাকুলভাবে) কেয়া, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি অন্য কাজে—

কেয়া। মিছে কথা বলো না, তুমি নলিনীকে ভালবাস।

(হঠাৎ বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল)

অনন্ত। (খাটের ধারে নতজানু হইয়া) কেয়া, আমার অন্তর্যামী জানেন, আমি তাকে ভালবাসি না।

কেয়া। নিশ্চয় বাস।

অনন্ত। না কেয়া, আমি তোমাকে ভালবাসি।

কেয়া। তবে এই রাত্রে নলিনীর ঘরে এসেছিলে কেন?

অনন্ত। কেয়া, তবে বলি শোন। আমাদের দেশের এক জমিদারের মহামায়া নামে এক মেয়ে হারিয়ে যায়, আমি তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। তোমার বন্ধু নলিনীকে দেখে আমার সন্দেহ হয় যে সে মহামায়া।

কেয়া। কেন মিছে রূপকথা তৈরি করছ?

অনন্ত। রূপকথা নয়, আমি প্রমাণ করব যে সত্যি কথা।

কেয়া। (ধড়মড় করিয়া উঠিয়া) চুপ। কে যেন এদিকে আসছে। বোধহয় মা কিংবা বাবা। তাঁরা যদি এসে তোমাকে আমার ঘরে দেখতে পান, কি মনে ভাববেন?

অনন্ত। আমি যাচ্ছি। কিন্তু কেয়া, বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ছাড়া আর কারুকে—

(কেয়া ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল)

চললুম, কিন্তু কাল তোমার প্রতীক্ষা করব; এস কেয়া, তখন সব কথা বলব।

(গবাক্ষপথে প্রস্থান)

কেয়া। সত্যি মিথ্যে সব গুলিয়ে গেছে। কি বিশ্বাস করব, কি অবিশ্বাস করব, তাও বুঝতে পারছি না।

(ভূপতিত সার্টিফিকেট তুলিয়া লইল)

কিন্তু এতে অবিশ্বাস করবার তো কিছু নেই, এ যে একেবারে স্পষ্ট।

(হিরন্ময়ী প্রবেশ করিলেন)

হিরন্ময়ী। তোমার ঘরে যেন কার গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম। কেয়া, কার সঙ্গে কথা কইছিলি? তোর হাতে ও কিসের কাগজ?

কেয়া। মা, বাবা কই?

(হীরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন)

এই যে—বাবা মা, আমার বয়স উনিশ বছর কিনা?

হিরণ্ময়ী। হ্যাঁ, তা কি হয়েছে? কেয়া, অমন করছিস কেন?

কেয়া। (সার্টিফিকেট দিয়া) তবে এর মানে কি?

(হীরেন্দ্র ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন; হিরণ্ময়ী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

বাবা, আমি জানতে চাই, এর মানে কি? আমি কি তবে—

হিরণ্ময়ী। না না, কেয়া তা নয়।

কেয়া। তবে কি? বাবা, সব কথা বল, আমি সহ্য করতে পারছি না।

(স্বামী-স্ত্রী দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন)

হীরেন্দ্র। (ভগ্নস্বরে) সত্যই জয়ী হোক। কেয়া, তুমি আমাদের—আমাদের মেয়ে নও; তোমাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।

কেয়া। কুড়িয়ে পেয়েছিলে? আমি কুড়নো মেয়ে?

হীরেন্দ্র। হ্যাঁ। আমরা নিঃসন্তান। আমাদের বিবাহের দু বছর পরে অর্ধোদয় যোগের দিন তোমাকে কুড়িয়ে পাই, সে আজ পনেরো বছরের কথা। তখন তোমার বয়স আন্দাজ চার বছর। তোমাকে পেয়েই আমি রেঙ্গুনে চলে যাই, তারপর—

কেয়া। মা, তুমি আমার মা নও? বাবা, তুমিও আমার কেউ নও?

হিরণ্ময়ী। (কাঁদিতে কাঁদিতে কেয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা মা, তুই-ই আমাদের সর্বস্ব।

হীরেন্দ্র। নিজের সন্তান কি রকম হয় জানি না, কিন্তু এই চোদ্দ বছর ধরে তুমিই আমাদের বুক জুড়ে আছ।

কেয়া। তবু—আমি তোমাদের কেউ নই, রক্তের বন্ধন নেই। আমি একা, পৃথিবীতে আত্মীয় কেউ নেই, একেবারে একা। কুড়নো মেয়ে (কিছুক্ষণ মূঢ়বৎ থাকিয়া) মা, আমি চললুম।

হিরণ্ময়ী। কোথায় যাবি কেয়া?

কেয়া। একজন আমার প্রতীক্ষা করে আছে, তাকে সব কথা বলতে হবে। সে আমাকে চায় কিনা জানি না, কিন্তু তাকে সব কথা না বললেও আমার নিস্তার নেই।

(দ্রুত প্রস্থান)

হিরণ্ময়ী। কেয়া, কেয়া! ওগো, তুমি বসে রইলে?

হীরেন্দ্র। কি করব? মিথ্যে দিয়ে ওকে বেঁধে রেখেছিলুম, তাই আজ মিথ্যের শেকল কেটে উড়ে গেল। (উঠিয়া) কার কাছে গেল?

হিরণ্ময়ী। তা তো জানি না।

(নলিনী প্রবেশ করিল)

নলিনী। কিসের গোলমাল হচ্ছিল? কেয়া কোথায়?

হিরণ্ময়ী। সে কোথায় চলে গেল!

নলিনী। চলে গেল?

হিরণ্ময়ী। নলিনী, তুই জানিস সে কোথায় গেছে? তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস?

নলিনী। (দাঁতে আঙুল কামড়াইয়া চিন্তা করিল) বোধহয় পারি। বুঝেছি, সে কার কাছে গেছে। আমার কাছেও লুকিয়েছিল—কিন্তু আমি বুঝেছি। আসুন আমার সঙ্গে।

দশম দৃশ্য

অনন্তর অফিস। রাত্রিকাল

অনন্ত। সাড়ে দশটা তো বাজে। এখনই জগদীশবাবু আসবেন। বলাই! বলাই!

(বলাই আসিল না)

কেয়া কি কাল আসবে? সে ভেবেছে, আমি নলিনীকে ভালবাসি, তাই—; বোধ হয় আমাকে সত্যিই ঘৃণা করে না। বলাই! বলাই! বলাইটা আবার এত রাত্তিরে কোথায় গেল?

(দ্বারের বাহিরে কাতরোক্তি)

ও কিসের শব্দ? কেয়ার গলা না?

(ছুটিয়া প্রস্থান করিল ও কিয়ৎকাল পরে কেয়াকে কোলে লইয়া প্রবেশ করিল)

কেয়া, কি করে পড়ে গেলে? পায়ে কি লেগেছে?

কেয়া। অন্ধকার সিঁড়িতে উঠতে পা মচকে গেছে।

অনন্ত। (কেয়াকে সোফায় শোয়াইয়া) কোন্ পা?

কেয়া। বাঁ পা। আমি এই রাত্রে তোমার কাছে এসেছি—

অনন্ত। ও কথা পরে হবে, এখন পা দেখি।

(জুতা খুলিতে প্রবৃত্ত)

কেয়া। আমার কেউ নেই, আমি একা, আমি কুড়নো মেয়ে।

অনন্ত। (জুতা খুলিয়া জড়ুল দেখিয়া) অ্যাঁ, কেয়া, তুমি মহামায়া?

কেয়া। মহামায়া!

অনন্ত। (উত্তেজনায় দিশহারা হইয়া) হ্যাঁ, এই যে জড়ুল। মহামায়া, তুমি কেয়া? মানে—কেয়া, তুমি মহামায়া?

কেয়া। মহামায়া কে?

অনন্ত। সেই যে, যার কথা তোমায় বলেছিলুম, যাকে খুঁজতে আমি বেরিয়েছি। উঃ, কি সংঘাতিক ডিটেকটিভ আমি। তিন মাস ধরে তোমাকে দেখছি, ভালবাসছি, আর তুমিই যে মহামায়া তা বুঝতে পারিনি।

কেয়া। তাহলে আমাকে খুঁজতেই তুমি আজ রাত্রে—

অনন্ত। হ্যাঁ, পায়ের ওই জড়ুল দেখবার জন্যে।

কেয়া। (সলজ্জ কণ্ঠে) আমি ভেবেছিলুম তুমি নলিনীকে—

(অনন্ত হাঁটু গাড়িয়া কেয়াকে জড়াইয়া ধরিল)

আমি বুঝতে পারিনি। আমার ভুল হয়েছে। মাফ্ কর।

(কেয়া অনন্তর বুকে মাথা রাখিল। জগদীশ প্রবেশ করিলেন)

জগদীশ। অনন্ত!

অনন্ত। (লাফাইয়া উঠিয়া) কাকাবাবু, এই নিন আপনার মেয়ে মহামায়া। ওই দেখুন পায়ে জড়ুল।

জগদীশ। (কম্পিত স্বরে) মহামায়া!

অনন্ত। কেয়া, ইনি তোমার—মানে—আসল বাবা।

কেয়া। (বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া) না না, আমার মা কোথায়, বাবা কোথায়?

আমি যে তাঁদের কাছে যাব।

জগদীশ। মহামায়া, যাঁরা তোমায় প্রতিপালন করেছেন—

কেয়া। প্রতিপালন! না না, তাঁরাই আমার সত্যিকার মা বাবা। আজ আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে চলে এসেছি। (অনন্তকে) আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে চলুন।

(নলিনী, হিরণ্ময়ী ও হীরেন্দ্র প্রবেশ করিলেন)

অনন্ত। নিয়ে যাবার আর দরকার হল না, ওঁরা নিজেরাই এসে পড়েছেন। নলিনী দেবীও আছেন দেখছি।

হিরণ্ময়ী। কেয়া!

(হিরণ্ময়ী ছুটিয়া গিয়া কেয়াকে জড়াইয়া ধরিলেন। হীরেন্দ্র কেয়ার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। নলিনী হাত ধরিয়া বসিল। কিয়ৎকাল আদর ও অশ্রু বিসর্জন চলিল। জগদীশ নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন)

অনন্ত। এবার পরিচয়টা করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন জগদীশবাবু, বিরাজপুরের জমিদার, মহামায়ার অর্থাৎ কেয়ার বাবা।

(হিরণ্ময়ী সভয়ে তাঁহার দিকে তাকাইলেন; হীরেন্দ্র হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন)

হীরেন্দ্র। (কণ্ঠস্বর সংযত করিতে করিতে) জগদীশবাবু, মেয়ে আপনার, কিন্তু—

জগদীশ। (মাথা নাড়িয়া) না, মেয়ে আমার নয়, মেয়ে আপনাদের। আমি ওর জন্মদাতা পিতা বটে, কিন্তু আপনারাই ওর প্রকৃত মা বাপ। যে ভয়ঙ্কর দুর্গতির পথে ওর নিয়তি ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আপনারা ওকে সেই দুর্নিয়তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এতদিন পরে আমি বাপের দাবিতে যদি ওকে আপনাদের স্নেহের নীড় থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না। মেয়ে আপনাদেরই থাক। তবে—তবে আপনারা যদি অনুমতি দেন, আমি রোজ এসে ওকে দেখব, দুটো কথা কইব। এখন ও আমাকে চেনে না, ভালবাসে না; পরে হয়তো—

(জগদীশ ভাঙিয়া পড়িলেন)

(হীরেন্দ্র জগদীশকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। তারপর উভয়ে দূরে গিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন)

অনন্ত। চলুন চলুন, আপনারা ও ঘরে বসবেন চলুন।

(অনন্ত হীরেন্দ্র, জগদীশ ও হিরণ্ময়ীকে লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল)

নলিনী। (চুপিচুপি) তুই হীরেনবাবুরও নয়, জগদীশবাবুরও নয়; তুই কার আমি জানি।

কেয়া। কার?

নলিনী। ওই ওঁর। (অনন্তকে নির্দেশ করিল) লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি! তোর ডিটেকটিভ মন্দ নয় ভাই।

কেয়া। তোর তোতলার চাইতে ভাল।

নলিনী। ইঃ!

(বলাইয়ের ঘাড় ধরিয়া সমরেশ প্রবেশ করিল)

সমরেশ। ধধধরেছি! একি, আপনারা সসসব এখানে? নননলিনী দেবীও রয়েছেন। ব্যাব্যাপার কি?

নলিনী। ভয়ঙ্কর, সাংঘাতিক।

সমরেশ। কিকিকিছু বুঝতে পারছি না। যা হোক, আপনারা আছেন ভাভালই হল।

আপনাদের সাসামনেই আজ এই ডিডিডিডিটেকটিভপুঙ্গবের নাক থ্যাথ্যাবড়া করব।

অনন্ত। সসসমরেশবাবু যে।

সমরেশ। ভেভেভেংচি কেটো না বলছি, মেরে পপপস্তা উড়িয়ে দেব।

নলিনী। কেন, কি করেছেন উনি?

সমরেশ। ও-ই সেদিন আপনার জুজুজুতো খুলতে চেয়েছিল। আজ এই চাচাকরটার কাছ থেকে বার করেছি।

(বলাইকে ঝাঁকানি দিল)

বলাই। (করুণ স্বরে) আজ্ঞে, উনি আমাকে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে গলা-টিপুনি দিলেন, তাই বোঁ বোঁ শব্দে বলে ফেলতে হল।

সমরেশ। (বলাইয়ের ছাড়িয়া দিয়া) ডিডিডিটেকটিভ, এবার প্রস্তুত হও। আজ তোতোমার অনন্ত দুর্দশা করব।

(আস্তিন গুটাইতে লাগিল)

অনন্ত। দেখুন, আজ আমার মনটা ভয়ঙ্কর ভাল আছে, তাই আপনাকে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, আমি যুযুৎসু জানি।

সমরেশ। বেবেশ, দেখা যাক, আমার ঘুঘুষির জোর বেশী, না তোমার যুযুযুযুৎসুর জোর বেশী।

(উভয়ে মারামারি করিতে উদ্যত হইল)

কেয়া। নলি, তোর সমরেশবাবু যদি আমার—আমার ডিটেকটিভের গায়ে হাত দেয়, তাহলে আমি জন্মে তোর সঙ্গে কথা কইব না।

নলিনী। তা আমি কি করব? যেমন কর্ম তেমনই ফল।

কেয়া। তুই তোর সমরেশবাবুকে সামলা।

নলিনী। (উঠিয়া গিয়া) থাম, আর লড়াই করতে হবে না।

সমরেশ। কেকেন হবে না?

নলিনী। (হাত ধরিয়া) আমার হুকুম।

সমরেশ। (বিগলিত আনন্দে) তোতোমার হুহুকুম?

নলিনী। হ্যাঁ। কেন, আমি তোমায় হুকুম করতে পারি না?

সমরেশ। কেকে বলে পার না? কিকিন্তু ওর নাক থ্যাবড়া করা যে নিতান্ত দদরকার।

নলিনী। না, কিছু দরকার নেই। উনি কেয়ার—

— (কানে কানে কথা বলিল)

সমরেশ। অ্যাঁ! তাতাই নাকি?

অনন্ত। সমরেশবাবু, স্বীকার করছি যে নলিনী দেবীর জুতো খোলবার প্রস্তাব করা আমার অন্যায় হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম উনিই মহামায়া।

সমরেশ। বুঝতে পারলুম্ না। কিন্তু যখন আপনি অন্যায় স্বীস্বীকার করছেন তখন আর কোনও কথা নেই।

(উভয়ে করমর্দন করিল। সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। হ্যাঁরে অন্তু, তোর কি কাণ্ড! একেবারে তিন মাস কোন খোঁজখবর নেই!

অনন্ত। এই যে দিদি, এসে পড়েছ ভালই হয়েছে, মহামায়াকে খুঁজে পেয়েছি।

সুরমা। তুই খুঁজে বার করলি? আমি তো আগেই বলেছিলুম তুই পারবি। কাকাবাবুকে খবর দিয়েছিস?

অনন্ত। কাকাবাবু ও ঘরে। সে কাহিনী বলব'খন। এ'দের সঙ্গে আগে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি সমরেশবাবু, আর ইনি মিস নলিনী দেবী—খুব শিগ্‌গির

মালাবদল করবেন। আর ইনি তোমাদের মহামায়া।

সুরমা। (কাছে গিয়া) এই মহামায়া! কাকাবাবু তো ঠিকই বলেছিলেন—সত্যিই এ যে দুর্গাপ্রতিমা, এটিকে তো বাড়ি নিয়ে যেতেই হয়, বাবার ইচ্ছে তো আর ঠেলা যায় না।

অনন্ত। সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তুমি কাকাবাবুর সংগে ততক্ষণ পাকাপাকি করে এস।

সুরমা। আচ্ছা যাই।

(প্রস্থান)

বলাই। বোঁ বোঁ শব্দে সব ভাব হয়ে গেল দেখছি। মাঝ থেকে আমিই কেবল গলা-টিপুনি খেলুম।

অনন্ত। (কেয়ার পাশে বসিয়া) আজকের রাত্রিটা ভারি আশ্চর্য! যেন রূপকথার রাত্রি!

নলিনী। কেয়া, তুই একটা গান গা। আজকের রাত্রির সেই হবে সবচেয়ে সুন্দর পরিসমাপ্তি।

কেয়া। আমি পারব না, আমার পা মচকে গেছে। তার চেয়ে তুই গা, তোর গান শুনতে সমরেশবাবু বড্ড ভালবাসেন।

সমরেশ। মামামামানে?

(নলিনী তাহাব ঠোঁটে আঙুল বাখিযা তাহাকে নিবাবণ করিল)

নলিনী। তার চেয়ে এস সবাই মিলে গাই।

অনন্ত। সেই ভাল, আসুন।

—গান—

তোমায় আমায় যখন মিলন হবে,
ধরার বুকে দুখের ভরা তখন কি আর রবে?
ছয়টি ঋতুর অযুত ফুলের ডালা,
রচবে শুধু একটি মিলন-মালা,
অশোক নীপ কুন্দ কমল-বালা
থাকবে গাঁথা একটি সুতোয় সবে।
আকাশ কি গো রইবে জলদ ছাওয়া,
বইবে কি ধীরে মঞ্জু মলয় হাওয়া?
তোমার আমার দুটি হৃদয় ঘিরে
রাগ-রাগিণীর নৃত্য হবে কি রে!
চন্দ্র তারার বরণ-বাতি শিরে
মাতবে নিখিল মিলন মহোৎসবে।

যবনিকা পতন

পথ বেঁধে দিল

ফেড্ ইন্।

বঙ্গদেশ ও সাঁওতাল পরগণার মাঝামাঝি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের এক অংশ। পথ নির্জন; কেবল একটিমাত্র মোটর সাইক্লের আরোহী প্রচন্ড বেগে সাইক্ল্ চালাইয়া যাইতেছে।

মোটর সাইক্লের আরোহী সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান এক যুবা— তাহার নাম রঞ্জন-প্রকাশ সিংহ। সে মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। মোটর সাইক্লের আওয়াজে তাহার গানের কথাগুলা কিন্তু ভাল ধরা যাইতেছে না।

এইভাবে চলিতে চলিতে রাস্তার পাশে একটি সাইন-পোস্ট যুবকের দৃষ্টিগোচর হইল। সে গাড়ির গতি হ্রাস করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

মোটর সাইক্ল সাইন-পোস্টের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন গাড়ি হইতে না নামিয়া সাইন-পোস্টের লেখা পড়িল—

'ঝাঝা—১৭৫ মাইল'

রঞ্জনঃ ঝাঝা—১৭৫ মাইল। বেশ কথা...

রঞ্জন শিষ্টতাসহকারে সাইন-পোস্টের দিকে ঘাড় নাড়িল; সিগারেট কেস বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল; তারপর সাইন-পোস্টের দিকে চক্ষু বাঁকাইয়া অর্ধস্ফুট একটি 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া গাড়ি চলিয়াছে। মোটরের ফট্ ফট্ শব্দের সহিত গানের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

ডিজল্‌ভ্।

কলিকাতা শহর।

একটি বড় দোকানের দরজার মাথায় প্রকান্ড সাইনবোর্ড টাঙানো রহিয়াছে—

'বৃহৎ দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা'
স্বত্বাধিকারীঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ

দোকানের প্রশস্ত দ্বার কাচ-নির্মিত। এই পথে ক্রমাগত বহু ক্রেতা প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে। কাহারও কাহারও চোয়াল ও মাথা ঘিরিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধা; তাহা হইতে অনুমান হয় ইহারা দন্তশূলের রোগী। যাহারা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে তাহাদের সকলের হাতেই সদ্য-ক্রীত ঔষধের শিশি।

দোকানের অভ্যন্তর।

একটি বড় ঘর। প্রত্যেক দেয়াল বহু ঊর্ধ্ব পর্যন্ত ঔষধের আলমারি দিয়া ঢাকা। ঘরের মাঝখান দিয়া উঁচু কাউন্টার এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত চলিয়া গিয়াছে। কাউন্টারের একদিকে ক্রেতারা, অপর দিকে দোকানের কর্মচারিগণ। দ্রুত কাজ চলিতেছে; কর্মচারিগণ ঔষধ কাগজে মুড়িয়া দিতেছে, টাকা লইতেছে; ক্যাস্ মেমো কাটিতেছে। একটা সমবেত গুঞ্জন শব্দ মৌমাছিপূর্ণ মৌচাকের কর্মতৎপরতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কাউন্টারের ঠিক মধ্যস্থলে স্বত্বাধিকারী প্রতাপবাবু একটি উঁচু চেয়ারে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে কাউন্টারের উপর মোটা মোটা কয়েকটি খাতা কাগজ কলম

প্রভৃতি রহিয়াছে। প্রতাপবাবুর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। তাঁহার বাম গণ্ডে সুপারির আকারের একটি আব্ আছে। তিনি যে একজন পাকা ও হুঁসিয়ার ব্যবসাদার তাহা তাহার চোখের সতর্ক দৃষ্টি হইতে পরিস্ফুট। তাঁহার চোখ দোকানের চারিদিকে ঘুরিতেছে ; অথচ তিনি অমায়িকভাবে বিধুবাবুর সহিত গল্প করিতেছেন।

বিধুবাবু কাউণ্টারের বাহিরের দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি প্রতাপবাবুর মত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক; একজোড়া ভিজা-বিড়াল জাতীয় গোঁফ আছে। তিনি সামাজিক জীব, অত্যাধুনিক সমাজে তাঁহার গতিবিধি আছে। এখানকার কথা ওখানে চালাচালি করা এবং নিজে নির্লিপ্তভাবে মজা দেখাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

বিধুবাবু ও প্রতাপবাবুতে কথা হইতেছে। বিধু সপ্রশংস নেত্রে প্রতাপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—

বিধুঃ বাস্তবিক তোমাকে দেখলে আনন্দ হয়। এই দাঁতের ওষুধ তৈরি ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছ, কিন্তু এখনও রোজ দোকানে এসে বসা চাই...

প্রতাপ একটু গ্রাম্ভারিভাবে হাসিলেন।

প্রতাপঃ ভায়া, নিজে না দেখলে ব্যবসা চলে না—সব ব্যাটা চোর। বুঝলে?

বিধু ঃ যাই বল, এবার কিন্তু তোমার বিশ্রাম করা দরকার। আর কি, ছেলে লেখা-পড়া শেষ করল, এবার তার হাতে দোকান তুলে দিয়ে বাড়িতে বসে আরাম কর।

প্রতাপের মুখচোখের ভাব একটু কড়া আকার ধারণ করিল।

প্রতাপ ঃ হুঃ—আরাম করব!

এই সময় একটি কেরানী কয়েকটি কাগজপত্র লইয়া প্রবেশ করিল ও সেগুলি প্রতাপের সম্মুখে স্থাপন করিল। প্রতাপ সেগুলির উপর চোখ বুলাইয়া দস্তখৎ করিলেন। কেরানী কাগজপত্র লইয়া চলিয়া গেল।

বিধু এইবার কথা কহিলেন।

বিধু ঃ (ঈষৎ বিস্ময়ে) কিন্তু তোমার রঞ্জন তো খুব ভাল ছেলে! সমাজে সকলের মুখেই তার সুখ্যাতি শুনতে পাই। সবাই বলে অমন ছেলে হয় না!

প্রতাপ ঃ (সক্ষোভে) আরে, ভাল ছেলে হয়েই তো হয়েছ বিপদ। তাকে কলকাতা থেকে একেবারে বাইরে পাচার ক'রে দিয়েছি।

বিধু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন।

বিধু ঃ বল কি! কেন হে?

প্রতাপ ঃ কেন আবার! তুমি তো সবই জানো।. .(গলা খাটো করিয়া) আমাদের সমাজে যত—এই--প্রবীণা ভদ্রমহিলা আছেন না?--সকলের নজর আমার ছেলেটার ওপর। সবাই চান, কোনও ফিকিরে আমার ছেলেটিকে ফাঁসিয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। তার ওপর, এখন ছেলে আমার এম্. এস্-সি পাস করেছে—এখন তো কি বলে ভদ্রমহিলারা সব হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাই মণ্টে মণ্টে ছেলেটিকে...

আঙুলে তুড়ি দিয়া প্রতাপ এমন একটি হস্তভঙ্গী করিলেন যাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি পুত্রকে বহুদূরে প্রেরণ করিয়াছেন। বিধু হাস্য গোপনের চেষ্টায় মুখ বিকৃত করিয়া গালের উপর হাত রাখিলেন : প্রকাশ্যে হাসিয়া ফেলিলে হয়তো প্রতাপ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। প্রতাপ কিন্তু তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করিলেন।

প্রতাপ ঃ কি হে, তোমারও আবার দন্তশূল চাগাড় দিল না কি? (পকেটে হাত দিয়া) ভেবো না, আমার পকেটেই দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা আছে—এই নাও, খেয়ে ফ্যালো—দু' মিনিটে আরাম হয়ে যাবে।

তিনি বড়ি বাহির করিয়া ধরিলেন। বিধু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বিধু ঃ না না, দন্তশূল নয়। বলছিলুম কি যে, ছেলের বিয়ে তো তোমাকে দিতেই হবে—তা, সমাজেরই একটি ভাল মেয়ে দেখেশুনে—

প্রতাপ বড়ি পুনশ্চ পকেটে পুরিলেন; তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন।

প্রতাপ ঃ হুঃ—আমি একটা হাড়হাবাতে ফাজিল বেহায়া মেয়ে বৌ ক'রে ঘরে আনব? আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে, আমি রাজার ঘরে তার সম্বন্ধ ঠিক করছি।

বিধু পুলকিত আগ্রহে কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন।

বিধু ঃ ও—তাই। বুঝেছি। তা, সে জন্যে ছেলেকে একেবারে দেশান্তরী করবার কি দরকার ছিল?

প্রতাপ সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া ঈষৎ খাটো গলায় জবাব দিলেন।

প্রতাপ ঃ তুমি বোঝো না বিধু। আজকালকার নয়া আমলের ছোঁড়ারা একটু ফসা-গোছ মেয়ে দেখেছে কি পট ক'রে প্রেমে পড়ে গেছে। আমার রঞ্জন অবশ্য তেমন নয়—কিন্তু বলা তো যায় না। এখন ধর, আমার ছেলেটি একদিন এসে যদি বলে—'বাবা, আমি অমুক কলেজের কুমারী অমুককে ভালবেসে ফেলেছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'—তখন আমি কি করব? তাই এই মতলব করেছি, বাবাজীকে একেবারে পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপর এদিকে সব ঠিকঠাক ক'রে একদিন নিজে গিয়ে বাবাজীকে নিয়ে আসব। ব্যস্।

বিধু হাসিতে হাসিতে বিদায় লইবার উপক্রম করিলেন।

বিধু ঃ মন্দ ফন্দি আঁটো নি। তা, ছেলেকে পাঠালে কোথায়?

প্রতাপ ঃ (সগর্বে) এমন জায়গায় পাঠিয়েছি যেখানে কোনও ভদ্রমহিলা নাগাল পাচ্ছেন না। ঝাঝাতে নতুন বাড়ি কিনেছি জানো তো?

প্রতাপ মস্তক সঞ্চালন ও চক্ষের ভংগী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে ছেলেকে তিনি সেইখানেই পাঠাইয়াছেন। বিধু সংবাদটি পরিপাক করিয়া ঘাড় নাড়িলেন, তারপর ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বিধু ঃ বেশ বেশ। আজ চল্‌লুম ভাই—

বিধু প্রস্থানোদ্যত হইলে প্রতাপ সহসা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ ঃ ওহে বিধু! দেখো, তোমাকে চুপি চুপি বললুম, কথাটা যেন চাউর হয়ে না পড়ে—

বিধু ঃ আরে না না, পাগল নাকি?

বিধু প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ ঈষৎ উৎকণ্ঠিত সংশয়ের ভাব মুখে ফুটাইয়া সেই-দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়া রঞ্জন মোটর সাইক্‌লে চলিয়াছে। তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে ঋজু নির্জন পথ পড়িয়া আছে।

কাট্।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের অন্য অংশ। রাস্তার একপাশে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে। গাড়িতে আরোহী কেহ নাই।

গাড়ির আরও নিকটবর্তী হইলে দেখা যায়, গাড়ির তলা হইতে দুটি পা বাহির

হইয়া আছে, যেন কেহ গাড়ির তলায় ঢুকিয়া গাড়ি মেরামত করিতেছে। পা দুটি আকারে ক্ষুদ্র ও জুতা বর্জিত।

দূরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গেল। তারপর দেখা গেল রঞ্জন এইদিকেই আসিতেছে।

রঞ্জনের বাইক ঠিক মোটরকারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন তদবস্থায় গাড়ির মধ্যে উঁকি মারিল।

রঞ্জন ঃ আরে! বিলকুল ফাঁকা—ওঃ!

নীচের দিকে নজর পড়িতে সে পা দুটি দেখিতে পাইল। বাইক হইতে নামিয়া সে পদদ্বয়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; কোমরে হাত রাখিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ ওহে ছোকরা! কি হয়েছে তোমার কারের? বেরিয়ে এসো।

কারের তলা হইতে কোনও জবাব আসিল না। তখন রঞ্জন নত হইয়া পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল। পায়ের আঙুল কুঁকড়াইয়া যতই সরিয়া যাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল, রঞ্জন ততই আমোদ বোধ করিয়া সুড়সুড়ি দিতে লাগিল।

অবশেষে পাযের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল গাড়ির নীচের লোকটি বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। রঞ্জন তখন একটু দূরে সরিযা গিয়া সকৌতুকে এই নিষ্ক্রমণক্রিয়া দেখিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে তাহার সহাস্য মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল; কৌতুকের পরিবর্তে একটা বোকাটে বিস্ময়ের ভাব তাহার চক্ষু ও অধরকে সুবর্তুল করিয়া দিল।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখা গেল, যিনি গাড়ির তলা হইতে বাহির হইযা উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছেন তিনি যুবতী। তাঁহার চেহারা অতিশয় সুশ্রী, কিন্তু সম্প্রতি কালিমাখা এক ফোঁটা চর্বির দাগ তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাঁহার বুক হইতে হাঁটু পর্যন্ত একটি ক্যাম্বিসের ওভার-অল্ দ্বারা আবৃত। দক্ষিণ হস্তে একটি স্প্যানার, দুই চক্ষে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ মানসিক উষ্ণতার পরিমাপ ঘোষণা করিতেছে।

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জনের মুখোমুখি দাঁড়াইলেন; হাতের স্প্যানার দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া চাপা ক্রোধের স্বরে কথা কহিলেন—

যুবতী ঃ কে আপনি?

রঞ্জন যুবতীব মুখ হইতে স্প্যানারের দিকে তাকাইয়া এক পা পিছু হটিল; তার-পর কোণাচেভাবে নিজের বাইকের দিকে আগাইতে লাগিল। যুবতীর দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিল। নিজেব গাড়ির উপর চাপিয়া বসিয়া রঞ্জন ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিল; যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে কহিল—

রঞ্জন ঃ আমি! কেউ না—মানে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম—

যুবতী আরও দুই পা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ চোখের ভঙ্গীতে অহিংসা-নীতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইল না।

যুবতী ঃ আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিলেন কেন?

শান্তিকামী রঞ্জন ডান হাত নাড়িয়া ব্যাপারটাকে সহজতার পর্যায়ে আনিবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জন ঃ মানে—আমার কোনও ইয়ে ছিল না। আমি পা দেখে ভেবেছিলুম আপনি পুরুষমানুষ—অর্থাৎ কিনা—ছেলেমানুষ—অর্থাৎ—

কথার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার হস্তভঙ্গী করিয়া রঞ্জন বুঝাইবার চেষ্টা করিল

যে সে যুবতীটিকে কিশোরবয়স্ক বালক বলিয়া ভুল করিয়াছিল।

যুবতীর মুখমণ্ডলের দৃপ্ত অরুণিমা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল; তিনি নিজের নগ্ন পদদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি অবনত করিলেন।

যুবতী ঃ ওঃ—

ফিরিয়া গিয়া তিনি নিজের গাড়ির ভিতর হইতে একজোড়া স্লিপার বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। হাতের স্প্যানার ফেলিয়া দিয়া গাড়ির ফুটবোর্ডের উপর উপবেশন করিলেন। তারপর করতলে কপোল রাখিয়া এমনভাবে রঞ্জনের দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন চক্ষু দ্বারা তাহাকে যাচাই করিতেছেন।

মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করিলেও রঞ্জন যুবতীটির সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিল। সে উঠিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিতে করিতে যুবতীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া রুমালটি তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—

রঞ্জন ঃ ইয়ে—আপনার গালে—একটু কালি-ঝুলি—মুছে ফেলুন—

যুবতী সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজ দক্ষিণ গণ্ডে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলিতে কালির দাগ দেখিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। অস্ফুট আক্ষেপোক্তি করিয়া তিনি নিজের গাড়ির ভিতর হইতে রুমাল ও ভ্যানিটি কেস্ বাহির করিয়া ক্ষুদ্র আয়নায় নিজের মুখ দেখিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে নিরতিশয় ক্ষুব্ধভাবে রঞ্জনের প্রতি একটা কটাক্ষ হানিয়া তিনি গালে রুমাল ঘষিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রঞ্জন সদ্ভাব আরও ঘনীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কথা-বার্তা কহিতে আরম্ভ করিল।

রঞ্জন ঃ কি হয়েছে বলুন তো আপনার গাড়ির? মোটর সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানি—যদি ইঞ্জিনের কোনও গোলমাল হয়ে থাকে—অথবা—মোট কথা, সব মোটরের নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা আছে—মেরামত করতেও জানি—

যুবতীটি রঞ্জনের দিকে পাশ ফিরিয়া গালে রুমাল ঘষিতেছিলেন, এখন ক্ষণেকের জন্য ঘাড় ফিরাইয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন—

যুবতী ঃ আমিও জানি।

এই বলিয়া যুবতী আবার আয়নার মধ্যে চাহিয়া গণ্ডে রুমাল ঘষিতে লাগিলেন।

যুবতীর কথা বলার ভঙ্গী হইতে বিশেষ উৎসাহ না পাইলেও রঞ্জন হাল ছাড়িল না।

রঞ্জন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। তবে কিনা—আপনি মহিলা—

যুবতী এতক্ষণে গণ্ডের কলঙ্ক মোচন শেষ করিয়াছেন। এবার অত্যন্ত নিঃসংশয়-ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।

যুবতী ঃ মহিলা হলেও আমি নিজের কাজ নিজে করতে পারি। আপনার সাহায্যের দরকার নেই।

রঞ্জন মুষড়িয়া গেল; একটু রাগও হইল। স্কন্ধদ্বয়ের একটি নিরুপায়সূচক ভঙ্গী করিয়া সে নিজের মোটর বাইকের কাছে ফিরিয়া গেল; তারপর বাইকের আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিয়া গম্ভীর চোখে যুবতীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করায় সে যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা তাহার মুখভাব হইতে বুঝা যায়। ক্ষমতা থাকিলে সে চলিয়া যাইত, কিন্তু যুবতীটির এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে—

যুবতীটি আবার গাড়ির ফুটবোর্ডে বসিয়াছেন এবং পূর্ববৎ করলগ্নকপোলে

রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তিনি নির্লিপ্তভাবে কথা কহিলেন।

যুবতী : আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

রঞ্জন চমকিয়া উঠিল। যুবতী যে যাচিয়া তাহার সহিত কথা কহিবেন তাহা সে প্রত্যাশাই করে নাই ; হাস্যবিম্বিত মুখে সাগ্রহে উত্তর দিল—

রঞ্জন : আমি? আমি ঝাঝায় যাচ্ছি। ঐ যে—ঝাঝা—

হস্ত প্রসারিত করিয়া সে ঝাঝার দিকটা দেখাইয়া দিল, যেন ঘাড় ফিরাইলেই ঝাঝা দেখা যাইবে।

যুবতীটি কিন্তু তীক্ষ্ম জবাব দিলেন; তাঁহার বিনীত সুরের ভিতর হইতে তীব্র শ্লেষ ফুটিয়া উঠিল।

যুবতী : তবে যাচ্ছেন না কেন?

রঞ্জন হতভম্ব হইয়া গেল। নিরীহ প্রজাপতি যদি হঠাৎ বোলতার মত হুল ফুটাইয়া দেয় তাহা হইলে বোধ করি মানুষের মুখের ভাব এমনই হয়। ক্রমে সে রাগিয়া উঠিল। যুবতীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া নিজের গাড়ির উপর সোজা হইয়া বসিল; গাড়ির যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিয়া স্টার্ট দিতে গিয়া শেষে কি ভাবিয়া আবার আগের মত আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিল। বিদ্রোহীর মত বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া যেন আকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

রঞ্জন : আমার ইচ্ছে আমি যাব না— সরকারী রাস্তা—

যুবতী নয়ন হইতে রঞ্জনের প্রতি একটি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন; তারপর অপরিসীম অবজ্ঞায় চিবুক ও নাসিকা উন্নত করিয়া পুনরায় গাড়ির তলায় প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

রঞ্জন ভ্রূবদ্ধ ললাটে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল।

দ্রুত ডিজল্ভ্।

কিছুক্ষণ সময় কাটিয়াছে। রঞ্জন পূর্ববৎ বসিয়া আছে। সিগারেটের শেষাংটুকু ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়ামোড়া ভাঙিল।

মোটরের নীচে হইতে ঠুংঠাং মেরামতির আওয়াজ আসিতেছে। রঞ্জন অলসপদে মোটরখানাকে একবার প্রদক্ষিণ করিল; খোলা বনেটের ভিতর দিয়া ইঞ্জিনের ভিতর উঁকি মারিল; তারপর পশ্চাদ্দিকে গিয়া যেখানে পেট্রোল ট্যাঙ্ক আছে সেইখানে দাঁড়াইল। একটু ইতস্তত করিয়া নিঃশব্দে পেট্রোল ট্যাঙ্কের মুখ খুলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। শেষে পূর্ববৎ নির্লিপ্তভাবে একটি গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার মুখের মেঘ আর নাই।

ডিজল্ভ্।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। রাস্তার এক স্থানে অনেকগুলা সিগারেটের টুক্‌রা পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটা হইতে এখনও ধুঁয়া বাহির হইতেছে। রঞ্জন পায়ে তাল দিতে দিতে একটি গান গাহিতেছে। তালমান শুদ্ধ হইলেও গানের বিষয়বস্তু অতিশয় লঘু।

রঞ্জন : 'এক যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভাল
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো—'

রঞ্জন আকাশের দিকে চাহিয়া নিজমনেই গান গাহিতেছে; যদিও তাহার দৃষ্টি থাকিয়া থাকিয়া চকিতের ন্যায় মোটরের তলাটা ঘুরিয়া আসিতেছে।

রঞ্জন ঃ 'সেই দেশতে বেরাল পালায় নেংটি ইঁদুর দেখে
ছেলেরা খায় ক্যাস্টরয়েল রসগোল্লা রেখে।'

তৃতীয় চরণ গাহিতে আরম্ভ করিয়া রঞ্জন থামিয়া গেল; যুবতী গাড়ির তলা হইতে আবার বাহির হইয়া আসিতেছেন।

বাহির হইবার পর তিনি ক্রোধ-ক্ষোভ-ব্যর্থতা-লজ্জা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রঞ্জনকে অভিসিঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মোটরের চালকের আসনে প্রবেশ করিয়া গাড়ি স্টার্ট দিবার চেষ্টা করিলেন। গাড়ি কিন্তু চলিল না, কেবল তাহার পেটের মধ্যে ভুট্-ভাট্ শব্দ হইতে লাগিল। যুবতী তখন গাড়ির স্টীয়ারিং হুইলে একটা হিংস্র মোচড় দিয়া বাহিরে ফুটবোর্ডে আসিয়া বসিলেন।

রঞ্জন সিগারেট কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট বাহির করিল, অতি যত্নে সেটা ধরাইয়া একরাশ ধোঁয়া উদ্‌গীর্ণ করিল; তারপর যুবতীর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন ঃ হল না মেরামত?

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত যুবতী জ্বলিয়া উঠিলেন।

যুবতী ঃ না! কিন্তু তাতে আপনার কি?

রঞ্জন নির্বিকার। পুনশ্চ সিগারেট হইতে অপর্যাপ্ত ধূম উদ্‌গীর্ণ করিয়া সে সিগারেটের জ্বলন্ত প্রান্তের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল–

রঞ্জন ঃ গাড়ির কি হয়েছে আমি জানি—

যুবতীর চক্ষে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল; তিনি সপ্রশ্নভাবে রঞ্জনের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। রঞ্জন তেমনি অন্যমনস্কভাবে তাহার কথা শেষ করিল--

রঞ্জন ঃ পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে।

যুবতী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিলেন; তারপর দ্রুত উঠিয়া গাড়ির পশ্চাদ্দিকে অনুসন্ধান করিতে গেলেন।

রঞ্জন আড়চোখে চাহিয়া একটু বিজয়হাস্য করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-ভাব গোপন করিয়া নির্লিপ্ত মুখে সিগারেটে টান দিল।

যুবতী পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকা খুলিয়া তাহার মধ্যে একটি কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কাঠিটি টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন উহা সম্পূর্ণ শুষ্ক। ধীরে ধীরে তাঁহার গন্ডদ্বয় লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া মোটরের গায়ে হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন; রঞ্জনের মুখের পানে ভাল করিয়া তাকাইতে পারিলেন না।

রঞ্জন সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ফেলিয়া দিয়া আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল; হাট তুলিযা তুড়ি দিল; তারপর নিজের গাড়ির উপর সোজা হইয়া বসিয়া পিছন দিকে তাকাইয়া বিদায়-জ্ঞাপক হাত নাড়িল।

রঞ্জনঃ আচ্ছা চললুম্—নমস্কার।

সে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

যুবতী অসহায় ক্ষোভে অধর দংশন করিলেন। এদিকে রঞ্জন চলিয়া যায়, তাহার গাড়ি নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দর্প বিসর্জন দিয়া শেষে যুবতী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন—

যুবতীঃ শুনুন!

রঞ্জন বোধ করি এই আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছিল; গাড়ি থামাইয়া যুবতীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। নীরস শিষ্টতার কণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন ঃ আপনি ডাকছিলেন?

লজ্জায় যুবতীর মাথা কাটা যাইতেছিল ; তবু তিনি ঢোক গিলিয়া কোনও ক্রমে বলিলেন—

যুবতীঃ আমি—আমি—আপনার কাছে পেট্রোল আছে?

রঞ্জনঃ (নিরুৎসুকভাবে) আছে।

যুবতী পুনরায় অধর দংশন করিলেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই; মনের বিদ্রোহ দমন করিয়া বলিলেন—

যুবতী ঃ তাহলে—যদি—আমাকে দেন—

রঞ্জন ঈষৎ বিস্ময়ে যুবতীর দিকে তাকাইল।

রঞ্জন ঃ আমার পেট্রোল আপনাকে দেব! তারপর? আমি কি এখানে বসে বসে হাপু গাইব?

যুবতীর চক্ষু ফাটিয়া প্রায় জল আসিয়া পড়িল। তিনি কষ্টে তাহা গলাধঃকরণ করিলেন।

যুবতী ঃ আমিও ঝাঝা যাচ্ছি—আপনি আমার গাড়িতে আসতে পারেন।

রঞ্জন ঃ ও—আপনিও ঝাঝা যাচ্ছিলেন?

মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিলেও রঞ্জন বাহিরে যুবতীর প্রস্তাব বিবেচনা করার ভঙ্গীতে বলিল—

রঞ্জন ঃ বুঝেছি। আপনি ঝাঝা যাচ্ছেন—

যুবতী ঃ হ্যাঁ—আমরা ঝাঝাতেই থাকি—আমার বাবার ওখানে অভ্রের খনি আছে।

রঞ্জন ঃ ও—

যুবতী ঃ বাবা ঝাঝাতেই থাকেন—আমি—

রঞ্জন ঃ আপনি কলকাতায়!

যুবতী ঃ হ্যাঁ। হঠাৎ বাবার অসুখের 'তার' পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি—

রঞ্জন ঃ পেট্রোল না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছেন।

যুবতী ক্ষুব্ধ ধিক্কারে কেবল ঘাড় নাড়িলেন।

রঞ্জন ঃ তা যেন হল। আমি আপনাকে পেট্রোল দিলুম, বদলে আপনি আমাকে ঝাঝা পর্যন্ত পেঁছে দিলেন। কিন্তু আমার গাড়িটা কি এখানেই পড়ে থাকবে?

যুবতীর মনে আশা জাগিল। তিনি সাগ্রহে বলিলেন—

যুবতীঃ তা কেন? আপনার মোটর বাইক আমার গাড়ির পিছনের সীটে তুলে নিলেই হবে।

রঞ্জন এবার হাসিয়া ফেলিল; সপ্রশংস নেত্রে যুবতীর পানে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জনঃ ঠিক তো। ও কথাটা আমার মাথায় আসে নি। আপনার তো খুব উপস্থিত-বুদ্ধি!

এইবার সর্বপ্রথম যুবতীর মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি চক্ষু নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—ধন্যবাদ, মিঃ—?

রঞ্জনঃ (তৎক্ষণাৎ) রঞ্জনপ্রকাশ সিংহ।

যুবতী ঃ ধন্যবাদ রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন ঃ না না, সে কি কথা, মিস—?

যুবতী কৌতুক চপল চোখে চাহিলেন।

যুবতী ঃ মঞ্জু রায়।

রঞ্জন স্মিতমুখে দুই করতল একত্র করিল।

মঞ্জু তাহার অঙ্গাবরক ওভার-অল্ খুলিতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্ভ্।

কলিকাতার একটি প্রগতিশীল গৃহে ড্রয়িং-রুম। বাড়ির কর্ত্রী ও আরও তিনটি প্রবীণা মহিলা বিভিন্ন চেয়ারে বসিয়া আছেন। চায়ের উদ্যোগপর্ব চলিতেছে।

চা পরিবেশন করিতে করিতে গৃহকর্ত্রী অন্যত্র সহৃদয়তার সহিত কথা বলিতেছেন: তাঁহার স্থূল আতিথেয়তার ভিতর দিয়া কিন্তু টেক্কা দিবার গর্ব ফুটিয়া উঠিতেছে।

কর্ত্রী ঃ রঞ্জন পাস করেছে কিনা—হাজার হোক, ওর আপনার বলতে তো আমিই—তাই সামান্য একটু চায়ের আয়োজন করেছি—ওরে রামভরসা, কোথায় গেলি? এদিকে কেক্ নিয়ে আয়।

মহিলারা রঞ্জনের নাম শুনিয়া একেবারে স্থির-নেত্র হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমা মহিলা ঠক্ করিয়া নিজের চায়ের বাটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—

প্রথমা মহিলা ঃ অ্যাঁ! রঞ্জনের আসবার কথা আছে না-কি?

দ্বিতীয়া মহিলার অধরোষ্ঠ বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; তিনি বলিলেন—ওমা, এমন জান্‌লে আমি যে মলিনাকে নিয়ে আসতুম—

তৃতীয়া মহিলার মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন।

তৃতীয়া মহিলা ঃ এ ভাই তোমার ভারি অন্যায়। আগে জানালে না কেন? আমার মীরার সঙ্গে রঞ্জনের কত ভাব! আগে জানলে মীরাকে নিয়ে আসতুম।

গৃহকর্ত্রী গাল ভরিয়া হাসিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের পরাজয়ের আনন্দে তাঁহার মেদ-মণ্ডিত গণ্ডদ্বয় পিণ্ডীভূত হইয়া উঠিল।

কর্ত্রী ঃ রঞ্জন আর আমার ইন্দুতে যেমন ভাব, এমন আর কারুর সঙ্গে নয়। যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল। একদিনও দু'জনে দু'জনকে না দেখে থাক্‌তে পারে না।

অতিথিত্রয় এই অত্যন্ত অরুচিকর কথায় চিরেতা খাওয়ার মত মুখ করিয়া পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

ঘরের বাহিরে পদধ্বনি শুনা গেল। গৃহকর্ত্রী সচকিত আগ্রহে দ্বারের পানে চাহিলেন।

কর্ত্রীঃ ঐ বুঝি রঞ্জন এল। (নেপথ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া) ওরে বিন্দি, ইন্দুকে ওপর থেকে ডেকে আন্ না—আর কত সাজগোজ করবে—

তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন।

বিধুবাবু দ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া মহিলা-গুলিকে একে একে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর হাসিমুখে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। সবগুলিকে এক জায়গায় পাইয়া তিনি খুশি হইয়াছেন বোধ হইল।

রঞ্জনের স্থানে বিধুবাবুকে পাইয়া গৃহকর্ত্রী নিরাশ হইলেন; শুষ্কস্বরে কহিলেন—বিধুবাবু! আসুন।

অন্য মহিলাগণ রঞ্জনকে না দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্তভাবে হাঁফ ছাড়িলেন।

বিধুবাবু আসিয়া গৃহকর্ত্রীর পাশের চেয়ারে বসিলেন। গৃহকর্ত্রী উৎকণ্ঠিতভাবে ঘড়ির পানে তাকাইলেন।

কর্ত্রী ঃ তাই তো, রঞ্জনের এত দেরি হচ্ছে কেন? পাঁচটা বাজতে চলল—সে তো কখনও এমন করে না!

বিধুবাবু ইতিমধ্যে রামভরসার হাত হইতে এক পেয়ালা চা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; চায়ে চুমুক দিতে গিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তারপর ধীর মন্থর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

বিধু ঃ আপনারা কি রঞ্জনের অপেক্ষা করছেন!

কর্ত্রী ঃ হ্যাঁ--তার জন্যেই তো আজ বিশেষ ক'রে চায়ের আয়োজন করেছিলুম।

বিধু ঃ কিন্তু—

তিনি ধীরে সুস্থে একচুমুক চা পান করিলেন।

বিধু ঃ রঞ্জন তো বোধ হয় আসতে পারবে না।

গৃহকর্ত্রী তাঁহার সমস্ত দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ বিধুবাবুর দিকে ফিরাইলেন।

কর্ত্রী ঃ আসতে পারবে না! কেন?

বিধুবাবু পুনরায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

বিধু ঃ যেহেতু তার বাপ তাকে হঠাৎ কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কর্ত্রী ঃ অ্যাঁ—সে কি?

হাসি-হাসি মুখে এই সংবাদ-বোমা মহিলাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিধুবাবু চায়ের বাটিতে মন দিলেন। অন্য মহিলারাও কম বিচলিত হন নাই।

প্রথমা মহিলা ঃ কই, আমরা তো কিছু জানি না!

বিধুবাবু মহিলাদের এই চাঞ্চল্য চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিতেছেন।

বিধু ঃ আপনারা জানবেন কোত্থেকে? প্রতাপ তো আর আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের ছেলেকে দেশান্তরী করে নি।

দ্বিতীয়া মহিলাঃ কিন্তু এরকম করবার মানে কি?

তৃতীয়া মহিলা ঃ ছেলে সবে পাস করেছে, এখন কোথায় দু-চারদিন কলকাতায় আমোদ-আহ্লাদ করবে--

বিধু ঃ (শান্ত স্বরে) প্রতাপ তার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছে।

সকলেঃ অ্যাঁ!

মহিলাগণ ব্যাকুলনেত্রে পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন।

গৃহকর্ত্রী অনুনয়পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বিধুকে বলিলেন—

কর্ত্রীঃ সত্যি বলছেন বিধুবাবু? (বিধু ঘাড় নাড়িলেন) ভিতরের কথাটা কি বলুন না, বিধুবাবু। কি হয়েছে?

বিধুবাবু নেপথ্যের পানে তাকাইয়া হাঁকিলেন—

বিধুঃ ওরে রামভরসা, এদিকে কেক্ নিয়ে আয় তো।

কর্ত্রীঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে বিধুবাবুকে কেক্ দে। তারপর, কথাটা কি বিধুবাবু? হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে গেল কি ক'রে?

রামভরসা কেকপূর্ণ ট্রে লইয়া বিধুবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিধুবাবু সযত্নে একটি বড় গোছের কেক্ নির্বাচন করিয়া তাহাতে কামড় দিলেন।

বিধুঃ (চিবাইতে চিবাইতে) কথাটা আর কিছু নয়, প্রতাপের ইচ্ছে রাজরাজড়ার ঘরে ছেলের বিয়ে দেয়। তাই, পাছে ছেলে ইতিমধ্যে কোনও মেয়ের 'লভে' পড়ে যায়, এই ভয়ে তাকে একেবারে ঝাঝায় পাঠিয়ে দিয়েছে। জংলী দেশ, সেখানে তো আর অলিতে গলিতে সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণী পাওয়া যায় না।

চারিটি মহিলাই বিধুর কথা শুনিতে শুনিতে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমা মহিলা গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজ মনে উচ্চারণ করিলেন—

প্রথমা মহিলাঃ ঝাঝা!

তৃতীয়া মহিলা সহসা শূন্যের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—

তৃতীয়া মহিলাঃ ঝাঝা!

দ্বিতীয়া মহিলা পিন্‌বিদ্ধবৎ চেয়ার হইতে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার

দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

দ্বিতীয়া মহিলাঃ ঝাঝা!

বাকি দুটি মহিলাও আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

প্রথমা মহিলাঃ (গৃহকর্ত্রীকে) চললুম ভাই, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লোহার সিন্দুক খোলা ফেলে এসেছি—

তিনি দ্রুত দ্বারের অভিমুখে চলিলেন। বাকি দুইজন পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারাও দ্বারের দিকে ছুটিলেন, তাঁহাদের সম্মিলিত ওজুহাত বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া গৃহকর্ত্রীর কানে পৌঁছিল।

মিলিত স্বরঃ কর্তার পায়ে মেয়ের সঙ্গে অন্য সময় হাতিবাগানে স্যাকরা আসবার কথা আবার আর একদিন—

মহিলাগণ শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া গেলেন।

গৃহকর্ত্রী হতভম্ব। তিনি বিধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলেন—বিধু পরম কৌতুকে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। হঠাৎ গৃহকর্ত্রীর মস্তিষ্করন্ধ্র বুদ্ধির প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাড়ির ভিতর দিকে চলিলেন

কর্ত্রীঃ ইন্দু। ওরে ইন্দু—ঝাঝা—ঝাঝা!

বিধু ধূর্ত শৃগাল-হাস্য হাসিতে লাগিলেন।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া মঞ্জুর মোটর চলিয়াছে। গাড়ির হুড নামানো হইয়াছে; পিছনের সীট হইতে রঞ্জনের মোটর বাইক মাথা উঁচু করিয়া আছে।

গাড়ি চালাইতেছে মঞ্জু; রঞ্জন তাহার পাশের সীটে বসিয়া মঞ্জুর দিকে ফিরিয়া কথা কহিতেছে, তাহার ডান হাতটা সীটের পিঠের উপর ন্যস্ত।

রঞ্জনঃ দেখুন মঞ্জু দেবী, আমাকে গাড়িটা চালাতে দিলেই ভাল করতেন। এখনও প্রায় দেড়শ' মাইল যেতে হবে।

মঞ্জুঃ কতবারই তো গিয়েছি। নতুন কিছু নয়।

রঞ্জনঃ কিন্তু তবু, আমি যখন রয়েছি—

মঞ্জু ভ্রূ তুলিয়া ক্ষণেকের জন্য রঞ্জনের দিকে চাহিল।

মঞ্জুঃ আপনার কি বিশ্বাস আমার চেয়ে আপনি ভাল গাড়ি চালাতে পারেন?

এ কথার সোজা উত্তর মহিলাকে দেওয়া যায় না। রঞ্জন কাঁধের একটা ভঙ্গী করিয়া সম্মুখ দিকে তাকাইল।

রঞ্জনঃ পুরুষের নার্ভ আর মেয়েদের নার্ভ সমান নয়। হাজার হোক—

মঞ্জুঃ আমার নার্ভ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পাবেন। আমি আপনাকে খানায় ফেলব না।

রঞ্জন বেশ খানিকক্ষণ মঞ্জুর পানে চোখ পাতিয়া চাহিয়া রহিল; তারপর সীটের পিঠ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। তাহার চোখের মধ্যে একটা দুষ্টামিবুদ্ধি খেলা করিয়া গেল; সে একবার আড়চোখে মঞ্জুর দিকে তাকাইয়া নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল। রুমালটা ঝাড়িয়া পাট খুলিয়া সেটাকে কোলের উপর রাখিয়া কোণাকুণিভাবে পাট করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে মৃদু গানের গুঞ্জন বাহির হইতে লাগিল।

মঞ্জু সকৌতুকে একবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইল।

মঞ্জুঃ হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি গান করুন; তবু তো কিছু করা হবে।

রঞ্জনঃ বেশ তো। আমার গাইতে আপত্তি নেই।

রুমাল পাট করিতে করিতে সে গান ধরিল—

রঞ্জন ঃ 'দু'জনে দেখা হল—মধু-যামিনী রে!'

গান শুনিতে শুনিতে মঞ্জুর মুখে চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। রঞ্জন প্রথম পংক্তি শেষ করিতেই সে দ্বিতীয় পংক্তি ধরিল—

মঞ্জুঃ 'কেহ কিছু কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে।'

হাসিতে হাসিতে রঞ্জনের দিকে চোখ ফিরাইতেই তাহার কোলের উপর মঞ্জুর দৃষ্টি পড়িল। কৌতূহলী মঞ্জু জিজ্ঞাসা করিল—

মঞ্জুঃ ওটা কি হচ্ছে?

রঞ্জন যে জিনিসটি তৈয়ারি করিতেছিল তাহা এবার ডান হাতের তেলোর উপর তুলিয়া ধরিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—

রঞ্জনঃ ইঁদুর।

উত্তর শুনিয়া মঞ্জু চমকিয়া একবার ঘাড় ফিরাইল; তারপর উৎকণ্ঠিত চক্ষে সম্মুখ দিকে চাহিয়া গাড়ি চালাইতে চালাইতে বলিল—

মঞ্জুঃ ইঁদুর!

রঞ্জনঃ হ্যাঁ। এই যে দেখুন না কেমন লাফায়!

ডান হাতের উপর ইঁদুর রাখিয়া সস্নেহে তাহার পিঠে বাঁ হাত বুলাইতে লাগিল। রুমালের ইঁদুর জীবন্ত ইঁদুরের মত তাহার হাতের ভিতর হইতে পিছলাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইঁদুর দেখিয়া ভয় পায় না—তা হোক সে রুমালের ইঁদুর—এমন মেয়ে কয়টা আছে? মঞ্জুর মুখ শুকাইয়া গেল; ত্রস্ত চোখে ইঁদুরের দিকে তাকাইয়া সে কোণ ঘেঁষিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জনের ইঁদুর এবার মস্ত এক লাফ দিয়া তাহার হাত হইতে বাহির হইয়া একেবারে মঞ্জুর কোলের উপর পড়িল। মঞ্জু চোখ বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এদিকে গাড়ির অবস্থা শোচনীয়। স্টীয়ারিং হুইলের উপর মঞ্জুর হাত শিথিল হইয়া যাওয়ার ফলে গাড়ি স্বেচ্ছামত রাস্তার এধার হইতে ওধার পরিক্রমা করিতে করিতে চলিয়াছে। শেষে খানার ঠিক কিনারায় আসিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ি থামিয়া গেল।

গাড়ির ভিতরে তখন রঞ্জন দৃঢ় মুষ্টিতে স্টীয়ারিং ধরিয়া ব্রেক কশিয়াছে, মঞ্জুর শিথিল হস্ত রঞ্জনের হাতের তলায় চাপা পড়িয়াছে।

রঞ্জন ছদ্ম ভর্ৎসনার চক্ষে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ কি বলেছিলুম? আর একটু হ'লেই খানায় ফেলেছিলেন!

মঞ্জুঃ (কম্পিত কণ্ঠে) কিন্তু আপনিই তো—

রঞ্জনঃ নিন্—এবার আমাকে চালাতে দিন। জানি আমি মেয়েদের নার্ভ ভাল নয়—

মঞ্জু অত্যন্ত সুবোধ বালিকার ন্যায় স্টীয়ারিং ছাড়িয়া দিল। সে এমন বিনীত সম্ভ্রমের সহিত রঞ্জনের মুখের পানে তাকাইল যাহাতে মনে হয় রঞ্জনের কূট-বুদ্ধির উপর তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

ডিজল্ভ্।

গাড়ি চলিতেছে, এবার রঞ্জন চালক এবং তাহার পাশে বসিয়া মঞ্জু। রঞ্জনের অধরকোণে একটু হাসি আনাগোনা করিতেছে। সে আড় চক্ষে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জন : এবার না হয় আপনি গান করুন।

মঞ্জু উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল। অস্তমান সূর্যের আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—

মঞ্জু : সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

রঞ্জনও সেই দিকে তাকাইল।

নানা বর্ণচ্ছটার মধ্য দিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে।

রঞ্জনের কণ্ঠস্বর : পেঁছুতে রাত হয়ে যাবে।

রাত্রি। গাড়ি চলিয়াছে। সুইচ্-বোর্ডের আলোয় মঞ্জু ও রঞ্জনের মুখ দেখা যাইতেছে। রঞ্জন সতর্কভাবে গাড়ি চালাইতেছে; তাহার দুই চক্ষু সম্মুখে নিবদ্ধ। মঞ্জুর ঢুল আসিতেছে। তাহার চোখ মাঝে মাঝে মুদিয়া আসিতেছে, আবার গাড়ির ঝাঁকানিতে খুলিয়া যাইতেছে। শেষে তাহার চোখদুটি ভালভাবে মুদিত হইয়া গেল; মাথাটি পাশের দিকে নত হইতে হইতে অবশেষে রঞ্জনের কাঁধে ঠেকিয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

রঞ্জন একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; তারপরে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে সর্তক চক্ষু সম্মুখে রাখিয়া গাড়ি চালাইতে লাগিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড ইন্।

ঝাঝায় মঞ্জুর পিতা শ্রীকেদারনাথ রায়ের বাড়ি। কাল—প্রভাত। বাড়ির ড্রয়িং-রুমটি বেশ সুপরিসর ও মূল্যবান আসবাবে সাজানো। ঘরের এক কোণে শীতের সময় আগুন জ্বালিবার চিম্‌নি আছে, এই চুল্লী ঘিরিয়া কারুকার্য খচিত ম্যাণ্টেলপীস্। ঘর হইতে ভিতর দিকে যাইবার দ্বারের কাছে একটি বড় পিয়ানো।

কেদারবাবু একটি গদি-মোড়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার চোয়াল ও মাথা বেষ্টন করিয়া একটি পশমের গলাবন্ধ ব্রহ্মতালুর উপর গিঁট বাঁধা আছে। কেদারবাবু স্নায়বিক দন্তশূলে ভুগিতেছেন। এজন্য তাঁহার স্বভাবত কড়া মেজাজ সম্প্রতি আরও কড়া হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ডান দিকে একটু পিছনে একটি সচল চা-টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। চায়ের বাটিতে চামচের ঠুং ঠাং শব্দ আসিতেছে। মঞ্জু চা তৈয়ার করিতে করিতে পিতাকে গতদিনের পথের বিপত্তির গল্প বলিতেছিল।

কেদারবাবু গলার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার-শব্দ করিলেন। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক; কোনও কথা বলিবার পূর্বে প্রায়ই এরূপ করিয়া থাকেন।

কেদার : হুঁঃ । তারপর!

মঞ্জু গতদিনের ক্লান্তির পর আজ সকালে উঠিয়াই স্নান করিয়াছে; একটি চওড়া কালোপাড় আটপৌরে শাড়ি ও হাতকাটা মলমলের ব্লাউজ পরিয়া তাহাকে বৃষ্টিধৌত

সদ্যস্ফুট মল্লিকাফুলের মত দেখাইতেছে। সে চা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া মুখ তুলিল।

মঞ্জু ঃ তারপর আর কি—আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। রাত্তিরে বাড়িতে এসে ঘুমুলুম; তারপর আজ সকালে উঠে তোমাকে চা তৈরি করে দিচ্ছি।

কেদারবাবু গলার মধ্যে আবার হুঙ্কার ছাড়িলেন; মঞ্জুর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া স্বভাবসিদ্ধ কড়া স্বরে প্রশ্ন করিলেন—

কেদার ঃ হুঁঃ । ছোকরা কেমন? ভদ্রলোক?

মঞ্জু স্মিত চোখদুটি শূন্যে পাতিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল; তারপর ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল—

মঞ্জু ঃ হ্যাঁ—ভদ্রলোক।

কেদার ঃ নাম কি?

মঞ্জু চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইতে লইতে বলিল—

মঞ্জু ঃ শ্রীরঞ্জনপ্রকাশ সিংহ।

কেদারবাবুর ললাট ভ্রূকুটি কুটিল হইল; তিনি প্রতিধ্বনি করিলেন—

কেদার ঃ সিংহ!

কেদারবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল তাঁহার অন্তরে স্মৃতির আগুন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—

কেদার ঃ সিংগি! আমার যখন বয়স কম ছিল, একটা সিংগিকে জানতুম—পাজি নচ্ছার হতচ্ছাড়া লোক। আমার বন্ধু ছিল; তারপর আজ পঁচিশ বছর তার মুখ দেখি নি। বোম্বেটে শয়তান—

মঞ্জু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; চায়ের পেয়ালা কেদারবাবুর সম্মুখে একটা ছোট টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—

মঞ্জু ঃ কিন্তু তাই বলে কি সব সিংগিই বোম্বেটে শয়তান হবে বাবা?

কেদারবাবু বিবেচনা করিলেন, শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিলেন—

কেদার ঃ তা না হতে পারে। নল দাও।

মঞ্জু ঃ (বুঝিতে না পারিয়া) নল?

কেদার ঃ (ঈষৎ তিরিক্ষিভাবে) হাঁ করতে পারছি না, চা খাব কি করে? নল দাও।

মঞ্জু ঃ ও!

বুঝিতে পারিয়া মঞ্জু হাসিয়া উঠিল; তারপর নল আনিতে গেল। ম্যাণ্টেলপীসের উপর একটি কাচের গেলাসে এক গোছা খড়ের নল ছিল। (যাহার সাহায্যে সরবৎ চুষিয়া খাইবার ফ্যাসান হইয়াছে); মঞ্জু তাহারই একটি আনিতে আনিতে স্নেহকৌতুক-বিগলিত-কণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু ঃ কিন্তু তুমি কি কাণ্ডটাই করলে! সামান্য একটু দাঁতের ব্যথা হয়েছিল, অমনি আমাকে টেলিগ্রাম!

কেদারবাবুর চেয়ারের দক্ষিণ পাশে দাঁড়াইয়া মঞ্জু খড়ের নল তাঁহার হাতে দিল। কেদারবাবু একবার কট্মট্ করিয়া তাহার পানে তাকাইলেন।

কেদার ঃ দাঁতের ব্যথা সামান্য ব্যাপার! জানো, দাঁতের ব্যথায় কত লোক মারা গেছে? হুঁ!

তিনি চায়ের মধ্যে খড় ডুবাইয়া চুষিতে আরম্ভ করিলেন। মঞ্জু ভর্ৎসনার সুরে বলিল—

মঞ্জু ঃ ছি বাবা, তোমার যত অলক্ষুণে কথা।

মঞ্জু পিতার চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিল—দুষ্টামি-

ভরা সুরে বলিল—

মঞ্জু : কিন্তু আসল কথাটি আমি বুঝেছি—আমাকে না দেখে তুমি থাকতে পারো না, যা হোক একটা ছুতো করে ডেকে পাঠাও।

কেদারবাবু ক্ষণেকের জন্য মুখ তুলিলেন; তাঁহার মুখের উপর দিয়া এমন একটা ভাব খেলিয়া গেল যাহাকে হাসি বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন—

কেদার : হুঁ থাকতে পারি না! হুঁঃ!

মঞ্জু : পারোই না তো! বোর্ডিংয়ে সবাই আমায় কত ঠাট্টা করে। বলে, বাবার নয়ন-মণি মেয়ে!

বিগলিত স্নেহে মঞ্জু কেদারবাবুর গিল্‌ট-বাঁধা মস্তকের উপর গাল রাখিল। এবার একটি অসন্দিগ্ধ হাসি সত্য সত্যই কেদারবাবুর মুখে দেখা গেল; কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। আবার গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন—

কেদার : কি নাম—সেই সিংগি ছোকরা আজ এখানে আসবে নাকি?

মঞ্জু উঠিয়া বসিয়া একটু চিন্তা করিল।

মঞ্জু : রঞ্জনবাবু? কি জানি আসবেন কিনা—কিছু তো বলেন নি। আসবেন হয়তো।

কেদারবাবু একটি হুংকার দিয়া চায়ে নল-সংযোগ করিলেন। মঞ্জু অলসপদে উঠিয়া গিয়া নিজের পেয়ালায় চা ঢালিল। একটু অন্যমনস্কভাবে পেয়ালাটি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের নিকট পদশব্দ শুনা গেল। মঞ্জু তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা রাখিয়া সাগ্রহে দ্বারের দিকে তাকাইল।

দ্বার দিয়া যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি বয়সে রঞ্জনের সমসাময়িক হইলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইনি অতিশয় শীর্ণকায় ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট। একটি ছোট ক্যামেরা তাঁহার কাঁধে উপবীতের ন্যায় চামড়ার অবলম্বনের সাহায্যে ঝুলিতেছে।

মঞ্জু ঈষৎ আশাহত কণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু : ও—মিহিরবাবু!

মিহির ভাবাতুর নেত্রে চাহিল।

মিহির : আকাশে চাঁদ উঠেছে!

কেদারবাবুও মিহিরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; অত্যন্ত বিরক্তভাবে বলিলেন—

কেদার : অ্যাঁ! কি বলছ হে ছোকরা? বেলা সাড়ে আটটার সময় আকাশে চাঁদ উঠেছে!

মিহির ভাবুকের ভঙ্গীতে মাথাটি দোলাইতে দোলাইতে কেদারবাবুর সম্মুখস্থ চেয়ারে আসিয়া বসিল—

মিহির : আপনি ভুল বুঝেছেন। জাপানী কায়দায় একটি কবিতা লিখেছি তাই আবৃত্তি করছিলুম।

কেদারবাবু একটি নাতিক্ষুদ্র হুংকার ছাড়িয়া চায়ের পেয়ালায় অবহিত হইলেন। মঞ্জু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—

মঞ্জু : জাপানী কায়দাটা কি রকম?

মিহির : শুনবেন? (ভঙ্গী সহকারে)

'আকাশে চাঁদ উঠেছে!
যেন রে ফুল ফুটেছে।
গন্ধে মন লুটেছে।'

কেদারবাবু মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কবি আর কথা কহিলেন না। কেদারবাবু তখন অধীর হইয়া বলিলেন—

কেদার ঃ তারপর কি?

মিহির ঃ তারপর আর নেই—ঐখানেই শেষ!

কেদারবাবু কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিলেন।

কেদার ঃ শেষ! তিন লাইনে কবিতা শেষ! হুঁ। যত সব—

ক্রুদ্ধভাবে কেদারবাবু চায়ে খড় ডুবাইয়া চুষিতে লাগিলেন। মিহির ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাহার চক্ষে শিল্পী-জনোচিত উদ্দীপনা ফুটিয়া উঠিল। সে একাগ্রভাবে কেদারবাবুর চা-পান দেখিতে লাগিল।

মিহির ঃ বাঃ! চমৎকার! একটা নতুন দৃশ্য। কেদারবাবু, নড়বেন না, আমি আপনার ছবিটা জাপানী ভঙ্গীতে তুলে দিই।

ক্ষিপ্রহস্তে ক্যামেরা বাহির করিয়া মিহির কেদারবাবুর উপর লক্ষ্য স্থির করিল। কেদারবাবু গর্জিয়া উঠিলেন—

কেদার ঃ খবরদার ছোকরা, আমার দন্তশূল হয়েছে—এখন আমার ছবি তুললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

কেদারবাবুর চক্ষে হিংস্র আপত্তি দেখিয়া মিহির দুঃখিতভাবে নিরস্ত হইল। মঞ্জু কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বিষণ্ণভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া মিহির আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। মঞ্জু আঁচলের প্রান্ত ঠোঁটের উপর চাপিয়া হাসি নিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মিহির ক্যামেরা বাগাইয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

মিহির ঃ মঞ্জু দেবী, ঠিক যেমন আছেন তেমনি দাঁড়িয়ে থাকুন, আপনার ছবিটা জাপানী স্টাইলে তুলে নি।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িল।

মঞ্জু ঃ ধন্যবাদ, জাপানী স্টাইলের থ্যাব্‌ড়া মুখের ছবি আমার দরকার নেই। তার চেয়ে আপনি এক পেয়ালা চা খান।

মিহিরের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িল, হতাশভাবে ক্যামেরাটি খাপে পুরিবার উপক্রম করিয়া সে নিরুৎসুক স্বরে প্রশ্ন করিল—

মিহির ঃ জাপানী চা?

মঞ্জু ঃ উঁহু—দার্জিলিং।

মিহির ঃ (নিশ্বাস ফেলিয়া) তবে থাক।

মিহির উদ্‌ভ্রান্তভাবে দ্বারের দিকে চলিল। প্রায় দ্বার পর্যন্ত পেঁছিয়াছে, এমন সময় রঞ্জন বাহির হইতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন মিহিরকে দেখিতে পাইল না, প্রথমেই তাহার দৃষ্টি মঞ্জুর উপর গিয়া পড়িয়াছিল। সে স্মিতমুখে হাত তুলিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ নমস্কার!

সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মিহির ক্যামেরা খাপে পুরিতে পুরিতে মধ্যপথে থামিয়া গিয়া গভীর কৌতূহলে রঞ্জনের পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ক্যামেরাটি আবার বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেদারবাবু নবাগত রঞ্জনকে তীক্ষ্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, মঞ্জু তাঁহার কাছে আসিয়া চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু ঃ বাবা, ইনিই রঞ্জনবাবু!

রঞ্জন করজোড়ে কেদারবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় পাশ হইতে ক্লিক্ করিয়া ক্যামেরার শব্দ হইল। সকলে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইলেন।

মিহির ক্যামেরা খাপে পুরিতে পুরিতে বাহির হইয়া যাইতেছে; দ্বারের কাছে পৌঁছিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল।

মিহির ঃ নমস্কার! (মিহির প্রস্থান করিল)

রঞ্জন ঈষৎ বিস্ময়ে দুজনের মুখের পানে চাহিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ ইনি কে?

কেদার ঃ উনি একটি হনুমান। আপনি বসুন।

রঞ্জন কেদারবাবুর সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিল।

রঞ্জন ঃ (বসিতে বসিতে) হনুমান!

কেদার ঃ হ্যাঁ। বাপের কিছু পয়সা আছে তাই জাপানী কায়দায় কবিতা লিখে আর ফটোগ্রাফ তুলে বেড়ান।

রঞ্জন চকিতে একবার মঞ্জুর মুখের পানে চাহিল; যেন এই কবির প্রতি মঞ্জুর মনের ভাবটা কিরূপ তাহা জানিতে চায়। কিন্তু মঞ্জুর মুখের নিগূঢ় হাসি হইতে কিছুই ধরা গেল না। রঞ্জন গম্ভীর মুখে বলিল—

রঞ্জন ঃ ও! বাঃ—বেশ তো।

কেদার সন্দিগ্ধভাবে রঞ্জনের দিকে চাহিলেন।

কেদার ঃ আপনিও কবিতা লেখেন না কি?

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে, জীবনে এক লাইন কবিতা লিখি নি।

কেদারবাবু গলার মধ্যে পরিতোষ-সূচক একটি ক্ষুদ্র হুংকার দিলেন।

কেদার ঃ বেশ বেশ। আপনার কি করা হয়?

রঞ্জন ঃ (বিনীতভাবে) আজ্ঞে, এই সবে এম্-এস্‌সি পাস করেছি।

কেদারবাবু অধিকতর পরিতোষ জ্ঞাপন করিয়া হুংকার দিলেন।

কেদার ঃ বেশ বেশ, খুশি হলুম।—মঞ্জু, এঁকে চা দাও।

মঞ্জু চায়ের টেবিলের দিকে গেল। কেদারবাবু এতক্ষণে একটি মনোমত প্রসঙ্গ পাইয়া বেশ উৎসাহের সহিত মাথার উপরকার গিঁট খুলিতে খুলিতে বলিলেন—

কেদার ঃ সায়েন্সই হচ্ছে আজকাল একমাত্র পড়বার জিনিস! তা না পড়ে' আজ-কালকার ছোঁড়ারা পড়তে যায় কাব্য আর ফিলজফি—হ্যাঃ! আমার মেয়েকে আমি সায়েন্স পড়াচ্ছি।

মঞ্জু চায়ের বাটি আনিয়া রঞ্জনকে দিল; রঞ্জন স্মিতমুখে উঠিয়া পেয়ালা লইয়া আবার বসিল। মঞ্জু বাপের চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কেদারবাবু বলিয়া চলিলেন।

কেদার ঃ Mechanics, আবিষ্কার, invention—এরির ওপর বর্তমান পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে! (সহসা রঞ্জনকে) আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন?

রঞ্জন ঃ (চমকিয়া) আজ্ঞে আবিষ্কার! আমি? (সে ধীরে ধীরে দক্ষিণ হইতে বামে মাথা নাড়িল) আজ্ঞে না।

কেদার ঃ একটাও না?

রঞ্জন হাতের পেয়ালা পাশে টিপয়ের উপর রাখিয়া মাথা চুল্‌কাইল। আবিষ্কার করিয়াছে বলিতে পারিলেই ভাল হয়, কেদারবাবু খুশি হন। কিন্তু—

রঞ্জনঃ আজ্ঞে, কই মনে করতে তো পারছি না।

কেদার গলাবন্ধ খুলিয়া ফেলিয়াছেন। মঞ্জু তাঁহার চেয়ারের পিঠের উপর কনুই

রাখিয়া করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া রঞ্জনের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া আছে। সে এখন আস্তে আস্তে কথা কহিল—

মঞ্জুঃ আপনার একটা আবিষ্কারের কথা কিন্তু আমি জানি।

রঞ্জন চমকিয়া তাকাইল।

রঞ্জন ঃ অ্যাঁ! কি?

মঞ্জুঃ (মুখ টিপিয়া) ইঁদুর।

ইঁদুরের প্রসঙ্গে রঞ্জন বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। কেদারবাবু সবিস্ময়ে ঘাড় বাঁকাইয়া মঞ্জুর দিকে চাহিলেন।

কেদার ঃ ইঁদুর?

মঞ্জু ঃ (ছদ্ম গাম্ভীর্যে) হ্যাঁ। ওঁকেই জিগ্যেস কর না—একেবারে জ্যান্ত ইঁদুর।

কেদারবাবু রঞ্জনের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন—

কেদার ঃ আপনি ইঁদুর আবিষ্কার করেছেন?

রঞ্জন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

রঞ্জনঃ আজ্ঞে সে কিছু নয়—সামান্য রুমাল দিয়ে—ছেলেমানুষী—

রঞ্জন ভর্ৎসনাপূর্ণ নেত্রে মঞ্জুর পানে তাকাইল। কেদারবাবু কিন্তু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন।

কেদার ঃ আবিষ্কার কখনও ছেলেমানুষী হতে পারে? কি করেছেন দেখি?

রঞ্জন ঃ (করুণভাবে) আজ্ঞে, নেহাত বাজে জিনিস—সকলেই জানে।

কেদার কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়।

কেদার ঃ তা হোক, দেখি।

রঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল; ক্ষুব্ধ কটাক্ষে মঞ্জুর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে মুখে কাপড় গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি রোধ করিতেছে। গত সন্ধ্যার প্রতিশোধ লইয়া সে যে খুশি হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

রঞ্জন ইঁদুর তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেদারবাবু দুই চক্ষে আগ্রহ ও একাগ্রতা ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইঁদুর প্রস্তুত হইলে রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন ঃ এই নিন, হয়েছে।

ইঁদুরটিকে ডান হাতের উপর রাখিয়া রঞ্জন বাঁ হাতে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। ইঁদুর পিছলাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার হাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রঞ্জন তাহার ল্যাজ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল।

ইঁদুরের কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে কেদারবাবুর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। হাসি ক্রমে প্রসার লাভ করিল; তাঁহার গলা হইতে নানা প্রকার কৌতুক-দ্যোতক শব্দ বাহির হইতে লাগিল। সর্বশেষে তিনি দুই হাতে পেট চাপিযা ধরিয়া হো হো শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাহা নিমেষকালের জন্য। পরক্ষণেই তাঁহার উচ্চ হাস্য উচ্চতর কাতরোক্তিতে পরিণত হইল। মুখ অতিমাত্রায় বিকৃত করিয়া তিনি একহাতে গাল চাপিয়া ধরিলেন।

কেদার ঃ উহুহুহু—

রঞ্জন শঙ্কিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন ঃ কি হল! কি হল!

কেদারঃ দাঁত! উহুহুহু—দাঁত!

মঞ্জু পিছন হইতে ছুটিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া তাড়াতাড়ি গলাবন্ধটা আবার তাঁহার গালের পাশে জড়াইতে লাগিল। রঞ্জন চেয়ারের অন্য পাশে দাঁড়াইয়া এই

শুশ্রূষা কার্যে মঞ্জুকে সাহায্য করিতে লাগিল। কেদারবাবু কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে মস্তক শীর্ষে গিঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হইল। মঞ্জু ও রঞ্জনের হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হইয়া যাইতেছিল তাহা যেন উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না।

ফেড্ আউট্।

কেদারবাবুর বাড়ির সদর। রাস্তার ধারেই স্তম্ভযুক্ত ফটক; ফটক হইতে দশ-বারো গজ ভিতরে বাড়ি। বাড়ির ভিত উঁচু ; কয়েক ধাপ সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া সদর বারান্দায় উপনীত হইতে হয়।

সিঁড়ির উচ্চতম সোপানে বসিয়া মঞ্জু নিবিষ্ট মনে একটি জাপানী ফ্রেমে আঁটা ফটোগ্রাফ দেখিতেছে। ফটোগ্রাফটি রঞ্জনের; কয়েকদিন পূর্বে যাহা মিহির আচমকা তুলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

মিহিরও উপস্থিত আছে। সে মঞ্জুর পাশে বসিয়া এক হাত মেঝেয় রাখিয়া গলা বাড়াইয়া ফটোটি দেখিতেছে; তাহার মুখে কৃতী শিল্পীর গর্ব সুপরিস্ফুট। চিরসঙ্গী ক্যামেরাটি অবশ্য তাহার সঙ্গেই আছে।

মঞ্জু মগ্নভাবে ছবিটি হাঁটুর উপর রাখিয়া দেখিতেছে: ছবির শিল্পকলা অথবা মানুষটি—কিসে মঞ্জু বেশী অভিভূত ঠিক বোঝা যাইতেছে না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মিহির জিজ্ঞাসা করিল—

মিহির ঃ কেমন? ঠিক জাপানী স্টাইলে হয় নি?

মঞ্জু একবার মিহিরের দিকে তাকাইয়া ছবিটিকে সমালোচকের নিষ্করুণ দৃষ্টি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিল।

মঞ্জুঃ হুঁ! আপনি তো বেশ ফটো তোলেন।

মিহির আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া দুই হাত দিয়া নিজের একটা হাঁটু আলিঙ্গন করিয়া আকাশের পানে তাকাইল।

মিহির ঃ জাপানী টেক্নিক্ আয়ত্ত করেছি। জগতের শ্রেষ্ঠ আর্ট হচ্ছে জাপানী আর্ট। একটা জাপানী কবিতাও লিখেছি—শুনবেন।

মঞ্জু একটু শঙ্কিত হইল।

মঞ্জু ঃ আবার জাপানী কবিতা! তা বলুন, এক মিনিটে তো ফুরিয়ে যাবে!

মিহির যথাযোগ্য ভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করিল—

মিহির ঃ 'চেরীর বনে একটি মেয়ে জাপানী
মনের সুখে খাচ্ছে বসে চা-পানি
পরণে তার একটি কেবল কিমোনো
জাগ রে কবি—আর কি সাজে ঝিমানো?'

ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গীতে দুই হস্ত লীলায়িত করিযা মিহির কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, হঠাৎ ফটকের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে তদবস্থায় থামিয়া গেল।

ফটকের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া একটি আধুনিকা তরুণী যাইতেছিলেন। অলস মন্থর গতি; কাঁধের উপর একটি রঙিন প্যারাসোল অলসভাবে ঘুরিতেছে: তরুণী একবার ফটকের ভিতরে অলস নেত্রপাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিহির ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া চিড়িক্ মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে কবিসুলভ ভাবালুতা। সে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

মঞ্জু এতক্ষণ মজা দেখিতেছিল; গূঢ় কৌতুকে মৃদু হাসিয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ চললেন না কি মিহিরবাবু?

মিহির থামিল না, পিছু ফিরিয়া তাকাইল না; কেবল একটা হাত নাড়িয়া বলিল—

মিহির ঃ হ্যাঁ—নমস্কার।

তরুণী যে-পথে গিয়াছিলেন, মিহির দ্রুতপদে ফটক পার হইয়া সেই পথ ধরিল।

হাসিয়া মঞ্জু ছবির দিকে চোখ নামাইল। বেশ কিছুক্ষণ ভাল করিয়া ছবিটি দেখিয়া লইয়া সে সচকিতে চারিদিকে তাকাইল। কেহ দেখিয়া ফেলে নাই। সে তখন উঠিয়া ছবিটা দোলাইতে দোলাইতে—যেন ছবিটার প্রতি তাহার কোনই লোভ নাই এমনিভাবে—বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

কাট্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং-রুম। একটি সোফার উপর কেদারবাবু একটা হাঁটু তুলিয়া পাশ ফিরিয়া বসিয়াছেন; সোফার উপর একটি রুমাল পাতিয়া সেটিকে নানাভাবে পাট করিয়া ইঁদুর তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সতর্ক চক্ষু দুটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আসিতেছে; তাঁহার শিশুসুলভ ক্রীড়া যাহাতে কেহ দেখিয়া না ফেলে।

বহির্দ্বারের নিকট মঞ্জুর পদশব্দ শুনিয়া কেদারবাবু চট্ করিয়া রুমালটি পকেটে পুরিলেন, তারপর গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঞ্জু ঘরে ঢুকিয়া চোখের কোণ দিয়া কেদারবাবুকে দেখিয়া লইল; তারপর অন্যমনস্কভাবে একটা সুর গুন গুন করিতে করিতে ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কোনও ক্রমে একবার নিজের ঘরে পেঁছিতে পারিলে হয়।

সে দরজায় চৌকাঠ অবধি পেঁছিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে কেদারবাবুর কণ্ঠস্বর আসিল—

কেদার ঃ তোর হাতে ওটা কিরে মঞ্জু?

ধরা পড়িয়া গিয়া থতমতভাবে মঞ্জু দাঁড়াইয়া পড়িল; তারপর সামলাইয়া লইয়া তাচ্ছিল্যের ভান করিয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ এটা? ওঃ! সেদিন মিহিরবাবু যে ফটো তুলেছিলেন সেইটে দিয়ে গেলেন।

কেদার হাত বাড়াইয়া বলিলেন—

কেদার ঃ দেখি।

অগত্যা ছবিটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিতে হইল। কেদারবাবু সেটি দুহাতে ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন; তারপর চশমা বাহির করিয়া পরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। শেষে একটা হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—

কেদার ঃ মন্দ তোলে নি ছোঁড়া! তা ছাড়া, এ ছোকরার চেহারাটাও খাসা।

তিনি ঘরের এদিক-ওদিক দেয়ালের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, যেন ছবিটি টাঙাইবার একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজিতেছেন।

কেদার ঃ ঐখানে ঠিক হবে! কি বলিস্?

তিনি জানালার পাশে একটা স্থান নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

মঞ্জু দেখিল পিতৃদেব যখন ছবিটি দখল করিয়াছেন তখন আর তাহা উদ্ধারের উপায় নাই। সেও ঘরের দেয়ালগুলি দেখিতে দেখিতে বলিল—

মঞ্জু ঃ ঐখানে? না বাবা, তার চেয়ে ঐ দেয়ালে বেশ ভাল হবে।

মঞ্জু আর একটা স্থান নির্দেশ করিল।

কেদার ঃ ওখানে ভাল হলেই হল? আমি বলছি ঐখানে ঠিক হবে।

মঞ্জু ঃ কিন্তু আলো লাগবে না যে!

কেদার ঃ হুঃ, আলো লাগবে না! আলবৎ লাগবে। দেখি তো কেমন না লাগে

তিনি ছবি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার ঃ তুই যা, চট্ করে একটা হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে আয়। আমি এখানে টাঙিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্জু ঃ কোথায় পাব হাতুড়ি আর পেরেক?

কেদার ঃ দ্যাখ্ না, বাড়িতেই কোথাও আছে।

মঞ্জু ঃ আচ্ছা দেখছি। কিন্তু ঐ দেয়ালে হলেই ভাল হত।

কেদার ঃ না না, তুই ছেলেমানুষ এসব কী বুঝবি! হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে আয় তো আগে—

মঞ্জু অনিচ্ছাভরে বাড়ির অন্দরের দিকে চলিল; কেদার ছবিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহার মনোনীত দেয়ালে কেমন মানাইবে তাহাই দেখিতে লাগিলেন

কাট্।

ঝাঝার একটি পথ। বেশী লোক চলাচল নাই। রঞ্জন এই পথ দিয়া মোটর সাইক্‌ল চালাইয়া আসিতেছে। তাহার চোখে মোটর গগ্‌ল্ থাকা সত্ত্বেও মুখখানা বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছে।

যে তরুণীটিকে আমরা পূর্বে দেখিয়াছি তিনিও এই পথ দিয়া প্যারাসোল ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইতেছেন।

রঞ্জনের মোটর সাইক্‌ল্ তাঁহার পাশ দিয়া বিপরীত মুখে চলিয়া গেল। তরুণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর হাত তুলিয়া ডাকিলেন—

তরুণী ঃ রঞ্জনবাবু! অ রঞ্জনবাবু!

রঞ্জন কিছু দূর আগাইয়া গিয়াছিল, ডাক শুনিয়া গাড়ি থামাইল। তরুণী হাস্য মুখে তাহার সম্মুখস্থ হইলেন।

তরুণীঃ (বিস্ময়মিশ্রিত কলকণ্ঠে) এ কি রঞ্জনবাবু—আপনি এখানে? ভাি আশ্চর্য তো। কে ভেবেছিল যে—

তরুণী থামিয়া গেলেন; অপ্রত্যাশিত মিলনের অপরিমিত আনন্দ যেন তাঁহা কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখের গগ্‌ল্ খুলিয়া ফেলিল। তরুণীকে চিনিতে পারিয় সেও হাসিল বটে কিন্তু হাসির মধ্যে তেমন প্রাণ মাতানো আহ্লাদ ফুটিয়া উঠি না।

রঞ্জন ঃ তাই তো, ইন্দু দেবী যে! আপনি এখানে কবে এলেন?

ইন্দু ঃ আমি কাল এসেছি। আপনিও যে এখানে এসেছেন তা কে জান্‌তো?

রঞ্জন ঃ কেউ না। অর্থাৎ যাক্, বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

ইন্দু ঃ হ্যাঁ—কলকাতায় যা গরম—

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল, যেন পলায়নের রাস্তা খুঁজিতেছে।

ইতিমধ্যে মিহির যে ইন্দুর অনুসরণ করিয়া অকুস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহ কেহ লক্ষ্য করিল না। মিহির ইহাদের কিছু দূরে তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে এবং নিজের ক্যামেরাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

ইন্দু কথা বলিয়া চলিয়াছে—

ইন্দু ঃ প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাই পালিয়ে এলুম। এখানে তবু ঠাণ্ডা।—

তারপর, আপনি এখন চলেছেন কোথায়?

কোথায় যাইতেছে তাহা বলিবার অভিপ্রায় রঞ্জনের একেবারেই ছিল না; সে ভাসা ভাসা উত্তর দিল—

রঞ্জন ঃ বিশেষ কোথাও নয়—এমনি—একটু এদিক-ওদিক বেড়াতে—

ইন্দু ঃ ও—তা আমাদের বাড়িতেই চলুন না।

রঞ্জন বিপন্ন হইয়া পড়িল।

রঞ্জন ঃ মানে—কথা হচ্ছে যে—

ইন্দু বাঁকা হাসিয়া বলিল—

ইন্দু ঃ ভয় কি! আমি একা নই— বাড়িতে মা আছেন।

রঞ্জন ভয় পাইয়া গেল।

রঞ্জন ঃ মা! ইর্‌র্‌—অর্থাৎ কিনা—মা?

ইন্দু ঃ হ্যাঁ—তিনিও এসেছেন কিনা।

রঞ্জন দেখিল আর উদ্ধার নাই, সে ঘাড় চুলকাইল।

রঞ্জন ঃ ও—তা—কি বল—

এই সময় দূরে চটুল বাদ্যযন্ত্রের নিক্কণ শোনা গেল; শব্দ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। ইন্দু সেইদিকে তাকাইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল—

ইন্দু ঃ বাঃ! কী সুন্দর! দেখুন দেখুন—

একটি সাঁওতাল-মিথুন পথের মোড়ের উপর নৃত্য শুরু করিয়াছে; সঙ্গে বাঁশী ও মাদল বাজিতেছে। কয়েকজন পথচারী তাহাদের ঘিরিয়া দেখিতেছে।

নর্তক-নর্তকীর দেহের নিটোল যৌবন নৃত্যের ছন্দে ছন্দে যেন উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। ইন্দু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিল।

নৃত্য চলিতেছে। রঞ্জন আড় চোখে ইন্দুর পানে তাকাইয়া দেখিল, সে মগ্ন হইয়া নৃত্য দেখিতেছে, অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। রঞ্জন সন্তর্পণে গাড়ির হ্যান্ডেল ধরিয়া পিছু হটিতে লাগিল। ইন্দু কিছু জানিতে পারিল না। রঞ্জন কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া গাড়ির মুখ ঘুরাইয়া লইল; তারপর গাড়িটি ঠেলিতে ঠেলিতে এবং সশঙ্কচক্ষে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে অদৃশ্য হইল।

এদিকে নৃত্য ক্রমে শেষ হইল। নর্তক-নর্তকী দর্শকদের সেলাম করিয়া দক্ষিণার জন্য হাত পাতিল।

ইন্দু হাতের ব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিতে করিতে বলিল—

ইন্দু ঃ চমৎকার! না রঞ্জনবাবু?

পাশে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল রঞ্জন নাই, তাহার স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি যুবক দন্তবিকাশ করিয়া আছে।

মিহির ঃ ভারি সুন্দর!

ইন্দু ঃ (বিস্মিত ক্ষোভে) এ কি? আপনি কে? রঞ্জনবাবু কোথায়?

সে পিছন ফিরিয়া দেখিল কিন্তু পথে রঞ্জন বা তাহার গাড়ির চিহ্নমাত্র নাই। মিহির বিগলিতস্বরে বলিল—

মিহির ঃ আমার নাম মিহিরনাথ মণ্ডল। রঞ্জনবাবু অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

ইন্দুর মুখ ও চোখের চাহনি কঠিন হইয়া উঠিল।

ইন্দু ঃ অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

মিহির এই ফাঁকে ক্যামেরা বাহির করিল।

মিহির ঃ দেখুন, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে ঐ প্যারাসোল মাথায় দিয়ে—

ঠিক জাপানী মেয়ের মত। একটু দাঁড়ান ঐভাবে।

মিহির ক্যামেরা উদ্যত করিল। ইন্দু তাহার প্রতি একটা তীব্র বিরক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে ক্যামেরার দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল।

মিহির ক্যামেরা হইতে চোখ তুলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল।

কাট্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং-রুম। মঞ্জু আসিয়া তাঁহাকে একটি হাতুড়ি ও পেরেক দিল; তিনি সে-দুটি দু'হাতে লইয়া হৃষ্টস্বরে বলিলেন—

কেদার ঃ তুই ছবিটা নিয়ে আয়।

তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট দেয়ালের দিকে গেলেন। ছবিটা টিপয়ের উপর রাখা ছিল, মঞ্জু সেটা হাতে লইল।

মঞ্জু ঃ তোমার নিজের পেরেক ঠোকবার কি দরকার বাবা, চাকরদের কাউকে ডাকলেই তো ঠুকে দিতে পারে।

কেদার দেয়ালের কাছে পৌঁছিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন।

কেদার ঃ চাকরে আমার চেয়ে ভাল পেরেক ঠুকতে পারে? হুঁ!

মঞ্জু ঃ তা নয়—তবে—

কেদার ঃ তবে মিছে বকিস্ নি—নিয়ে আয়।

কেদার পেরেকটিকে দেয়ালের এখানে ওখানে দাঁড় করাইয়া ঠিক কোন্ স্থানটি উপযোগী তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। শেষে একটি স্থান নির্বাচন করিয়া পেরেকটি সেখানে দাঁড় করাইয়া হাতুড়ি দ্বারা দু-তিন বার মৃদু আঘাত করিলেন; তারপর জোরে আঘাত করিবার জন্য হাতুড়ি তুলিলেন। ঠিক এই সময় পিছন হইতে মঞ্জুর গলা শোনা গেল।

মঞ্জু ঃ ওঃ! রঞ্জনবাবু!

বিঘ্ন হইল। কেদারবাবুর উদ্যত হাতুড়ি তাঁহার বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর গিয়া পড়িল। হাতুড়ি ও পেরেক ছাড়িয়া দিয়া কেদারবাবু লাফাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

কেদার ঃ উঃ! গিছি রে—উহুহু—গিছি রে বাবা—

রঞ্জন সদ্য ঘরে ঢুকিয়াছিল; সে উৎকণ্ঠিতভাবে আগাইয়া মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিল—

রঞ্জন ঃ কী হয়েছে?

কেদারবাবু যন্ত্রণায় নাচিতে নাচিতে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে নানা প্রকার অর্থহীন কাতরোক্তি বাহির হইতে লাগিল।

রঞ্জন আসিয়া মঞ্জুর পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

রঞ্জন ঃ তাই তো—লেগেছে না কি?

মঞ্জু ঃ (অস্থিরভাবে) হ্যাঁ—হাতুড়ি দিয়ে—বুড়ো আঙুলে। কি করি এখন?

কেদার ক্রুদ্ধ চক্ষে তাহার পানে তাকাইলেন।

কেদার ঃ দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ফুঁ দিতে পারো না?

এই বলিয়া তিনি আহত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহাদের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিলেন।

মঞ্জু ও রঞ্জন ছুটিয়া গিয়া কেদারের চেয়ারের দুই পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তারপর একসঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল।

দু'জনে মুখোমুখি ফুঁ দিয়া চলিল। এইভাবে ফুঁ দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কোনও

মাধুর্য আছে; দুজনের মুখ হইতেই উৎকণ্ঠার ভাব কাটিয়া গিয়া উৎসাহ দেখা দিল।

রঞ্জন : (ফুঁ দিতে দিতে মঞ্জুকে) কালশিরে পড়ে গেছে।

মঞ্জু : হুঁ—

দ্বিগুণ উৎসাহে ফুঁ দেওয়া চলিল। কেদারবাবুর কাতরোক্তিও ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কলিকাতায় প্রতাপবাবুর গৃহে বসিবার ঘর। জনৈক রাজাশ্রেণীর বড় জমিদারের ম্যানেজার এবং প্রতাপ মুখোমুখি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মাঝখানে একটি কাচে ঢাকা নীচু গোল টেবিল। টেবিলের উপর ফল, মিষ্টান্ন, চা প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। প্রতাপের পাশে একটি ছোট টিপয়ের উপর টেলিফোন যন্ত্র।

ম্যানেজারবাবুর চেহারাটি চতুষ্কোণ; তিনি থাকিয়া থাকিয়া একটি রসগোল্লা দুই আঙুলে ধরিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছেন। প্রতাপ একটি বিবাহযোগ্যা বালিকার ফটো মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন।

দেখা শেষ করিয়া প্রতাপ ফটোটি ম্যানেজারকে ফেরত দিয়া শূন্যে তাকাইয়া বলিলেন—

প্রতাপ : ফটো দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে—

ম্যানেজার ফটোটি পাঞ্জাবির পকেটে রাখিয়া মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন—

ম্যানেজার : আরে মশাই, রাজার ঘরের মেয়ে ভাল হবে না তো কি ঘুঁটে কুড়ুনির মত হবে?

তিনি আর একটি রসগোল্লা মুখে ফেলিলেন।

প্রতাপ : তা বটে—তা বটে। কিন্তু তবু একবার নিজের চোখে দেখা দরকার।

ম্যানেজার : তা বেশ। দেখতে চান দেখুন—আপত্তি কি?

এই সময় টেলিফোন যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। ম্যানেজারের প্রতি একটি অর্ধোচ্চারিত বিনয়োক্তি করিয়া প্রতাপ টেলিফোন তুলিয়া লইলেন।

প্রতাপ : মাফ্ করবেন। হ্যালো! কে বিধু? এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি—কী খবর?

কাট্।

তারের অন্য প্রান্তে বিধু কথা কহিতেছেন।

বিধু: শোনো নি? যে ক'টি ভদ্রমহিলার বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে তাঁরা সবাই হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন।

কাট্।

প্রতাপ একটু বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন।

প্রতাপ : গেছেন তো গেছেন—আমার তাতে কি?

কাট্।

বিধু : আরে, চটো কেন? আমার কি মনে হয় জানো? ভদ্রমহিলারা সব মেয়ে নিয়ে—এই—ঝাঝার দিকেই যাত্রা করেছেন।

কাট্।

প্রতাপের চক্ষু বিস্ফারিত হইল, চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল।

প্রতাপ ঃ অ্যাঁ—বল কি বধু? তবে কি তারা কিছু জানতে পেরেছে নাকি?

কাট্।

বিধু ঃ (সরলভাবে) তা কি ক'রে বলব ভাই? তবে গুজব শুনেছি, কথাটা নাকি আর চাপা নেই।—অ্যাঁ? আরে না না, আমি কি কখনও বলতে পারি? হয়তো তোমার ছেলেই কাউকে চিঠিপত্র লিখেছিল—আচ্ছা, তুমি ব্যস্ত আছ—আজ আসি তাহলে—

পরিতৃপ্তভাবে হাসিতে হাসিতে বিধু ফোন রাখিয়া দিলেন।

কাট্।

অত্যন্ত বিচলিতভাবে ফোন রাখিয়া প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চিন্তা-বন্ধুর ললাটে গালের আব্‌টি টিপিতে টিপিতে ঘরের মধ্যে কয়েকবার পাক খাইলেন। ম্যানেজার মিষ্টান্ন চিবাইতে চিবাইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিতেছিলেন; অবশেষে প্রশ্ন করিলেন -

ম্যানেজার ঃ তাহলে মেয়ে দেখতে যাওয়াই স্থির।

প্রতাপ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; মেয়ে দেখার কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রতাপ ঃ মেয়ে! থামুন মশাই, আগে ছেলে উদ্ধার করি, তারপর মেয়ে দেখব।

ম্যানেজারের চর্বণ ক্রিয়া বন্ধ হইল, তিনি অনিমেষ নেত্রে প্রতাপের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ম্যানেজার ঃ কি হয়েছে ছেলের?

প্রতাপ ব্যাপারটাকে লঘু করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

প্রতাপ ঃ হয় নি কিছু। তাকে এক জায়গায় বেড়াতে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি সে জায়গা আর নিরাপদ নয়।

ম্যানেজারের চর্বণ কার্য আবার সচল হইল। প্রতাপ দুশ্চিন্তায় চুলের মধ্য দিয়া আঙুল চালাইয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—

প্রতাপ ঃ ভ্যালা ফ্যাসাদ! এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও তো—তাঁরাও গুটি গুটি ফিরে আসবেন! নাঃ, ছেলে বিয়ের যুগ্যি হওয়াও একটা ফ্যাসাদ দেখছি। কে জানে ছেলেটা এখন কি করছে? হয়তো—

ওয়াইপ্।

ঝাঝার উপকণ্ঠে একটি পার্বত্য স্থান। অসমতল উপল বন্ধুর ভূমি; মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড়, শালের ঝোপ। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ধারা বিস্তীর্ণ বালু-শয্যার উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

একটি পাথরের স্তূপ বেশ উঁচু; তাহার চূড়া মাটি হইতে প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চে। এই গিরিশৃঙ্গের উপর রঞ্জন অতি সাবধানে আরোহণ করিতেছিল। কিন্তু একা নয়। মঞ্জুও উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে দুরারোহ স্থানে পৌঁছিলে রঞ্জন হাত ধরিয়া মঞ্জুকে টানিয়া তুলিতেছিল।

অবশেষে প্রায় চূড়ার কাছে পৌঁছিয়া উভয়ে দেখিল আর ওঠা যায় না; তখন সেই-খানে দাঁড়াইয়া তাহারা বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

উঁচু হইতে চারিদিকের দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়। রঞ্জন মুগ্ধভাবে বলিল—

রঞ্জন ঃ কী চমৎকার! ঝাঝার এত কাছে যে এত সুন্দর জায়গা আছে তা আমি জানতুমই না—পাহাড়—জঙ্গল—আবার একটি ছোট্ট নদীও আছে।

রঞ্জনের মুগ্ধ ভাব দেখিয়া মঞ্জু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। রঞ্জন পিছনে তাকা-ইয়া দেখিল—পাহাড়ের গায়ে বেঞ্চির মত খাঁজকাটা বসিবার স্থান আছে।

রঞ্জন ঃ বসুন!

উভয়ে পাশাপাশি বসিল।

রঞ্জন ঃ বাস্তবিক কী নির্জন জায়গা! এবার যখনই দেখব বাড়িতে বিপদের সম্ভাবনা, এখানে পালিয়ে আসব।

মঞ্জু চকিতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইল।

মঞ্জু ঃ বাড়িতে বিপদ কিসের?

রঞ্জন একটু অপ্রতিভ হইল।

রঞ্জন ঃ না, এম্নি কথার কথা বলছি।—আপনি এখানে বেড়াতে আসেন না কেন?

মঞ্জু বাহিরের দিকে তাকাইল; তাহার চক্ষু ক্রমে স্বপ্নাতুর হইল।

মঞ্জু ঃ প্রায়ই আসি—পাহাড়ে, জঙ্গলে, যোড়ের বালির ওপর ঘুরে বেড়াই।

রঞ্জনও চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাতুর করিয়া চাহিল।

রঞ্জন ঃ এবার থেকে আমিও প্রায়ই আস্‌ব—পাহাড়ে জঙ্গলে নদীর চরে ঘুরে বেড়াব।

রঞ্জন মঞ্জুর পানে একবার আড়চক্ষে চাহিল।

রঞ্জন ঃ কে বলতে পারে, ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হয়তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে।

মঞ্জু হাসি লুকাইল।

মঞ্জু ঃ তারপর আমি মোটরে বাড়ি ফিরে যাব।

রঞ্জন ঃ আমিও মোটর বাইকে বাড়ি ফিরে যাব।

উভয়ে নীচের দিকে তাকাইল। নীচে একটি সমতল স্থানে মঞ্জুর মোটর ও রঞ্জনের মোটর বাইক ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াইয়া আছে, যেন দুটির মধ্যে ভারী ভাব।

মঞ্জু ও রঞ্জন পরস্পরের পানে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল। এই সময় নিম্ন হইতে রাখালের বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিল। দুজনে চোখে চোখে চাহিয়া শব্দ শুনিল; তারপর নীচের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

একপাল মহিষ দিনের চারণ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। সর্বশেষ মহিষের পিঠের উপর বসিয়া একটি ক্ষুদ্র বালক বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে। রঞ্জন ও মঞ্জু পাশাপাশি বসিয়া বাঁশী শুনিতেছে। ক্রমে রঞ্জন গুন্ গুন্ করিয়া বাঁশীর সুর গুঞ্জন করিতে লাগিল, তারপর মৃদুস্বরে গাহিল—

রঞ্জন ঃ 'প্রাণের বাঁশী বাজাও তুমি কে?
কোথায় এমন সুর এলো শিখে?'

মঞ্জু গাহিয়া উত্তর দিল—

মঞ্জু ঃ 'ও যে ব্রজের রাখাল চরায় ধেনু
বাজায় বেণু গো—'

রঞ্জন নদীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া গাহিল—

রঞ্জন ঃ 'প্রেম-যমুনার তীরে তারে
দেখতে পেনু গো—'

মঞ্জু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—

মঞ্জু ঃ 'এবার ঘরে ফেরার সময় হ'ল
চল্ রে সেই দিকে।'

রঞ্জনও উঠিয়া দাঁড়াইল—

রঞ্জন ঃ 'আজ ঘর ভুলেছি বাঁশীর তানে
বনের অন্তিকে।'

মহিষপাল গোধূলি আলোর ভিতর দিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। বাঁশী বাজিতেছে। মঞ্জু ও রঞ্জনের কণ্ঠস্বর বাঁশীর সুরে মিশিতেছে।

ফেট আউট্।

ফেড ইন্।

ঝাঝায় একটি বাড়ির সম্মুখস্থ ঢাকা বারান্দা। একটি ডেক্ চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া একটি টুলের পা তুলিয়া দিয়া ইন্দু নভেল পড়িতেছে। তাহার বেশবাস ও কেশপাশ অযত্ন বিন্যস্ত।

নভেল পড়িতে পড়িতে পাশের একটি বেতের টেবিলের উপর হইতে চকোলেট লইয়া মুখে পুরিয়া ইন্দু চিবাইতে লাগিল। ইন্দুর মাতা আসিয়া ইতিমধ্যে একটি বেতের চেয়ারের মাথা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং মুখে ভর্ৎসনা ও বিরক্তি মিশাইয়া মেয়ের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ইনি আমাদের পূর্বপরিচিতা স্থূলাঙ্গী গৃহকর্ত্রী।

কর্ত্রী ঃ কেদারায় গা এলিয়ে নভেল পড়লেই চল্‌বে? এই জন্যেই বুঝি এখানে আসা হয়েছে?

ইন্দু মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল; তাহার মুখেও বিরক্তি ও বিদ্রোহ সুপরিস্ফুট।

ইন্দু ঃ তা—আর কী করব বলে দাও—

হৃদয়ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহকর্ত্রী বেতের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

কর্ত্রী ঃ তোকে নিয়ে আমি যে কি করি ইন্দু, ভেবে পাই না। একটু গা নাড়বি না—কেবল আলিস্যি আর নভেল পড়া। বলি, দায় কি শুধু আমারই? বিয়ে করবে কে? তুই—না আমি?

ইন্দু রুক্ষস্বরে উত্তর দিল—

ইন্দু ঃ তা কি জানি—তুমিই বল্‌তে পার।

কর্ত্রী ঃ ইন্দু—

ইন্দু মাতার বিমূঢ় বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া আর থাকিতে পারিল না খিল খিল করিয়া হাসিয়া মুখে বই চাপা দিল। রাগের মাথায় সে যাহা বলিয়াছিল তাহার যে একটা হাস্যকর দিক আছে তাহা সে পূর্বে খেয়াল করে নাই।

কর্ত্রী ঃ আবার হাসি! আজকালকার মেয়েরা সত্যি বেহায়া বাপু। ও কথা বল্‌তে তোর মুখে বাধ্‌ল না?

ইন্দু আবার উদ্ধত স্বরে জবাব দিল—

ইন্দু ঃ বাধ্‌বে কোন দুঃখে! তোমরাই তো আমাদের বেহায়া করে তুলেছ; নইলে একটা পুরুষমানুষের পেছনে ছুটে বেড়াতে আমার কি লজ্জা হয় না?

কর্ত্রী ঃ বোকার মত কথা বলিস নি ইন্দু। ছুটে বেড়াতে বলি কি সাধে। ওর বাপের যে লক্ষ লক্ষ টাকা; বিয়ে হলে সব যে তোর হবে। এতটুকু নিজের ইষ্ট বুঝতে পারিস নে?

ইন্দু সশব্দে বই বন্ধ করিল।

ইন্দু ঃ খুব পারি। কিন্তু যে লোক পালিয়ে বেড়ায়, তার পেছনে ছুটে বেড়াতে নিজের ওপর ঘেন্না হয়।

কর্ত্রী ঃ (ধমক দিয়া) ঘেন্না আবার কিসের! সবাই করছে। এই যে মীরার মা, মলিনার

মা, সলিলার মা, সবাই এসে জুটেছে—সে কি হাওয়া বদ্‌লাবার জন্যে? সকলের মতলব রঞ্জনকে হাত করা।

ইন্দু বই খুলিয়া বসিল।

ইন্দু ঃ যা ইচ্ছা করুক তারা; আমি পারব না।

কর্ত্রী ঃ আবার বই খুললি? পারি নে বাপু? (মিনতির সুরে) নে ওঠ—লক্ষ্মীটি, তাড়াতাড়ি সাজ-গোজ করে নে'র হ। কী হয়ে রয়েছিস বল্ দেখি? চুলগুলো একমাথা—মা গো মা!

ইন্দু ঃ কোথায় যেতে হবে শুনি?

কর্ত্রী ঃ তা—বেড়াতে বেড়াতে না হয় রঞ্জনের বাড়ির দিকেই যা না—হয়তো সে—

ইন্দু ঃ বলেছি তো বাড়িতে থাকে না—দু'বার গিয়ে ফিরে এসেছি।

গৃহকর্ত্রী ইন্দুর হাত ধরিয়া একটু নাড়া দিলেন।

কর্ত্রী ঃ তা হোক; তুই এখন ওঠ তো। কে বলতে পারে হয়তো রাস্তাতেই দেখা হ'য়ে যাবে।

ইন্দু ঃ (মুখ বিকৃত করিয়া) হ্যাঁ—হয়তো দেখবো মীরা কি মলিনা আগে থাকতেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

কর্ত্রী ঃ তাহলে তুইও সেই সঙ্গে জুটে যাবি। আর কিছু না হোক, ওরা তো কিছু করতে পারবে না; সেটাই কি কম লাভ? নে, আর দেরি করিস নি।

ইন্দু বইখানা বিরক্তিভরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু ঃ বেশ, যা বল করছি। মান ইজ্জৎ আর রইল না—

সে রাগে গাল ফুলাইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। গৃহকর্ত্রী তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজ মনেই বলিলেন—

কর্ত্রী ঃ মান ইজ্জৎ। কথা শোনো না, টাকার কাছে মান ইজ্জৎ!

কাট্।

ঝাঝার বাজারের পাশে একটা আম বাগান। মিহির এই বাগানের একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়া একান্তমনে কাঠবিড়ালীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল; বোধ হয় ফটো তুলিবার ইচ্ছা।

একটি যুবতী মিহিরের পিছন দিকে প্রবেশ করিলেন। ইনি মলিনা। পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তিনি পিছন হইতে মিহিরের চোখ টিপিয়া ধরিলেন। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—

মলিনা ঃ বলুন তো আমি কে?

মিহির ত্বরিতে নিজের চোখের উপর হইতে মলিনার হাত সরাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইল; তারপর তাহার সন্ত্রস্ত মুখে হাসি দেখা দিল। সে মলিনার দিকে ঘুরিয়া বসিল।

মলিনার মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল; সে থতমত খাইয়া বলিল—

মলিনা ঃ ওঃ মাফ করবেন। আমি ভেবেছিলুম আপনি রঞ্জনবাবু—

মিহিরের আনন্দ কিছুমাত্র প্রশমিত হইল না। মলিনা পিছু হটিতে লাগিল।

মিহির ঃ না—আমার নাম মিহিরনাথ মণ্ডল—রঞ্জনবাবু এখা'ন নেই।

মলিনা ঃ মাফ করবেন—

চলিয়া যাইতে যাইতে মলিনা দ্বিধাভরে দাঁড়াইল।

মলিনা ঃ আপনি—রঞ্জনবাবুকে চেনেন?

মিহির উঠিয়া মলিনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিহির ঃ চিনি বৈকি। আপনি কি তাঁর কেউ?

মলিনা ঃ বান্ধবী। তাঁকে কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?

মিহির ঃ এই তো খানিকক্ষণ হল তিনি ফট্‌ফট্‌ করে এদিক দিয়ে নদীর দিকে বেড়াতে গেলেন।

মলিনা ঃ ও। তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল বুঝি?

মিহির ঃ কেউ না—একলা। কী ব্যাপার বলুন দেখি? কালকেও একটি অপরিচিতা তরুণী আমাকে এই কথাই জিগ্যেস করছিলেন।

মলিনা সচকিতে মিহিরের পানে তাকাইল।

মলিনা ঃ তাই না কি?

মিহির ঃ হ্যাঁ। তাঁকেও বললুম—রঞ্জনবাবু তো প্রায়ই নদীর ধারে বেড়াতে যান।

মলিনা একটু চিন্তা করিল।

মলিনা ঃ হুঁ, নদীর ধারটা কোন দিকে?

মিহির সোৎসাহে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

মিহির ঃ ঐ দিকে। এই যে রাস্তাটা ঐ দিকেই গিয়েছে। ভারি সুন্দর জায়গা; পাহাড়, বন, নদী। যাবেন সেখানে? বেশ তো, চলুন না—

মলিনাঃ ধন্যবাদ। আমি একাই যেতে পারব।

মিহিরের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মলিনা চলিয়া গেল। মিহির একটু নিরাশ-ভাবে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

ঝাঝার উপকণ্ঠস্থ পার্বত্য ভূমি। মঞ্জুর মোটর পূর্বে যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়া। গাড়ি শূন্য; কাছে পিঠে কেহ নাই।

ফট্‌ফট্‌ শব্দ হইল; রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া মঞ্জুর মোটরের পাশে দাঁড়াইল। রঞ্জন অবতরণ করিয়া উৎসুকভাবে চারিদিকে তাকাইল, কিন্তু ঈপ্সিত মূর্তিটিকে দেখিতে পাইল না। রঞ্জন মনে মনে একটু হাসিল; তারপর মুখে আঙুল দিয়া দীর্ঘ শিস্‌ দিল। শিস্‌ দিয়া উৎকণ্ঠ হইয়া রহিল—কোন্‌ দিক হইতে উত্তর আসে!

দুইটি মানুষ যখন পরস্পর ভালবাসিয়া ফেলে তখন তাহাদের মধ্যে আদৌ খেলার অভিনয় চলিতে থাকে। এই জন্যই বোধ হয় 'রস' 'ক্রীড়া' 'কেলি' প্রভৃতি শব্দগুলি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মঞ্জু কিছু দূরে একটা বড় পাথরের চ্যাঙড়ের আড়ালে লুকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল; এখন একবার সতর্কভাবে ওধারে উঁকি মারিবার চেষ্টা করিল। তারপর দুই করতল শঙ্খের আকারে মুখের কাছে লইয়া গিয়া দীর্ঘ টু দিল।

মঞ্জু ঃ টুউউউ—'

টু দিয়াই সে দেহ ঝুঁকাইয়া ক্ষিপ্রচরণে পাথরের আশ্রয় ছাড়িয়া সম্মুখ দিকে পলায়ন করিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে রঞ্জন আসিয়া প্রবেশ করিল; কিন্তু কেহ কোথাও নাই। রঞ্জন একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছে এমন সময় দূর হইতে আবার মঞ্জুর টু আসিল। রঞ্জনের মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে একটু চিন্তা করিল; তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া গেল।

মঞ্জু আর একটা পাথরের তলায় গিয়া লুকাইয়া বসিয়াছিল। হাঁটু পর্যন্ত উলুবন; পাথরটাও বেশী উঁচু নয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে মাথা দেখা যাইবে। মঞ্জু রঞ্জনের পদধ্বনি শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কিছু শুনিতে না পাইয়া সে উল্টা দিকে ফিরিয়া অবনতভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। পাথরের আড়ালে আড়ালে কিছুদূর গিয়া যেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেখিল ঠিক সম্মুখেই পাথরে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জন গম্ভীরভাবে সিগারেট ধরাইতেছে।

মঞ্জু চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

রঞ্জন সিগারেট ধরাইয়া ধীরে-সুস্থে তাহার অনুসরণ করিল।

নদীর বালুর উপর দিয়া মঞ্জু ক্রীড়া-চপলা বালিকার মত হাসিতে হাসিতে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ছুটিতেছে। অবশেষে জলের নিকটবর্তী ভিজা বালুর উপর পেঁীছিয়া সে বসিয়া পড়িল: তারপর দু'হাত দিয়া ভিজা বালু খুঁড়িয়া বালির ঘর তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এইখানে নদীটি প্রায় বিশ হাত চওড়া, জলের উপর সমব্যবধানে কয়েকটি বড় বড় পাথরের চাঁই বসাইয়া পারাপারের ব্যবস্থা হইয়াছে। জল অবশ্য গভীর নয়; কিন্তু জলে না নামিয়া তাহা অনুমান করা যায় না।

রঞ্জন আসিয়া মঞ্জুর পিছনে দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ ওটা কি হচ্ছে ?

মঞ্জু একবার উপর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া আবার বালু খননকার্যে মনোনিবেশ করিয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ ঘর তৈরি হচ্ছে। আপনিও আসুন না, দেখি কেমন ঘর তৈরি করতে পারেন।

রঞ্জন ঘুরিয়া গিয়া মঞ্জুর সম্মুখে বালুর উপর পা ছড়াইয়া বসিল; বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ মেয়েদের ঐ এক কাজ—ঘর তৈরি করা, আর ঘর তৈরি করা।

মঞ্জুর ঘর তখন প্রায় শেষ হইয়াছে; সে ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ আর পুরুষের কাজ বুঝি ঘর ভাঙা, আর ঘর ভাঙা?

রঞ্জন উত্তর দিল না; সিগারেট টানিয়া আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। তাহার চোখ ও অধর-কোণে দুষ্টামি ঝিলিক মারিয়া উঠিল। সে সরলভাবে মঞ্জুর দিকে দৃষ্টি নামাইয়া প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন ঃ তোমার বাড়িতে ক'টি ঘর?

মঞ্জু ঃ একটি—কেন?

রঞ্জন দুষ্টামি-ভরা চক্ষু আবার আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ না কিছু না—এম্নি জিগ্যেস করছিলুম।

মঞ্জু কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিল।

মঞ্জু ঃ কী কথাটা, শুনিই না।

রঞ্জন ঃ নাঃ—কিচ্ছু না—

বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মঞ্জু দ্রুত একমুঠি ভিজা বালি তুলিয়া রঞ্জনকে ছুঁড়িয়া মারিল। রঞ্জন টপ্ করিয়া মাথা সরাইয়া আত্মরক্ষা করিল; তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

মঞ্জু চোখ পাকাইয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ হাসি হচ্ছে কেন? নিজে বাড়ি তৈরি করতে পারেন না তাই আমার বাড়ি

দেখে ঠাট্টা হচ্ছে?

হাস্য সম্বরণ করিয়া রঞ্জন মাথা নাড়িল।

রঞ্জন ঃ উঁহু—

মঞ্জু ঃ তবে? দেখি না কেমন ঘর তৈরি করতে পারেন। আমার চেয়ে ভাল ঘর তৈরি করুন তবে বুঝব।

রঞ্জন ঃ আমি আলাদা ঘর তৈরি করছি না—

মঞ্জু ঃ তবে?

রঞ্জন ঃ তোমার ঘর তৈরি হলে তাইতে ঢুকে পড়ব।

খেলাঘরের ঝগড়ার ভিতর দিয়া রঞ্জনের কথার ধারা কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহা মঞ্জু বুঝিতে পারে নাই। কপট যুযুৎসায় সেও আর একমুঠি বালি তুলিয়া লইয়া বলিল—

মঞ্জুঃ ইঃ! আসুন না দেখি! আমি ঢুকতে দিলে তো! আমার দুর্গ আমি প্রাণ-পণে রক্ষা করব।

রঞ্জন কিন্তু দুর্গ আক্রমণের কোনও চেষ্টা করিল না; হঠাৎ গম্ভীর হইয়া মঞ্জুর দিকে একটু ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু, মনে কর আমার বাড়ি নেই; আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে তোমার কি আপত্তি হবে?

মঞ্জু বালুমুষ্টি নিক্ষেপ করিবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলিয়াছিল, সেগুলি ঝরিয়া তাহার কাপড়ের উপর পড়িল। তাহার গাল দুটি তপ্ত হইয়া উঠিল; সে মাথা হেঁট করিয়া কাপড় হইতে বালি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন ঃ মঞ্জু—

মঞ্জুও উঠিয়া ঘাড় হেঁট করিযা দাঁড়াইল। রঞ্জন কাছে আসিয়া তাহার দুই হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

রঞ্জন ঃ কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলবার চেষ্টা করছি—

মঞ্জু তাহার সলজ্জ চোখ দুটি রঞ্জনের বুক পর্যন্ত তুলিয়াই আবার নত করিয়া ফেলিল, চুপি চুপি বলিল—

মঞ্জু ঃ খুব গোপনীয় কথা বুঝি?

রঞ্জন ঃ হ্যাঁ। বলব?

মঞ্জু ভালমানুষের মত বলিল—

মঞ্জু ঃ বলুন না—এখানে তো কেউ নেই—

বলিয়া স্থানটির জনশূন্যতার প্রতি রঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই যেন পাশের দিকে চোখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদাহতের মত হাত ছাড়াইয়া সে পিছু হটিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জনও ঘাড় ফিরাইল।

যেখানে নদীর বালু শেষ হইয়াছে তাহারই কিনারায় একটি গাছে আলস্যভরে ঠেস্ দিয়া একটি তরুণী দাঁড়াইয়া তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন। এখন তিনি একটি ক্ষুদ্র গাছের শাখা বাঁ হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে মঞ্জু ও রঞ্জনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মঞ্জু ও রঞ্জন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। রঞ্জনের মুখে অস্বস্তি ও বিরক্তি সুপরিস্ফুট; তরুণীটি যে তাহার পূর্বপরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্জু চকিতের ন্যায় তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া রহিল।

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে তরুণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রঞ্জনের প্রতি একটি কুটিল ভ্রূবিন্যাস করিয়া বলিলেন—

মীরাঃ কী রঞ্জনবাবু? আমাকে চিনতে পারছেন না নাকি?

রঞ্জন ঃ (চমকিয়া) না না, চিনতে পারছি বৈকি মীরা দেবী। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম আপনাকে দেখে। ইয়ে— (পরিচয় করাইয়া দিল) ইনি মঞ্জু দেবী—মীরা দেবী—

যুবতীদ্বয় কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখাইয়া শুধু একবার ঘাড় ঝুঁকাইলেন। মীরা একটু বাঁকা সুরে রঞ্জনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—

মীরা ঃ আমিও কম আশ্চর্য হই নি আপনাকে দেখে—

রঞ্জন লাল হইয়া উঠিয়া কাশিল।

মীরা ঃ কে ভেবেছিল যে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন—

রঞ্জন ঃ না, না, লুকিয়ে আর কি—

মঞ্জুর মুখ গাম্ভীর্যে রাহুগ্রস্ত। সে রঞ্জনকে বলিল—

মঞ্জু ঃ দেরি হয়ে যাচ্ছে ; এবার বাড়ি ফেরা উচিত।

রঞ্জন যেন কূল পাইল ; সোৎসাহে বলিল—

রঞ্জন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় বাড়ি ফেরা দরকার। কেদারবাবু হয়তো কত ভাবছেন। —(মীরাকে) আচ্ছা তাহলে—

মীরা আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিল।

মীরা ঃ কই, এখনও তো দিব্যি আলো রয়েছে; ছ'টাও বাজে নি বোধ হয়। এত শিগ্‌গির বাড়ি ফেরা তো আপনার অভ্যেস নয় রঞ্জনবাবু—

মীরা মুচকি হাসিয়া তারপর মঞ্জুর পানে নিরুৎসুকভাবে তাকাইয়া বলিল—

মীরা ঃ কিন্তু আপনার যদি দেরি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আপনাকে আট্‌কাবো না।—আসুন রঞ্জনবাবু, ঐ দিকটা খানিক বেড়ানো যাক। কী সুন্দর জায়গা।

মঞ্জুর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু সে মনের ভাব জোর করিয়া চাপিয়া শুষ্কস্বরে বলিল—

মঞ্জু ঃ আচ্ছা চললুম।

মঞ্জু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। রঞ্জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল সে বুঝি তাহার অনুসরণ করিবে; কিন্তু মীরার মধুঢালা কণ্ঠস্বর তাহাকে পা বাড়াইতে দিল না। সে কেবল দুই চক্ষে আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া যেদিকে মঞ্জু গিয়াছে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

মীরা ঃ কলকাতার কত জায়গায় আমরা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন রোমান্টিক কোথাও পাই নি—

মীরা রঞ্জনের বাম বাহুর সহিত নিজ দক্ষিণ বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে একটা নাড়া দিল।

মীরা ঃ না রঞ্জনবাবু?

রঞ্জন চমকিযা মীরার দিকে মুখ ফিরাইল।

রঞ্জন ঃ হ্যাঁ—না—মানে—

দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

মঞ্জু মোটর চালাইযা ফিরিয়া চলিয়াছে। গাড়ি প্রচন্ড বেগে চলিয়াছে। মঞ্জুর চোখের দৃষ্টি স্থির, ঠোঁট দুটি চাপা; সে প্রয়োজন মত গাড়ির কলকব্জা নাড়িতেছে, কখনও হর্ণ বাজাইতেছে; কিন্তু তাহার মন যে আজিকার ঘটনায় একেবারে বিকল হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যায়।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং-রুম। মঞ্জু পিয়ানোয় বসিয়া উদাস কণ্ঠে গান গাহিতেছে; তাহার দৃষ্টি জানালার দিকে যাইতে যাইতে পথে রঞ্জনের ছবিটার কাছে আট্‌কাইয়া যাইতেছে, কিন্তু মুখের বিষণ্নতা দূর হইতেছে না।

মঞ্জু ঃ 'ঘন বাদল আসে কেন গগন ঘিরে?
কেন নয়ন ভাসে সখী নয়ন নীরে!
ছিল উজল শশী মেঘে পড়িল ঢাকা—
কালো কাজল মসী এল মেলিয়া পাখা—
মোর তরণীখানি বুঝি ডুবিল তীরে।'

এতক্ষণ আমরা মঞ্জুকেই দেখিতেছিলাম; কেদারবাবু যে ঘরে আছেন তাহা লক্ষ্য করি নাই। কেদারবাবু চোখে চশমা লাগাইয়া একটা মোটা বই পড়িতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঘাড় তুলিয়া চশমার উপর দিয়া মঞ্জুর প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। মঞ্জুর মনে যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় তিনি সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

গান শেষ হইলে মঞ্জু পিয়ানোর দিকে পাশ ফিরিয়া গালে হাত দিয়া বসিল। কেদারবাবু লক্ষ্য করিতেছিলেন, সহসা প্রশ্ন করিলেন—

কেদার ঃ আজ বেড়াতে যাবি না?

মঞ্জু হাত হইতে মুখ তুলিল।

মঞ্জু ঃ (নিরুৎসুক) বেড়াতে? কি জানি—

কেদার হাতের বই বন্ধ করিয়া চশমার উপর দিয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন—

কেদার ঃ কী হয়েছে? শরীর খারাপ?

মঞ্জু উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু ঃ না —কিছু নয়—

কেদার গলার মধ্যে হুঙ্কার করিলেন।

কেদার ঃ হুঁঃ। তবে বেড়িয়ে এসো—

বই খুলিয়া পড়িতে গিয়া তিনি আবার মুখ তুলিলেন।

কেদার ঃ সে ছোকরা—কি নাম? রঞ্জন!—কই, আজকাল তো আর আসে না। চলে গেছে নাকি?

মঞ্জু বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মাথা নাড়িল।

মঞ্জু ঃ না—

কেদার ঃ তবে আসে না কেন?

মঞ্জুঃ (পূর্ববৎ) জানি না।

কেদার এবার তাঁহার চশমা কপালের উপর তুলিয়া দিলেন; ভাল করিয়া মঞ্জুকে নিরীক্ষণ করিয়া আবার চশমা নাকের উপর নামাইয়া দিয়া একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার দিলেন।

কেদারঃ হুঁঃ। তুমি এখন একটু বেড়িয়ে এসো। আর, যদি 'দৈবাৎ' সে ছোকরার সঙ্গে দেখা হয়, তাকে আসতে বোলো। তাকে আমার বেশ লাগে—হুঁঃ।

কেদার পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। মঞ্জু একটু ইতস্তত করিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য গমনোদ্যত হইল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পার্বত্য ভূমির যে-স্থানে মঞ্জু ও রঞ্জনের গাড়ি আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিত, সেখানে কেবল রঞ্জনের মোটর বাইক নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

রঞ্জন কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সপ্রশ্ন নেত্রে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শেষে মুখের মধ্যে আঙুল দিয়া সাংকেতিক শিস্‌ দিল। কিন্তু কোন দিক হইতেই উত্তর আসিল না।

রঞ্জন প্রথম দিন যে পাথরের স্তম্ভের মাথায় উঠিয়াছিল সেইদিকে দৃষ্টি তুলিল কিন্তু সেখানে কেহ নাই। রঞ্জন নদীর দিকে চলিল।

নদীতীর জনশূন্য; সেখানে মঞ্জু নাই।

রঞ্জন চিন্তিত মুখে সেখান হইতে ফিরিল। যে পাথরের ঢিবির পশ্চাতে মঞ্জু লুকাইয়া লুকোচুরি খেলার অভিনয় করিয়াছিল তাহাতে কনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া রঞ্জন ভাবিতে লাগিল।

কিছু দূরে একটা ঝোপের মত ছিল; ঘন আগাছা ও কাঁটা গাছ মিলিয়া খানিকটা স্থান বেড়ার মত আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সেই বেড়া ফাঁক করিয়া একটি যুবতী উঁকি মারিল। যুবতীটি মলিনা। ক্ষণেক নিঃশব্দে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া মলিনা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রঞ্জনের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। কী হইল? মঞ্জু আজ আসিল না কেন? সহসা তাহার দুশ্চিন্তা জাল ছিন্ন করিয়া ঝোপের অন্তরাল হইতে রমণী কণ্ঠের উচ্চ কাতরোক্তি কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া রঞ্জন মুখ তুলিল। তারপর দ্রুত ঝোপের কাছে গিয়া কাঁটা গাছ দু'হাতে সরাইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

কাট্‌।

যেখানে রঞ্জনের মোটর বাইক দাঁড়াইয়াছিল, মঞ্জুর গাড়ি সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল। একটু দূরে গাড়ি দাঁড় করাইয়া মঞ্জু গাড়ি হইতে নামিল, নিরুৎসুকভাবে এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর মন্থরপদে নদীর দিকে চলিল।

কাট্‌।

ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রঞ্জন দেখিল অদূরে একটি গাছের তলায় একটি যুবতী পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। সে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রঞ্জন ঃ এ কি! মলিনা দেবী—!

মলিনা কাতরভাবে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল—

মলিনা ঃ রঞ্জনবাবু! আপনি! উঃ—!

রঞ্জন একটু ইতস্তত করিয়া মলিনার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

রঞ্জন ঃ কি হয়েছে?

মলিনা ঃ বেড়াতে এসেছিলুম—হঠাৎ পড়ে গিয়ে পা মুচ্‌কে গেছে—

যেন যন্ত্রণা চাপিবার জন্য মলিনা অধর দংশন করিল।

রঞ্জন ঃ তাই তো—কোনখানটা—দেখি?

পায়ের গোছের উপর হইতে শাড়ির প্রান্ত সরাইয়া রঞ্জন চরণ দুটি পর্যবেক্ষণ করিল, কিন্তু কোথাও স্ফীতির লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

রঞ্জন ঃ কোন্‌ পায়ে?

মলিনা ঃ (মুহূর্তকাল দ্বিধা করিয়া তাড়াতাড়ি) বাঁ পায়ে।

রঞ্জন ঃ এইখানে? লাগছে?

তর্জনী দিয়া রঞ্জন পায়ের আহত স্থানটা টিপিয়া দিতেই মলিনা জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রঞ্জন দ্রুত আঙুল টানিয়া লইল।

কাট্

মঞ্জু ইতিমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে ঝোপের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল; ঝোপের অভ্যন্তরে চীৎকার শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; বিস্মিতভাবে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া মঞ্জু দ্বিধা-শঙ্কিত ভাবে ঝোপের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

কাট্।

ওদিকে রঞ্জন রুমাল বাহির করিয়া মলিনার পায়ের গোছ বাঁধিয়া দিতেছে; মলিনা সময়োচিত ক্লিষ্ট মুখভঙ্গী করিয়া যেন যন্ত্রণা অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বাঁধা শেষ করিয়া রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন ঃ এবার দেখুন তো উঠ্‌তে পারেন কিনা—

মলিনা উঠিবার চেষ্টা করিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

মলিনা ঃ আপনি সাহায্য করুন, নইলে উঠ্‌তে পারব না—

রঞ্জন উদ্বিগ্নভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন ঃ আমি—সাহায্য—! আচ্ছা—

রঞ্জন মলিনার একটা বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল।

মলিনা ঃ না, না, ও রকম করে নয়। আপনি হাঁটু গেড়ে বসুন—এইখানে—

মলিনা নিজের পাশে হাঁটু গাড়িবার স্থান নির্দেশ করিল। ঘাতকের খড়্গের সম্মুখে আসামীকে হাঁটু গাড়িতে বলিলে তাহার মুখের ভাব যেরূপ হয়, সেইরূপ মুখ লইয়া রঞ্জন মলিনার পাশে নতজানু হইল।

মলিনা তাহার বাম বাহুটি রঞ্জনের কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া বলিল—

মলিনা ঃ এইবার আপনি উঠুন—

রঞ্জন উঠিল; সেইসঙ্গে মলিনাও দাঁড়াইল।

একজন ঝোপ ফাঁক করিয়া যে এই পরম ঘনিষ্ঠ দৃশ্যটি লক্ষ্য করিতেছে তাহা ইহারা দেখিতে পাইল না। মঞ্জুর মুখ শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি কঠিন। সে আর দাঁড়াইল না; হাত সরাইয়া লইতেই ঝোপের ডালপালা তাহাকে আড়াল করিয়া দিল।

এদিকে রঞ্জন গলা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; টানাটানি করিয়া নয়, বিনীত শিষ্টতার সহিত।

রঞ্জন ঃ এবার বোধ হয় আপনি দাঁড়াতে পারবেন—

মলিনা ঃ দাঁড়াতে হয়তো পারি, কিন্তু একলা হাঁটতে পারব না। বাড়ি যেতে হবে তো। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন; নইলে কি করে যে বাড়ি যেতুম—

এইভাবে বাড়ি যাইতে হইবে শুনিয়া রঞ্জন ঘামিয়া উঠিল। ক্ষীণস্বরে বলিল—

রঞ্জন ঃ অ্যাঁ—বাড়ি—! কিন্তু—

কিন্তু মলিনার বাহুবন্ধন শিথিল হইল না। হতাশভাবে রঞ্জন তদবস্থায় সম্মুখ দিকে পা বাড়াইল।

কাট্।

পূর্বোক্ত স্থানে মঞ্জুর মোটর ও রঞ্জনের বাইক দাঁড়াইয়া আছে। মঞ্জু দ্রুতপদে, প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে প্রবেশ করিল; গাড়ির চালকের আসনে বসিয়া গাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রঞ্জন ও তাহার কণ্ঠলগ্ন মলিনাকে আসিতে দেখা গেল। দূর হইতে

মোটর বাইক দেখিতে পাইয়া মলিনা বলিল—

মলিনা : ওটা বুঝি আপনার মোটর বাইক?

রঞ্জন : হ্যাঁ—

মলিনা : ভালই হল। আপনি গাড়ি চালাবেন, আর আমি আপনার কোমর ধরে পেছনে বস্‌ব—

চিত্রটি মানসচক্ষে দেখিতে পাইয়া রঞ্জনের হাত-পা শিথিল হইয়া গেল। মলিনা আর একটু হইলেই পড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত রঞ্জনের গলা চাপিয়া ধরিয়া পতন হইতে আত্মরক্ষা করিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

ঝাঝার একটি পথ। মিহির পথের মাঝখান দিয়া চলিয়াছে; তাহার অবিচ্ছেদ্য ক্যামেরাটি অবশ্য সঙ্গে আছে।

পিছনে মোটর বাইকের ফট্‌ ফট্‌ শব্দ শুনিয়া মিহির পিছু ফিরিয়া তাকাইল; তারপর তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বাহির করিতে করিতে রাস্তার একপাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জনের মোটর বাইক আসিতেছে দেখা গেল। রঞ্জন গাড়ি চালাইতেছে; মলিনা তাহার কোমর জড়াইয়া পিছনে বসিয়া আছে। মলিনার মুখ মিহিরের দিকে। মোটর বাইক সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেই মিহির টক্‌ করিয়া ফটো তুলিয়া লইল।

মোটর বাইক চলিয়া গেল। মিহির ক্যামেরা হইতে মুখ তুলিল। তাহার মুখে সার্থকতার হাসি ক্রীড়া করিতেছে।

ফেড্‌ আউট্‌।

ফেড্‌ ইন্‌।

কেদারবাবুর বাড়ির সদর। সিঁড়ির উপর মঞ্জু একাকিনী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। মুখে প্রফুল্লতা নাই; চোখের পাতা যেন একটু ফুলিয়াছে, দেখিলে সন্দেহ হয় লুকাইয়া কাঁদিয়াছে! তাহার প্রকৃতি স্বভাবতই প্রফুল্ল ও দৃঢ়; কিন্তু আজ তাহাকে কিছু বেশী রকম বিমর্ষ দেখাইতেছিল।

সম্মুখে ফটকের দিকে উন্মনাভাবে তাকাইয়া মঞ্জু বসিয়াছিল। চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে তাহার চোখে সচেতনা ফিরিয়া আসিল; যেন ফটক দিয়া কেহ প্রবেশ করিতেছে। সে চেষ্টা করিয়া মুখে একটু স্বাগত হাসি আনিয়া বলিল—

মঞ্জু : আসুন মিহিরবাবু!

কবি-প্রকৃতি মিহির মঞ্জুর মুখের ভাবান্তর কিছুই দেখিতে পাইল না; এক গাল হাসিয়া মঞ্জুর পাশে সিঁড়ির উপর আসিয়া বসিল; পকেটে হাত পুরিয়া কয়েকখানা পোস্টকার্ড আয়তনের ফটোগ্রাফ বাহির করিতে করিতে বলিল—

মিহির : কয়েকখানা স্ন্যাপ্‌-শট্‌ তুলেছি। দেখুন দিকি, কার সাধ্য বলে জাপানী ছবি নয়—

ছবিগুলি হাতে লইয়া মঞ্জু একে একে দেখিতে লাগিল। প্রথম ছবিটি নৃত্যরত সাঁওতাল মিথুনের। ছবিটি উপর হইতে সরাইয়া নীচে রাখিয়া মঞ্জু দ্বিতীয় ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

এটিতে রঞ্জন ও ইন্দু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নেপথ্যে সাঁওতাল-নৃত্য দেখিতেছে। মঞ্জু বেশ কিছুক্ষণ ছবিটার পানে তাকাইয়া রহিল, তারপর ইন্দুকে নির্দেশ করিয়া বলিল—

মঞ্জু : ইনি কে?

মিহির গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল—

মিহির : আমি চিনি না; বোধ হয় রঞ্জনবাবুর বান্ধবী—

মঞ্জু তিক্ত হাসিল।

মঞ্জু : রঞ্জনবাবুর অনেক বান্ধবী আছেন দেখছি—

ছবিটা তলায় রাখিয়া মঞ্জু তৃতীয় ছবি দেখিল। একটি ছাগল দেয়ালে সম্মুখের দুটি পা তুলিয়া দিয়া প্রাংশুলভ্য লতার পানে গলা বাড়াইয়াছে। সেটি অপসারিত করিয়া পরবর্তী ছবির উপর দৃষ্টি পড়িতেই মঞ্জু শক্ত হইয়া উঠিল। মোটর বাইকে রঞ্জন ও মলিনা। দেখিতে দেখিতে মঞ্জুর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—

মঞ্জু : নির্লজ্জ!

মিহির ভুল বুঝিয়া বলিল—

মিহির : অ্যাঁ! হ্যাঁ—নির্লজ্জ বইকি। নির্লজ্জতাই হচ্ছে আর্টের লক্ষণ—

মঞ্জু : নিন্ আপনার আর্ট, আমি দেখতে চাই না—

ছবিগুলি সক্রোধে ফিরাইয়া দিয়া মঞ্জু অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার ঠোঁট দুটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

এই সময় কেদারবাবু পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। হাতে লাঠি, বাহিরে যাইবার সাজ। মঞ্জু তাঁহার পদশব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। মিহির ছবিগুলি হাতে লইয়া বোকার মত বসিয়াছিল, সেও সেগুলি পকেটে পুরিতে পুরিতে দাঁড়াইয়া উঠিল।

মঞ্জু : বাবা, বেরুচ্ছ নাকি?

কেদার : হ্যাঁ, একবার ডাক্তারের বাড়িটা ঘুরে আসি। দাঁতের ব্যথাটা আবার যেন ধরব-ধরব করছে।

মঞ্জু : তা হেঁটে যাবে কেন? দাঁড়াওনা আমি গাড়ি করে পেঁছে দিচ্ছি—

কেদার : হুঃ—গাড়ি! আমি হেঁটেই যাব—এইটুকু তো রাস্তা—

সিঁড়ি দিয়া নামিতে উদ্যত হইয়া তিনি থামিলেন।

কেদার : তুই আজ বেড়াতে গেলি নে?

মঞ্জু মুখ অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে তাকাইল। তারপর হঠাৎ মিহিরের দিকে সচকিতে চাহিয়া সে চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মঞ্জু : বেড়াতে! হ্যাঁ—যাব।—মিহিরবাবু, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি গাড়ি বের ক'রে নিয়ে আসি; আপনিও আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন—

মঞ্জু দ্রুতপদে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কেদারবাবু বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর চিন্তিতভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। মিহির অবাক হইয়া বোকাটে মুখে একবার এদিক একবার ওদিক তাকাইতে লাগিল।

দ্রুত ডিজল্‌ভ্।

ফটকের সম্মুখে মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; চালকের আসনে মঞ্জু। সে দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ আসুন মিহিরবাবু—

মিহির বিহ্বলভাবে মঞ্জুর পাশে গিয়া বসিল।

মঞ্জুর মুখ কঠিন; সে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

এমন সময় পিছনে ফট্‌ফট্‌ শব্দ। পরক্ষণেই রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া মঞ্জুর পাশে দাঁড়াইল। রঞ্জন গাড়ি হইতে লাফাইয়া নামিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু!

মাথা একটু নীচু করিতেই তাহার চোখে পড়িল মিহির মঞ্জুর পাশে বসিয়া আছে; রঞ্জন থামিয়া গেল।

মঞ্জুর কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না; সে উপেক্ষাভরে একবার রঞ্জনের দিকে তাকাইয়া গাড়ির কলকব্জা নাড়িয়া গাড়ি চালাইবার উপক্রম করিল। রঞ্জন আগ্রহ-সংহতকণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যভরে মঞ্জু মুখ তুলিল।

মঞ্জু ঃ আমার সঙ্গে আবার কি কথা!

মঞ্জুর গাড়ি চলিয়া গেল।

রঞ্জন বিস্মিত ও আহতভাবে সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কেদারবাবু আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন; রঞ্জন জানিতে পারিল না। কেদারবাবু তীক্ষ্ণচক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, যে পথে মঞ্জুর গাড়ি চলিয়া গিয়াছিল সেই পথে তাকাইলেন, তারপর গলার মধ্যে একটি হুংকার ছাড়িলেন।

কেদার ঃ হুঁঃ—

রঞ্জন চমকিয়া পাশের দিকে তাকাইল।

কেদার ঃ ওরা চলে গেল?

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ—

সে নিজের মোটর বাইকের কাছে গিয়া আরোহণের উদ্যোগ করিল। কেদারবাবু অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে তাহার ভাবভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রঞ্জন গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কেদার ঃ ওহে শোন—

রঞ্জন ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া কেদারবাবুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে?

কেদার ঃ তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

রঞ্জন। আজ্ঞে বলুন।

কেদারবাবু বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন, একটু চিন্তা করিলেন।

কেদার ঃ আজ নয়—আজ আমি একটু ভাবতে চাই—

রঞ্জন ঃ যে আজ্ঞে—

রঞ্জন ফিরিয়া গিয়া নিজের গাড়ির উপর বসিল।

কেদার ঃ কাল তুমি এসো—বুঝলে?

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে—আচ্ছা—নমস্কার—

রঞ্জনের গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। যে দিকে মঞ্জুর গাড়ি গিয়াছিল সেইদিকে

চলিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পার্বত্য ভূমি। রঞ্জনের মোটর বাইক ধীরে ধীরে চলিয়াছে। রঞ্জন সচকিতভাবে আশপাশের ঝোপঝাপের দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে।

যে স্থানে তাহাদের গাড়ি দাঁড়াইত সেখানে আসিয়া দেখিল মঞ্জুর গাড়ি নাই। তারপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, অদূরে একটি গাছের নিচু ডাল হইতে দুটি জুতাপরা পদপল্লব ঝুলিতেছে। গাছের পাতায় চরণ দুটির স্বত্বাধিকারিণীর ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখা যাইতেছে না।

রঞ্জন পা দুটি মঞ্জুর মনে করিয়া দ্রুত গাছের তলায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মুখের সাগ্রহ ভাব পরিবর্তিত হইয়া বিরক্তির আকার ধারণ করিল। বৃক্ষারূঢ়া তরুণী সাবলীল ভঙ্গীতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়া কলহাস্য করিল।

ক্ষুব্ধ হতাশ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন ঃ সলিলা দেবী! আপনিও এসে পেঁছে গেছেন! (দীর্ঘশ্বাস)—আচ্ছা, নমস্কার!

রঞ্জন পিছু ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্প দূর গিয়াই পিছু ডাক শুনিয়া তাহাকে থামিতে হইল।

সলিলা ঃ শুনুন—রঞ্জনবাবু!

সলিলা রঞ্জনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সলিলা ঃ এত দিন পরে দেখা, আর কোনও কথা না বলেই চলে যাচ্ছেন! উঃ, আপনি কি নিষ্ঠুর!

রঞ্জন ঃ নিষ্ঠুর! দেখুন—মাফ করবেন। আজ আমার মনটা ভাল নেই।

সে আবার গমনোদ্যত হইল। এমন সময় পিছন হইতে মীরার কন্ঠস্বর শোনা গেল।

মীরা ঃ মন ভাল নেই! কী হয়েছে রঞ্জনবাবু?

দৈবী আবির্ভাবের মত মীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কন্ঠস্বরে উৎকন্ঠা মিশাইয়া বলিলেন—

মীরা ঃ শরীর ভাল নেই বুঝি?

রঞ্জন ঃ (দৃঢ়স্বরে) না, শরীর বেশ ভাল আছে—মন খারাপ।

এইবার মলিনা দেবীর মধুর স্বর শোনা গেল; ভোজবাজীর মত আবির্ভূতা হইয়া তিনিও এইদিকেই আসিতেছেন।

মলিনা ঃ কেন মন খারাপ হল রঞ্জনবাবু?

রঞ্জন প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল; মলিনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া প্রচ্ছন্ন শ্লেষের স্বরে বলিল—

রঞ্জন ঃ আপনার পা তো বেশ সেরে গেছে দেখছি—

মলিনা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যে বলিল—

মলিনা ঃ তা সারবে না? আপনি কত যত্ন করে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলেন—জানিস ভাই, সেদিন কি হয়েছিল—

ইন্দুর ক্লান্ত কণ্ঠ শোনা গেল।

ইন্দু ঃ জানি—আমরা অনেকবার শুনেছি।

তরুণীত্রয় চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল ইন্দু কখন তাহাদের পিছনে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রঞ্জন আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বোধ করি ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করিল।

ইন্দু সহজভাবে বলিল—

ইন্দু ঃ সবাই দাঁড়িয়ে কেন? আসুন রঞ্জনবাবু, ঘাসের ওপর বসা যাক—

রঞ্জন ঃ বেশ, যা বলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতী-চতুষ্টয় প্রচ্ছন্নভাবে পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন।

রঞ্জন ঃ এবার কি করতে চান?

মীরা ঃ এবার? তাই তো?

সকলেই চিন্তিত। মলিনা উজ্জ্বল চোখ তুলিয়া চাহিল।

মলিনা ঃ আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।—আসুন, পাঁচজনে মিলে লুকোচুরি খেলা যাক—

ইন্দু ঃ (ঠোঁট উল্টাইয়া) লুকোচুরি।

রঞ্জন ঃ লুকোচুরি—

হঠাৎ তাহার মাথায় কূটবুদ্ধি খেলিয়া গেল। মেয়েরা তাহার মতামত অনুধাবন করিবার জন্য তাহার দিকে চাহিতেই সে বলিল—

রঞ্জন ঃ তা মন্দ কি! আসুন না খেলা যাক। এখানে লুকোবার জায়গার অভাব নেই।

রঞ্জনের মত আছে দেখিয়া সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মলিনার উত্তেজনা সবচেয়ে বেশী।

মলিনা ঃ বেশ। প্রথমে কে চোর হবে?

রঞ্জন ঃ আমি আঙুল মটকাচ্ছি।

রঞ্জন পিছনে হাত লুকাইয়া আঙুল মটকাইল; তারপর তরুণীদের সম্মুখে হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল। তরুণীগণ নানাপ্রকার আশঙ্কার অভিনয় করিতে করিতে গলার মধ্যে চাপা হাসি হাসিতে হাসিতে এক একটি আঙুল ধরিলেন।

রঞ্জন বিষণ্ণ স্বরে বলিল—

রঞ্জন ঃ আমিই চোর হলাম। বুড়ো আঙুল মট্‌কে ছিল।

তরুণীগণ সকলেই খুশি হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মীরা ঃ বেশ। আপনি তাহলে চোখ বুজে বসুন। কিন্তু বুড়ী হবে কে?

রঞ্জন চট্‌ করিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ ঐ যে আমার গাড়িটা বুড়ী।

মীরা ঃ আচ্ছা—

চারিটি যুবতী চারিদিকে চলিলেন। রঞ্জন দু'হাতে চোখ ঢাকিল।

মলিনা ঃ (যাইতে যাইতে) টু না দিলে চোখ খুলবেন না যেন।

রঞ্জন মাথা নাড়িল। তরুণীগণ পা টিপিয়া টিপিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারিদিক হইতে টু শব্দ আসিল। রঞ্জন চোখ হইতে হাত সরাইয়া সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর হঠাৎ তীরবেগে নিজের গাড়ি লক্ষ্য করিয়া ছুট দিল।

তরুণীগণ কিছুই জানিলেন না। রঞ্জন মোটর বাইক ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাতে স্টার্ট দিয়া লাফাইয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

ফট্‌ফট্‌ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তরুণীগণ বাহির হইয়া আসিয়া স্তম্ভিতবৎ

দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যভাবে পলাইতে পলাইতে রঞ্জন পাশের দিকে চোখ ফিরাইয়া হঠাৎ সবলে ব্রেক কশিল। প্রায় একশত গজ দূরে অসমতল ভূমির উপর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঞ্জু ও মিহির বিপরীত মুখে চলিয়াছে।

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া রঞ্জন পদব্রজে তাহাদের অনুসরণ করিল।

মঞ্জু ও মিহির পাশাপাশি চলিয়াছে; পিছন দিক হইতে রঞ্জন যে দীর্ঘ পদক্ষেপে তাহাদের নিকটবর্তী হইতেছে তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। কাছাকাছি পৌঁছিয়া রঞ্জন গলা চড়াইয়া ডাকিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু!

মঞ্জু ও মিহির থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জুর মুখ অপ্রসন্ন। রঞ্জন কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে হঠাৎ পিছু ফিরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। কয়েক পা গিয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—

মঞ্জু ঃ আসুন মিহিরবাবু!

মিহির ইতস্তত করিতেছিল; আহ্বান শুনিয়া যেই পা বাড়াইয়াছে অমনি রঞ্জনের হস্ত কাঁধের উপর পড়িয়া তাহার গতিরোধ করিল। মিহির ভ্যাবাচাকা খাইয়া রঞ্জনের মুখের পানে তাকাইল। রঞ্জন গম্ভীরমুখে তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ আপনি ঐদিকে যান—

বলিয়া বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

মিহির ঃ ঐদিকে?

রঞ্জন ঃ হ্যাঁ, ঐদিকে।

কাঁধের কামিজ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রঞ্জন মিহিরকে একটি অনুচ্চ ঢিবির উপর লইয়া গেল; দূরে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ দেখ্‌ছেন?

মিহির দেখিল—দূরে চারিটি তরুণী একস্থানে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে যে পথে রঞ্জন পলাইয়াছিল সেই দিকে তাকাইয়া আছেন। মিহিরের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে একবার রঞ্জনের দিকে সহাস্যমুখে ঘাড় নাড়িয়া দ্রুতপদে ঢিবি হইতে নামিয়া তরুণীদের অভিমুখে চলিল।

এইরূপে মিহিরকে বিদায় করিয়া রঞ্জন আবার মঞ্জুর পশ্চাদ্ধাবন করিল।

মঞ্জু ইতিমধ্যে খানিকদূর গিয়াছে। পিছন হইতে তাহার চলনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় সে অত্যন্ত রাগিয়াছে। সে একবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, রঞ্জন আসিতেছে—মিহির পলাতক। সে সক্রোধে আরও জোরে চলিতে লাগিল—

পশ্চাৎ হইতে রঞ্জনের গলা আসিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু! দাঁড়াও!

মঞ্জু দাঁড়াইল না; একটা উঁচু চ্যাঙড়ের পাশ দিয়া মোড় ফিরিয়া চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রঞ্জনও সেইখানে মোড় ফিরিয়া মঞ্জুর অনুসরণ করিল।

ক্রমে মঞ্জু নদীর বালুর উপর গিয়া পড়িল। অদূরে ছোট নদীর বুকের উপর মাঝে মাঝে পাথরের চাপ বসাইয়া পারাপারের সেতু রহিয়াছে; ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। মঞ্জু সেই সেতু লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

পিছন হইতে রঞ্জন ডাকিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু! শোনো—

কিন্তু শুনিবে কে? মঞ্জু তখন নদীর কিনারায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। সে সেতুর প্রথম ধাপের উপর লাফাইয়া উঠিয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল—রঞ্জন অনেকটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সে আর দ্বিধা না করিয়া দ্বিতীয় পাথরের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার মনের অবস্থা এমন যে রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে নদী পার হইয়া যেখানে খুশি চলিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

নদীর ঠিক মাঝখানে যে পাথরটি বসানো আছে তাহা সবচেয়ে বড়। সেটার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মঞ্জু চকিতের ন্যায় পিছু ফিরিয়া দেখিল রঞ্জন নদীর কিনারায় প্রথম ধাপের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

রঞ্জন উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু, আর যেও না—জলে পড়ে যাবে—

মঞ্জু তখন বাকি পাথরগুলি লঙ্ঘন করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া রঞ্জনের মুখে হঠাৎ একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল। সেও নদী লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইল।

ওদিকে মঞ্জু তখন প্রায় পরপারে পৌঁছিয়াছে। শেষ ধাপে পৌঁছিতেই পিছন হইতে একটা ভয়ার্ত চীৎকার তাহার কানে আসিল; সে চমকিয়া পিছু ফিরিয়া ক্ষণ-কাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চলিল।

নদীর মাঝখানে পাথরটার ঠিক পাশে রঞ্জন জলে পড়িয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতেছে; তাহার অসহায় হাত পা আস্ফালন দেখিয়া মনে হয় সে ডুবিল বলিয়া, আর দেরি নাই।

মঞ্জু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পাথরের কিনারায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে রঞ্জনের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ এই যে—রঞ্জনবাবু, আমার হাত ধরুন!

রঞ্জন অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে মঞ্জুর প্রসারিত হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। মঞ্জু প্রাণপণে টানিয়া তাহাকে পাথরের কিনারায় লইয়া আসিল।

এখানেও গলা পর্যন্ত জল। মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু ঃ এবার উঠে আসুন—

রঞ্জন মুখের জল কুলকুচা করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ আগে বল আমার কথা শুনবে।

মঞ্জুর মুখ অমনি শক্ত হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টি অপ্রসন্ন হইল। রঞ্জন তাহা দেখিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ শুনবে না? বেশ—তবে—

মঞ্জুর হাত ছাড়িয়া দিয়া সে আবার ডুবিবার উপক্রম করিল। তাহার মাথা জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গেল; একটা হাত যেন শূন্যে কিছু ধরিবার চেষ্টা করিয়া মস্তকের অনুবর্তী হইল। ভয় পাইয়া মঞ্জু চীৎকার করিয়া উঠিল—

মঞ্জু ঃ ও রঞ্জনবাবু!

রঞ্জনের মাথা আবার জাগিয়া উঠিল।

রঞ্জন ঃ বল কথা শুনবে? শুনবে না? তবে—

রঞ্জন আবার ডুবিতে উদ্যত হইল।

মঞ্জু ঃ শুনবো শুনবো—আপনি আগে উঠে আসুন।

মঞ্জু হাত বাড়াইয়া দিল; রঞ্জন হাত ধরিয়া পাথরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

গত কয়েক মিনিটের ব্যাপারে মঞ্জুর দেহের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল; সে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। রঞ্জনও সিক্ত বস্ত্রাদি সমেত তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া

একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ উঃ! কী গভীর জল।

শঙ্কিত মুখে মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু ঃ কত জল?

রঞ্জনের অধর কোণে একটি ক্ষণিক হাসি দেয়া দিয়াই মিলাইয়া গেল; সে গম্ভীর মুখে যেন হিসাব করিতে করিতে বলিল—

রঞ্জন ঃ তা—প্রায়—আমার কোমর পর্যন্ত হবে!

মঞ্জুর অধরোষ্ঠ খুলিয়া গেল; সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া পুরুষ জাতির হীন প্রবঞ্চনায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সে রঞ্জনের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বসিল।

রঞ্জন ঃ পিছু ফিরলে চলবে না; কথা দিয়েছ, আমার কথা শুনতে হবে।

দুর্লঙ্ঘ্য গাম্ভীর্যের সহিত মঞ্জু বলিল—

মঞ্জু ঃ কি বলবেন বলুন—আমি শুনতে পাচ্ছি।

রঞ্জন তখন উঠিয়া মঞ্জুর পিছনে নতজানু হইয়া বসিল; গলা পরিষ্কার করিয়া জোড় হস্তে বলিল—

রঞ্জন ঃ আপনার কাছে অধমের একটি আর্জি আছে—

মঞ্জু একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; রঞ্জনের হাস্যকর ভঙ্গিমা দেখিয়া হাসি পাইলেও সে মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। রঞ্জন দীনতা সহকারে বলিল—

রঞ্জন ঃ আমার বিনীত আর্জি এই যে, আমি বড় বিপদে পড়েছি, আপনি দয়া করে আমাকে উদ্ধার করুন—

মঞ্জু নিরুৎসুক স্বরে বলিল—

মঞ্জু ঃ কি বিপদ?

মর্মান্তিক মুখভঙ্গী করিয়া রঞ্জন আকাশের পানে তাকাইল।

রঞ্জন ঃ কি বিপদ! এমন বিপদ আজ পর্যন্ত মানুষের হয় নি।—একটি নয় দুটি নয়, চার চারটি তরুণী আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে—আনাচে কানাচে ওৎ পেতে বসে আছে, সুবিধে পেলেই আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।—মেঘনাদ বধ পড়েছ তো—

—রক্তচক্ষু হর্য্যক্ষ যেমতি
কড়মড়ি ভীম দন্ত পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে—

শুনিতে শুনিতে মঞ্জুর মুখের মেঘ একেবারে কাটিয়া গিয়াছিল; অধরপ্রান্তে হাসি উছলিয়া উঠিতেছিল। তবু সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বলিল—

মঞ্জু ঃ এই বিপদ!

রঞ্জন ঃ এটা সামান্য বিপদ হল! রাত্রে দুশ্চিন্তায় আমার চোখে ঘুম নেই; দিনের বেলা বাড়িতে থাকতে ভয় করে—এখানে পালিয়ে আসি। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে? আজ তো চারজনে একসঙ্গে ধরেছিল—

মঞ্জু আর বুঝি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে না। চাপা বিকৃত স্বরে সে বলিল—

মঞ্জু ঃ তা আমি কি করব?

রঞ্জন এবার তাহার ভক্ত-হনুমানভঙ্গী ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল, সহজ মিনতির স্বরে বলিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু, কেউ যদি আমাকে উদ্ধার করতে পারে তো সে তুমি। সত্যি বলছি,

তুমি যদি কিছু না কর, ওরা কেউ না কেউ জোর করে আমাকে বিয়ে করে ছাড়বে!

মঞ্জু : তা বেশ তো—ভালই তো হবে।

ভর্ৎসনাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রঞ্জন মঞ্জুর কাঁধ ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল, মঞ্জু পুরা ফিরিল না, আধাআধি ফিরিল।

রঞ্জন : মঞ্জু, তুমি এ কথা বল্‌তে পারলে? মন থেকে?

মঞ্জু হাসিয়া ফেলিল।

মঞ্জু : তা আর কি বলব? আমি কি করতে পারি?

রঞ্জন : তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো।

মঞ্জু গ্রীবা বাঁকাইয়া হাসিল।

মঞ্জু : কি করে বাঁচাব?

রঞ্জন মঞ্জুর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—

রঞ্জন : বুঝতে তো পেরেছ, তবে কেন দুষ্টুমি করছ? সত্যি মঞ্জু, বল আমাকে বিয়ে করবে!

মঞ্জু হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

মঞ্জু : হাত ছেড়ে দাও।

রঞ্জন : ছাড়ব না। আগে বল বিয়ে করবে।

মঞ্জু ঘাড় নীচু করিয়া রহিল; মুখ টিপিয়া বলিল—

মঞ্জু : কেন? ওদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে?

রঞ্জন : শুধু তাই নয়।

রঞ্জন তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া আনিল।

রঞ্জন : মঞ্জু, এখনও মনের কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে? বেশ বল্‌ছি—আমি তোমাকে ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি। এবার বল, বিয়ে করবে?

মঞ্জুর নত মুখ অরুণাভ হইয়া উঠিয়াছিল; সে উত্তর না দিয়া পাথরের উপর আঁচড় কাটিতে লাগিল।

রঞ্জন : বল। না বললে ছাড়বো না।

মঞ্জু এবার চোখ দুটি একটু তুলিল।

মঞ্জু : তুমি কি সায়েব?

রঞ্জন কথাটা বুঝিতে পারিল না।

রঞ্জন : সায়েব? তার মানে?

মঞ্জু : বাবাকে বলতে হবে না?

রঞ্জন : (বুঝিতে পারিয়া) ওঃ—! না, সায়েব নই। তাঁকেও বলব, আমার বাবাকেও বলব। কিন্তু তার আগে তোমার মনের কথাটা তুমি বল মঞ্জু—

মঞ্জু : সব কথা স্পষ্ট করে বল্‌তে হবে?

রঞ্জন : হ্যাঁ।

মঞ্জু হাসিয়া পাশের দিকে চোখ ফিরাইল; তারপর ঘাড় তুলিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

রঞ্জন : কই, বললে না?

মঞ্জু অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিল—

মঞ্জু : ঐ দ্যাখো—

রঞ্জন চোখ তুলিয়া দেখিল, কিছু দূরে নদীর কিনারায় এক সারস-দম্পতি আসিয়া বসিয়াছে। তাহারা পরস্পর চঞ্চু চুম্বন করিতেছে, গলায় গলা জড়াইয়া আদর

করিতেছে।

দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া পক্ষী-দম্পতির অনুরাগ-নিবেদন দেখিতে লাগিল। তারপর রঞ্জন মঞ্জুর কাছে আরও ঘেঁষিয়া বসিয়া এক হাত দিয়া তার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া লইল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

অপরাহ্ণ। ঝাঝায় রঞ্জনের বাড়িতে একটি ঘর। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া রঞ্জন বেশভূষা করিতেছে ও মৃদুস্বরে সুর ভাঁজিতেছে। পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খোলা রাখিয়া দিয়া চুলে বুরুশ ঘষিতে ঘষিতে রঞ্জন আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইল— ভৃত্য রমাই একটি পোস্টকার্ড হাতে লইয়া প্রবেশ করিতেছে।

রমাই মধ্যবয়স্ক কৃশ ও বেঁটে, পুরুলিয়া অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। রঞ্জন আয়নার ভিতরে রমাইয়ের প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন : কি রে রমাই?

রমাই : একটি পোস্টকাট্ আইছেন আজ্ঞে।

রঞ্জন পোস্টকার্ড হাতে লইয়া বলিল—

রঞ্জন : বাবা লিখেছেন—

পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

রঞ্জন : বাবা আসছেন। রমাই—বাবা আসছেন। ভালই হল—

রমাই : কবে আসতেছেন কুর্তাবাবু আজ্ঞে?

রঞ্জন : অ্যাঁ—কবে? (চিঠির উপর আবার চোখ বুলাইয়া) কই, তা তো কিছু লেখেন নি। আজ-কালের মধ্যেই আসবেন নিশ্চয়। ভালই হল—আমাকে আর কলকাতা যেতে হল না—(রমাইয়ের পিঠে সস্নেহে একটি চাঁটি মারিয়া) কি চমৎকার যোগাযোগ দেখেছিস রমাই? বাবাও ঠিক এই সময় এসে পড়েছেন—

রমাই : যোগাযোগটা কিসের আজ্ঞে?

রঞ্জন বিস্মিতভাবে তাহার পানে তাকাইল, তারপর হাসিয়া উঠিল।

রঞ্জন : ও—তুই বুঝি জানিস না। শিগ্‌গির জানতে পারবি। এখন যা, বাবার ঘর ঠিক করে রাখ গে—

রঞ্জন চেয়ারের পিঠ হইতে একটা কোঁচানো চাদর তুলিয়া গায়ে জড়াইতে লাগিল।

রমাই : আজ কি বাড়িতে চা খাওয়া হবেন না আজ্ঞে?

রঞ্জন : না আজ্ঞে, আজ অন্য কোথায় চা খাওয়া হবেন আজ্ঞে।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে রঞ্জন বাহির হইয়া গেল। রমাই তাহার প্রবীণ বহুদর্শী চক্ষুদুটি একটু কুঞ্চিত করিয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্।

কেদারবাবুর বাড়ির সদর। সম্মুখের বন্ধ দরজা ভেদ করিয়া সংগীতের চাপা আওয়াজ আসিতেছে।

কেদারবাবু ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া

ফেলিলেন ; অমনি সংগীতের পূর্ণ আওয়াজ মেঘভাঙা রৌদ্রের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

কেদারবাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কাট্।

মঞ্জু পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুলে বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে ; তাহার মন যেন কোন্ স্বপ্নলোকে ভাসিয়া গিয়াছে; অন্তরের মাধুর্য-রসে আবিষ্ট চোখদুটি ফিরিয়া ফিরিয়া দেয়ালে টাঙানো রঞ্জনের ছবিটিকে স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া যাইতেছে।

মঞ্জু গাহিতেছে—

'দখিন হাওয়া—
আমার বুকের মাঝে পরশ দিয়ে যায়।
—দখিন হাওয়া।
কার নয়ন দুটি মরম বি'ধে চায়—
—দখিন হাওয়া।
আমি মন হারালাম নদীর কিনারায়—
—দখিন হাওয়া।'

গান শেষ হইবার পূর্বেই কেদারবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং নিঃশব্দে একটি সোফায় গিয়া বসিয়াছিলেন। মঞ্জু জানিতে পারে নাই। গান শেষ করিয়া মঞ্জু যখন ফিরিয়া বসিল তখন সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; সলজ্জ ধরা-পড়িয়া-যাওয়া ভাব। তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ বাবা, ডাক্তারের বাড়ি থেকে কখন ফিরলে?

কেদার ঃ এই খানিকক্ষণ। গান শেষ হয়ে গেল?

মঞ্জু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া কেদারের পাশে আসিয়া বসিল।

মঞ্জু ঃ জাপানী গান কি না, তাই তিন লাইনে শেষ হয়ে গেল।—ডাক্তার কি বললেন?

কেদার বিরক্তি ও বিদ্বেষপূর্ণ মুখভঙ্গী করিলেন।

কেদার ঃ কী আর বলবে! যত সব গো-বদ্যি। রোগ আরাম করতে পারে না, বলে 'দাঁত তুলিয়ে ফেল।' হুঁ! কিন্তু মরুক গে ডাক্তার। তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

কেদার যেরূপ গম্ভীরকণ্ঠে কথাটা বলিলেন তাহাতে চকিত আশঙ্কায় মঞ্জু তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিল।

মঞ্জু ঃ কি কথা বাবা?

কেদার পিঠ ঠেসান দিয়া বসিলেন ; ফাঁসির হুকুম-জারি করার মত কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—

কেদার ঃ আমি তোমার বিয়ে ঠিক করেছি—

মঞ্জুর মুখ তপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু উৎকণ্ঠা কমিল না। কেদার হাকিমীকণ্ঠে বলিয়া চলিলেন—

কেদার ঃ আমি তোমাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছি—সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে চাইবে আশা করি এতটা স্বাধীন এখনও হও নি।

মঞ্জুর উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল; চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল। ঢোক গিলিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু ঃ না বাবা।

কেদার সন্তুষ্ট হইয়া গলার মধ্যে একটি হুংকার করিলেন। তাঁহার স্বর একটু নরম হইল।

কেদার ঃ বেশ। এখন আমার কাছে সরে আয়।

পূর্বগামী কথোপকথনের মধ্যে মঞ্জু নিজের অজ্ঞাতসারে কেদার হইতে একটু দূরে সরিয়া গিয়াছিল; এখন আবার তাঁহার পাশে ঘেঁষিয়া বসিল। কেদার সহসা হস্ত প্রসারিত করিয়া রঞ্জনের ছবির দিকে নির্দেশ করিলেন—

কেদার ঃ এবার দ্যাখ্, ঐ ছেলেটিকে পছন্দ হয়?

কেদার মঞ্জুর পানে চোখ ফিরাইলেন। মঞ্জু চকিত কটাক্ষে ছবিটা দেখিয়া লইয়া ঘাড় নীচু করিয়া ফেলিয়াছিল; অস্পষ্ট লজ্জারুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু ঃ আমি জানি না।

কেদার কিন্তু এরূপ অ-সন্তোষজনক কথায় তৃপ্ত হইবার পাত্র নয়; তিনি মঞ্জুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

কেদার ঃ আমার ওকে খুব পছন্দ হয়। তুই কি বলিস?

মঞ্জু ঃ (নতচক্ষে)—তুমি যা বলবে তাই হবে।

বলিয়া লজ্জারুণ মুখখানা কেদারবাবুর বগলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। কেদারের মুখে এতক্ষণে সত্যসত্যই প্রসন্নতা জাগিয়া উঠিল; হয়তো তাঁহার অধরোষ্ঠের কোণ ঊর্ধ্বমুখী হইয়া একটু হাসির আভাসই প্রকাশ করিল।

কেদার ঃ বেশ—আমার মেয়ের মুখ থেকে আমি এই কথাই শুনতে চাই—(রঞ্জনের ছবির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া) ছোকরা সব দিক দিয়েই সুপাত্র! সায়েন্স্ পড়েছে—দেখতে শুনতেও ভাল—এখন কেবল ওর বংশ পরিচয় পেলেই—

বহির্দ্বারের কাছে গলা ঝাড়ার শব্দ শুনিয়া কেদার সেইদিকে ফিরিয়া দেখিলেন—রঞ্জন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতেছে; পিতাপুত্রীর ঘনিষ্ঠ ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্ন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে।

কেদার ঃ (প্রশান্তকণ্ঠে) এসো রঞ্জন, তোমার অপেক্ষা করছি—

মঞ্জু পিতার কুক্ষি হইতে মুখ তুলিয়া রঞ্জনকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেদারবাবু যতক্ষণে রঞ্জনকে সম্ভাষণ করিয়া বসাইতেছিলেন মঞ্জু ততক্ষণে অলক্ষিতে ভিতরের দরজা পর্যন্ত পেঁীছিয়াছিল; কিন্তু তাহার ঘর ছাড়িয়া পলায়নের চেষ্টা সফল হইল না। কেদার ডাকিলেন—

কেদার ঃ মঞ্জু, তুই যাস নি—আমাদের কথা এমন কিছু গোপনীয় নয়—

দ্বারের কাছেই পিয়ানোর সম্মুখে মিউজিক টুল ছিল, মঞ্জু সঙ্কুচিতভাবে তাহার উপর বসিয়া পড়িল।

রঞ্জন ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছিল; কেদারবাবু তাহাকে সোজাসুজি বলিলেন—

কেদার ঃ তোমাকে ডেকেছিলুম। মঞ্জুর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার। আমার দাঁতের রোগ, কোন্ দিন আছি কোন্ দিন নেই—

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে, সে কি কথা।

কেদার ঃ না না, তোমরা ছেলেমানুষ বোঝ না—দাঁত বড় ভয়ংকর জিনিস; কিন্তু সে যাক, তুমি কায়স্থ তো?

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ—উত্তর রাঢ়ী।

কেদার ঃ বেশ বেশ।

ওদিকে মঞ্জু চুপটি করিয়া বসিয়া শুনিতেছে; সে একবার চোখ তুলিয়া আবার

নামাইয়া ফেলিল। কেদার বলিতে লাগিলেন—

কেদার ঃ এতদিন তুমি যাওয়া-আসা করছ অথচ তোমার কোনও পরিচয়ই নেওয়া হয় নি। তোমার বাবার নামটি কি বল তো।

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে, আমার বাবার নাম শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ।

কেদারবাবু হাসিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন ; তারপর ধীরে ধীরে সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় চক্রাকৃতি হইয়া ঘুরিয়া উঠিল।

কেদার ঃ প্র—! কি বললে তোমার বাপের নাম?

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ।

কেদার ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জনও হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়াইল। কেদারের কণ্ঠে একটি অন্তগূঢ় মেঘগর্জন হইল।

কেদার ঃ প্রতাপ সিংগি! তুমি—প্রতাপ সিংগির ব্যাটা—অ্যাঁ!

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু—

কেদারবাবু রক্তনেত্রে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

কেদার ঃ তোমার বাপের গালে এতবড় আব্ আছে?

বলিয়া হাতে কমলালেবুর মত আকার দেখাইলেন। রঞ্জন বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিল—

রঞ্জন ঃ আজ্ঞে না, অতবড় নয়—এতটুকু—

বলিয়া সুপারির আকার দেখাইল। কেদার সহসা সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

কেদার ঃ ব্যস্—আর সন্দেহ নেই। তুমি সেই দুশমনের বাচ্ছা!

মঞ্জু কাঠ হইয়া বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল ; রঞ্জন বিভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল; কেদার তাহার মুখের সামনে তর্জনী আস্ফালন করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন।

কেদার ঃ তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ছোকরা! প্রতাপ সিংগির ব্যাটা হয়ে তুমি আমার বাড়িতে ঢুকেছ? বেল্লিক বেয়াদপ!

হঠাৎ টেবিল হইতে একটি ফুলদানি তুলিয়া লইয়া তিনি দু'হাতে সেটা মাটিতে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিলেন। মঞ্জু চীৎকার করিয়া উঠিল।

মঞ্জু ঃ বাবা!

আহত সিংহের মত কেদার কন্যার দিকে ফিরিলেন।

কেদার ঃ খবরদার! যদি আমার মেয়ে হোস্, একটি কথা কইবি না—

মঞ্জু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অধর দংশন করিয়া আবার বসিয়া পড়িল। কেদার রঞ্জনের দিকে ফিরিলেন ; ডান হাতের মুষ্টি তাহার নাকের কাছে ধরিয়া এবং বাঁ হাতের তর্জনী বহির্দ্বারের দিকে নির্দেশ করিয়া তিনি চীৎকার ছাড়িলেন—

কেদার ঃ ঐ দরজা দেখতে পাচ্ছ? সোজা বেরিয়ে যাও। আর যদি কখনও আমার বাড়িতে মাথা গলিয়েছ—মাথা ফাটিয়ে দেব। যা—ও!

রঞ্জন মোহাচ্ছন্নের মত কেদারবাবুর মুষ্টির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন মাথা ঝাড়া দিয়া নিজেকে কতকটা সচেতন করিয়া লইল, তারপর তন্দ্রাহতের মত বলিল—

রঞ্জন ঃ আচ্ছা—আমি যাচ্ছি।

সে দ্বারের দিকে ফিরিল।

মঞ্জু মিউজিক টুলে বসিয়াছিল ; তাহার নিপীড়িত চক্ষু দুটি এতক্ষণ ব্যাকুল-ভাবে এই দৃশ্যের মর্মানুসন্ধান করিতেছিল ; রঞ্জন দ্বারের অভিমুখী হইতেই সে

পিয়ানোর উপর হাত রাখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিয়ানো আর্ত বেসুরাকণ্ঠে আপত্তি জানাইল।

কেদার চীৎকার করিয়া চলিলেন—

কেদার ঃ যত সব ঠগ্ জোচ্চোর দাগাবাজ! প্রতাপ সিংগির ছেলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে?

রঞ্জন দ্বার পর্যন্ত পেঁাছিয়াছিল, একবার দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। অমনি কেদারবাবুর বজ্রনাদ আসিল—

কেদার ঃ বেরোও।

রঞ্জন আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

মঞ্জু সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, এখন পিতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল তিনি আর কিছু না পাইয়া গট্‌গট্ করিয়া দেয়ালে লম্বিত রঞ্জনের ছবিটার পানে চলিয়াছেন। মঞ্জু অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মঞ্জু ঃ বাবা!

ছবির নিকটে পেঁাছিয়া কেদার কট্‌মট্ করিয়া একবার মঞ্জুর পানে তাকাইলেন, তারপর দু'হাতে হেঁচ্‌কা মারিয়া ছবিটাকে দেয়াল হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর ঝড়ের শক্তি ফুরাইয়া গেলে প্রকৃতি যেমন ক্লান্ত নিঝুম হইয়া পড়ে, কেদারবাবুর ক্রুদ্ধ আস্ফালনও তেমনি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিল; তিনি অবসন্ন দেহে ফিরিয়া গিয়া একটা কৌচে বসিয়া পড়িলেন। গালে হাত দিয়া একবার অনুভব করিলেন। যেন দন্তশূলের পূর্বাভাস পাইতেছেন।

মঞ্জু পিয়ানোর পাশে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ফ্যাকাসে রক্তহীন মুখে ঠোঁটদুটি অল্প কাঁপিতেছিল। কেদার তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন; তারপর ঈষৎ ভাঙা গলায় ডাকিলেন—

কেদার ঃ মঞ্জু, এদিকে এসো।

মঞ্জু একবার চোখ তুলিল; তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কেদার পাশে হাত রাখিয়া বলিলেন—

কেদার ঃ বোসো।

যন্ত্রের পুতুলের মত মঞ্জু নির্দিষ্ট স্থানে বসিল। কেদার একবার গলা-খাঁকারি দিলেন, যে জোর মনের মধ্যে নাই তাহাই যেন কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিলেন; তারপর অন্যদিকে তাকাইয়া বলিলেন—

কেদার ঃ ও আমার শত্তুরের ছেলে; ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

মঞ্জু প্রথমটা উত্তর দিল না, তারপর মনের ব্যাকুলতা যথাসম্ভব দমন করিয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ ওঁকে কেন অপমান করলে বাবা? উনি তো কিছু করেন নি।

কেদারবাবুর মুখ একগুঁয়ে ভাব ধারণ করিল।

কেদার ঃ না করুক—ওর বাপ আমার শত্তুর।

মঞ্জু ঃ কিন্তু—কি নিয়ে এত শত্রুতা?

কেদার স্মৃতির ফুটন্ত জলে অবগাহন করিলেন, কিন্তু অনুভূতিটা আরামদায়ক হইল না। ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তাহা অনেক সময় এমন লঘু প্রতীয়মান হয় যে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কেদার প্রশ্নটা এড়াইয়া গেলেন।

কেদার ঃ তা এখন আমার মনে পড়ছে না—পঁচিশ বছরের কথা। কিন্তু সে যাই

হোক, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। বুঝলে?

মঞ্জু হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। কেদার কন্যার মনের ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না; আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাঁহার মুখের আকৃতি হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিল। তিনি চাপা আবেগের স্বরে বলিলেন—

কেদার ঃ মঞ্জু, আমার আর কেউ নেই, ছেলে বলতে মেয়ে বলতে সব তুই। তোর বুড়ো বাপের মনে যাতে আঘাত লাগে এমন কাজ তুই বোধ হয় করবি না—

মঞ্জু আর পারিল না, কেদারবাবুর উরুর উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল; তারপর বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু ঃ না বাবা, সে ভয় তুমি কোরো না—

ডিজল্ভ্।

বাড়ির পাশে জানালা হইতে কিছু দূরে রঞ্জনের ফটোখানা ভাঙা অবস্থায় পড়িয়া আছে। জাপানী ফ্রেম কেদারবাবুর প্রচণ্ড দাপট সহ্য করিতে পারে নাই।

মঞ্জু পাশের একটা দরজা দিয়া সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছবিটি তুলিয়া ভাঙা ফ্রেম হইতে উদ্ধার করিল, তারপর বুকের মধ্যে লুকাইয়া যেমন সন্তর্পণে আসিয়াছিল তেমনি বাড়ির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কাট্।

ঝাঝায় রঞ্জনের বাড়ির সম্মুখস্থ খোলা বারান্দা। বাড়িটি রাস্তা হইতে খানিকটা পিছনে অবস্থিত; ফটক পার হইয়া বড় বড় ঝাউয়ের শান্ত্রী-রক্ষিত কাঁকরের সড়ক অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিয়াছে। ফটক হইতে বারান্দা দেখা যায় না।

বারান্দার উপর টেবিল চেয়ার পাতা হইয়াছে; টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম, টোস্ট্ মাখন কেক্ ইত্যাদি। একটি চেয়ারে বসিয়া প্রতাপবাবু টোস্টে মাখন মাখাইয়া তাহাতে কামড় দিতেছেন এবং মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া গলা ভিজাইয়া লইতেছেন। ভৃত্য রমাই আশেপাশে প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বারান্দার নীচে জুতার মশ্মশ্ শব্দ শুনা গেল; প্রতাপ পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রঞ্জন বিষণ্ণ অন্যমনস্কভাবে আসিতেছে, পিতাকে বারান্দার উপর আসীন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার উদ্ভ্রান্ত মন এত শীঘ্র পিতৃদর্শনের জন্য প্রস্তুত ছিল না; সে কতকটা বিস্মিতভাবেই বলিয়া উঠিল—

রঞ্জন ঃ বাবা!

তারপর আত্মসম্বরণ পূর্বক মুখে হাসি আনিয়া সে তাড়াতাড়ি বারান্দার উপর উঠিয়া গেল।

প্রতাপও কামিজের হাতায় মুখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; রঞ্জন আসিয়া প্রণাম করিতেই তাহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধটা ছিল প্রায় সমবয়স্ক বন্ধুর মত।

প্রতাপ ঃ কেমন আছিস?

রঞ্জন ঃ (মুখ প্রফুল্ল করিয়া) ভাল আছি বাবা। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে!

প্রতাপ ঃ এম্নি—অনেক দিন তুই কাছছাড়া—ভাবলুম একবার দেখে আসি!

প্রতাপ স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া বসিলেন; রঞ্জন তাঁহার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসিল। পিতার কথায় সে একটু কোমল হাসিল।

রঞ্জন ঃ ও। ভালই তো, তবু দু'দিন বিশ্রাম করতে পারবে। —রমাই, আর একটা পেয়ালা নিয়ে আয়—

রমাই প্রস্থান করিল। রঞ্জনের পক্ষে প্রফুল্লতার মাত্রা বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল; প্রদীপে যখন তৈলের অভাব তখন কেবল মাত্র সলতে উস্কাইয়া তাহাকে কতক্ষণ বাঁচাইয়া রাখা যায়! প্রতাপ চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিতে তুলিতে তীক্ষ্নচক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

রমাই পেয়ালা লইয়া ফিরিল; রঞ্জনের সম্মুখে রাখিতে রাখিতে বলিল—

রমাই ঃ বাইরে চা খাওয়া হলেন না আজ্ঞে?

রঞ্জন সচকিতে চোখ তুলিল; তাহার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঘাড় হেঁট করিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল—

রঞ্জন ঃ না।

প্রতাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন; তাঁহার মুখ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। রঞ্জন একচুমুক চা খাইয়া বাঁ হাত গালে দিয়া বসিল। প্রতাপ টোস্টের পাত্রটা তাহার দিকে ঠেলিয়া দিলেন, রঞ্জন মাথা নাড়িয়া সেটা তাঁহার দিকে ফেরত দিল। তখন প্রতাপ আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—

প্রতাপ ঃ কি হয়েছে রঞ্জন?

রঞ্জন সোজা হইয়া বসিয়া মুখে হাসি আনিয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জন ঃ কই—কিছুই তো হয় নি!

প্রতাপ ঃ তবে গালে হাত দিয়ে অমন করে বসে আছিস কেন?—(সহসা) হাঁরে, দাঁতের ব্যথা নয় তো?

বলিতে বলিতে তিনি নিজের পকেটে হাত পুরিলেন।

রঞ্জন হাসিয়া ফেলিল।

রঞ্জন ঃ না বাবা, দাঁত ঠিক আছে।

প্রতাপ ঃ তবে? অমন করে বসে আছিস, কিছু খাচ্ছিস না—এর মানে কি?

রঞ্জন চায়ের পেয়ালাটাও সরাইয়া দিয়াছিল, এখন আবার কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে একবার চুমুক দিল; মুখে হাসি আনিয়া যথাসম্ভব সহজ সুরে বলিল—

রঞ্জন ঃ বললুম তো বাবা, কিছু নয়—

প্রতাপবাবুর ধৈর্য ক্রমশ ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তিনি হঠাৎ টেবিলের উপর একটা কীল মারিলেন। চায়ের বাসনগুলি সশব্দে নাচিয়া উঠিল।

প্রতাপ ঃ নিশ্চয় কিছু। আমি শুনতে চাই।

রঞ্জনের মুখ গম্ভীর হইল; সে কিছুক্ষণ প্রতাপের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন ঃ বাবা, কেদার রায় বলে কাউকে তুমি চেনো?

প্রতাপ চেয়ার ছাড়িয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ ঃ কেদার! সেই বেল্লিক হনুমানটা?

(তিনি আবার দৃঢ়ভাবে বলিলেন) হ্যাঁ, চিনতুম তাকে পঁচিশ বছর আগে! কিন্তু সে উল্লুকটার কথা কেন?

রঞ্জন ক্লান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন ঃ না, কিছু নয়। এখানে তাঁর মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—

প্রতাপ গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিট্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ ঃ কি বলাল—সেই ক্যাদার বোম্বেটের মেয়ের সঙ্গে তোর আলাপ! আস্পর্দ্ধা কম নয় তো ক্যাদারের! আমার ছেলেকে ফাঁসাতে চায়—

ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের স্বরে রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন ঃ বাবা, তুমি ভুল করছ—তিনি—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রতাপ গর্জিতে আরম্ভ করিলেন—

প্রতাপ ঃ হতে পারে না, হতে পারে না—

তিনি উন্মত্তবৎ হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; তারপর রঞ্জনের নিরীহ স্কন্ধে গদার মত বাহু সজোরে নিপাতিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন—

প্রতাপ ঃ রঞ্জন, তুই যদি বাপের ব্যাটা হোস, আর কখনও ওর বাড়িতে মাথা গলাবি নে—

রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ না বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কেদারবাবু বলেছেন, তাঁর বাড়িতে মাথা গলালেই তিনি আমার মাথা ফাটিয়ে দেবেন।

প্রতাপ আবার দাপাদাপি করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ ঃ কী! এতবড় আস্পর্দ্ধা—আমার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেবে। দেখে নেবো—পুলিসে দেবো হতভাগা নচ্ছারকে—

দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনও লাভ নাই দেখিয়া রঞ্জন বাড়ির ভিতর দিকে চলিল। প্রতাপ হাঁকিলেন—

প্রতাপ ঃ শোন্!

রঞ্জন ফিরিল।

প্রতাপ ঃ কাল রাত্রের গাড়িতে আমরা কলকাতায় ফিরে যাব—

রঞ্জন ঃ (উদাস কণ্ঠে) বেশ!

রঞ্জন আবার গমনোদ্যত হইল।

প্রতাপ ঃ আমি রাজার বাড়িতে তোর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছি।

রঞ্জন অধর দংশন করিল।

রঞ্জন ঃ বিয়ে আমি করব না বাবা।

প্রতাপ ঃ করবি না! (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) আচ্ছা সে দেখা যাবে। কলকাতায় চল্ তো আগে। এ বুনো জায়গায় আর নয়, কালই রাত্রের গাড়িতে।

রঞ্জনের মুখে চোখে একটা চকিত চিন্তার ছায়া পড়িল। সে অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করিল—

রঞ্জন ঃ কাল রাত্রের গাড়িতে—

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

পরদিন অপরাহ্ণ। রঞ্জন নিজের ঘরে বসিয়া খানিকটা রবার ও একটা দ্বিভুজ পেয়ারার ডাল দিয়া গুল্তি তৈয়ার করিতেছে। কাজটা যে সে গোপনে সম্পন্ন করিতে চায় তাহা তাহার দ্বারের দিকে সতর্ক নজর হইতে প্রমাণিত হয়।

গুল্তি প্রস্তুত শেষ করিয়া সে রবার টানিয়া পরীক্ষা করিল, ঠিক হইয়াছে। একটা

কাগজ গুলি পাকাইয়া গুল্‌তিতে সংযোগ করিয়া অদূরস্থ ড্রেসিং টেবিলে রক্ষিত একটি প্ল্যাস্টারের পরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। পরী টলিয়া পড়িল।

সন্তুষ্ট হইয়া রঞ্জন গুল্‌তি পকেটে রাখিল; তারপর দ্বারের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল।

চিঠি লেখা হইলে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া রঞ্জন উঠিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে চলিল।

কাট্‌।

এই বাড়িরই আর একটা ঘরে প্রতাপ রেল-জার্নির উপযুক্ত সাজ-পোশাক করিয়া অত্যন্ত অধীরভাবে পায়চারি করিতেছেন। ঘরের একটা জানালা বাগানের দিকে। সেই জানালা হইতে দরজা পর্যন্ত পিঞ্জরাবদ্ধ পশুরাজের মত যাতায়াত করিতে করিতে প্রতাপ মাঝে মাঝে জেব-ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিতেছেন।

একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘড়ি দেখিলেন; তারপর বিরক্তভাবে নিজ মনেই বিড়্‌ বিড়্‌ করিলেন—

প্রতাপ ঃ সময় যেন কাটতে চায় না। এখনও ট্রেনের সময় হতে—পাঁচ ঘন্টা।

হঠাৎ জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়িতেই প্রতাপ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলেন: তারপর জানালার গরাদ ধরিয়া অপলকচক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

জানালার বাহিরে কিছুদূরে একটা মেহদি ঝাড়ের বেড়া বাড়ির সমান্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। প্রতাপ দেখিলেন, বেড়ার ওপারে সন্তর্পণে গা ঢাকিয়া কে একজন চলিয়া যাইতেছে; তাহার মুখ বা দেহ পাতার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে; কেবল ঝাড়ের পত্র-বিরল তলার দিক দিয়া সঞ্চারমান পদযুগল দেখা যাইতেছে। পদযুগল যে কাহার তাহা প্রতাপের চিনিতে বিলম্ব হইল না।

যতক্ষণ দেখা গেল প্রতাপ পদযুগল দেখিলেন; তারপর চক্ষু চক্রাকার করিয়া চিন্তা করিলেন। গালের আব্‌টি ধরিয়া টিপিতে টিপিতে তাঁহার মাথায় একটা কূটবুদ্ধির উদয় হইল, চাদর কাঁধে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

কাট্‌।

বাড়ির ফটকের ঠিক অভ্যন্তর। ফটকের পাশে দরোয়ানের কুঠুরি, তাহার পাশে গারাজ-ঘর। একজন গুর্খা দরোয়ান রঞ্জনের মোটর বাইক বাহির করিয়া আনিতেছে; রঞ্জন ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

মোটর বাইক রঞ্জনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া গুর্খা দরোয়ান দুই পা জোড় করিয়া স্যালুট্‌ করিল। রঞ্জন গাড়িতে চাপিয়া বসিয়া স্টার্ট দিতে গিয়া থামিয়া গেল। শব্দ করা হয়তো নিরাপদ হইবে না, এই ভাবিয়া সে নামিয়া পড়িল। মাথা নাড়িয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ না, হেঁটেই যাব।

বলিয়া মোটর বাইক আবার দরোয়ানকে প্রত্যর্পণ করিয়া রঞ্জন দ্রুত পদক্ষেপে ফটক হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাট্‌।

বাগানের একটি ঝাউগাছের আড়ালে প্রতাপ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; রঞ্জন বাহির হইয়া যাইবার পর তিনি গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিলেন; তারপর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন দরোযান গাড়িটা আবার গারাজে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি চাপা গলায় ডাকিলেন—

প্রতাপ ঃ এই! সস্‌স্‌!

গুর্খা দরোয়ান পিছু ফিরিয়া মালিককে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জোড় পদে স্যালুট্‌

করিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রতাপ ঃ ছোটবাবু কোন্ দিকে গেল?

দারোয়ান হিট্লারি কায়দায় হস্ত প্রসারিত করিয়া রঞ্জন যেদিকে গিয়াছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিল। প্রতাপ আবার তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রচরণে ফটক পার হইয়া সেই পথ ধরিলেন।

ডিজল্ভ্।

ঝাঝার একটি পথ। দুই-চারিটি পথিক দেখা যায়। রঞ্জন পথের মাঝখান দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বহুদূর পশ্চাতে প্রতাপ রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া নিজেকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছেন।

ক্রমে রঞ্জন দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল; প্রতাপ কাছে আসিতে লাগিলেন। একটা কুকুর তাঁহার সন্দেহজনক ভাবভঙ্গী দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাঁহার পিছু লইল। উত্যক্ত হইয়া শেষে প্রতাপ একটি ঢিল কুড়াইয়া লইয়া কুকুরের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলেন। কুকুর পলায়ন করিল।

ডিজল্ভ্।

কেদারবাবুর বাড়ির পাশ দিয়া একটি সংকীর্ণ গলি গিয়াছে। কলিকাতার গলি নয়; পদতলে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, দুই পাশে ফণিমনসার ঝাড়। ঝাড়ের অপর পাশে বাগান-ঘেরা বাড়ি।

রঞ্জন সাবধানে এই গলির একটা মনসা-বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখে কেদারবাবুর দ্বিতল বাড়ির পার্শ্বভাগ। রঞ্জনের দৃষ্টি অনুসরণ করিলে একটি জানালা চোখে পড়ে। দ্বিতলের জানালা, গরাদ নাই, কিন্তু কাচের কবাট বন্ধ।

কাট্।

দ্বিতলে মঞ্জুর শয়নকক্ষ। নানাপ্রকার ছোট-খাটো মেয়েলি-আসবাব চোখের প্রীতি সম্পাদন করে। ঘরটি কিন্তু বর্তমানে ঈষদন্ধকার।

মঞ্জু নিজের শয্যার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া দু'হাতে রঞ্জনের ছবিখানি সম্মুখে মাথার বালিশের উপর ধরিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছে। তাহার মুখখানি অত্যন্ত বিরস।

দেখিতে দেখিতে তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া উঠিল; অশ্রুনিরোধের চেষ্টায় ঠোঁট কাম্ড়াইয়া ধরিয়াও কোনও ফল হইল না; ছবির উপর মাথা রাখিয়া মঞ্জু নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

কাট্।

রঞ্জন জানালার দিকে তাকাইয়া ছিল, সেখান হইতে দৃষ্টি নামাইয়া মাটিতে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল। তারপর একটি ছোট নুড়ির মত পাথর কুড়াইয়া লইয়া পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহাকে মোড়কের মত মুড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রতাপবাবু কিয়দ্দূর পশ্চাতে বেড়ার পাশে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন; উৎকণ্ঠিতভাবে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিতেই তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ফণিমনসার কাঁটা ফুটিল। তিনি চকিতে আবার খাড়া হইলেন।

রঞ্জন গুল্তি বাহির করিয়া তাহাতে নুড়িটি বসাইয়াছিল, এখন অতি যত্নে জানালার দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া নুড়ি নিক্ষেপ করিল।

জানালার একটা কাচ ভাঙিয়া নুড়ি ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাট্।

মঞ্জু ঘরের মধ্যে পূর্ববৎ কাঁদিতেছিল, কাচ ভাঙার শব্দে মুখ তুলিল। কাচ ভাঙা জানালা হইতে তাহার চক্ষু মেঝের উপর নামিয়া আসিল; কাগজ মোড়া নুড়িটি দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সেটি কুড়াইয়া লইল।

চিঠিতে লেখা ছিল—

> 'মঞ্জু, আজ আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি, আমারও বাবা এসেছেন। যাবার আগে তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। যে পাথরের আড়ালে রোজ আমাদের দেখা হত, সেইখানে আমি অপেক্ষা করব। তুমি আসবে কি?
>
> তোমার রঞ্জন'

চিঠি পড়া শেষ হইয়া যাইবার পরও মঞ্জু চিঠি হাতে ধরিয়া তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; চিঠিখানা স্খলিত হইয়া মেঝেয় পড়িল। মঞ্জু অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিল—

মঞ্জু ঃ একবার—শেষবার—

কাট্।

বেড়ার ধারে রঞ্জন ব্যগ্র ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া আছে।

জানালা খুলিয়া গেল; মঞ্জুর পাংশু মুখখানি দেখা গেল। নিম্নাভিমুখে তাকাইয়া সে কিছুক্ষণ রঞ্জনকে দেখিল, তারপর আস্তে আস্তে সম্মতিজ্ঞাপক ঘাড় নাড়িল।

ডিজল্ভ্।

দ্বিতলে মঞ্জুর শয়নকক্ষের দরজার সম্মুখে কেদারবাবু দাঁড়াইয়া আছেন; দরজা ভেজানো রহিয়াছে। কেদারের মুখে ক্ষুব্ধ বিষণ্ণতা। মঞ্জুর মনে দুঃখ দিয়া তিনিও সুখী নন।

কেদার দ্বারে মৃদু টোকা দিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না। দ্বিতীয়বার টোকা দিয়াও যখন জবাব পাওয়া গেল না, তিনি ডাকিলেন।

কেদার ঃ মঞ্জু!

এবারও সাড়া নাই। কেদার তখন উদ্বিগ্নমুখে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ঘরে কেহ নাই। কেদার বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাইলেন। ভাঙা জানালাটা চোখে পড়িল; তারপর মেঝেয় চিঠিখানা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন।

চিঠি তুলিয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ ভীষণাকৃতি ধারণ করিল; তিনি সেটা মুঠির মধ্যে তাল পাকাইয়া গলার মধ্যে হুঙ্কার দিলেন, তারপর দ্রুতবেগে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্রুত ডিজল্ভ্।

কেদারবাবুর বাড়ির সদর। মিহির জাপানী ছন্দে হেলিতে দুলিতে ফটক দিয়া প্রবেশ করিতেছিল, হঠাৎ সম্মুখ হইতে প্রচন্ড ধাক্কা খাইয়া প্রায় টাউরি খাইয়া পড়িল। কেদারবাবু ক্রুদ্ধ বন্য মহিষের মত তাহার পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মিহির কোনও মতে সামলাইয়া লইয়া চক্ষু মিটি মিটি করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

পার্বত্য স্থান। যে পাথরের ঢিবিটার উপর রঞ্জন ও মঞ্জু প্রথম দিন আরোহণ করিয়াছিল, তাহারই তলদেশে একটা পাথরে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জন প্রতীক্ষা করিতেছে। যেদিক দিয়া মঞ্জু আসিবে, তাহার অপলক দৃষ্টি সেইদিকে স্থির হইয়া আছে।

কাট্‌।

পার্বত্য স্থানের আর এক অংশ। প্রতাপ একটা ঝোপের আড়াল হইতে অনিশ্চিতভাবে উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন—যেন কোন্‌ দিক্‌ দিয়া অগ্রসর হইলে অলক্ষ্যে রঞ্জনের নিকটবর্তী হওয়া যায় তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছেন না। শেষে তিনি ঝোপের আড়ালে থাকিয়া বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কাট্‌।

মঞ্জু আসিতেছে। যেস্থানে সাধারণত তাহাদের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইত সেখান হইতে সিধা রঞ্জনের দিকে আসিতেছে। শুষ্ক মুখে করুণ আগ্রহ ; চুল ঈষৎ রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। সম্মুখ দিকে চাহিয়া চলিতে চলিতে সে একবার হোঁচট খাইল, কিন্তু তাহা জানিতেও পারিল না।

রঞ্জন মঞ্জুকে দেখিতে পাইয়াছিল ; সে কাছে আসিতেই দুই হাত বাড়াইয়া হাত ধরিল।

দু'জনে পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; মুখে কথা নাই। দু'জনের চোখেই আশাহীন ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা! মঞ্জুর শ্বাস একটু দ্রুত বহিতেছে। অবশেষে রঞ্জন ধরা-ধরা গলায় বলিল—

রঞ্জন ঃ মঞ্জু! এই আমাদের শেষ দেখা—আর দেখা হবে না।

মঞ্জু হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নীরবে মাথা নাড়িয়া অন্য দিকে তাকাইয়া রহিল। রঞ্জন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রঞ্জন ঃ বেশ, দেখা না হোক। কিন্তু তুমি চিরদিন আমাকে এমনি ভালবাসবে?

মঞ্জু রঞ্জনের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল—

মঞ্জু ঃ বাসবো। আমাদের ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

রঞ্জন দৃঢ়মুষ্টিতে হাত ধরিয়া তাহাকে আরও একটু কাছে টানিয়া আনিল।

কাট্‌।

পাথরের পশ্চাতে কিছুদূরে অসমতল কঙ্করপূর্ণ জমির উপর দিয়া কেদার হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছেন।

কাট্‌।

মঞ্জু ও রঞ্জন। দু'জনের চক্ষু যেন পরস্পরের মুখের উপর জুড়িয়া গিয়াছে। রঞ্জন একটু মলিন হাসিল।

রঞ্জন ঃ আমরা কেউই নিজের বাবার মনে দুঃখ দিতে পারব না ; তা যদি পারতুম আমরা নিজেরা খেলো হয়ে যেতুম, আর আমাদের ভালবাসাও তুচ্ছ হয়ে যেত—

মঞ্জুর চোখে আরতি প্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

মঞ্জু ঃ কেমন করে তুমি আমার মনের কথা জানলে?

রঞ্জন ঃ তোমার মনের কথা আর আমার মনের কথা এক হয়ে গেছে মঞ্জু।

কাট্‌।

প্রতাপ কঙ্করপূর্ণ ভূমির উপর হামাগুড়ি দিতেছেন।

কাট্।

মঞ্জু বিদায় চাহিতেছে। তাহাদের হাতে হাত আঙুলে আঙুল শৃংখলিত হইয়া আছে; রঞ্জন এখনও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না। মঞ্জু রুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু ঃ এবার ছেড়ে দাও।

ধীরে ধীরে রঞ্জনের অংগুলির শৃংখল শিথিল হইয়া গেল; মঞ্জু স্খলিতপদে অশ্রু-অন্ধ নয়নে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। চোখে অপরিসীম বিয়োগ-ব্যথা লইয়া রঞ্জন সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মঞ্জু চলিয়া যাইতেছে; যাইতে যাইতে একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল, আবার চলিতে লাগিল।

কাট্।

কঙ্করপূর্ণ স্থান। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে হামাগুড়ি দিয়া প্রতাপ ও কেদার প্রবেশ করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন।

তারপর কাছাকাছি পেঁছিয়া দুজনে একসংগে মুখ তুলিয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল; পঁচিশ বৎসরের অদর্শন সত্ত্বেও চিনিতে বিলম্ব হইল না।

দুইটি অপরিচিত কুকুর পথে সাক্ষাৎকার ঘটিলে যেমন দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া গূঢ় গর্জন করে, ইহারাও তদ্রূপ গর্জন করিলেন; তারপর চতুষ্পদ ভাব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার প্রথম কথা কহিলেন।

কেদার ঃ এঁ—ঃ! তুই! আমার বোঝা উচিত ছিল যে এ একটা নচ্ছার উল্লুকের কাজ।

প্রতাপ ঃ চোপ-রও ভাল্লুক কোথাকার! আমার ছেলে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতেছিস!

যুযুৎসুভাবে উভয়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

কেদার ঃ (সচীৎকারে) ফাঁদ পেতেছি! দাঁড়া রে নচ্ছার, তোর ছেলেকে পেলে তার হাড় এক ঠাঁই—মাস এক ঠাঁই করব। এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার মেয়েকে চিঠি লেখে!

প্রতাপ ঃ (আস্ফালন করিতে করিতে) তবে রে বেঁড়ে ওস্তাদ! মারবি আমার ছেলেকে! পুলিস ডেকে তোকে হাজতে না পুরি তো আমার নাম প্রতাপ সিংগিই নয়—

কাট্!

রঞ্জন যথাস্থানে পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল; রুমাল বাহির করিয়া মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। মুছিতে মুছিতে হঠাৎ থামিয়া সে শুনিতে লাগিল, অনতিদূর পশ্চাৎ হইতে কর্কশ কলহের আওয়াজ আসিতেছে।

রঞ্জনের বিস্মিত মুখের ভাব ক্রমশ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল; সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

কাট্।

কেদার ও প্রতাপ। তাঁহাদের দ্বন্দ্ব ক্রমে সপ্তমে চড়িতেছে।

কেদার ঃ শয়তানি করবার আর জায়গা পাস্ নি—হতভাগা হাতী—

প্রতাপ ঃ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—রাস্কেল রামছাগল!

কাট্।

রঞ্জন শুনিতেছিল; এতক্ষণে কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া তাহার মাথার চুল প্রায় খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার বিবর্ণ মুখ হইতে বাহির হইল—

রঞ্জন ঃ বাবা! কেদারবাবু!

কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া রঞ্জন কিছুক্ষণ হাত কচ্‌লাইল; তারপর দ্বিধাভরে মল্লভূমির দিকে চলিল।

কাট্‌।

কেদার যথাযোগ্য হস্ত আস্ফালন সহকারে বলিতেছেন—

কেদার ঃ ইচ্ছে করে এক চড় মেরে তোর আব-সুদ্ধ গালটা চ্যাপ্টা করে দিই!

প্রত্যুত্তরে প্রতাপ কেদারের মুখের সিকি ইঞ্চি দূরে নিজের বদ্ধ মুষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—

প্রতাপ ঃ ইচ্ছে করে একটি ঘুঁষি মেরে তোর দাঁতের পাটি উড়িয়ে দিই।

কেদার উত্তর দিবার জন্য হাঁ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য বাহির না হইয়া সহসা আর্ত কাতরোক্তি নির্গত হইল। তিনি হাত দিয়া গাল চাপিয়া ধরিলেন।

কেদারঃ অ্যা—উ! উ হু হু হু—আ রে রে রে রে—

যন্ত্রণায় তিনি মাটির উপর সজোরে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলেন; নিজের মুষ্টির দিকে উদ্বিগ্ন সংশয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন—হয়তো অজ্ঞাতসারে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বসিয়াছেন। কেদারবাবুর আক্ষেপোক্তি হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধির দিকেই চলিল। তখন প্রতাপ ধমক দিয়া বলিলেন—

প্রতাপ ঃ কি হয়েছে—কাঁদছিস কেন? আমি তোকে মেরেছি—মিথ্যেবাদী কোথাকার?

কেদার ঃ আরে রে রে রে রে—দাঁত রে লক্ষ্মীছাড়া—দাঁত—রে রে রে রে—

প্রতাপ কণ্টকবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ ঃ দাঁত?

কেদারের স্কন্ধ ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—

প্রতাপ ঃ কি বল্‌লি—দাঁত? দাঁত ব্যথা করছে?

কেদার ঃ হাঁ রে বোম্বেটে—দন্তশূল! নইলে তোকে আজ—হু হু হু—

প্রতাপ ঃ দন্তশূল! এতক্ষণ বলিস্‌ নি কেন রে গাধা?

ত্বরিতে পকেট হইতে গুলি বাহির করিয়া তিনি কেদারের সম্মুখে ধরিলেন।

প্রতাপ ঃ এই নে—খেয়ে ফ্যাল। দু'মিনিটে যদি তোর দন্তশূল সেরে না যায় আমার নামই প্রতাপ সিংগি নয়—

কেদার সন্দিগ্ধভাবে বড়ি নিরীক্ষণ করিলেন।

কেদার ঃ এঁঃ? খুনে কোথাকার, বিষ খাইয়ে মারবার মতলব? অ্যা—উ!

কেদার হাঁ করিতেই, প্রতাপ বড়ি তাঁহার মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

প্রতাপ ঃ নে—খা। আহাম্মক—

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার পূর্বেই কেদার বড়ি গিলিয়া ফেলিলেন।

কাট্‌।

রঞ্জন অনিশ্চিত পদে অগ্রসর হইতেছিল; তাহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ। কিছু দূরে আসিয়া সে একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। কলহের কলস্বরে মন্দা পড়িয়াছে; কেদারবাবু থাকিয়া থাকিয়া কেবল একটু কুন্থন করিতেছেন। রঞ্জন অন্তরালে দাঁড়াইয়া সবিস্ময় আগ্রহে দেখিতে লাগিল।

কাট্‌।

দুইটি টিবির উপর কেদার ও প্রতাপ বসিয়া আছেন। কেদারের মুখ বিস্ময়ে হত-বুদ্ধি; তাঁহার দন্তশূল যে এমন মন্ত্রবৎ উড়িয়া যাইতে পারে তাহা যেন তিনি ধারণাই করিতে পারিতেছেন না; বিহ্বলভাবে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রতাপের দিকে আড়-চক্ষে তাকাইতেছেন। প্রতাপের মুখে বিজয়-দীপ্ত হাসি সুপরিস্ফুট। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া প্রতাপ মস্তকের ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—

প্রতাপ ঃ কি বলেছিলুম? সারলো কি না?

কেদার মিন্ মিন্ করিয়া বলিলেন—

কেদার ঃ আশ্চর্য ওষুধ! কোথায় পাওয়া যায়?

প্রতাপ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ ঃ হেঃ হেঃ হেঃ—এ আমার তৈরি ওষুধ। চালাকি নয়, নিজে আবিষ্কার করেছি—

কেদার ঃ (ঘোর অবিশ্বাসভরে) আবিষ্কার করেছিস! তুই?

প্রতাপ ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি না তো কে?

তিনি উঠিয়া গিয়া কেদারের টিবির উপর বসিলেন।

প্রতাপ ঃ এর নাম হচ্ছে বৃহৎ দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা। বুঝলি? এই বড়ি বার করে সতের লাখ টাকা করেছি—

কেদার একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কেদার ঃ বলিস্ কি! আমি যে অভ্রের খনি করে মোটে এগারো লাখ করেছি—

প্রতাপ সপ্রশংস নেত্রে কেদারের পানে তাকাইলেন।

প্রতাপ ঃ তাই নাকি! তা এগারো লাখ কি চাট্টিখানি কথা না কি! কটা লোক পারে?

তিনি কেদারের পিঠে প্রশংসা-জ্ঞাপক চপেটাঘাত করিলেন। কেদারের মুখে সহসা হাসি ফুটিল।

কাট্।

রঞ্জন পূর্বস্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; তাহার মুখ অপরিসীম আনন্দে যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এই সময় কেদার ও প্রতাপ উভয়ের সম্মিলিত হাসির আওয়াজ ভাসিয়া আসিল।

রঞ্জন পা টিপিয়া টিপিয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিল; তারপর পিছু ফিরিয়া সোজা দৌড় দিল। দৌড়িতে দৌড়িতে সে যে 'মঞ্জু' 'মঞ্জু' উচ্চারণ করিতেছে তাহা সে নিজেই জানে না।

কাট্।

কেদারবাবুর গৃহের ফটকের সম্মুখ। মঞ্জুর মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মঞ্জু ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল; পশ্চাতে মিহির।

মিহির ঃ চল্লেন? একটা জাপানী কবিতা লিখেছিলুম—

মঞ্জু মোটরের চালকের সীটে প্রবেশ করিতে করিতে ভারী গলায় বলিল—

মঞ্জু ঃ মাফ করবেন মিহিরবাবু, আমার সময় নেই। হ্যাঁ, বাবা এলে বলে দেবেন, তাঁর জন্যে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর চিঠি রেখে গেলুম—

গাড়িতে স্টার্ট দিয়া মঞ্জু চলিয়া গেল। মিহির করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাট্।

রঞ্জনের বাড়ির ফটক। গুর্খা দরোয়ান স্বস্থানে দণ্ডায়মান আছে। রঞ্জন দৌড়িতে

দৌড়িতে বাহির হইতে প্রবেশ করিতেই দরোয়ান পদযুগল সশব্দে জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন ঃ দরোয়ান, জলদি—জলদি ফটফটিয়া নিকালো—

দরোয়ান স্যালুট করিয়া মোটর বাইক আনিবার জন্য প্রস্থান করিল। রঞ্জন নিজের উৎফুল্ল অথচ ঘর্মাক্ত মুখখানা রুমাল দিয়া মুছিতে লাগিল।

কাট্।

ঢিবির উপর পরস্পরের স্কন্ধ জড়াজড়ি করিয়া প্রতাপ ও কেদার বসিয়া আছেন; উভয়েরই চক্ষু আর্দ্র। পুনর্মিলনের অকাল বর্ষা দু'জনেরই মন ভিজাইয়া দিয়াছে।

কেদার ঃ (নাক টানিয়া) ভাই, আমি কি মিছামিছি তোর ওপর রাগ করছিলুম? তুই আমাকে 'কদু রায়' বলেছিলি কেন? আমার নামটাকে বেঁকিয়ে অমন করে ডাকা কি তোর উচিত হয়েছিল?

প্রতাপ ঃ ভাই, তুইও তো আমাকে 'আবু হোসেন' বলেছিলি। আমার গালে আব্ আছে বলে আমাকে আবু হোসেন বলা কি বন্ধুর কাজ হয়েছিল?

কেদার ঃ (চক্ষু মুছিয়া) যেতে দে ওসব পুরানো কথা—চল্ বাড়ি যাই।

উভয়ে উঠিলেন।

প্রতাপ ঃ আগে আমার বাড়িতে তোকে যেতে হবে কিন্তু।

কেদার ঃ না, আমার বাড়িতে আগে—

উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কেদার ঃ আমার মেয়েকে তো তুই এখনও দেখিস নি। (সগর্বে) অমন মেয়ে আর হয় না—

প্রতাপ ঃ (গর্বোদ্দীপ্ত কণ্ঠে) আর আমার ছেলে? তুই তো দেখেছিস—কেমন ছেলে?

সন্তানগর্বে উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া হাস্য করিতে করিতে চলিলেন।

কাট্।

কেদারবাবুর ফটকের সম্মুখ। রঞ্জনের মোটর বাইক আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সিঁড়ির উপর মিহির বিমর্ষভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে।

রঞ্জন ঃ মিহিরবাবু! মঞ্জু কোথায়?

মিহির ঃ (বিরস কণ্ঠে) তিনি মোটরে চড়ে চলে গেলেন। আমার জাপানী কবিতা শুনলেন না—

রঞ্জন ঃ চলে গেলেন? কোথায় চলে গেলেন?

মিহির ঃ তা জানি না। ঐ দিকে। আপনি শুনবেন কবিতা—

রঞ্জন আর দাঁড়াইল না; লাফাইয়া গিয়া গাড়িতে চড়িল।

রঞ্জন ঃ আর এক সময় হবে।

তাহার মোটর বাইক তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

কাট্।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। মঞ্জুর মোটর কলিকাতার দিকে চলিয়াছে। মঞ্জু চালকের আসনে বসিয়া; তাহার দৃষ্টি সম্মুখে স্থির হইয়া আছে; ঠোঁট দুটি দৃঢ়বদ্ধ।

কাট্।

রঞ্জনের গাড়ি ঝাঝার সীমানা পার হইয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পড়িল। গাড়ি উল্কার বেগে ছুটিয়াছে। একটা গ্রাম্যকুকুর কিছুদূর পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল, তারপর হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল।

কাট্।

বাড়ির সম্মুখের বারান্দায় মিহির, কেদার ও প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছেন। কেদার বড়ই ঘাব্ড়াইয়া গিয়াছেন।

কেদার ঃ অ্যাঁ—চলে গেছে! কোথায় চলে গেছে?

মিহির ঃ তা তো জানি না—কিছুক্ষণ পরে রঞ্জনবাবু এলেন, তিনিও খবর পেয়ে মঞ্জু দেবীর পিছনে মোটর বাইক ছোটালেন।

কেদার ও প্রতাপ উদ্বিগ্নভাবে মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন।

মিহির ঃ মঞ্জু দেবী আপনার জন্যে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর চিঠি রেখে গেছেন—

কেদার ঃ (খিঁচাইয়া) এতক্ষণ তা বলনি কেন?—এসো প্রতাপ।

দু'জনে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনাহূত মিহির আবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া গালে হাত দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার চোখে সহসা প্রাণ-সঞ্চার হইল। ফটকের সম্মুখ দিয়া চারিটি তরুণী—ইন্দু, মলিনা, সলিলা, মীরা—যাইতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিরীহ বাড়িটার দিকে তীব্র কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

তাঁহারা অন্তর্হিত হইতে না হইতেই মিহির চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দ্রুতপদে সিঁড়ি নামিয়া তরুণীদের পশ্চাদ্বর্তী হইল।

কাট্।

ড্রয়িং-রুমে কেদার মঞ্জুর পত্রপাঠ শেষ করিয়া বিহ্বলভাবে প্রতাপের পানে তাকাইলেন।

কেদার ঃ কলকাতায় চলে গেছে!—কি করি প্রতাপ?

প্রতাপ আশ্বাস দিয়া কেদারের পৃষ্ঠে কয়েকটি মৃদু চপেটাঘাত করিলেন।

প্রতাপ ঃ কিছু ভেবো না, আমার রঞ্জন তাকে ঠিক ফিরিয়ে আনবে। বোসো—

উভয়ে একটি সোফায় বসিলেন; কেদারের মন কিন্তু নিরুদ্বেগ হইল না।

কেদার ঃ ছেলেমানুষের কাণ্ড—কিছু বোঝে না—আমাদের মত মাথা ঠাণ্ডা তো নয়। শেষে কি করতে কি করে বসবে—

প্রতাপ ঃ আরে না না, কোনও ভয় নেই। আসল কথা দু'টোতে দু'জনের প্রেমে পড়ে গেছে—ভীষণভাবে।

কেদার ঃ হুঁ—দুটোই বেহায়া। সেই তো হয়েছে ভাবনা।—কি করা যায় এখন!

প্রতাপ ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, বোধ করি মনে মনে রাজকন্যাকে পুত্রবধূ করিবার উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। তারপর কেদারের ঊরুর উপর একটি চাপড় মারিলেন।

প্রতাপ ঃ ঠিক হয়েছে! এক কাজ করি এসো—

কেদার সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন।

প্রতাপ ঃ ও দুটোর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক!

কিছুক্ষণ পরস্পর তাকাইয়া রহিলেন। তারপর উভয়ে একটু হাসিলেন; হাসি ক্রমে প্রসারলাভ করিল। শেষে উভয়ে পরস্পর হাত ধরিয়া দীর্ঘকাল কর-কম্পন করিতে লাগিলেন।

কাট্।

মঞ্জুর গাড়ি চলিয়াছে।

মঞ্জুর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে; ঠোঁট কাঁপিতেছে; মুখের বাহ্য দৃঢ়তা আর রক্ষা হইতেছে না।

সহসা সে চলন্ত গাড়ির স্টীয়ারিং হুইলের উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া

উঠিল।

অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটিতে পাইল না; গাড়ি স্বেচ্ছানুযায়ী কিছু দূর গিয়া ক্রমে মন্দবেগ হইয়া অবশেষে থামিয়া গেল।

মঞ্জু অশ্রু-ধৌত মুখ তুলিয়া দেখিল গাড়ি নিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে সেল্ফ-স্টার্টার দিয়া গাড়ির শরীরে প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা করিল, কিন্তু এঞ্জিনের স্পন্দন পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিল না।

ব্যর্থ হইয়া মঞ্জু গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিল।

কাট্।

রঞ্জনের মোটর বাইক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে।

কাট্।

মঞ্জু একান্ত ম্রিয়মাণ মুখচ্ছবি লইয়া মোটরের ফুটবোর্ডে বসিয়া আছে। তার যেন আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।

দূরে অস্পষ্ট ফট্ ফট্ শব্দ শোনা গেল ; ক্রমে শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। মঞ্জু প্রথমটা কান করে নাই; তারপর সচকিতে ঘাড় তুলিয়া সেইদিকে তাকাইল।

দূরে রঞ্জনের মোটর বাইক আসিতেছে দেখা গেল। শব্দ ও গাড়ি নিকটতর হইতে লাগিল। শেষে রঞ্জনের মোটর বাইক মঞ্জুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিল, মুখ গম্ভীর। কিছুক্ষণ দু'জনে নীরবে দু'জনের পানে তাকাইয়া রহিল।

রঞ্জন ঃ গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?

মঞ্জু উত্তর দিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িল।

রঞ্জনের অধর প্রান্ত একটু নড়িয়া উঠিল।

রঞ্জন ঃ আমি জানি কি হয়েছে—পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে—

মঞ্জু অধর দংশন করিয়া অধোমুখে রহিল।

রঞ্জন উঠিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। মঞ্জু চোখ তুলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল—

মঞ্জু ঃ আবার কেন এলে?

রঞ্জন গম্ভীরভাবে একটু হাসিল।

রঞ্জন ঃ তোমাকে একটা খবর দিতে এলুম। তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার আবার ভাব হয়ে গেছে—ভীষণ ভাব।

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া মঞ্জু আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু ঃ কি—কি বললে?

রঞ্জন আর গাম্ভীর্যের অভিনয় বজায় রাখিতে পারিল না; অন্তরের চাপা উল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। সে দু'হাতে মঞ্জুকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন ঃ যা বললুম—দু'জনে একেবারে হরিহর আত্মা! চল, ফিরে যেতে যেতে সব বলব।

ডিজল্ভ্।

মঞ্জুর গাড়ি ফিরিয়া চলিয়াছে। রঞ্জনের মোটর বাইক তাহার পিছনের সীটে উঁচু হইয়া আছে।

রঞ্জন গাড়ি চালাইতেছে। পাশে মঞ্জু। মঞ্জুর মাথাটি রঞ্জনের স্কন্ধের উপর আশ্রয় লইয়াছে; চক্ষুদুটি পরিতৃপ্তির আবেশে স্বপ্নাতুর।

রঞ্জন একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; তারপর মঞ্জুর নরম চুলের মধ্যে নিজের গাল রাখিয়া সস্নেহে একটু নাড়া দিল। মঞ্জু সুখাবিষ্ট চোখ তুলিল।

ফেড আউট্।

যুগে যুগে

নয় বৎসরের অধিককাল ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাস করিতেছি, কিন্তু এ পর্যন্ত এদেশ ও এদেশের মানুষ লইয়া কাহিনী রচনা করিবার সাহস হয় নাই। পুরোপুরি এদেশের গল্প এই আমার প্রথম। অতীতকাল লইয়াই আরম্ভ করিলাম।

বাংলা দেশের রঘু ডাকাত, বিশে ডাকাতের মত এদেশেও স্বনামধন্য দস্যুর ইতিহাস আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ইংলণ্ডের রবিন্ হুডকে আমরা চিনি কিন্তু নিজের দেশের এইসব পুণ্যশ্লোক দস্যুদের কীর্তিকলাপ কিছুই জানি না।

এই কাহিনীর নায়ক প্রতাপ সিং ঐতিহাসিক চরিত্র নয়; কয়েকটি কাথিয়াবাড়ী দস্যুদের জীবনের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় ঘটনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া কল্পিত নায়কের জীবনে তাহা অর্পণ করিয়াছি।

কাথিয়াবাড় ও রাজপুতানা গায়ে গায়ে। বলা বাহুল্য, বহু রাজপুত কাথিয়াবাড়ে বাস করেন। অনেকগুলি রাজপুত দস্যুর ইতিহাস পাওয়া যায়। কয়েকজন মুসলমানও ছিলেন।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্ ইন্।

চিত্রপটের উপর ভারতবর্ষের একটি বৃহৎ রেখাচিত্র অঙ্কিত হইল। ক্রমে নদ নদী ও কয়েকটি বড় শহরের চিহ্নও ফুটিয়া উঠিল।

নেপথ্য হইতে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

কণ্ঠস্বরঃ আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলে কাথিয়াবাড় নামে একটি প্রদেশ আছে—যেখানে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ—অহিংসার পূর্ণাবতার জন্মগ্রহণ করেছেন—

এই সময় মানচিত্রের উপর কাথিয়াবাড় প্রদেশের সীমানা কৃষ্ণরেখার দ্বারা চিহ্নিত হইল।

কণ্ঠস্বরঃ —এই কাথিয়াবাড় প্রদেশ অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত—

মানচিত্রে রাজ্যগুলির সীমানা চিহ্নিত হইল।

কণ্ঠস্বরঃ —ছোট ছোট রাজা আছেন—এখনও তাঁরা প্রায় সাবেক পদ্ধতিতে রাজ্য-ভোগ করে চলেছেন। রাজারা আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকেন, পাত্র মিত্র সচিবেরা নিজেদের লাভের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করেন, মহাজনেরা অসহায় প্রজার অর্থ শোষণ করে—

ডিজল্‌ভ্।

মানচিত্র মিলাইয়া গিয়া একটি গিরি-প্রান্তর বিচিত্র দৃশ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। দৃশ্য বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত; পিছনে শুষ্ক নগ্ন গিরিমালা, সম্মুখে মরুভূমির মত পাদপ-বিরল শিলাবন্ধুর ভূমি—তাহার ভিতর দিয়া অসমতল কুটিল-রেখায় একটি পথ গিয়াছে।

কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ বলিয়া চলিয়াছে।

কণ্ঠস্বর ঃ —এই মরুদগ্ধ জলবিরল দেশে আমাদের কাহিনী আরম্ভ হল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেও এদেশে মাঝে মাঝে একজাতীয় বীর দস্যুর আবির্ভাব হত—যাদের রবিন্ হুডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেশের লোক এদের বল্‌ত—বার্‌বটিয়া।

কাট্।

অতঃপর কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ড চিত্রের সাহায্যে দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রদর্শিত হইল। কোথাও একটি উপলোদ্ধত ঝরণা গিরিসঙ্কটের ফাঁকে ফাঁকে লাফাইয়া পড়িতেছে, কোথাও পর্বতের শিখর হইতে নিম্নে উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র নগর বা গ্রাম দেখা যাইতেছে, কোথাও বা পার্বত্য-পথের একটি প্রপা বা জলসত্র দেখা যাইতেছে।

কণ্ঠস্বরঃ —যুগে যুগে দেশে দেশে প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্বলের মনুষ্যত্ব বিদ্রোহ করেছে—এই বীর দস্যুরা সেই বিদ্রোহের প্রতীক। যখনই ধর্মের গ্লানি হয়েছে, অন্যায়ের অভ্যুত্থান ঘটেছে, তখনই এ'রা আর্তের পরিত্রাণের জন্য আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে এ'দের সমাজদ্রোহী বলেই মনে হয়, কিন্তু যুগে যুগে এ'রাই সমাজকে রক্ষা করেছেন, দুর্বৃত্তের বিনাশ করেছেন, ন্যায়ের

শাসন প্রবর্তন করেছেন—কখনও দস্যুর বেশে, কখনও দিগ্বিজয়ীর বেশে, কখনও কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর বেশে—

কণ্ঠস্বর নীরব হইল।

ডিজল্ভ্।

বেলা অপরাহ্ণ।

নিকটতম নগর হইতে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে যেখানে সমতল ভূমি শেষ হইয়া পাহাড়ের চড়াই শুরু হইয়াছে, সেইখানে নির্জন গিরিপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি প্রপা বা জলসত্র। জলসংকটপূর্ণ মরুদেশের ইহা একটি বিশেষ অঙ্গ, সর্বত্র পথের ধারে দুই তিন ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া প্রপার ব্যবস্থা আছে; ইহা রাজকীয় ব্যবস্থা, আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। দেশের লোক ইহাকে বলে—পরপ্। সংস্কৃত প্রপা শব্দটি এই অপভ্রংশের মধ্যে এখনও বাঁচিয়া আছে। প্রতি প্রপার একটি করিয়া প্রপাপালিকা রমণী থাকে; পিপাসার্ত পথিক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া জলপান করিয়া আবার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

জলসত্র গৃহটি অতি ক্ষুদ্র; অসংস্কৃত-পাথরের টুকরা দিয়া নির্মিত একটি ছোট ঘর, সম্মুখে একটুখানি বারান্দা। বারান্দায় সারি সারি জলের কুম্ভ সাজানো আছে। চারিদিকে জংলী ঝোপঝাড়, পাথরের চ্যাঙড়া; অন্য কোনও লোকালয় নাই। পিছনে পোয়াটাক পথ দূরে পার্বত্য ঝরণার জল জমিয়া একটি জলাশয় তৈয়ার হইয়াছে, এই সরোবর হইতে জল আনিয়া প্রপাপালিকা জলসত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এই সত্রের প্রপাপালিকাটি বয়সে যুবতী; তাহার নাম চিন্তা। সে দেখিতে অতিশয় সুশ্রী, কিন্তু তাহার সুকুমার মুখখানি সর্বদাই যেন ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। সে বারান্দার কিনারায় বসিয়া টাকুতে সুতা কাটিতেছে আর উদাস কণ্ঠে গান গাহিতেছে। এ পথে অধিক পান্থের যাতায়াত নাই, তাই চিন্তা অধিকাংশ সময় তক্‌লি কাটিয়া ও গান গাহিয়া কাটায়। সঙ্গিহীন প্রপায় আর কিছু করিবার নাই। যে তরুণ শিকারীটি মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দেখা দিয়া তাহার প্রাণে বসন্তের হাওয়া বহাইয়া দিয়া যায়, সে আজ আসিবে কিনা চিন্তা জানে না, তবু তাহার চোখ দুটি থাকিয়া থাকিয়া পথের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে, কান দুটিও একটি পরিচিত অশ্বক্ষুরধ্বনির জন্য সতর্ক হইয়া আছে।

চিন্তাঃ

দরশ বিনে মোর নয়ন দুখায়
দূর পথের পানে চেয়ে থাকি
কভু ঝরে আঁখি, কভু শুকায়।
বুকের আঁধারে প্রদীপ-শিখা
কাঁপে আশার বায়ে
রহি শ্রবণ পাতি—
ঐ নূপুর বাজে বুঝি রাঙা পায়ে—
মরি হায় রে!
কোন বৈরাগী খঞ্জনি বাজায়ে যায় রে
মোর আশার দামিনী মেঘে লুকায়।

গানে বাধা পড়িল। পথের যে-প্রান্তটা পাহাড়ের দিকে উঠিয়াছে সেই দিকে হুম্-হুম্ শব্দ শুনিয়া চিন্তা চাহিয়া দেখিল, একটি ডুলি আসিতেছে। সামনে পিছনে

তিনজন করিয়া বাহক, দুই পাশে দুইজন বল্লমধারী রক্ষী। ডুলি জলসত্রের সম্মুখে পৌঁছিতেই ডুলির ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ রমণী-সুলভ কণ্ঠের আওয়াজ বাহির হইল—

আওয়াজ ঃ ওরে, থামা থামা—এটা 'পরপ' না?

বাহকেরা তৎক্ষণাৎ ডুলি নামাইল। ডুলির মুখ রৌদ্র ও ধূলি নিবারণের জন্য পর্দা দিয়া ঢাকা ছিল। এখন পর্দা সরাইয়া যিনি মুখ বাহির করিলেন, তিনি কিন্তু রমণী নয়, পুরুষ। প্রৌঢ় শেঠ গোকুলদাসের কণ্ঠস্বর রমণীর মত এবং চেহারা মর্কটের মত, কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাকে ভয় করিত। দেশে সুদখোর মহাজনের অভাব ছিল না কিন্তু এই গোকুলদাসের মত এমন বিবেকহীন হৃদয়হীন 'সাহুকার' আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ।

ঘটনাচক্রে চিন্তা গোকুলদাসকে চিনিত, তাই তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। গোকুলদাস তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

গোকুলদাস ঃ ওরে ঐ! পটের বিবির মত বসে আছিস—চোখে দেখতে পাস না? জল নিয়ে আয়।

চিন্তা কোনও ত্বরা দেখাইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া একটি লম্বা আকৃতির ঘটিতে জল ভরিয়া ডুলির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

গোকুলদাস গলা বাড়াইয়া নিজের দক্ষিণ করতল মুখের কাছে অঞ্জলি করিয়া ধরিলেন, চিন্তা তাহাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। জল পান করিতে করিতে গোকুল-দাস চক্ষু বাঁকাইয়া কয়েকবার চিন্তাকে দেখিলেন, তারপর জল পান শেষ হইলে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—

গোকুলদাস ঃ আরে এ মেয়েটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে! বীর গ্রামের সেই রাজপুতটার মেয়ে না?

ডুলির এ-পাশে যে বল্লমধারী রক্ষীটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার নাম কান্তিলাল; সে এতক্ষণ নির্লজ্জ লোলিহ চক্ষু দিয়া চিন্তার রূপ-যৌবন নিরীক্ষণ করিতেছিল, এখন প্রভুর প্রশ্নে গোঁফে একটা মোচড় দিয়া বলিল—

কান্তিলাল ঃ হ্যাঁ শেঠ, চৈৎ সিংয়ের মেয়েই বটে। দেখছো * না মুখখানা হাঁড়িপানা করে রয়েছে—একটু হাসছেও না।

ভৃত্যের এই রসিকতায় গোকুলদাস কৃষ্ণ-দন্ত বাহির করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিলেন।

গোকুলদাস ঃ হি হি হি—তুই চৈৎ সিংয়ের মেয়ে! শেষে পরপে কাজ করছিস?

চিন্তার চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল।

চিন্তা ঃ (চাপা স্বরে) হ্যাঁ। দেনার দায়ে তুমি আমার বাবার যথাসর্বস্ব নিলেম করে নিয়েছিলে, সেই অপমানে বাবা মারা গেলেন। তাই আজ আমি জলসত্রের দাসী।

গোকুলদাস ঃ তোর বাপ টাকা ধার নিয়েছিল কেন? আর এতই যদি মানী লোক, তোকে বিক্রি করে আমার টাকা ফেলে দিলেই পারত। তাহলে তো আর তোকে দাসী-বৃত্তি করতে হত না।

কান্তিলাল ঃ দাসীবৃত্তি! রানীর হালে থাকত শেঠজি। খরিদ্দার ওকে মাথায় করে রাখত।

চিন্তা তাহার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু পরপওয়ালীর অগ্নিদৃষ্টি কে গ্রাহ্য করে? কান্তিলাল গোঁফে চাড়া দিতে দিতে কদর্য-ভঙ্গীতে

* গুজরাত কাথিয়াবাড়ে আপনি বলিবার রীতি নাই—সকলে সকলকে নির্বিচারে তুমি বা তুই বলে।

হাসিতে লাগিল। চিন্তা আর কোনও কথা না বলিয়া নিবিড় ঘৃণাভরে ফিরিয়া চলিল।

ডুলির বাহকেরা এতক্ষণ ঘর্মাক্ত-দেহে দাঁড়াইয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে-ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন অনুনয়ের কণ্ঠে বলিল—

বাহকঃ বেন, আমাদের এক গণ্ডূষ জল দাও না—বড় তেষ্টা পেয়েছে।

কান্তিলাল শুনিতে পাইয়া লাফাইয়া উঠিল।

কান্তিলালঃ কি বল্‌লি—তেষ্টা পেয়েছে? নবাবের নাতি সব! উৎরাই-পথে ডুলি নামিয়েছিস তাতেই তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নে চল্‌—ডুলি কাঁধে নে—

গোকুলদাস ইতিমধ্যে ডুলির পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছেন; ভিতর হইতে তীক্ষ্মস্বর আসিল—

গোকুলদাস ঃ ডুলি তোল্‌—চাকা ডোববার আগে গদিতে পেঁছানো চাই—গদিতে অনেক কাজ—

চিন্তা দাঁড়াইয়া রহিল, ডুলি চলিয়া গেল। যতদূর দেখা গেল, ডুলির সহগামী কান্তিলাল ঘাড় ফিরাইয়া চিন্তার দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহারা একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলে চিন্তা হাতের ঘটি রাখিয়া পূর্বস্থানে আসিল; কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া থাকিবার পর একটা উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া টাকু তুলিয়া লইল। অস্ফুটস্বরে বলিল—

চিন্তা ঃ জানোয়ার সব! ঠগ—জোচ্চোর—ডাকাত—

কাট্‌।

পাহাড়ের ভিতর দিয়া পথের যে-অংশটা গিয়াছে সেই পথ দিয়া এক তরুণ অশ্বা-রোহী নামিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহীর নাম প্রতাপ সিং, তাহার পরিধানে যোধপুরী পায়জামা ও বড় বড় পকেট-যুক্ত ফৌজী-কুর্তা, পিঠে একনলা গাদা বন্দুক ঝুলিতেছে। প্রতাপ শিকারে বাহির হইয়াছিল; পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জঙ্গল আছে। তাহাতে হরিণ ময়ূর খরগোশ পাওয়া যায়। কিন্তু আজ শিকারীর ভাগ্যে কিছুই জোটে নাই; প্রতাপ রিক্তহস্তে ফিরিতেছিল।

ঘোড়াটি স্বচ্ছন্দ-মন্থরপদে চলিয়াছে। একস্থানে পথ দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এইখানে পেঁছিয়া প্রতাপ বল্‌গা টানিয়া ঘোড়া দাঁড় করাইল, চোখের উপর করতল রাখিয়া নিম্নে উপত্যকার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। এখান হইতে প্রতাপের বাসস্থান ক্ষুদ্র শহরটি ধোঁয়াটে বাতাবরণের ভিতর দিয়া দেখা যায়। এখনও অনেক দূর—ঘোড়ার পিঠে এক ঘণ্টার পথ।

এই সময়ে প্রতাপের পকেটের মধ্যে চিঁ চিঁ শব্দ হইল। প্রতাপ প্রথম একটু চম-কিত হইয়া তারপর মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। পকেটের উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া বলিল—

প্রতাপ ঃ আহা বেচারা! ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? আর একটু চুপ করে থাক্‌, আস্তানায় পেঁছুতে আর দেরি নেই। আমারও তেষ্টা পেয়েছে। মোতি, চল্‌ বেটা—

বল্‌গার ইঙ্গিত পাইয়া মোতি নিম্নাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। এবার তাহার গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত।

ওয়াইপ্‌।

চিন্তা পূর্ববৎ বসিয়া সুতা কাটিতেছে। দূর হইতে অশ্বক্ষুরধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চকিতে মুখ তুলিয়া চিন্তা উৎকর্ণভাবে শুনিল, ক্ষুরধ্বনি কাছে

আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে তাহার বিষণ্ণ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মোতির ক্ষুরধ্বনিতে হয়তো পরিচিত কোনও বিশিষ্টতা ছিল, চিন্তা চিনিতে পারিল কে আসিতেছে। সে দ্রুত বেশবাস সম্বরণপূর্বক মুখখানি বেশ গম্ভীর করিয়া আবার তক্‌লি কাটিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রতাপ প্রপার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাশ টানিল, ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফাইয়া অবতরণপূর্বক চিন্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, চিন্তা পরম মনোযোগের সহিত তক্‌লি কাটিয়া চলিয়াছে, পথিকসুজন যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেদিকে লক্ষ্যই নাই। প্রতাপের মুখে একটু চাপা হাসি খেলিয়া গেল, সে মোতির বল্‌গা ছাড়িয়া দিয়া চিন্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বন্দুকটা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিয়া গূঢ়-কৌতুকে তাহার সুতা-কাটা নিরীক্ষণ করিল, তারপর পরম সম্ভ্রম-ভরে হাত জোড় করিয়া বলিল—

প্রতাপঃ প্রপাপালিকে, পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত পথিক একটু জল পেতে পারে কি?

চোখাচোখি হইলেই আর হাসি চাপা যাইবে না, তাই চিন্তা চোখ না তুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুতা কাটিতে কাটিতে বলিল—

চিন্তাঃ পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত পথিক, পিপাসা নিবারণের আগে এইখানে বসে খানিক বিশ্রাম কর।

এই বলিয়া সে একটু সরিয়া বসিল, যেন ইঙ্গিতে নিজের পাশে প্রতাপের বসিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিল। প্রতাপ দিরুক্তি না করিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল, মহা আড়ম্বরে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল—

প্রতাপঃ ভদ্রে, তোমার সুমধুর ব্যবহারে আমার ক্লান্তি আপনি দূর হয়েছে—তৃষ্ণাও আর নেই। তোমার অধর-সুধা পান করে—

চিন্তা ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহার পানে তাকাইল।

প্রতাপঃ অর্থাৎ তোমার অধরক্ষরিত বাক্যসুধা পান করে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, জলের আর প্রয়োজন নেই।

চিন্তা ঃ প্রয়োজন আছে বৈকি। মাথায় জল না ঢাললে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হবে না।

উভয়ের মিলিত উচ্চহাস্যে অভিনয়ের মুখোস খসিয়া পড়িল। প্রতাপ হাত ধরিয়া চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইল, তারপর গাঢ়স্বরে বলিল—

প্রতাপঃ চিন্তা, এস বিয়ে করি—আর ভাল লাগছে না। শিকারের ছুতোয় এসে দু-দণ্ডের জন্যে চোখে দেখা—একি ভাল লাগে? বল—একটিবার মুখ ফুটে বল, কালই আমি তোমাকে ডুলিতে তুলে ঘরে নিয়ে যাব।

চিন্তার চোখ দুটি চাপা বাষ্পোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই প্রস্তাবটিই সে অনেকদিন হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, আবার মনের কোণে একটু আশঙ্কাও ছিল। সে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

চিন্তাঃ তুমি গণ্যমান্য লোক—পরপের মেয়েকে বিয়ে করবে?

প্রতাপঃ আমি রাজপুত, তুমি রাজপুতের মেয়ে—এর বেশী আর কি চাই? আমি মা'কে বলেছি, তিনি খুব খুশি হয়ে রাজী হয়েছেন।

চিন্তাঃ লোকে কিন্তু ছি ছি করবে।

প্রতাপ ঃ করুক—লোকের কথায় কী আসে যায়? তোমার মন আছে কিনা তাই বল।—চিন্তা, আমার ঘরে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না?

চিন্তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কত ইচ্ছা করে তাহা সে কি করিয়া বুঝাইবে?

চিন্তা ঃ করে—

প্রতাপ আবেগভরে চিন্তার স্কন্ধে বাহু দিয়া জড়াইয়া তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিল—

প্রতাপ ঃ ব্যস্—আর কিছুই চাই না—

প্রতাপের পকেটের মধ্যে—সম্ভবত দুই জনের দেহের চাপ পাইয়া—অতি ক্ষীণ চিঁ চিঁ শব্দ উত্থিত হইল। প্রতাপের কণ্ঠোদ্গত আনন্দ-বিহ্বলতা আর শেষ হইতে পাইল না। সে থামিয়া গেল; তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

প্রতাপ ঃ আরে—ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই নাও তোমার জন্যে সওগাত এনেছি।

সুপরিসর পকেট হইতে প্রতাপ সন্তর্পণে দুইটি কপোত-শিশু বাহির করিল। কৃষ্ণবর্ণ বন-কপোতের শাবক, এখনও ভাল করিয়া পালক গজায় নাই; চিন্তা সাগ্রহে তাহাদের হাতে তুলিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—

চিন্তা ঃ কী সুন্দর পায়রার ছানা, আমি পুষব।—কোথায় পেলে এদের?

প্রতাপ ঃ কোথায় আবার—গাছের মগডালে বাসার মধ্যে বসেছিল, তুলে নিয়ে এলাম।

চিন্তা ঃ অ্যাঁ—মায়ের বাছাদের বাসা থেকে কেড়ে নিয়ে এলে?

প্রতাপ ঃ কি করি? দেখলাম একটা বাজপাখি ওদের বাসা ঘিরে উড়ছে, ওদের মা-বাপ প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। শেষে বাজের পেটে যাবে, তাই পকেটে করে নিয়ে এসেছি।

চিন্তা ছানা দুটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল। অত্যাচারী পৃথিবীর উপর তাহার অভিমান স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

চিন্তা ঃ কি হিংস্র নিষ্ঠুর সবাই! ডাকাত—ডাকাত সব।

প্রতাপ ঃ সে কি, আমিও ডাকাত হলাম?

চিন্তা ঃ হ্যাঁ, তুমিও ডাকাত।

প্রতাপ ঈষৎ হাসিল।

প্রতাপ ঃ আমি যদি ডাকাত হতাম চিন্তা, তাহলে আগে তোমাকে হরণ করে নিয়ে যেতাম।

উৎফুল্লনেত্রে চিন্তা প্রতাপের পানে চাহিল।

চিন্তা ঃ নিয়ে গেলে না কেন? আমি তোমাকে আঁচড়ে দিতাম, কামড়ে দিতাম, তারপর যেতাম—

চিন্তা প্রণয়ভঙ্গুরে হাসিল। প্রতাপ আঙুল দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া চোখের মধ্যে চাহিল।

প্রতাপ ঃ রাজপুতের মেয়ে, হরণ করে নিয়ে না গেলে বিয়ে করেও সুখ হয় না। বেশ, তাই হবে। কাল লোকলস্কর নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে যাব।—কেমন, তাহলে মন ভরবে তো?

দু'জনে উদ্বেল আনন্দভরে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ডিজল্ভ্।

প্রায় সায়ংকাল। অবসন্ন সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা পশ্চিম দিঙ্মণ্ডলকে অরুণায়িত করিয়াছে।

শহরের এক অংশ; বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন। এইখানে প্রতাপের প্রাচীন পৈতৃক বাসভবন। সম্মুখে একটি সিংদরজা আছে, ভিতরে খানিকটা মুক্ত স্থান। বাড়িটি আকারে বৃহৎ, কিন্তু বহুদিন সংস্কারের অভাবে কিছু জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির সাবেক ভৃত্য লছমন উঠানের চিকু গাছতলায় শয়ন করিয়া বোধকরি ঘুমাইতেছিল; সে বৃদ্ধ হইয়াছে, ঘুমাইবার সময়-অসময় নাই। প্রতাপের বিধবা মাতা অস্থিরভাবে বারবার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেছেন এবং আবার ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি ঈষৎ স্থূল কলেবরা; দেহের মাংস অকালে লোল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র অতিশয় দুর্বল, মনটিও উদ্বেগপ্রবণ, সহজেই উৎ-কণ্ঠিত হইয়া ওঠে। বিশেষত আজ তাঁহার উৎকণ্ঠার গুরুতর কারণ ঘটিয়াছে।

তিনি বারান্দায় আসিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকিলেন—

মা: লছমনভাই, ও লছমনভাই, এই ভর-সন্ধেবেলা তুমি ঘুমুলে?

লছমন চেটাইয়ের উপর উঠিয়া বসিল।

লছমন : ঘুমোব কেন বাঈ, ঘুমোব কেন—একটু গড়াচ্ছিলাম।

মা: সূয্যি পাটে বসতে চলল, এখনও যে প্রতাপ ফিরল না লছমনভাই।

লছমন চিকু তলা হইতে উঠিয়া আসিল।

লছমন: ফিরবে বৈকি বাঈ, ফিরবে বৈকি। তোমার জোয়ান ছেলে শিকারে বেরিয়েছে, ফিরবে বৈকি।—সেকালে কর্তারা শিকারে বেরুতো, তা রাত দুপুরের আগে কেউ ঘরে ফিরতো না। কথায় বলে শিক্‌রে বাজ আর প্যাঁচা, দুইই শিকারী—কেউ দিনে কেউ রাত্তিরে।

মা কানের কাছে হাত তুলিয়া উৎকর্ণভাবে কিছুক্ষণ শুনিলেন।

মা: ঐ বুঝি প্রতাপ এল, মোতির ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি—

লছমন : আসবে বৈকি বাঈ, আসবে বৈকি।

কাট্‌।

বাহির হইতে প্রতাপের সিংদরজার দৃশ্য। সিংদরজার থামে একটুকরা কাগজ লটকানো রহিয়াছে।

প্রতাপকে পিঠে লইয়া মোতি হাঁটা-পায়ে আসিয়া সিংদরজায় প্রবেশ করিল; এই সময় কাগজের টুকরার উপর প্রতাপের নজর পড়িলে সে ঘোড়া থামাইয়া হাত বাড়াইয়া কাগজের টুকরা তুলিয়া লইল; ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া কাগজের লেখা পড়িতে লাগিল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মা প্রতাপকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি দু'হাতে বুক চাপিয়া উদ্বেগভরা মুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাগজের লেখা পাঠ করিয়া প্রতাপ তাচ্ছিল্যভরে সেটা মুঠির মধ্যে গোলা পাকা-ইয়া লইল; তারপর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া লাফাইয়া মোতির পিঠ হইতে নামিয়া লছমনের হাতে রাশ ফেলিয়া দিল।

প্রতাপ: লছমনভাই, মোতিকে দানা-পানি দাও।

লছমন : দেব বৈকি ভাই, দেব বৈকি। আজ বুঝি শিকার কিছু পেলে না?

প্রতাপ : পেয়েছি—পরে বলব।

হাসিয়া পিঠ হইতে বন্দুক নামাইতে নামাইতে প্রতাপ বারান্দায় গিয়া উঠিল। বারান্দার দেওয়ালে পাশাপাশি দুটি খোঁটা পোঁতা ছিল, তাহার উপর বন্দুক রাখিয়া

দিয়া প্রতাপ মা'র দিকে ফিরিল।

মাঃ প্রতাপ, চিঠি পড়লি?

প্রতাপ ঃ চিঠি? ও—শেঠ গোকুলদাসের রোকা! ও কিছু নয়।

মাঃ না না বাবা, তুই গোকুলদাসের চিঠি তুচ্ছ করিস নে। গোকুলদাস বড় ভয়ানক সাহুকার—কত লোকের সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই—

প্রতাপ এক হাত দিয়া মায়ের স্কন্ধ জড়াইয়া লইল।

প্রতাপঃ তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা? বাবা তো মাত্র পাঁচশো টাকা ধার করেছিলেন—যখন ইচ্ছে শোধ করে দেব।

মা ঃ ওরে না না, গোকুলদাস নিজে এসে চিঠি টাঙিয়ে গেছে, আর শাসিয়ে গেছে সুদে-আসলে তার দশ হাজার টাকা পাওনা হয়েছে; আজই নাকি মেয়াদের শেষ দিন; যদি শোধ না হয়, তোর জমি-জমা বাড়ি-ঘর সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে।

তিনি আবার নিজের স্পন্দমান বুক চাপিয়া ধরিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—

প্রতাপ ঃ সে কী! পাঁচ শো টাকা দশ হাজার টাকা হবে কি করে?

লছমন তখনও মোতিকে আস্তাবলে লইয়া যায় নাই, অঙ্গনে দাঁড়াইয়া মাতা-পুত্রের কথা শুনিতেছিল; সে উত্তর দিল—

লছমন ঃ হয় বৈকি ভাই, হয় বৈকি। মহাজনের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে কিনা।

প্রতাপঃ (হতবুদ্ধি ভাবে) মহাজনের সুদ—হ্যাঁ—কিন্তু এ যে অসম্ভব। দশ হাজার টাকা...আমি এখনই যাচ্ছি গোকুলদাসের কাছে—নিশ্চয় তোমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে—

প্রতাপ ত্বরিতে গিয়া আবার ঘোড়ার পিঠে উঠিল, ঘোড়ার মুখ বাহিরের দিকে ফিরাইয়া পিছু ফিরিয়া বলিল—

প্রতাপ ঃ মা, তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে বাহির হইয়া গেল।

ওয়াইপ্।

প্রাচীর-বেষ্টিত চতুষ্কোণ-ভূমির উপর শেঠ গোকুলদাসের দ্বিতল প্রাসাদ। সম্মুখে লৌহকবাটযুক্ত সিংদরজা; দুইজন তক্মাধারী সান্ত্রী সেখানে পাহারা দিতেছে।

বাড়ির দ্বিতলের একটি জানালা খোলা রহিয়াছে। জানালার কবাট লৌহময় কিন্তু গরাদ নাই; সুতরাং এই পথে আমরা গোকুলদাসের তোশাখানায় প্রবেশ করিতে পারি।

তোশাখানা ঘরটি ঈষদন্ধকার; একটি মাত্র দরজা ও একটি জানালা আছে। দরজার দুই পাশে দুটি গাদা পিস্তল দেয়ালে আটকানো রহিয়াছে। গোকুলদাস ধর্মে জৈন কিন্তু নিজের ঐশ্বর্য রক্ষার জন্য তিনি যে প্রাণীহত্যায় পরাঙ্মুখ নয়, পিস্তল দুটি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

ঘরের চারিটি দেয়াল জুড়িয়া সারি সারি লোহার সিন্দুক। ঘরের মাঝখানে মোটা গদির উপর হিসাবের বহি খাতা ও একটি কাঠের হাত-বাক্স।

গোকুলদাস ঘরেই আছেন। প্রকাণ্ড চাবির থোলো হইতে একটি চাবি বাছিয়া লইয়া তিনি সিন্দুকের ছিদ্রমুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তারপর সতর্কভাবে দ্বারের দিকে একবার তাকাইয়া চাবি ঘুরাইলেন।

সিন্দুকের কবাট খুলিলে দেখা গেল, তাহার থাকে থাকে অসংখ্য সোনা ও জহরতের গহনা সাজানো রহিয়াছে, তাছাড়া মোটা মোটা মোহরের থলি ও মূল্যবান দলিলপত্র

আছে। গোকুলদাস সন্তর্পণে একটি জড়োয়া-হার তুলিয়া লইয়া সতৃষ্ণভাবে সেটি দেখিতে লাগিলেন। কাবুলী মটরের মত কয়েকটা হীরা স্বল্পালোকেও ঝল্ঝল্ করিতে লাগিল। গোকুলদাসের কণ্ঠ হইতে একটি লুব্ধ ঘুৎকার বাহির হইল।

এই সময় নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া একটি যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল। চম্পা গোকুলদাসের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। গোলগাল গড়ন, মিষ্ট ছেলেমানুষী ভরা মুখ, সে পা টিপিয়া টিপিয়া গোকুলদাসের পিছনে গিয়া সিন্দুকের মধ্যে উঁকি মারিল; যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুখ দিয়া হর্ষোল্লাসসূচক চিৎকার বাহির হইল। স্বামীর সিন্দুকের অভ্যন্তরভাগ সে আগে কখনও দেখে নাই।

পলকমধ্যে গোকুলদাস সিন্দুকের কবাট বন্ধ করিয়া সিন্দুকে পিঠ দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যেন কোণ-নেওয়া বিড়াল। কিন্তু চম্পাকে দেখিয়া তাঁহার ভয় দূর হইল।

গোকুলদাসঃ ও চম্পা! আমি ভেবেছিলাম—

চম্পাঃ (হাসিয়া) ডাকাত?

হীরার হারটি গোকুলদাসের হাতেই রহিয়া গিয়াছিল, এখন তিনি আবার সিন্দুক খুলিয়া উহা ভিতরে রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চম্পাঃ ওটা কি—দেখি দেখি! উঃ, কী সুন্দর হার!

চম্পা হারটি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, গোকুলদাস তাড়াতাড়ি উহা সরাইয়া লইলেন।

গোকুলদাসঃ আরে না না, এতে হাত দিও না।

চম্পাঃ কেন দেব না? আমি তোমার বৈরী* কি না? তৃতীয় পক্ষের বৈরী কি বৈরী নয়? তবে আমি তোমার জিনিসে হাত দেব না কেন?

গোকুলদাস হার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া চাবির গোছা কোমরে ঝুলাইলেন।

গোকুলদাসঃ আহা, বুঝলে না চম্পা, ওটা এখনও আমার হয়নি—বন্ধকী মাল। তবে একবার যখন আমার সিন্দুকে ঢুকেছে তখন আর বেরুচ্ছে না।

গোকুলদাস হুঁ হুঁ করিয়া হাসিলেন। চম্পা একটু বিমনাভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

চম্পাঃ এই সিন্দুকগুলোকে তুমি বড্ড ভালবাস—না?

গোকুলদাস উত্তরে কেবল আনুনাসিক হাসিলেন।

চম্পাঃ এর সিকির সিকি যদি বৌদের ভালবাসতে তাহলে তারা হয়তো সুখী হত।

গোকুলদাস ক্ষুদ্র ইন্দুর-চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন।

গোকুলদাসঃ কেন, আমার সঙ্গে বিয়ে করে তুমি সুখী হওনি?

চম্পা মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চম্পাঃ ওমা, হইনি আবার। তোমার মত মানুষ দেশে আর কটা আছে? দেশসুদ্ধ লোক তোমার ভয়ে কাঁপে, স্বয়ং রাজা তোমার খাতক! তোমাকে বিয়ে করে সুখী হইনি এমন কথা কে বলে!—নাও চল এখন, খাবার বেড়ে রেখে এসেছি—এতক্ষণে বোধ হয় সূর্য ডুবল।**

এই সময় বাহিরের জানালার নীচে হইতে গণ্ডগোলের আওয়াজ আসিল। চম্পা দ্রুত জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, গোকুলদাস তাহার পশ্চাতে গিয়া সতর্কভাবে বাহিরে উঁকি মারিলেন।

* সংসার-প্রাজ্ঞ গুজরাতিরা স্ত্রীকে 'বৈরী' বলিয়া থাকেন।

** জৈনগণ সূর্যাস্তের পূর্বেই নৈশ আহার সমাধা করেন।

নীচে সিংদরজার বাহিরে অশ্বারূঢ় প্রতাপের সহিত দ্বাররক্ষী সান্ত্রীদের বচসা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সান্ত্রীদ্বয় সিংদরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতাপকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।

প্রতাপঃ শেঠের সঙ্গে এখনি আমার দেখা না করলেই নয়—

সান্ত্রীঃ শেঠ এ সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না। যাও—কাল সকালে এস।

প্রতাপঃ কিন্তু আজ আমাকে দেখা করতেই হবে—বড় জরুরী দরকার—

চম্পা জানালায় গোকুলদাসের দিকে ফিরিল।

চম্পাঃ হাঁগা, কে ও নওজোয়ান? ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কেন?

গোকুলদাসঃ চুপ—আস্তে। ও একটা রাজপুত—আমার খাতক। বোধ হয় টাকা শোধ দিতে এসেছে—

চম্পাঃ তাহলে?

গোকুলদাসঃ চুপ—তুমি ওসব বুঝবে না।

নীচে সান্ত্রীরা লোহার কবাট বন্ধ করিয়া দিতেছে।

প্রতাপঃ আজ কিছুতেই দেখা হবে না?

সান্ত্রীঃ না, আজ রাজা এলেও দেখা হবে না?

ক্রুদ্ধ-হতাশ-চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিতেই জানালার উপর প্রতাপের দৃষ্টি পড়িল। গোকুলদাস ঝটিতি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রতাপ কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ক্রোধতপ্ত একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

পরদিন প্রভাত। পাখিরা কলরব করিতেছে, দূরে মন্দির হইতে প্রভাত-আরতির শঙ্খঘণ্টারব আসিতেছে।

প্রতাপ তাহার শয়নকক্ষে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার পালঙ্কের শিয়রে দুইটি পট দেয়ালে টাঙানো রহিয়াছে; একটি রাণা প্রতাপ সিংহের, অপরটি ছত্রপতি শিবাজীর।

অঙ্গনের দিকের জানালা দিয়া সূর্যের নবারুণ আলোক ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, সহসা কয়েকজনের কলহ-রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রতাপ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল, তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে শয্যাপাশে উঠিয়া বসিল। ঘুমের জড়তা তখনও ভাল করিয়া ভাঙে নাই—

অকস্মাৎ বারান্দা হইতে তাহার মাতার মর্মান্তিক কাতরোক্তি কানে আসিল।

মাঃ হা রণছোড়জি, এ কি করলে—এ কি করলে—

প্রতাপ এক লাফে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জানালা দিয়া প্রাঙ্গণের সমস্তটাই দেখা যাইতেছে। শেঠ গোকুলদাস এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহার সঙ্গে জন দশ বারো লাঠিয়াল অনুচর। একজন অনুচর মোতির লাগাম ধরিয়া বাহিরের দিকে লইয়া যাইতেছে এবং বৃদ্ধ লছমন তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

গোকুলদাসঃ যাও—নিয়ে যাও আমার আস্তাবলে—

লছমনঃ না না—ছেড়ে দাও মোতিকে—আমার মালিকের ঘোড়া আমি নিয়ে যেতে দেব না—

যে লোকটা মোতিকে লইয়া যাইতেছিল সে লছমনকে সজোরে একটা ঠেলা দিল, লছমন ছিটকাইয়া গিয়া চিকু গাছের তলায় পড়িল।

জানালায় প্রতাপের মা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—

মাঃ ওরে প্রতাপ—কি হবে বাবা—

ক্রোধে বিস্ময়ে প্রতাপের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, সে এক হাতে মা'কে সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

বাহিরের বারান্দায় যেখানে বন্দুকটা দেওয়ালে টাঙানো ছিল, ঠিক সেই স্থানে গোকুলদাসের অনুচর কান্তিলাল দাঁড়াইয়া ছিল, প্রতাপ তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া গেল। গোকুলদাসের সম্মুখীন হইয়া কঠোর স্বরে কহিল—

প্রতাপঃ কি হয়েছে? কি চাও তুমি আমার বাড়িতে?

গোকুলদাসঃ (ব্যঙ্গভরে) ওহে, ঘুম ভেঙেছে এতক্ষণে? যারা মহাজনের টাকা ধারে তাদের এত ঘুম ভাল নয়। এখন গা তোলো—আমার বাড়ি ছেড়ে দাও।

প্রতাপঃ তোমার বাড়ি!

গোকুলদাসঃ হ্যাঁ, আমার বাড়ি। তোমার বাপ টাকা ধার করেছিল, কাল তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। আজ আমি সমস্ত সম্পত্তি দখল করেছি; এ বাড়ি এখন আমার।

প্রতাপঃ আদালতের হুকুম এনেছ?

গোকুলদাস মিহি সুরে হাস্য করিলেন।

গোকুলদাসঃ আদালতের হুকুম আমার দরকার নেই। আমার হক, আমি দখল করেছি। তোমার যদি কোনও নালিশ থাকে তুমি আদালতে যাও।

প্রতাপ এতক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া কথা বলিতেছিল, এখন আর পারিল না। তাহার পায়ের কাছে একটা চেলাকাঠ পড়িয়াছিল, সে তাহাই তুলিয়া লইল।

প্রতাপঃ বটে! আমার সম্পত্তি তুমি গায়ের জোরে দখল করবে! পাজি বেনিয়ার বাচ্চা, বেরোও আমার বাড়ি থেকে, নইলে—

প্রতাপ হিংস্রভাবে চেলাকাঠ গোকুলদাসের মাথার উপর তুলিল, গোকুলদাস সভয়ে মস্তক রক্ষা করিবার জন্য হাত তুলিলেন।

এই সময় বারান্দা হইতে কান্তিলালের কণ্ঠস্বর আসিল—

কান্তিলালঃ খবরদার!

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কান্তিলাল প্রতাপের বন্দুক লইয়া তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়া আছে। গোকুলদাস এবার নির্ভয় হইয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন।

কান্তিলালঃ লাঠি ফেলে দাও—

প্রতাপ নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতে লাগিল কিন্তু হাতের লাঠি ফেলিল না।

কান্তিলালঃ লাঠি ফেলে দাও—নইলে—

বন্দুকের ঘোড়া টানার কট্ করিয়া শব্দ হইল। এই সময় আলুথালু বেশে প্রতাপের মা ভিতর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার চেহারা দেখিলেই বোঝা যায় তাঁহার মানসিক বিপন্নতা চরমসীমায় পোঁছিয়াছে।

মাঃ প্রতাপ—ওরে প্রতাপ, লাঠি ফেলে দে বাবা। আয়, আমার কাছে আয়—

প্রতাপ দেখিল, মা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া টলিতেছেন, এখনি পড়িয়া যাইবেন। সে হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া মা'কে ধরিয়া ফেলিল।

প্রতাপঃ মা—! কি হয়েছে মা?

মাঃ কিছু না বাবা, বুকটা বড় ধড়ফড় করছে! চল্ বাবা, আমরা চলে যাই—

গোকুলদাসঃ হ্যাঁ, ভাল চাও তো ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে যাও—আমার কাছে চালাকি চলবে না।

মাঃ চল্ বাবা—এখান থেকে আমায় নিয়ে চল্—

মাতা-পুত্র হাত ধরাধরি করিয়া এক পা অগ্রসর হইলেন, তারপর মায়ের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল।

মাঃ উঃ—আমার স্বামীর ভিটে—শ্বশুরের ভিটে—

চাপা কান্নার দুর্নিবার উচ্ছ্বাস তাঁহার কণ্ঠে আসিয়া আট্‌কাইয়া গেল, শিথিল অঙ্গে ধীরে ধীরে তিনি মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। প্রতাপ সভয়ে ডাকিল—

প্রতাপঃ মা—

মা সাড়া দিলেন না। প্রতাপ নতজানু হইয়া তাঁহার বুকে কান রাখিয়া শুনিল, বুকের শেষ দুর্বল স্পন্দন ধীরে ধীরে থামিয়া যাইতেছে।

মুখ তুলিয়া প্রতাপ পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—

প্রতাপঃ মা—! মা—! মা—!

ডিজল্‌ভ।

রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

শ্মশানে চিতার উপর প্রতাপের মাতার দেহাবশেষ পুড়িতেছে। অদূরে প্রতাপ একটি শিলাখণ্ডের উপর করলগ্নকপোলে বসিয়া একদৃষ্টে চিতার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কয়েকজন শ্মশানসঙ্গী প্রতিবেশী আশেপাশে বসিয়া আছে—সকলেই নীবব। তাহাদের মুখের উপর চিতার অস্থির আলো খেলা করিতেছে।

প্রতাপের মুখ পাথরের মত নিশ্চল, আলো-ছায়ার চঞ্চল খেলা তাহার মুখে কোনও ভাবান্তর আনিতে পারিতেছে না।

নিকটবর্তী গাছের ডালে একটা শকুন কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। সকলে মুখ তুলিয়া সেইদিকে চাহিল, কিন্তু প্রতাপ মুখ তুলিল না, যেমন অপলক চক্ষে চিতার পানে চাহিয়া ছিল, তেমনি চাহিয়া রহিল।

কাট্।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু শ্মশান হইতে বহু দূরে।

জলসত্রের ক্ষুদ্র কক্ষে বাতায়ন দিয়া এক ফালি চাঁদের আলো মেঝের উপর পড়িয়াছে। ভিতর হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ, ঘরের কোণে স্তিমিত দীপশিখা জ্বলিতেছে। মেঝের উপর উপুড়-করা একটি বেতের টুক্‌রির ভিতর হইতে মাঝে মাঝে সুপ্তোত্থিত পক্ষি-শাবকের তন্দ্রাক্ষীণ কিচিমিচি শব্দ আসিতেছে।

কাঠের একটি সুপরিসর হিচ্‌কা বা দোলনার উপর চিন্তা বসিয়া আছে। এই দোলনাই তাহার শয্যা। আজ চিন্তার চোখে নিদ্রা নাই; প্রতাপ আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। কেন আসিল না? তবে কি তাহার অনুরাগ শুধু মুখের কথা? দুদণ্ডের চিত্ত-বিনোদন? ভাবিয়া ভাবিয়া চিন্তা কূলকিনারা পায় নাই; মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় গড়াইয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা মধ্যরাত্রের নিথর নিষ্ফলতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেন সে আসিল না? আজ প্রতাপ আসিবে বলিয়া চিন্তা বন্যকুসুম তুলিয়া দুটি মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল—সে-মালা চিন্তা কাহার গলায় দিবে?

ব্যথাবিষণ্ণ সুরে সে নিজমনেই গাহিতেছিল—

চিন্তাঃ

আমার মনে যে-ফুল ফুটেছিল
আকাশের সূর্য তারে শুকিয়ে দিল রে।
ধুলাতে পড়ল ঝরে সে
বাতাসের নিদয় পরশে
বুকে মোর কাঁটার বেদনা
বুক দুখিয়ে দিল রে।
আমার মনে চাঁদ—
আমার মনে চাঁদ যে উঠেছিল
ও তারে প্রলয় মেঘে লুকিয়ে দিল রে।
মরমের মৌন অতলে
নিরাশার ঢেউ যে উথলে—
জীবনের পাওনা-দেনা মোর
কে চুকিয়ে দিল রে।

গুনগুন করিয়া গাহিতে গাহিতে চিন্তা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল, টুক্‌রি তুলিয়া কপোতশিশু দুটিকে দেখিল, জানালায় দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না নিষিক্ত বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার সংশয়পীড়িত মন শান্ত হইল না।

কাট্।

শ্মশান। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে; প্রতাপ ও তাহার সঙ্গীগণ জল ঢালিয়া চিতা নিভাইতেছে।

চিতা ধৌত করিয়া সকলে চিতার উপর এক মুষ্টি করিয়া ফুল ফেলিয়া দেল, তারপর সরিয়া আসিয়া একত্র দাঁড়াইল। সঙ্গীদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রতাপ বলিল—

প্রতাপঃ অম্বুভাই, তোমরা আমার দুর্দিনের বন্ধু। আমি আর তোমাদের কী বলব, মা স্বর্গ থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। শ্মশানের কাজ তো শেষ হয়েছে, এবার তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

অম্বুভাইঃ আর—তুমি?

প্রতাপঃ আমি আর কোথায় যাব অম্বুভাই, আমার তো যাবার স্থান নেই।

অম্বুভাইঃ ও কথা বোলো না প্রতাপ। আমার কুঁড়েঘর যতদিন আছে ততদিন তোমারও মাথা গুঁজবার স্থান আছে। চল, আজ রাত্রিটা বিশ্রাম কর, তারপর কাল যা হয় স্থির করা যাবে।

প্রতাপঃ আমার কর্তব্য আমি স্থির করে নিয়েছি। তোমরা ঘরে ফিরে যাও অম্বুভাই। আমি অন্য পথে যাব।

অম্বুভাইঃ অন্য পথে? কোথায়? কোন্ পথে?

প্রতাপঃ আমি যেপথে যাব সে পথে আজ তোমরা যেতে পারবে না, তাই তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। হয়তো আবার কোনোদিন দেখা হবে।—বিদায় বন্ধু, বিদায় ভাই সব। নমস্কার, তোমাদের নমস্কার।

প্রতাপ যুক্তকরে সকলকে বিদায়-নমস্কার করিল। সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

ডিজল্‌ভ্।

শেঠ গোকুলদাসের প্রাসাদ মধ্যরাত্রির চন্দ্রালোকে ঘুমাইতেছে। কিংবা হয়তো ঘুমায় নাই। দ্বিতলে তোশাখানার জানালাটি খোলা আছে এবং সেখান হইতে মৃদু প্রদীপের আলোক নির্গত হইতেছে, মনে হয় প্রাসাদ ঘুমাইলেও তাহার একটি চক্ষু জাগিয়া আছে।

সিংদরজার সম্মুখে সশস্ত্র সান্ত্রিগণ কিন্তু দুই চক্ষু মুদিত করিয়াই ঘুমাইতেছে। না ঘুমাইবার কোনও কারণ নাই, শেঠ গোকুলদাসের দেউড়িতে চোর ঢুকিবে এতবড় সাহসী চোর দেশে নাই।

সিংদরজার দুইপাশে দীর্ঘ প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের দেয়াল যেখানে মোড় ঘুরিয়া পিছন দিকে গিয়াছে, সেই কোণের কাছে সহসা একটি মাথা উঁকি মারিল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল—প্রতাপ। সে শ্মশানে সঙ্গীদের বিদায় দিয়া সটান এখানে আসিয়াছে। গোকুলদাসের সহিত তাহার হিসাব-নিকাশ এখনও শেষ হয় নাই।

প্রতাপ দেয়ালের কোণ হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল প্রহরীরা ঘুমাইতেছে। তখন সে দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া পিছন দিকে ফিরিয়া চলিল। বাড়ির পশ্চাদ্দিকে যেখানে পাঁচিল শেষ হইয়াছে সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রতাপ দেখিল পাঁচিলের গায়ে একটি দরজা রহিয়াছে; ইহা চাকর-বাকরদের ব্যবহার্য খিড়কি দরজা।

খিড়কি দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কিন্তু পাঁচিল বেশী উঁচু নয়। প্রতাপ লাফাইয়া পাঁচিলের কিনারা ধরিয়া ফেলিল, তারপর বাহুর বলে শরীরকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া পাঁচিলের উপর উঠিয়া বসিল। ভিতরে কেহ কোথাও নাই, শষ্পাকীর্ণ ভূমির উপর শিশিরকণা ঝিকমিক করিতেছে। বাড়িটি সবুজ জলে ভাসমান এক চাপ বরফের মত দেখাইতেছে। পিছনের দেয়াল ঘেঁষিয়া এক সারি ঘর, ইহা গোকুলদাসের আস্তাবল ও গোহাল।

প্রতাপ নিঃশব্দে নিজেকে পাঁচিল হইতে ভিতর দিকে নামাইয়া দিল। খিড়কির দরজা কেবল অর্গলবদ্ধ ছিল, প্রথমেই সেটি খুলিয়া দিল। প্রয়োজন হইলে পলায়নের রাস্তা খোলা চাই।

তারপর সে সতর্কপদে পিছনের ঘরগুলির দিকে চলিল। মানুষ কেহ নাই; একটি ঘরে কয়েকটি গরু রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি ঘর পার হইবার পর একটি ঘরের সম্মুখীন হইতেই ভিতরের অন্ধকার হইতে ঘোড়ার মৃদু হর্ষধ্বনি আসিল। প্রতাপ চিনিল—মোতি।

ঘরের সম্মুখে দ্বার নাই, কেবল দুইটি বাঁশ পাশাপাশি অর্গল রচনা করিয়াছে। প্রতাপ বাঁশ দুটি সন্তর্পণে সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আস্তাবলের মধ্যে মোতি প্রভুকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতাপ তাহার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিল, তারপর দেয়ালে-টাঙানো লাগাম লইয়া তাহার মুখে পরাইল। জিনের পরিবর্তে একটি কম্বল তাহার পিঠে বাঁধিল, লাগাম ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিল।

এই সব ব্যাপারে একটু শব্দ হইল বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে কেহ জাগিল না। প্রতাপ মোতিকে লইয়া খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইল; কিছুদূরে একটা গাছের তলায় লইয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল—

প্রতাপঃ মোতি, এইখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক্। যতক্ষণ না ফিরে আসি, শব্দ করিস নি।

মোতি সম্মতিসূচক শব্দ করিল। তখন প্রতাপ তাহার গলা চাপড়াইয়া আবার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। এইবার আসল কাজ।

প্রতাপ দুই হাত ধীরে ধীরে ঘষিতে ঘষিতে ঊর্ধ্বে প্রাসাদের দিকে চাহিল।

কাট্।

তোশাখানার গদির উপর বসিয়া গোকুলদাস মোহর গণিতেছিলেন। তাঁহার হাতবাক্সের পিঠের উপর সারবন্দী সিপাহীর মত থাকে থাকে মোহরের স্তম্ভ গড়িয়া উঠিতেছিল। চম্পা গদির এক পাশে অর্ধ-শয়ান অবস্থায় চিবুকের নিচে করতল রাখিয়া নিদ্রালুনেত্রে দেখিতেছিল।

পিতলের দীপদণ্ডে তৈলপ্রদীপ মৃদু আলো বিকীর্ণ করিতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। ভারী মজবুত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

ঘুম-জড়ানো চোখে চম্পা ছোট্ট একটি হাই তুলিল।

চম্পাঃ আর কত মোহর গুণবে? এবার শোবে চল না।

গোকুলদাস থলি হইতে আরও এক মুঠি মোহর বাহির করিয়া গণিতে গণিতে বলিলেন—

গোকুলদাসঃ হুঁ হুঁ—এই যে—হল—

এই সময় খোলা জানালার বাহিরে প্রতাপের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। গোকুলদাস মোহর গণনায় মগ্ন; চম্পার পিঠ জানালার দিকে; সুতরাং কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

প্রতাপ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল, তাহার সতর্ক চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া আসিল। বন্ধ দরজার দুই পাশে দুটি পিস্তলের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে দেয়াল ঘেঁষিয়া ছায়ার মত সেই দিকে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে গোকুলদাস ও চম্পার মধ্যে অলস বাঙ্-বিনিময় চলিয়াছে।

চম্পাঃ আচ্ছা, বারবার মোহর গুণে কি লাভ হয়? মোহর কি গুণলে বাড়ে?

গোকুলদাস একটি সন্দেহজনক মোহর আলোর কাছে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে নাকিসুরে হাস্য করিলেন।

গোকুলদাসঃ হুঁ হুঁ হুঁ—তুমি কি বুঝবে! মেয়েমানুষ আর টাকা—দুইই সমান, কড়া নজর না রাখলে হাতছাড়া হয়ে যায়—হুঁ হুঁ হুঁ—

কথাটা চম্পার গায়ে লাগিল। সে উঠিয়া বসিয়া স্থিরনেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

চম্পাঃ টাকার কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু মেয়েমানুষের কি জানো তুমি? তিনবার বিয়ে করলেই হয় না।

গোকুলদাসঃ হুঁ হুঁ হুঁ—

চম্পার চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল।

চম্পাঃ কড়া নজর না রাখলে মেয়েমানুষ হাতছাড়া হয়ে যায়! আমার ওপর কত নজর রাখো তুমি? তার মানে কি আমি মন্দ?

গোকুলদাসঃ শাস্ত্রে বলে পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র—হুঁ হুঁ হুঁ—

চম্পা অধর দংশন করিল।

চম্পাঃ দ্যাখো, স্বামীর নিন্দে করতে নেই, স্বামী মাথার মণি। কিন্তু তুমি—মহাপাপী! একদিন বুঝবে আমি সতীলক্ষ্মী কি না—যেদিন তোমার চিতায় আমি সহমরণে যাব। সেদিন যখন আসবে—

বন্ধদ্বারের নিকট হইতে গম্ভীর আওয়াজ আসিল—

প্রতাপঃ সেদিন এসেছে।

চম্পা ও গোকুলদাস একসঙ্গে দ্বারের দিকে ফিরিলেন; দেখিলেন প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দুই হাতে দুটি পিস্তল।

কিছুক্ষণ জড়বৎ থাকিয়া গোকুলদাস জাঁতিকলে পড়া ইঁদুরের মত একটি শব্দ

করিয়া দুই হাতে হাতবাক্সটি আগ্লাইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। চম্পা একেবারে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়াছিল, সে তেমনি বসিয়া রহিল।

প্রতাপ আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইল; তাহার চোখে কঠিন কাচের মত দৃষ্টি।

প্রতাপঃ গোকুলদাস, আমাকে চিনতে পার?

গোকুলদাস ভয়ে ভয়ে একটু মাথা তুলিলেন।

গোকুলদাসঃ অ্যাঁ—হ্যাঁ—প্রতাপভাই—

প্রতাপঃ মহাজন, আজ তোমার দিন ফুরিয়েছে তা বুঝতে পারছ?

গোকুলদাসের কণ্ঠস্বর ভয়ে তীক্ষ্ন হইয়া উঠিল।

গোকুলদাসঃ না না না, প্রতাপভাই, তুমি বড় ভাল ছেলে—বড় সাধু ছেলে—তোমাকে আমি সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব—

প্রতাপ ডান হাতের পিস্তলটা তাহার রগের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—

প্রতাপঃ চুপ—আস্তে। চেঁচিয়েছ কি গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।

গোকুলদাস ঢোক গিলিয়া নীরব হইলেন। এই সময় চম্পা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রতাপের বাঁ হাতের পিস্তল তাহার দিকে ফিরিল।

প্রতাপঃ বেন, তোমাকে আমি কিছুই বলতে চাই না, কিন্তু গোলমাল করলে তুমিও মরবে।

চম্পার সুন্দর মুখখানি বিচিত্র উত্তেজনায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল, সে চাপা গলায় বলিল—

চম্পাঃ না, আমি গোলমাল করব না। কিন্তু ওকে তুমি ছেড়ে দাও—প্রাণে মেরো না।

প্রতাপঃ প্রাণে মারব না! ও আমার কি করেছে তা জানো?

চম্পাঃ জানি। ও তোমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, ওর জন্যেই তোমার মা'র মৃত্যু হয়েছে। ও মহাপাপী। কিন্তু তবু ভাই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। আমি ওর জন্যে বলছি না, তুমি আমাকে বহিন বলেছ, আমার মুখ চেয়ে ওর প্রাণ ভিক্ষা দাও—

চম্পা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই নতজানু হইল।

চম্পাঃ ভাই, আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো—আমার কুড়ি বছর বয়স, এই বয়সে আমাকে বিধবা কোরো না—

গোকুলদাস চিঁ চিঁ শব্দে যোগ করিয়া দিলেন—

গোকুলদাসঃ শুধু ও নয়, আরও দু'জন আছে—

প্রতাপঃ চোপরও!

গোকুলদাস আবার কাঠের পুতুলের মত নিঃসাড় হইয়া রহিলেন।

চম্পাঃ ভাই—প্রতাপভাই—!

প্রতাপ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল। গোকুলদাসকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া তাহার পক্ষে বড় মর্মান্তিক ব্যর্থতা; এখনও তাহার বুকে মায়ের চিতার আগুন জ্বলিতেছে।...কিন্তু এদিকে এই নিরপরাধা যুবতী বিধবা হয়। প্রতাপ তিক্ত-দৃষ্টিতে গোকুলদাসের পানে চাহিল।

চম্পাঃ ভাই—! প্রতাপভাই—!

প্রতাপঃ ছেড়ে দিতে পারি—যদি—

উদ্ভাসিত মুখে চম্পা উঠিয়া দাঁড়াইল।

চম্পাঃ তুমি আর যা বলবে তাই করব।—কী করব বল?

প্রতাপ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল। গোকুলদাসের পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তি আছে। সে বলিল—

প্রতাপঃ প্রথমে চাবি নিয়ে সব সিন্দুক খুলে দাও।

গোকুলদাস আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিলেন।

গোকুলদাসঃ অ্যাঁ—তবে কি?

প্রতাপ দুইটি পিস্তল গোকুলদাসের দুই চোখের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া বলিল—

প্রতাপঃ চুপ করে থাক্ বেইমান হারামী; কথা কয়েছিস কি মরেছিস। (চম্পাকে) যা বললাম কর।

চম্পা ত্বরিতে গোকুলদাসের কোমর হইতে চাবির গোছা লইয়া একে একে সব সিন্দুক-গুলি খুলিয়া দিল। প্রত্যেকটির জঠরে বহু দলিল, মোহরের থলি ও বন্ধকী গহনা দেখা গেল।

চম্পাঃ এই যে প্রতাপভাই, এবার কি করব বল?

প্রতাপঃ এবার বেশ ভারি দেখে দুটো মোহরের থলি নাও।—নিয়েছ?

চম্পাঃ হ্যাঁ ভাই, এই যে নিয়েছি—

গলায় দড়ি বাঁধা দুটি পরিপুষ্ট থলির মুঠ ধরিয়া চম্পা দেখাইল।

প্রতাপঃ আচ্ছা, এবার থলি দুটোকে জানালার বাইরে ফেলে দাও।

চম্পা ভারি থলি দুটি বহিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল। নীচে ধপ্ ধপ্ করিয়া শব্দ হইল।

কাট্।

নীচে সিংদরজার সম্মুখে সান্ত্রীরা পূর্ববৎ ঘুমাইতেছিল; ধপ্ ধপ্ শব্দে চমকিয়া জাগিযা তাহারা সন্দিগ্ধভাবে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিল।

কাট্।

তোশাখানার জানালায় চম্পা ভিতর দিকে ফিরিয়া সপ্রশ্নচক্ষে প্রতাপের পানে চাহিল। প্রতাপ সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল—

প্রতাপঃ এবার সিন্দুক থেকে দলিলের কাগজ বার করে নিয়ে এস—

গোকুলদাস আর একবার আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিতেই প্রতাপের পিস্তল তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল, তিনি আবার তূষ্ণীভাব ধারণ করিলেন। চম্পা ছুটিয়া গিয়া সিন্দুক হইতে দুই মুঠি ভরিয়া দলিলের পাকানো কাগজ লইয়া প্রতাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ নীরবে শুধু চোখের সংকেতে প্রদীপশিখা দেখাইয়া দিল। ইঙ্গিত বুঝিতে চম্পার বিলম্ব হইল না, সে দলিলগুলি আগুনের উপর ধরিল।

দলিলগুলি জ্বলিয়া উঠিলে চম্পা সেগুলি মেঝের উপর রাখিয়া দিল। প্রতাপ আবার তাহাকে মস্তকের ইঙ্গিত করিল, সে ছুটিয়া পাঁজা ভরিয়া দলিল আনিয়া আগুনের উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল। চম্পার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে এই কাজ বেশ উপভোগ করিতেছে। ক্রমে একটি বেশ বড় গোছের ধুনি জ্বলিয়া উঠিল।

গোকুলদাস পঙ্কে-পতিত হাতীর মত বসিয়া নিজের এই সর্বনাশ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রগের কাছে পিস্তল উদ্যত হইয়া আছে, তিনি বাঙ্-নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মুখগহ্বর কেবল নিঃশব্দে ব্যাদিত এবং মুদিত হইতে লাগিল।

সমস্ত দলিল অগ্নিতে সমর্পিত হইলে, প্রতাপ পিস্তল দুটি নিজ কোমরবন্ধে রাখিল, শুষ্ক-কঠিন হাসিয়া বলিল—

প্রতাপঃ মহাজন, তোমার বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছি, এখন যত পারো ছোবল মারো। একটা দুঃখ, তোমার সিন্দুক লুঠ করে ন্যায্য অধিকারীর সোনাদানা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। হয়তো আবার আসতে হবে। (চম্পাকে) বেন্, তোমার বৈধব্য কামনা করি না, কিন্তু স্বামীকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও তাহলে ওকে সৎপথে চালিও।—চললাম।

প্রতাপ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। চম্পা জোড়হস্তে তদ্‌গত কণ্ঠে বলিল—

চম্পাঃ ভাই, তোমাকে প্রণাম করছি। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, যতদিন বাঁচব তোমার গুণ গাইব—

এমন সময় দ্বারের বাহিরে বহু কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল—পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রতাপ এক লাফে জানালা ডিঙাইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। দরজায় করাঘাত করিতেই গোকুলদাস লাফাইয়া উঠিয়া উন্মত্তকণ্ঠে চিৎকার করিলেন—

গোকুলদাসঃ চোর চোর—ডাকাত! আমার সর্বনাশ করে গেল। ওরে হতভাগা মেয়েমানুষ, দরজা খুলে দে না—

চম্পাঃ (হাসিয়া) তুমি খোলো না। আমি অবলা মেয়েমানুষ, ঐ জগদ্দল দরজা খোলা কি আমার কাজ!

গোকুলদাস মুক্তকচ্ছভাবে ছুটিয়া গিয়া লোহার দরজার হুড়কা খুলিতে খুলিতে চেঁচাইতে লাগিলেন—

গোকুলদাসঃ গুণ্ডার বাচ্চা পালিয়েছে—পাকড়ো পাকড়ো—ফটক বন্ধ করো—

কাট্।

জানালার নীচে মোহরভরা থলি দুটি পড়িয়াছিল। প্রতাপ দেওয়াল বাহিয়া নামিয়া আসিয়া থলি দুটি মুঠে ধরিয়া দু'হাতে তুলিয়া লইল।

সিংদরজার প্রহরীরা থলি পতনের শব্দে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, শব্দটা তাহাদের সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই তাহারা উঠিয়া কবাটের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্বক অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে পুরীর সকলে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জানালার নীচে পতিত থলি দুটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সিংদরজার কবাট খোলা রহিয়াছে কিন্তু সেখানে কেহ নাই। প্রতাপ শিকারী শ্বাপদের মত নিঃশব্দে পা ফেলিয়া সেইদিকে চলিল। খিড়কি দরজার বাহিরে মোতি আছে কিন্তু সেদিকে যাওয়া আর নিরাপদ নয়, চারিদিক হইতে সজাগ মানুষের হাঁক-ডাক আসিতেছে।

সিংদরজায় পৌঁছিতে প্রতাপের আর কয়েক পা বাকি আছে এমন সময় বাড়ির কোণ ঘুরিয়া এক দল লাঠি-সড়কিধারী লোক আসিয়া পড়িল—তাহাদের আগে আগে কান্তিলাল। প্রতাপকে দেখিয়াই তাহারা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল, সঙ্গে-সঙ্গে জানালা হইতে গোকুলদাসের তীক্ষ্ণ তারস্বর শোনা গেল—

গোকুলদাসঃ ধর্ ধর্—ঐ পালাচ্ছে—

প্রতাপ তীরবেগে সিংদরজা দিয়া বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিল। ঐ দিকে মোতি আছে; যদি সে কোনও রকমে একবার মোতির পিঠে চড়িয়া বসিতে পারে তবে আর তাহাকে ধরে কে? কিন্তু কান্তিলাল ও তাহার সহচরেরাও দৌড়ে কম পটু নয়, তাহারা সবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। বিশেষত একটা লোক এত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল বলিয়া।

দুই হাতে ভারি দুটি থলি, সুতরাং প্রতাপ অতি দ্রুত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল;

অবশেষে পলায়নের আর কোনও উপায় না দেখিয়া সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। যে লোকটা সর্বাগ্রে তাড়া করিয়া আসিতেছিল, সে নাগালের মধ্যে আসিতেই প্রতাপ ডান হাতের থলিটি ঘুরাইয়া গদার মত তাহার মস্তকে প্রহার করিল। লোকটা আর্তনাদ করিয়া সেইখানেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে মোহরের থলি ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে মোহর ছড়াইয়া পড়িল। প্রতাপ আর সেখানে দাঁড়াইল না, আবার দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ দৌড়িয়া সে একবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, কেহ তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে কিনা। সে দেখিল তাহার পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সকলেই মাটিতে হামাগুড়ি দিয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া মোহর কুড়াইতেছে। প্রতাপ তখন দৌড়িতে দৌড়িতে ডাকিল—

প্রতাপঃ মোতি—মোতি—

তাহার কণ্ঠস্বরে কান্তিলাল ও অনুচরগণের হুঁশ হইল যে চোর পলাইতেছে, তখন তাহারা উঠিয়া আবার তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

কিন্তু চোরকে তাহারা ধরিতে পারিল না। প্রভুর আহ্বান মোতির কানে গিয়াছিল; সে ক্ষণেক উৎকর্ণ থাকিয়া সহসা হ্রেষাধ্বনি করিয়া প্রভুর কণ্ঠস্বর অনুসরণপূর্বক দৌড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রতাপ শুনিল পিছনে মোতির ক্ষুরধ্বনি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সে আবার ডাকিল—

প্রতাপঃ মোতি! মোতি! আয় বেটা!

মোতির ক্ষুরধ্বনি আরও স্পষ্ট হইতে লাগিল। সে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের ছাড়াইয়া প্রতাপের পাশে পৌঁছিল। দুজনে পাশাপাশি দৌড়িতেছে। তারপর প্রতাপ একলম্ফে ধাবমান মোতির পিঠে চড়িয়া বসিল।

কান্তিলাল ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; বেগবান অশ্ব ও আরোহী জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

জলসত্রের প্রকোষ্ঠে চিন্তা ঝুলার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও বোধ করি প্রতাপের কথা তাহার মন জুড়িয়াছিল—ঠোঁট দুটি অল্প অল্প স্ফুরিত হইয়াছিল। অবহেলা-ম্লান মালা দুটি বুকের কাছে গুচ্ছাকারে পড়িয়া তাহার তপ্ত নিশ্বাসের সহিত নিজের ব্যর্থ সুগন্ধ মিশাইতেছিল।

সহসা অর্গলবদ্ধদ্বারে করাঘাত হইল। চিন্তা চমকিয়া চক্ষু মেলিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

আবার দ্বারে করাঘাত হইল। চিন্তা নিঃশব্দে উঠিল; দ্বারের পাশে একটি ঝক্‌-ঝকে ধারালো কাটারি ঝুলিতেছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কড়া সুরে প্রশ্ন করিল—

চিন্তাঃ কে তুমি?

বাহির হইতে চাপা গলায় আওয়াজ আসিল—

প্রতাপঃ চিন্তা, দোর খোলো—আমি প্রতাপ—

তাড়াতাড়ি কাটারি রাখিয়া চিন্তা দ্বারের হুড়কা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

চিন্তাঃ তুমি—তুমি—এত রাত্রে—!

দ্বার খুলিতেই প্রতাপ ভিতরে প্রবেশ করিল। কপালে ঘাম, চুলের উপর ধুলো পড়িয়াছে, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার মূর্তি দেখিয়া চিন্তা শঙ্কা-বিস্ময়ে তাহার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—

চিন্তাঃ এ কি—কী হয়েছে?

প্রতাপ প্রথমে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল; তারপর চিন্তার দিকে ফিরিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া ভগ্নস্বরে বলিল—

প্রতাপঃ চিন্তা, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার দুনিয়া ওলট্-পালট্ হয়ে গেছে। আমি এখন সমাজের বাইরে—ডাকাত—বারবটিয়া—

চিন্তা সত্রাসে প্রতিধ্বনি করিল—

চিন্তাঃ ডাকাত! বারবটিয়া! কেন, কি করেছ তুমি?

প্রতাপ মোহরের থলি চিন্তার হাতে দিয়া ক্লান্ত হাসিল, তারপর ঝুলার উপর গিয়া বসিল।

প্রতাপঃ বলছি। কিন্তু বেশী সময় নেই, এতক্ষণে আমার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে, সকাল হবার আগেই পালাতে হবে—

চিন্তা ঝুলার পাশে নতজানু হইয়া ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল-

চিন্তাঃ ওগো, কী হয়েছে সব আমায় বল।

প্রতাপঃ বলব। তার আগে তোমার কর্তব্য কর।

চিন্তাঃ কর্তব্য?

প্রতাপঃ পানিহারিন্, পিপাসার্ত পথিককে আগে একটু জল দাও।

ত্বরিতে জলভরা ঘটি আনিয়া চিন্তা প্রতাপের হাতে দিল। প্রতাপ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ঘটির জল গলায় ঢালিয়া দিতে লাগিল।

কাট্।

পরপেব বাহিরে মোতি দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখের লাগাম একটি খুঁটিতে বাঁধা ছিল। মোতি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কান পর্যন্ত নড়িতেছিল না। প্রয়োজন হইলে সে এমনি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে—যেন পাথরে কোঁদা মূর্তি।

অদূরে ঝোপের আড়াল হইতে একটি মুণ্ড গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিল। তাহার দৃষ্টি মোতির দিকে। কিছুক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে মোতিকে নিরীক্ষণ করিয়া সে নিঃশব্দে ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় লোকটিকে পরিষ্কার দেখা গেল—চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের একটি ক্ষীণকায় দীর্ঘগ্রীব যুবক। তাহার মুখে ধূর্ততা মাখানো, পাতলা গোঁফজোড়া সর্বদাই খরগোশের গোঁফের মত অল্প অল্প নড়িতেছে। সে মোতির উপর অবিচলিত দৃষ্টি রাখিয়া এক পা এক পা করিয়া তাহাব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মোতি সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সততার পরিচায়ক বলিযা মনে হয় না।

কাট্।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি ঝুলার উপর বসিয়া আছে, প্রতাপ তাহার কাহিনী বলা শেষ করিয়াছে। চিন্তার চোখে জল, সে দুই হাতে প্রতাপের একটি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে।

প্রতাপঃ সব তো শুনলে। আমি আমার রাস্তা বেছে নিয়েছি। এখন তুমি কি করবে বল।

চিন্তাঃ তুমি যা বলবে তাই করব।—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল—

নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ মাথা নাড়িল।

প্রতাপঃ তা হয় না। আমার সঙ্গে তুমি থাকলে—

চিন্তাঃ আমার কষ্ট হবে ভাবছ? তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারব।

প্রতাপঃ আমি তা জানি চিন্তা। সে জন্যে নয়। তবে বলি শোন। আমি এখন ডাকাত—বারবটিয়া, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার উপায় আর আমার নেই। পাহাড়ে গুহায় জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় জীবন কাটাতে হবে। অথচ শহরে বাজারে মহাজনদের মহলে কোথায় কি ঘটছে তার খবর না জানলেও আমার কাজ চলবে না। মেঘনাদের মত মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আমাকে এই অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে চিন্তা।

চিন্তাঃ তবে আমাকে কি করতে হবে হুকুম দাও।

প্রতাপঃ তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি যেমন প্রপাপালিকা আছ তেমনই থাকবে।

চিন্তাঃ আমি তোমার কোনো কাজেই লাগব না?

প্রতাপঃ তুমি হবে আমার সবচেয়ে বড় সহকারিণী। তোমার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ তা কেউ জানে না। তুমি এখানে যেমন আছ তেমনি থাকবে। এই পথ দিয়ে কত লোক আসে যায়, তাদের মুখে অনেক টুক্‌রো-টাক্‌রা খবর তুমি পাবে। এই সব খবর তুমি আমার জন্যে সঞ্চয় করে রাখবে। আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব আর দুনিয়ার খবর নিয়ে যাব—

চিন্তা কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিল, প্রস্তাবটা প্রথমে তাহার মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু ক্রমে তাহার সংশয় কাটিয়া গিযা মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

চিন্তাঃ বেশ, তাই ভাল। তবু তো মাঝে মাঝে তোমায় চোখে দেখতে পাব।

প্রতাপ চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—

প্রতাপঃ চিন্তা, আজ পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই—তোমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যে কত মর্মান্তিক তা তো তুমি বুঝতে পারছ? কোথায় ভেবেছিলাম তোমাকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাব—

চিন্তা অবহেলা-ম্লান মালা দুটি ঝুলার উপর হইতে তুলিয়া লইল; একটি মালা প্রতাপের হাতে দিয়া অন্যটি তাহার গলায় পরাইয়া দিল, গম্ভীর শান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল—

চিন্তাঃ এই আমাদের বিয়ে। ভগবান যদি দিন দেন তখন সুখে স্বচ্ছন্দে তোমার ঘর করব।

চিন্তার গলায় হাতের মালা পরাইয়া দিয়া প্রতাপ তাহার দুই হাত ধরিয়া গভীর আবেগভরে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রতাপঃ চিন্তা—

এই সময় দ্বারে খুটখুট করিয়া শব্দ হইল। প্রতাপের কথা শেষ হইল না, তাহাদের দুইজোড়া সন্ত্রস্ত চক্ষু দ্বারের উপর গিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরব; তারপর বাহির হইতে একটি করুণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

কণ্ঠস্বরঃ ও মশায় ঘোড়ার মালিক, একবার দয়া করে বাইরে আসবেন কি?

কণ্ঠস্বরের কাতরতা আশ্বাসজনক। তবু কিছুই বলা যায় না। প্রতাপ ও চিন্তা দৃষ্টি বিনিময় করিল। প্রতাপ কোমর হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া নিঃশব্দে দ্বারের কাছে গিয়া কান পাতিয়া শুনিল, তারপর হঠাৎ দ্বার খুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকটির বুকের উপর পিস্তল ধরিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—

প্রতাপঃ কি চাও? কে তুমি?

অতর্কিত আক্রমণে লোকটি প্রায় উল্‌টিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, কোনও রকমে সাম্‌লাইয়া লইল। সে আর কেহ নয়, সেই ক্ষীণকায় যুবক। চক্ষু চক্রাকার করিয়া সে প্রতাপের পানে ও পিস্তলটার পানে পর্যায়ক্রমে তাকাইয়া শেষে বলিল—

যুবকঃ ওটা সরিয়ে নিলে ভাল হয়—আমি কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েছি।

প্রতাপ পিস্তল নামাইল না, চিন্তাকে ডাকিয়া বলিল—

প্রতাপঃ চিন্তা, প্রদীপটা নিয়ে এস।

প্রদীপ হাতে লইয়া চিন্তা প্রতাপের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ এখন লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিল—সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও দৈহিকশক্তির দিক দিয়াও উপেক্ষণীয়।

লোকটিও ইহাদের দু'জনকে দেখিয়া বুঝিয়া লইল ইহারা গুপ্তপ্রণয়ী; সে একটু লজ্জার ভান করিয়া ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—

যুবকঃ এ হে হে—আমি দেখছি কিঞ্চিৎ দোষ করে ফেলেছি—এমন চাঁদনী রাত্রে প্রণয়ীদের মিলনে বাগড়া দেওয়া—কিঞ্চিৎ—

প্রতাপঃ তুমি কে?

যুবকঃ বলতে নেই আমার অবস্থাও প্রায় একই রকম। মামুদপুরের বড় মহাজন রতিলাল শেঠের মেয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রেম হয়েছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাশোনা হচ্ছিল, হঠাৎ বাগড়া পড়ে গেল। সবাই মার মার করে তেড়ে এল। কাজেই এখন আমি পলাতক—ফেরারী আসামী।

প্রতাপ ও চিন্তার মধ্যে চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

প্রতাপঃ তুমিও ফেরারী?

প্রতাপ ও চিন্তা বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

যুবকঃ ফেরারী না হয়ে উপায় কি? রতিলাল শেঠ কিঞ্চিৎ কড়া-পিত্তির লোক, ধরতে পারলে কোনো কথা শুনতো না, সটান টাঙিয়ে দিত। তাই পলায়নের রাস্তা যতদূর সুগম করা যায় তারই চেষ্টায় আছি। আপনার ঘোড়াটি—

যুবক লোলুপ দৃষ্টিতে মোতির পানে ফিরিয়া চাহিল।

প্রতাপঃ আমার ঘোড়া? মোতি?

যুবকঃ এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ঘোড়াটি চোখে পড়ল। তা ভাবলাম ঘোড়ার মালিক নিশ্চয় কাছে-পিঠে আছেন, তিনি যদি ঘোড়াটি উচিত মূল্যে বিক্রি করেন তাহলে আমার কিঞ্চিৎ উপকার হয়।

প্রতাপঃ বিক্রি করব? মোতিকে বিক্রি করব?

যুবকঃ দেখুন, আমি বড়লোক নই, কিন্তু গরজ বড় বালাই। আপনাকে না হয় উচিত মূল্যের কিঞ্চিৎ বেশীই দেব—

প্রতাপ একটু হাসিল, এই কৌতুকপ্রিয় অথচ কূটবুদ্ধি যুবকটিকে তাহার ভাল লাগিল। বিপদের মুখেও যাহার মন হইতে হাস্যরস মুছিয়া যায় না, তাহার ভিতরে পদার্থ আছে। প্রতাপ প্রশ্ন করিল—

প্রতাপঃ তোমার নাম কি?

যুবক সবিনয়ে উত্তর দিল—

যুবকঃ বলতে নেই আমার নাম ভীমভাই অর্জুনভাই শিয়াল।

প্রতাপঃ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার ঘোড়াটি একলা পেয়ে তুমি চুরি করলে না কেন?

ভীমভাই একটু সলজ্জ হাসিল, তাহার গোঁফজোড়া নড়িতে লাগিল।

ভীমভাইঃ বলতে নেই সে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ঘোড়াটি কিঞ্চিৎ

বেশী প্রভুভক্ত, লাগামে হাত দিতেই ঘ্যাঁক্ করে কামড়ে দিল। এই দেখুন—

ভীমভাই হাত বাহির করিয়া দেখাইল; হাতের পোঁচায় ঘোড়ার দাঁতের দাগ রহিয়াছে, তবে রক্তপাত হয় নাই।

ভীমভাইঃ এখন ফেরারী আসামীর প্রতি দয়া করে ঘোড়াটি বিক্রি করবেন কি?

প্রতাপঃ মোতিকে কিনতে পারে এত টাকা কাথিয়াবাড়ে নেই। তাছাড়া আমিও তোমার মত ফেরারী, মহাজনের টাকা লুঠ করেছি।

ভীমভাই বিপুল বিস্ময়ে হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ প্রতাপের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ভীমভাইঃ বলতে নেই কিঞ্চিৎ রোমহর্ষণ ব্যাপার মনে হচ্ছে—আমিও ফেরারী, আপনিও ফেরারী! এমন যোগাযোগ বলতে নেই সহজে ঘটে না!

প্রতাপ পিস্তল কোমরে রাখিয়া ভীমভাইয়ের কাঁধের উপর হাত রাখিল, মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—

প্রতাপঃ ভীমভাই, তোমার মত মানুষ আমার দরকার। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?

ভীমভাইঃ বলতে নেই—কোথায়?

প্রতাপঃ তোমার আমার জন্যে কেবল একটি পথ খোলা আছে, ডাকাতির পথ, বারবটিয়ার পথ। আসবে এ পথে?

মহানন্দে ভীমভাই প্রতাপকে জড়াইয়া ধরিল।

ভীমভাইঃ আসব না? বলতে নেই আসব না তো যাব কোথায়? আজ থেকে তুমি আমার গুরু—আমার সর্দার!

প্রতাপ ভীমের আলিঙ্গন মুক্ত হইল।

প্রতাপঃ আজ আমাদের নবজীবনের ভিত্তি হল।—চিন্তা, আজ আমবা মাত্র তিনজন বিদ্রোহী দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করলাম। ক্রমে আমাদের দল বেড়ে উঠবে—দেশে বিদ্রোহীর অভাব নেই। ভীমভাই, আমরা তিনজনে মিলে যে আগুন জ্বাল্‌ব—

ভীমভাইঃ তিনজন নয়—চারজন। বলতে নেই আমার একটি সাথী আছে—

প্রতাপঃ সাথী? কই—কোথায়?

ভীমভাইঃ অবস্থাগতিকে কিঞ্চিৎ আড়ালে আছে।—এই যে ডাকছি।

ভীমভাই মুখের মধ্যে দুইটি আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া তীব্র শিস দিল।

ভীমভাইঃ তিলু! তিলোত্তমা!

যে ঝোপের আড়াল হইতে কিছুকাল পূর্বে ভীমভাই উঁকি মারিয়াছিল, তাহার পিছন হইতে একটি হাস্যমুখী তরুণী বাহির হইয়া আসিল। পরিধানে ঘাগ্‌রি ও ওড়্‌নি, হাতে একটি ছোট পুঁটুলি, তিলোত্তমা দৌড়িয়া আসিয়া ভীমভাইয়ের পাশে [।

ভীমভাইঃ তিলু, আজ থেকে আমরা ডাকাত—(গলার মধ্যে হুঙ্কার শব্দ করিল) ইনি আমাদের সর্দার।

তিলুর চোখ দুটি ভারি চঞ্চল আর দাঁতগুলি মুক্তাশ্রেণীর মত উজ্জ্বল, সে চঞ্চল-কৌতুকভরা চক্ষে চিন্তা ও প্রতাপকে নিরীক্ষণ করিল, দশনচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া হাসিল। প্রতাপ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—

প্রতাপঃ ইনি কে ভীমভাই?

ভীমভাইঃ চিনতে পারলে না সর্দার? বলতে নেই রতিলাল শেঠের মেয়ে—তিলু। কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে মেয়ে, কিছুতেই শুনল না, আমার সঙ্গে পালাল। ওর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ।

প্রতাপ স্মিতমুখে চিন্তার পানে চাহিল। তিলু কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। চিন্তা

প্রদীপ রাখিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া তিলুকে জড়াইয়া ধরিল।

ওয়াইপ্।

ভোর হইতে আর দেরি নাই। চন্দ্র অস্ত যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দু'একটা কোকিল কুহরিয়া উঠিতেছে।

জলসত্রের সম্মুখে পথের উপর মোতি দাঁড়াইয়া। তাহার পিঠের উপর সারি দিয়া তিনজন আরোহী; সর্বাগ্রে প্রতাপ লাগাম ধরিয়া বসিয়া আছে, তাহার পিছনে ভীমভাই প্রতাপের কাঁধে হাত দিয়া বসিয়া আছে, সর্বশেষে তিলু একহাতে ভীমভাইয়ের কোমর জড়াইয়া তাহার পিঠের উপর গাল রাখিয়া পরম সুখে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তিলু ও ভীমভাইয়ের গলায় বনফুলের মালা দুটি ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারাও এখন গন্ধর্বমতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী।

চিন্তা পথের উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের বিদায় দিতেছে। কোনও কথা হইল না, প্রতাপ একবার ঘাড় ফিরাইয়া চিন্তার পানে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর তাহার বল্গার ইশারা পাইয়া মোতি ধীরপদে পাহাড়ের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

এক শহরের একটি প্রাচীর-গাত্রে বেশ বড় গোছের ইস্তাহার আঁটা রহিয়াছে—

১০০০৲ টাকা পুরস্কার।
বারবটিয়া প্রতাপ সিংকে
যে-কেহ রাজসকাশে ধরাইয়া দিতে পারিবে
সে এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।

ইস্তাহারের ঠিক পাশেই একটি দারুনির্মিত পায়রার খোপের মত ক্ষুদ্র পানের দোকান। দোকানদার দোকানের মধ্যে বসিয়া পান সাজিতেছে, সম্মুখে দুইজন গ্রাহক দাঁড়াইয়া পান কিনিতেছে।

একজন খরিদ্দার ইস্তাহারটি দেখিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল—

খরিদ্দারঃ ইস্তাহারে কী লেখা রয়েছে?

দোকানদার পানের খিলি খরিদ্দারকে দিয়া নীরসকণ্ঠে বলিল—

দোকানদারঃ লেখা আছে, প্রতাপ বারবটিয়াকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে সে হাজার টাকা ইনাম পাবে।

লোকটি পান চিবাইতে চিবাইতে কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে ইস্তাহারটি নিরীক্ষণ করিল, তারপর ঘৃণাভরে ইস্তাহারের উপর পানের পিক্ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় খরিদ্দারটি শীর্ণাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত ভীরু প্রকৃতির। সে পান মুখে দিয়া একবার সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর হঠাৎ ইস্তাহারের উপর পিচ্কারীর বেগে পিক্ ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

দোকানদার একটু গম্ভীর হাসিল। সে আর কেহ নয়, বৃদ্ধ লছমন।

ডিজল্ভ্।

আর একটি শহর। একটা তক্মাধারী লোক ঢোল পিটাইয়া রাস্তায় রাস্তায়

হুলিয়া দিয়া বেড়াইতেছে—

তক্‌মাধারীঃ সরকারী পুরস্কার বাড়িয়ে দেওয়া হল—শোনো সবাই—দেশের শত্রু সমাজের শত্রু রাজার শত্রু প্রতাপ বারবটিয়াকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে সে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে—

একটা গলির মোড়ে কয়েকজন বালক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে গুল্‌তি। বালক গুল্‌তিতে একটি প্রস্তরখণ্ড বসাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। তারপর বালকের দল হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

তক্‌মাধারী ঘোষক ঘোষণা শেষ করিয়া ঢোলে কাঠি দিতে গিয়া দেখিল ঢোল ফাঁসিয়া গিয়াছে। রাস্তার লোক বিদ্রূপভরে হাসিয়া উঠিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

চিন্তার জলসত্রে অসমতল দেয়ালে একটি ইস্তাহার আঁটা রহিয়াছে—

১০০০০৲ টাকা

প্রতাপ বারবটিয়াকে যে-কেহ ইত্যাদি।

প্রতাপ দাঁড়াইয়া এক টুকরা কয়লা দিয়া পুরস্কারের অঙ্কের পিছনে আরও কয়েকটা শূন্য যোগ করিয়া দিতেছে। তাহার মুখে মৃদু ব্যঙ্গ-হাসি।

পায়রার বক্‌বকম শব্দ শুনিয়া প্রতাপ ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিল। একটা দীর্ঘ বংশ-দণ্ডের আগায় কঞ্চির কামানি দিয়া ছত্র রচনা হইয়াছে, তাহার উপর দুটি কপোত। যে-কপোতশিশু দুটি প্রতাপ চিন্তাকে উপহার দিয়াছিল তাহারা আর শিশু নহে, সাবালক ও স-পালক হইয়াছে।

তাহাদের দিকে চাহিয়া প্রতাপের মুখের ব্যংগ হাসি স্নেহে কোমল হইয়া আসিল। এই সময় চিন্তা ঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল—

চিন্তাঃ ও কি, সদরে দাঁড়িয়ে আছো? কেউ যদি এসে পড়ে! মোতি কোথায়?

প্রতাপঃ মোতিকে ওদিকে লুকিয়ে রেখেছি, কেউ দেখতে পাবে না।

চিন্তাঃ তবে ওখানে দাঁড়িয়ে কি কাজ? এস—ভেতরে এস, তোমার খাবার দিয়েছি—

প্রতাপ আসিয়া বারান্দায় চিন্তার সহিত যোগ দিল।

প্রতাপঃ 'চুনি-মুনি'কে দেখছিলাম। ওদের যখন বাসা থেকে তুলে এনেছিলাম তখন কে ভেবেছিল ওরা এত কাজে লাগবে!

চিন্তাঃ আমাদের ভাগ্যবিধাতা জানতেন, তাই আগে থেকে আয়োজন করে রেখে-ছিলেন।

প্রতাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মেঝেয় পিঁড়ি পাতা হইয়াছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড পিতলের থালি; থালিতে নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন সজ্জিত রহিয়াছেঃ গমের ফুল্‌কা রুটি, শিং দিয়া তুরের ডাল*, মুঠিয়া, পকৌড়ি, ধোক্‌ড়া, দহি-বড়া, শ্রীখণ্ড—আরও কত কি। প্রতাপ সহর্ষে পিঁড়ির উপর বসিল।

প্রতাপঃ ভাগ্যবিধাতা আমার জন্যেও আজ কম আয়োজন করেননি—

প্রতাপ পরম আগ্রহে আহার আরম্ভ করিল, চিন্তা সলজ্জ তৃপ্তির সহিত বসিয়া দেখিতে লাগিল।

চিন্তাঃ রান্না ভাল হয়েছে?

*সজিনার ডাঁটা (শিং) দিয়া অড়র ডাল।

প্রতাপঃ ভাল? অমৃত। সত্যিই বলছি চিন্তা, ডাকাত হবার আগে যদি তোমার রান্না খেতাম তাহলে হয়তো—

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল, তাহার কৌতুক-চটুল মুখ সহসা গম্ভীর হইল। সে হাতের অর্ধভুক্ত ধোক্ড়া নামাইয়া রাখিল।

চিন্তাঃ কী হল?

প্রতাপঃ কিছু না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমি এখানে বসে দিব্যি চর্বচোষ্য খাচ্ছি আর ওরা—ভীম নানা প্রভু তিলু—নুন দিয়ে শুক্নো বাজরি রুটি চিবচ্ছে।

চিন্তাঃ (ঈষৎ হাসিয়া) তা হোক—তুমি খাও।

প্রতাপ বিষণ্ণমুখে উঠিবার উপক্রম করিল।

প্রতাপঃ না চিন্তা, এত ভাল খাবাব আর আমার গলা দিয়ে নামবে না।

চিন্তাঃ উঠো না, উঠো না। ওদের জন্যেও আমি খাবার তৈরি রেখেছি—তুমি নিয়ে যাবে। ঐ দ্যাখো।

ঘরের কোণে একটি আধমনী চটের থলি আভ্যন্তরিক পরিপূর্ণতায় পেট ফুলাইয়া ধনী মহাজনের মত বসিয়া ছিল, দেখিয়া প্রতাপের মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কৃতজ্ঞতা-তদ্গত স্বরে চিন্তাকে বলিল—

প্রতাপঃ চিন্তা, তুমি একটি জলজ্যান্ত দেবী—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রতাপ আহারে মন দিল। এই সময় পায়রা দুটি উড়িয়া আসিয়া জানালায় বসিল। চিন্তা একমুঠি শস্য লইযা মেঝেয় ছড়াইয়া দিল, চুনি-মুনি অমনি নামিয়া আসিয়া দানাগুলি খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব আহারে কাটিল।

প্রতাপঃ খবর কিছু আছে নাকি?

চিন্তাঃ না, নতুন খবর কিছু পাইনি।

প্রতাপঃ আমি বোধ হয় এখন কিছুদিন আর আসতে পারব না। যদি জরুরী খবর কিছু পাও—

প্রতাপ অর্থপূর্ণভাবে চুনি-মুনির পানে তাকাইল।

চিন্তাঃ (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ।

সহসা বাহিরে ডুলি বাহকের হুম্ হুম্ শব্দ শোনা গেল। প্রতাপ ও চিন্তা সচকিতে মুখ তুলিল।

কাট্।

বাহিরে রাস্তার উপর শেঠ গোকুলদাসের ডুলি আসিয়া থামিল। এবার সঙ্গে রক্ষীর সংখ্যা বেশী, কান্তিলাল ও পাঁচজন বন্দুকধারী সিপাহী। হতভাগা প্রতাপ সিং ধরা না পড়া পর্যন্ত মহাজন সম্প্রদায়কে সাবধানে পথ চলিতে হয়।

গোকুলদাস ডুলি হইতে মুণ্ড বাহির করিয়া হাঁকিলেন—

গোকুলদাসঃ ওরে, জল নিয়ে আয়।

কাট্।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ ও চিন্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিন্তা পাণ্ডুরমুখে প্রতাপের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে অধরোষ্ঠের সংকেতে বলিল—গোকুলদাস।

আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া প্রতাপের চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, সে চিন্তাকে কাছে টানিয়া কানে কানে বলিল—

প্রতাপঃ যাও, ওদের জল দাও গিয়ে, ভয় পেয়ো না। যদি জিজ্ঞাসা করে বোলো ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

বাহির হইতে গোকুলদাসের স্বর আসিল—

গোকুলদাসঃ আরে কোথায় গেল পরপওয়ালী ছুঁড়িটা? কাজের সময় হাজির থাকে না! কান্তিলাল, দ্যাখ তো ঘরে আছে কিনা।

চিন্তার হাত-পা ঠান্ডা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর বিলম্ব করিলে সর্বনাশ। সে কোনও ক্রমে মুখে একটু ঘুম-ঘুম ভাব আনিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কান্তিলাল ঘরের দিকে আসিতেছিল, চিন্তাকে জলের ঘটি লইয়া বাহির হইতে দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না। আকর্ণ দন্ত বাহির করিয়া হাসিল।

কান্তিলালঃ এই যে ধনি বেরিয়েছেন!

চিন্তা গোকুলদাসের সম্মুখীন হইতেই তিনি বিষাক্ত চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

গোকুলদাসঃ কোথায় ছিলি? সরকারের পগার* নিস না তুই। কাজে হাজির থাকিস না কেন?

চিন্তাঃ (জড়িতকণ্ঠে) ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—

গোকুলদাসঃ (বিকৃতমুখে) ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! কেন? রাত্তিরে ঘুমোস্ না?

কান্তিলাল চোখ টিপিয়া টিপ্পনি কাটিল—

কান্তিলালঃ রাত্তিরে ঘুম হবে কোত্থেকে শেঠ? রাত্তিরে বোধ হয় নাগর আসে।

কান্তিলালের সহচরেরা এই রসিকতায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ সবই শুনিতে পাইতেছিল, অসহায়-ক্রোধে তাহার চক্ষু জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

গোকুলদাস মুখের কাছে গণ্ডূষ করিয়া জল পান করিলেন, তারপর মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—

গোকুলদাসঃ ঠিক বলেছিস কান্তিলাল, ছুঁড়ি রাত্তিরে ঘরে নাগর আনে। রাজপুতের মেয়ে আর কত ভাল হবে?

রাজপুতের প্রতি বিদ্বেষ প্রতাপ ঘটিত ব্যাপারের পর হইতে গোকুলদাসের মনে শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার এই নীচ অপমানে চিন্তার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল, কিন্তু সে অধর দংশন করিয়া নীরব রহিল। প্রভুর অনুমোদন পাইয়া কান্তিলাল সোৎসাহে বলিল—

কান্তিলালঃ শুধু রাত্তিরে কেন শেঠ, দিনের বেলাও আনে। এখন হয়তো ঘরের মধ্যে নাগর লুকিয়ে আছে।—উঁকি মেরে দেখে আসব?

ঘরের মধ্যে প্রতাপের সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠিল, সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিল। যদি ধরা পড়িতেই হয়, ঐ নরপশুটাকে সে আগে শেষ করিবে।

শেঠ কিন্তু আর অযথা কালক্ষয় সমর্থন করিলেন না।

গোকুলদাসঃ না থাক। রাজপুতনী দশটা নাগর ঘরে আনুক না, আমার তাতে কি? নে—ডুলি তোল, বেলা থাকতে থাকতে কাছারি পৌঁছুতে হবে।

বাহকেরা ডুলি তুলিয়া চড়াইয়ের পথে যাত্রা করিল। কান্তিলাল চিন্তার পাশ দিয়া যাইবার সময় খাটো গলায় বলিয়া গেল—

কান্তিলালঃ আমিও এবার একদিন রাত্তিরে আসব—

*পগার—মাসিক বেতন।

চিন্তা অপমান-লাঞ্ছিত মুখে চুপ করিয়া রহিল—

ঘরের মধ্যে প্রতাপ জালবদ্ধ শ্বাপদের মত ছটফট করিতেছিল, চিন্তা ফিরিয়া আসিতেই তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া আগুনভরা চোখে চাহিল।

প্রতাপঃ চিন্তা! এই সব অপমান তোমাকে সহ্য করতে হয়?

চিন্তা একটা দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণেকের জন্য মুখ নীচু করিল। তারপর পাণ্ডুর হাসিয়া আবার মুখ তুলিল।

চিন্তাঃ ও কিছু নয়। কিন্তু তুমি আর দিনের বেলা এস না। আর একটু হলেই আজ—

চিন্তা এতক্ষণ কোনও ক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া সে প্রতাপের বুকের উপর মুখ ঢাকিল। ভয়, অপমান ও সর্বশেষে বিপন্মুক্তির আকস্মিক অব্যাহতি মিলিয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই দুর্নিবার অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়া পড়িল।

ডিজল্‌ভ্‌।

বিস্তীর্ণ গিরিকান্তারের একটি দৃশ্য। পাহাড়ের ভাগই বেশী। নিরাবরণ পাথরের বিশৃঙ্খল স্তূপ যেন কেহ অবহেলাভরে চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে নিম্নভূমিতে গৈরিক বনানীর নিষ্প্রাণ হরিদাভা।

এই দুর্গম স্থানটিকে দুর্গপ্রাকারের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে একটি গিরিচক্র। এই গিরিচক্রের গা বাহিয়া উপরে ওঠা মানুষের দুঃসাধ্য; কিন্তু একস্থানে এই নৈসর্গিক প্রাকারের গায়ে একটি ফাটল আছে। ফাটলটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ, কোনও ক্রমে একজন ঘোড়সওয়ার ইহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারে।

কোনও অজ্ঞ আগন্তুক কিন্তু এই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া এমন কিছু দেখিতে পাইবে না যাহাতে তাহার সন্দেহ হইতে পারে যে এই প্রস্তর-বিকীর্ণ স্থান প্রতাপ সিং ও তার দস্যুদলের আস্তানা। কেবল প্রতাপ ও তাহার মুষ্টিমেয় পার্শ্বচরেরাই ইহার সন্ধান জানে। দেশ জুড়িয়া প্রতাপের শত শত অনুচর আছে, ডাক পাইলেই তাহারা প্রতাপের সঙ্গে যোগ দিবে; কিন্তু তাহারা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী, প্রতাপের গুপ্ত আস্তানার ঠিকানা জানে না। যাহারা নামকাটা বিদ্রোহী—রাজদণ্ডের ভয়ে যাহাদের লোকসমাজ ছাড়িয়া পালাইতে হইয়াছে—তাহারাই প্রতাপের নিত্য সঙ্গী, গোপন ঘাঁটির সন্ধানও কেবল তাহারাই জানে।

সূর্য পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে কিন্তু অস্ত যায় নাই। দিবাবসানের প্রাক্‌কালে এই নিভৃত স্থানে একটি কৌতুককর অভিনয় চলিতেছিল।

তিলু ঝরণায় জল ভরিতে আসিয়াছিল। স্থানটি চারিদিক হইতে বেশ আড়াল করা; যেখানে ঝরণার জল ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার চারিপাশে শ্যামল শষ্পের সজীবতা। তিলু কলসে জল ভরিয়া ফিরিবার পথে দেখিল, ভীমভাই একটি প্রস্তরখণ্ডে পিঠ দিয়া দীর্ঘ পদযুগল দ্বারা তিলুর পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে। তাহার হাতে একটি বাঁশের এড়ো বাঁশী। ভীমভাইয়ের চাতুরী বুঝিতে তিলুর বাকি রহিল না; সে মুখ টিপিয়া হাসিল।

তিলুঃ বাঃ, পা ছড়িয়ে বসে আছ? আমাকে জল নিয়ে যেতে হবে না? রাত্তিরের রান্না এখনও বাকি।

ভীমভাই কপট-কোপে চক্ষু পাকাইয়া বলিল—

ভীমভাইঃ পাশে বস।

তিলুও মনে মনে তাই চায়। এই নবদম্পতি নিভৃতে পরস্পর সঙ্গলাভের বড় একটা সুযোগ পায় না। কিন্তু আজ বিশেষ কোনও কাজ নাই, প্রতাপও বাহিরে গিয়াছে, এই অবকাশে ভীমভাই দলের আর সকলকে এড়াইয়া ঝরণাতলার নির্জনে তিলুকে একলা পাইয়াছে। তিলু ভরা-ঘট নামাইয়া ভীমভাইয়ের পাশে পাথরে ঠেস দিয়া বসিল, পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

তিলুঃ আমার দায়-দোষ নেই। প্রতাপভাই যদি জিজ্ঞেস করেন—

ভীমভাই তিলুর মাথাটা ধরিয়া নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া দিল; তারপর বাঁশী অধরে তুলিয়া তাহাতে ফুঁ দিল। তিলু মুকুলিত-নেত্রে স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নৃত্য-চপল গ্রাম্য সুর, কিন্তু ভীমভাইয়ের ফুঁ বড় মিঠা। শুনিতে শুনিতে তিলুর পা দুটি বাঁশীর তালে-তালে নাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার কণ্ঠ হইতে নিদ্রালু পাখির মৃদু-কূজনের মত গানের কথাগুলি বাহির হইয়া আসিল—

পায়েলা মোর চপল হল
তব বাঁশীর সুরে—

কাট্।

ঝরণা হইতে বেশ খানিকটা দূরে একটি গুহার মুখ। গুহার ভিতরে অন্ধকার, সম্মুখে একটি বৃহৎ গাছের গুঁড়ি অঙ্গারস্তূপে পরিণত হইয়া স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। এই অগ্নি ঘিরিয়া তিনটি পুরুষ প্রস্তরখণ্ডের আসনে বসিয়া আছে।

প্রথম, নানাভাই—বেঁটে গজস্কন্ধ মহাবলবান; সে একটা বর্শার প্রান্তে ভুট্টা গাঁথিয়া তাহাই পোড়াইয়া খাইতেছে। দ্বিতীয়, প্রভু—মধ্যবয়স্ক কিন্তু বলিষ্ঠ পুরুষ; সে করলগ্নকপোলে বসিয়া গম্ভীরচক্ষে আগুনের পানে চাহিয়া আছে। তৃতীয়, পুরন্দর—শ্যামকান্তি যুবা, কর্মঠ, বালকস্বভাব; সে চামড়ার কয়েকটা লম্বা ফালি লইয়া ক্ষিপ্র নিপুণহস্তে ঘোড়ার লাগাম বুনিতেছে। ইহারাই প্রতাপের দল।

প্রভু দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া একবার সহচরদিগের উপর চক্ষু বুলাইল।

প্রভুঃ ভীমকে দেখছি না।

বাকি দুইজন চারিদিকে চাহিল; তারপর পুরন্দর গিয়া গুহার মধ্যে উঁকি মারিল।

পুরন্দরঃ তিলুবেনও নেই, বোধ হয় জল আনতে গেছে।

প্রভুঃ হুঁ। কিন্তু ভীম কোথায়?

এই সময়, যেন প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে দূর হইতে বাঁশীর নিঃস্বন ভাসিয়া আসিল। কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না ভীমভাই কোথায়। নানা ভুট্টায় কামড় মারিতে গিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। প্রভুর গম্ভীরমুখেও একটু হাসি ফুটিল। পুরন্দর লাগাম বুনিতে বুনিতে স্মিতমুখে মাথাটি নাড়িতে লাগিল।

পুরন্দরঃ চোরের মন বোঁচ্‌কার দিকে। কিন্তু যাই বল, ভীমভাই খাসা বাঁশী বাজায়; দূর থেকে শুনে সুখ হয় না—

বলিয়া মিটিমিটি বাকি দুইজনের পানে তাকাইতে লাগিল।

কাট্।

ভীমভাই পূর্ববৎ বাঁশী বাজাইতেছে; তিলুর পায়েলিয়া তাহার সহিত সঙ্গত করিয়া চলিয়াছে। তিলু গাহিতেছে—

তিলুঃ

পায়েলা মোর চপল হল
তব বাঁশীর সুরে!

শ্যামলিয়া ওগো শ্যামলিয়া
তুমি কত দূরে—
বুকের কাছে—তবু কত দূরে!

ভীমভাই আড়চোখে তিলুর পায়ের দিকে দেখিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতেই তাহাকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিল।

কনুইয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, তিলু উঠিয়া ঘাগ্‌রি ওড়্‌নি সম্বরণপূর্বক গানের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিল। কাথিয়াবাড় গুজরাতের সব মেয়েরাই নাচিতে জানে, ছেলেবেলা হইতে তাহারা গরবা নাচিতে অভ্যস্ত। এ বিষয়ে তাহাদের কোনও সঙ্কোচ নাই।

তিলু:

যে পথে যাই খুঁজে না পাই ঘন কুঞ্জবনে,
সোহাগ ভরে বাঁশী ডাকে অলি গুঞ্জরণে—
ওগো প্রিয়া, তুমি কত দূরে
বুকের মাঝে তবু কত কত দূরে।

কাট্।

পাহাড়ের যে রন্ধ্রটি দিয়া এই উপত্যকার একমাত্র প্রবেশপথ, সেই পথে প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে প্রবেশ করিল। প্রতাপের কোলের কাছে খাদ্যবস্তুর ঝুলিটি বিরাজ করিতেছে। প্রতাপ মোতিকে দাঁড় করাইয়া একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, ক্ষীণ বাঁশীর আওয়াজ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিল, তারপর আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া মোতিকে চালিত করিল।

কাট্।

ভীমভাইয়ের বাঁশী সমে আসিয়া থামিল। তিলুর নাচও একটি ঘূর্ণিপাকে সমাপ্তি লাভ করিল। সে ভীমের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া বসিল। দুজনের মনেই তৃপ্তির পরিপূর্ণতা।

তিলু: কেমন মজা হল। কেউ জানতে পারল না যে তোমার সঙ্গে আমার চুপি চুপি দেখা হয়েছে।

শূন্য হইতে একটি আওয়াজ আসিল—

আওয়াজ: নাঃ, কেউ জানতে পারল না।

চমকিয়া তিলু ও ভীমভাই দেখিল, অনতিদূরে একখণ্ড পাথরের উপর কনুই রাখিয়া প্রভু করলগ্নকপোলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কিছু দূরে বল্‌গা-বয়নরত পুরন্দর দাঁড়াইয়া তখনও গানের তালে তালে মাথাটি নাড়িয়া চলিয়াছে। আর সর্বশেষে নানাভাই বেদীর মত উচ্চ প্রস্তরের উপর পদ্মাসনে বসিয়া শাঁকালু ভক্ষণরত ভাল্লুকের মত দন্ত বিকশিত করিয়া আছে এবং ভুট্টা খাইতেছে।

ধরা পড়ার লজ্জায় তিলু দুহাতে মুখ ঢাকিল।

এই সময় প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইতেই সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

ভীমভাই: সর্দার, বলতে নেই ঝুলিতে কি একটা মহাজন পুরে নিয়ে এলে?

প্রতাপ: (হাসিয়া) না, চিন্তা তোমাদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছে।

মুহূর্তমধ্যে ঝুলি লইয়া সকলে বসিয়া গেল। প্রতাপ মোতিকে ঘাসের উপর ছাড়িয়া দিয়া, অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া তাহাদের আহার দেখিতে লাগিল; তিলু তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া পিছনে দাঁড়াইল। প্রভু খাইতে খাইতে একখণ্ড ধোক্‌ড়া প্রতাপকে দান করিলে, প্রতাপ তাহা নিজে না খাইয়া কাঁধের উপর দিয়া তিলুকে বাড়াইয়া দিল।

তিলুঃ তুমি নিজে খাও না প্রতাপভাই!

প্রতাপঃ চিন্তা আমাকে অনেক খাইয়েছে। তুমি খাও।

তিলু ধোক্‌ড়াতে একটু কামড় দিয়া বলিল—

তিলুঃ চিন্তাবেনকে সেই একবারই দেখেছি। তাকে এখানে নিয়ে আস না কেন প্রতাপভাই? আমরা দু'জনে কেমন একসঙ্গে থাকব—

প্রতাপ চক্ষু তুলিয়া আকাশের পানে চাহিল।

প্রতাপঃ আমারই কি ইচ্ছা করে না। কিন্তু—

হঠাৎ থামিয়া গিয়া প্রতাপ শ্যেনদৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিলুও তাহার দেখাদেখি আকাশের পানে চাহিল। ক্রমে সকলের দৃষ্টিও ঊর্ধ্বগামী হইল।

আকাশে একটি সঞ্চরমান কৃষ্ণবিন্দু দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বিন্দুটি একটি পাখিতে পরিণত হইল। প্রতাপ সঙ্কুচিত চক্ষে দেখিতে দেখিতে অস্ফুটস্বরে বলিল—

প্রতাপঃ চিন্তার পায়রা! এরি মধ্যে কি খবর পাঠাল চিন্তা?

পারাবত একবার তাহাদের মাথার উপর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতাপের কাঁধের উপর আসিয়া বসিল। তাহার পায়ে একটি কাগজ জড়ানো রহিয়াছে। প্রতাপ পা হইতে চিঠি খুলিয়া লইয়া পায়রাটিকে তিলুর হাতে দিল, তারপর চিঠি খুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

আর সকলে প্রতাপকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রভু প্রশ্ন করিল—

প্রভুঃ কী খবর?

পড়িতে পড়িতে প্রতাপের মুখ গম্ভীর হইয়াছিল, সে চিঠি পড়িয়া শুনাইল।

প্রতাপঃ তুমি চলে যাবার পরই একটা খবর পেলাম—তোমাকে ধরবার জন্য একদল সৈন্য রওনা হয়েছে। তাদের সর্দার—তেজ সিং!

প্রভুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সে মুখের উপর দিয়া একটা হাত চালাইয়া ভাবহীন কণ্ঠে বলিল—

প্রভুঃ তেজ সিংকে আমি জানি—একটা মানুষের মত মানুষ।

প্রতাপ চিঠিখানি মুড়িতে মুড়িতে ভ্রূবদ্ধ-ললাটে আবার আকাশের পানে চাহিল। পশ্চিম দিগন্তে গিরি-মালার অন্তরালে তখন দিবাদীপ্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

ফেড্ আউট্।

মধ্য বিরাম

ফেড্ ইন্।

রাজধানীর প্রশস্ত রাজপথ দিয়া একদল পদাতিক সৈন্য চলিয়াছে। চারিজন করিয়া সারি, সৈনিকদের কাঁধে বন্দুক, কোমরে কিরিচ। তাহাদের আগে আগে অশ্বপৃষ্ঠে সর্দার তেজ সিং চলিয়াছেন। বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, বুদ্ধি-দীপ্ত গম্ভীর মুখ, মাথায় পাগড়ির আকারে বাঁধা টুপি, সর্দার তেজ সিংকে দেখিলে মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদয় হয়। ইনি রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক এবং সম্ভবত রাজসরকারে একমাত্র কর্তব্য-নিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ লোক। তাঁহার বয়স ত্রিশের কিছু অধিক।

রাস্তার দুই পাশে লোক জমিয়াছিল, কিন্তু সকলেই নীরব, সকলের মুখেই অপ্রসন্নতার অন্ধকার। প্রতাপকে সৈন্যদল ধরিতে যাইতেছে ইহাতে রাজ্যের আপামর সাধারণ কেহই সুখী নয়। কিন্তু রাজা ও রাজপরিষৎ মহাজনদের মুঠার মধ্যে, তাই রাজ্যের দণ্ডনীতিও প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া সমাজের কল্যাণকামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছে।

পথপার্শ্বের জনতার মধ্যে প্রভু দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার মাথার উপর প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি তাহার মুখখানাকে একটু আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। সৈন্যগণ মশ্‌মশ্ শব্দে চলিয়া গেল; জনতাও ছত্রভঙ্গ হইয়া আপন আপন পথে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কেবল প্রভু বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটি ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ ভিক্ষুক প্রভুর পাশে আসিয়া হাত পাতিল।

ভিক্ষুকঃ ভিক্ষে দাও বাবা—

প্রভু ভিক্ষুকের দিকে ফিরিতেই ভিক্ষুক চোখ টিপিল।

প্রভুঃ (নিম্নকণ্ঠে) লছমন?

লছমনঃ হ্যাঁ বাবা, যা আছে তাই ভিক্ষে দাও বাবা—গরীবের পেটে অন্ন নেই, ঘরে ঘরে কাঙালী—

প্রভু কোমর হইতে কয়েকটি মোহর বাহির করিয়া লছমনের হাতে দিল, লছমন মোহরগুলি মুঠিতে লইয়া বস্ত্রের মধ্যে লুকাইল।

লছমনঃ বেঁচে থাকো বাবা—রাজা হও—

ছদ্মবেশী লছমন আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ডিজ্‌লভ্।

রাত্রিকাল। শহরের উপকণ্ঠে একটি কুটিরের অভ্যন্তর। ঘরের কোণে ম্লান তৈল-দীপ জ্বলিতেছে। একটি অকাল-বৃদ্ধা অনাহারজীর্ণা রমণী মেঝেয় বসিয়া ছিন্ন কাঁথা সেলাই করিতেছে।

একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ ঘরে প্রবেশ করিতেই রমণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। পুরুষের চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, জঠর মেরুদণ্ড-সংলগ্ন, সে টলিতে টলিতে আসিয়া ঘরের কোণে চারপাইয়ের উপর বসিয়া পড়িয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল। রমণী তাহার কাছে গিয়া উদ্বেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলিল—

রমণীঃ এ কি! তুমি একলা ফিরে এলে যে! রমণিক কোথায়?

পুরুষ হাত হইতে মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে চাহিয়া রহিল—

পুরুষঃ রমণিক!—না, সে ফিরে আসেনি—

রমণী ব্যাকুলভাবে পুরুষের কাঁধে নাড়া দিতে দিতে বলিল—

রমণীঃ ওগো, ঐটুকু ছেলেকে কোথায় ফেলে এলে? শহরে গিয়েছিলে শাক-ভাজী বিক্রি করতে, ছেলেকে কোথায় রেখে এলে?

পুরুষঃ তাকে—তাকে মহাজনের লোকেরা টেনে নিয়ে গেল—

রমণীঃ অ্যাঁ—

রমণী সেইখানেই বসিয়া পড়িল, পুরুষ উদ্‌ভ্রান্তবৎ আপন মনে বলিতে লাগিল—

পুরুষঃ শাক-ভাজীর ঝুড়ি নিয়ে বাজারে বেচতে বসেছিলাম এমন সময় মহাজনের পেয়াদা এল—ঝুড়ি তুলে নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে রমণিককেও হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল। বলে গেল, 'যতদিন না শেঠের সুদ চুকিয়ে দিতে পারবি ততদিন তোর ছেলে আটক থাকবে—শুধু জল খাইয়ে রাখব, তাড়াতাড়ি টাকা শোধ করতে না পারিস তোর ছেলে না খেয়ে মরবে—

রমণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া উপুড় হইয়া পড়িল, পুরুষ তেমনি বিহ্বলভাবে বলিয়া চলিল—

পুরুষঃ কি করব? কোথায় টাকা পাব? কত লোকের কাছে টাকা চাইলাম, কেউ দিলে না। অ্যাঁ—ওকি! ওকি!

রমণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পুরুষের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, ঘরের ক্ষুদ্র জানালা দিয়া একটা হাত প্রবেশ করিয়া জানালার উপর কিছু রাখিয়া দিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল। রমণী ব্যাকুলত্রাসে পুরুষের পানে চাহিল।

রমণীঃ ওগো, ও কে? কার হাত?

পুরুষ মাথা নাড়িল, তারপর উঠিয়া সঙ্কোচ-জড়িত পদে জানালার দিকে গেল। জানালার উপর দুইটি মোহর রাখা রহিয়াছে, দীপের আলোকে যেন চিক্‌মিক্‌ করিয়া হাসিতেছে।

রমণী পুরুষের পিছু পিছু আসিয়াছিল, দু'জনে কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত মোহরের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর রমণী হাত বাড়াইয়া মোহর দুটি তুলিয়া লইল।

রমণীঃ ওগো, এ যে সোনার টাকা—মোহর! কে দিলে? কোথা থেকে এল?

পুরুষ যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—

পুরুষঃ বুঝেছি—প্রতাপ। আমাদের বন্ধু—গরীবের বন্ধু প্রতাপ।

ওয়াইপ্‌।

রাত্রিকাল। আর একটি জীর্ণ কক্ষ। এটি পাকা ঘর; কিন্তু দেয়ালের চুন-বালি খসিয়া গিয়াছে। একটি ভাঙা তক্তপোশের উপর পাঁচ বছরের একটি শিশু শুইয়া আছে, মাথার শিয়রে কালি-পড়া লণ্ঠনের আলোতে তাহার অস্থিসার দেহ দেখা যাইতেছে। তাহার মা—একটি শীর্ণকায়া যুবতী—পাশে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। রুগ্ন শিশু বায়না ধরিয়াছে—

শিশুঃ মা, দুধ খাব—ক্ষিদে পেয়েছে—

মাঃ ছি বাবা, তোমার অসুখ করেছে—এখন ওষুধ খেতে হয়—

শিশুঃ না, ওষুধ খাব না—দুধ খাব—

মাঃ এই দ্যাখো না, তোমার বাপু এখনি তোমার জন্যে কত মুসম্বি আর ওষুধ নিয়ে আসবেন—ঘুমিয়ে পড় বাবা—

মা শিশুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, শিশু ঝিমাইয়া পড়িল। শিশুর কঙ্কালসার দেহের দিকে চাহিয়া যুবতীর চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে অর্ধোচ্চারিত ভগ্নস্বরে বলিল—

মাঃ ভগবান, অন্ন দাও—আমার ছেলে না খেয়ে মরে যাচ্ছে, তাকে অন্ন দাও—

ঠুং করিয়া শব্দ হইল। গলদশ্রুনেত্রা যুবতী চুপ করিয়া শুনিল—কিসের শব্দ! আবার ঠুং করিয়া শব্দ হইল। যুবতী তখন পাশের দিকে চক্ষু নামাইয়া দেখিল, মেঝের উপর চক্‌চকে গোলাকার দুটি ধাতুখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। অবশভাবে যুবতী সে দুটি হাতে তুলিয়া লইল, একাগ্রদৃষ্টিতে ক্ষণেক তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মোহর দুটি বুকে চাপিয়া ধরিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মাঃ এ তো আর কেউ নয়—প্রতাপ। প্রতাপ! গরীবের তুমিই ভগবান।

ডিজল্‌ভ্‌।

পূর্বে বলা হইয়াছে, চিন্তার জলসত্রের পিছনে কিছুদূরে একটি পার্বত্য ঝরণা আছে; পাহাড় গলিয়া এই প্রস্রবণের জল একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর জলাশয়ে সঞ্চিত হইয়াছিল। চারিদিকের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে স্বচ্ছ সবুজ সরোবরের দৃশ্যটি বড় নয়নাভিরাম।

প্রাতঃকালে চিন্তা কলস লইয়া জল ভরিতে যাইতেছিল। নির্জন উপল-বিসর্পিত পথ দিয়া যাইতে যাইতে সে আপন মনে গাহিতেছিল—

চিন্তাঃ

মনে কে লুকিয়ে আছে—মন জানে
মরমের কোন্‌ গহনে—কোন্‌খানে—
মন জানে।
মনের মানুষ মনের মাঝে রয়
মনে তাই মলয় বায়ু বয়
চাঁদ ওঠে ফুল ফোটে বন্ধুর সন্ধানে
সেকথা কেউ জানে না—মন জানে।

সরোবরের কিনারায় কয়েকটি শিলাপট্ট ঘাটের পৈঠার মত জলে নামিয়া গিয়াছে। চিন্তা কলস রাখিয়া একটি শিলাপট্টে নতজানু হইয়া নিজের চোখে মুখে জল দিল, তারপর কলস ভরিয়া কাঁখে তুলিবার উপক্রম করিল।

সহসা অদূরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চিন্তা কলস না তুলিয়া সচকিতে পিছু ফিরিয়া চাহিল। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়া দুইজন মানুষ কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে; তাহাদের কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্ত হইতে বড় বড় তামার ঘড়া ঝুলিতেছে।

মানুষ দুটি স্থূলকায়; মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নাই। তাহারা হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে হঠাৎ চিন্তাকে জলের ধারে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর শঙ্কা-বর্তুল চোখ মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

চিন্তা ইতিপূর্বে এই নির্জন অঞ্চলে কখনও মানুষ দেখে নাই, তাই অবাক হইয়া গিয়াছিল; কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর সে প্রশ্ন করিল—

চিন্তাঃ কে তোমরা?

মানুষ দুজন দৃষ্টি বিনিময় করিল, নিজ নিজ ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরস্পর সতর্ক করিয়া দিল, তারপর সন্তর্পণে চিন্তার দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর

আসিয়া তাহারা আবার দাঁড়াইল, আবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়া ঠোঁটে আঙুল রাখিল, তারপর একজন জিজ্ঞাসা করিল—

প্রথম মানুষঃ তুমি কে?

চিন্তাঃ কাছেই পরপ আছে, আমি পানিহারিন্।

দুইজন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁক নামাইল।

প্রথম মানুষঃ ও—পানিহারিন্! আমরা ভেবেছিলাম—

দ্বিতীয় মানুষঃ আমরা ভেবেছিলাম, তুমি পাহাড়ের উপদেবতা—

চিন্তা একটু হাসিল, লোক দুটিকে বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

চিন্তাঃ কিন্তু তোমরা কোথা থেকে এলে? এখানে কাছেপিঠে কেউ তো থাকে না।

প্রথম মানুষঃ আমরা ভিস্তি—আমরা—

সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ভিস্তি তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিল—

দ্বিতীয় ভিস্তিঃ স্ স্ স্—

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ভিস্তি ঠোঁটে আঙুল রাখিয়া শীৎকার করিয়া উঠিল।

প্রথম ভিস্তিঃ স্ স্ স্—আমরা এখানে নতুন এসেছি—

চিন্তার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

চিন্তাঃ ও—তা কাজে এসেছ বুঝি?

প্রথম ভিস্তিঃ কাজ? হুঁ—আমরা এসেছি—

দ্বিতীয় ভিস্তিঃ স্ স্ স্—কি কাজে এসেছি তা বলা বারণ। আমরা ফৌজি-ভিস্তি কিনা—একদল সিপাহীর সঙ্গে এসেছি।

প্রথম ভিস্তিঃ স্ স্ স্—

দ্বিতীয় ভিস্তিঃ স্ স্ স্—

চিন্তা আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—

চিন্তাঃ সিপাহী? কোথায় সিপাহী?

প্রথম ভিস্তিঃ স্ স্ স্—এখান থেকে আধক্রোশ দূরে পাহাড়ের মধ্যে তাঁবু ফেলেছে—সর্দার তেজ সিং—

দ্বিতীয় ভিস্তিঃ স্ স্ স্—বেন, তুমি জানতে চেও না, এসব ভারি গোপনীয় কথা—

চিন্তাঃ আমি জানতে চাই না, জেনেই বা আমার লাভ কি? আমি শুধু ভাবছি এই পাহাড়ের মধ্যে এত সিপাহীর কি কাজ?

প্রথম ভিস্তিঃ কাজ আছে বেন, ভারি জবর কাজ! সর্দার তেজ সিং পঞ্চাশজন সিপাহী নিয়ে এসেছে—

দ্বিতীয় ভিস্তিঃ স্ স্ স্—এ সব গোপনীয় কথা—

চিন্তাঃ না, তাহলে বোলো না—আমি যাই। আমার কলসী তুলে দেবে?

প্রথম ভিস্তিঃ দেব বৈকি বেন—এই যে—

কলসী চিন্তার কাঁখে তুলিয়া দিতে দিতে প্রথম ভিস্তি খাটো গলায় বলিল—

প্রথম ভিস্তিঃ ভারি গোপনীয় কথা বেন, কেউ জানে না—আমরা প্রতাপ বারবটি-য়াকে ধরতে বেরিয়েছি—স্ স্ স্—

আর অধিক সংবাদের প্রয়োজন ছিল না। চিন্তা পাংশু অধরে হাসি টানিয়া ঠোঁটে আঙুল রাখিল—

চিন্তাঃ স্ স্ স্—

উভয় ডিস্তিঃ স্ স্ স্—
চিন্তা আর দাঁড়াইল না, কলস কাঁখে ফিরিয়া চলিল।

ডিজল্ভ্।

গিরিচক্রের মাঝখানে একটি ছোট্ট প্রচ্ছন্ন উপত্যকা। তেজ সিং এইখানে শিবির ফেলিয়াছেন। সিপাহীরা ময়দানের মত সমতল স্থান ঘিরিয়া তাঁবু তুলিয়াছে; সর্দার তেজ সিং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের কাজ তদারক করিতেছেন। চারিদিকে কর্মব্যস্ততা, কিন্তু চেঁচামেচি নাই।

সিপাহীদের বন্দুকগুলি একস্থানে মন্দিরের আকারে জড়ো করা রহিয়াছে; যেন উহাকে কেন্দ্র করিযাই এই বস্ত্রনগরী গড়িয়া উঠিয়াছে।

ডিজল্ভ্।

চিন্তার পরপের পাশে বংশদণ্ডের মাথায় ছত্রের উপর বসিয়া কপোত দুটি রোদ পোহাইতেছে—পুরুষ কপোতটি থাকিয়া থাকিয়া গলা ফুলাইয়া গুমরাইয়া উঠিতেছে।

চিন্তা পরপের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে একটুকরা কাগজ। সে বারান্দার নীচে নামিয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিল—

চিন্তাঃ আয়—চুনি—আয়—

পুরুষ কপোতটি তৎক্ষণাৎ উড়িয়া আসিয়া তাহার কাঁধে বসিল। চিন্তা তাহাকে ধরিয়া তাহার পায়ে কাগজটি জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হ্রস্বকণ্ঠে বলিতে লাগিল—

চিন্তাঃ চুনি—দেরি কোরো না—শীগ্‌গির যেয়ো—তোমার ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে—

চিন্তা দূত-কপোতকে উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিল। কপোত শূন্যে একটা পাক খাইয়া পক্ষবাণ তীরের মত বিশেষ একটা দিক লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল। যতক্ষণ দেখা গেল, উৎকণ্ঠিতা চিন্তা সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

ডিজল্ভ্।

প্রতাপের গুহা-ভবনের সম্মুখে ভস্মাচ্ছাদিত আগুন জ্বলিতেছিল। অগ্নিহোত্রীর যজ্ঞকুণ্ডের মত এ আগুন কখনও নেভে না, অতি যত্নে ইহাকে জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কারণ, এই লোকালয়বর্জিত স্থানে একবার আগুন নিভিলে আবার আগুন সংগ্রহ করা বড় কঠিন কাজ।

অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া প্রতাপ প্রমুখ পাঁচজন বসিয়া ছিল। সকলেই চিন্তায় মগ্ন। প্রতাপ ললাট কুঞ্চিত করিয়া তরবারির অগ্রভাগ দিয়া মাটিতে খোঁচা দিতেছিল; প্রভু গালে হাত দিয়া আগুনের দিকে চাহিয়া ছিল; নানাভাই থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক গাছের ডাল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছিল- পুরন্দর কিছুই করিতেছিল না, কেবল নিজের আঙুলগুলিকে পরস্পর জড়াইয়া বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করিতেছিল। সর্বশেষে ভীম-ভাই একটু স্বতন্ত্র বসিয়া একটা খড়ের অগ্রভাগ নিজের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সকল বিবিধ কার্যকলাপ সত্ত্বেও তাহারা যে নিজ নিজ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া আছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড হাঁচির শব্দে সকলের চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। সকলের

ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি ভীমের দিকে ফিরিল; ভীম কিন্তু নির্বিকার চিত্তে আবার নাকে কাঠি দিবার উপক্রম করিল।

প্রভুঃ ভীম, তোমার আর অন্য কাজ নেই?

ভীমভাই একটি হাত তুলিয়া সকলকে আশ্বাস দিল।

ভীমভাইঃ থামো। মাথায় একটা মতলব আস্‌ব আস্‌ব করছে। যদি সাতবার হাঁচতে পারি তাহলেই মাথাটা সাফ্‌ হয়ে যাবে—

নানাভাইঃ খবরদার। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি উঁকি ঝুঁকি মারছিল, তোমার হাঁচির ধমকে ভড়্‌কে পালিয়ে গেল।

ভীমভাইঃ কিন্তু বলতে নেই মাথাটা কিঞ্চিৎ সাফ্‌ হওয়া যে দরকার।

প্রতাপঃ (হাসিয়া) দরকার বুঝলে তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা সাফ্‌ করে দিতে পারব—তোমাকে আর হাঁচতে হবে না।

ভীমভাইঃ বেশ, তবে বলতে নেই হাঁচব না।

খড় ফেলিয়া দিয়া ভীম নির্লিপ্তভাবে বসিল। প্রভু প্রতাপের দিকে ফিরিল।

প্রভুঃ কিছু মাথায় আসছে না। কী করা যায়?

প্রতাপঃ আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তেজ সিং কোথায় আছে, জানতে না পারলে কিছুই করা যায় না।

প্রভুঃ সেই তো। আশ্চর্য ধড়িবাজ লোক। সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম শহরের ভিতর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে গেল। তারপর রাতারাতি সারা পল্টন কোথায় লোপাট হয়ে গেল, আর পাত্তাই নেই!

পুরন্দরঃ কোথায় আস্তানা গেড়েছে জানতে পারলে—

নানাভাইঃ জানতে পারলে রাতারাতি কচুকাটা করে দেওয়া যেত—লোকজন জড়ো করে দুপুর রাত্রে রে রে রে করে হানা দিতাম, ব্যস্‌! ঘুম ভাঙবার আগেই কেল্লা ফতে।

প্রতাপ একটু হাসিয়া মাথা নাড়িল।

প্রতাপঃ নানাভাই, ব্যাপার অত সহজ নয়। রাজার সিপাহীরা তো আমাদের শত্রু নয়, তারা রাজার নিমক খায় তাই কর্তব্যের অনুরোধে আমাদের ধরতে এসেছে। তারা আমাদের জাতভাই, আমাদের দেশের লোক—তাদের প্রাণে মারা আমাদের উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কৌশলে তাদের পরাস্ত করা, যাতে তাদের ক্ষতি না হয় অথচ আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়।

ভীমভাইঃ কিন্তু বলতে নেই সেটা কি করে সম্ভব?

প্রতাপঃ সেই কথাই তো ভাবছি। যদি জানতে পারতাম তেজ সিং তার পল্টন নিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে—

এই সময় তিলু গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তিলুঃ ঢের ভাবনা-চিন্তে হয়েছে, এবার সব খাবে চল! পেটে রুটি পড়লেই মাথায় বুদ্ধি গজাবে।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নানাভাইঃ খাঁটি কথা বলেছে তিলুবেন।—পেট খালি তাই মাথা খালি।

নানাভাই পরম আরামে দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙিতে গিয়া সেই অবস্থায় রহিয়া গেল, তাহার চক্ষু আকাশে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

নানাভাইঃ আরে, চিন্তাবেনের পায়রা মনে হচ্ছে—

দেখিতে দেখিতে চুনি আসিয়া প্রতাপের স্কন্ধে অবতরণ করিল। ত্বরিতহস্তে চিঠি খুলিয়া প্রতাপ পড়িল, তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

প্রতাপঃ চিন্তা লিখেছে—'পঞ্চাশজন সিপাহী নিয়ে তেজ সিং পরপ থেকে আধ ক্রোশ দূরে তাঁবু ফেলেছে।'

সকলে অবরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রভুঃ যাক, তেজ সিংয়ের হদিস পাওয়া গেছে! এবার তোমার মতলবটা শুনি প্রতাপভাই।

প্রতাপ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে কাছে আহ্বান করিল।

প্রতাপঃ কাছে সরে এস, বলছি।

সকলে প্রতাপকে ঘিরিয়া ধরিল, প্রতাপ একদিকে ভীমভাইয়ের এবং অন্যদিকে তিলুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

প্রতাপঃ আমি যে মতলব করেছি, ভীমভাই ও তিলু হবে তার নায়ক নায়িকা—

তাহার কণ্ঠস্বর গোপনতার প্রয়োজনে ক্রমে গাঢ় ও হ্রস্ব হইয়া আসিল। সকলে পুঞ্জীভূত হইয়া শুনিতে লাগিল।

ফেড আউট্

ফেড ইন্।

প্রাতঃকাল। তেজ সিংয়ের ছাউনিতে প্রাত্যহিক কর্মসূচনা আরম্ভ হইয়াছে, সিপাহীরা কুচকাওয়াজ করিতেছে। তেজ সিং তাহাদের পরিচালনা করিতেছেন।

কুচকাওয়াজ শেষ হইলে সিপাহীরা তাহাদের বন্দুকগুলি একস্থানে মন্দিরের আকারে দাঁড় করাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তেজ সিং নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময় শিবিরচক্রের বাহিরে বাঁশীর শব্দ শোনা গেল। সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তারপর কৌতূহল পরবশ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভিস্তি-যুগল কাঁধে বাঁক লইয়া ঝরণা হইতে জল ভরিয়া ফিরিতেছে, তাহাদের পিছনে অপরূপ দুটি মূর্তি।

মূর্তি দুটি ভীমভাই ও তিলু, কিন্তু অভিনব সাজ-পোষাকের ভিতর হইতে তাহাদের চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। ভীমের পোষাক কতকটা কাবুলী ধরনের, থুতনির কাছে একটু দাড়ি গজাইয়াছে, মাথায় জরীর তাজ। তিলুর রংচঙা ঘাগ্রি ও ওড়নির কোমরবন্দ দেখিয়া তাহাকে বেদেনী বলিয়া মনে হয়; তার পায়ে ঘুঙুর, হাতে ঘণ্টিদার করতাল, মাথায় একখণ্ড লাল কাপড় জড়ানো।

ভিস্তিদ্বয় এই অবাঞ্ছিত সঙ্গীদের লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ঝরণা-তলায় এই দুটি জীব বসিয়াছিল, তাহাদের সহিত কথা কহিতে গিয়া ভিস্তিরা দেখিল, তাহাদের ভাষা একেবারেই অবোধ্য। ভিস্তিরা প্রথমে খুবই আমোদ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যখন জল লইয়া ফিরিয়া চলিল তখন দেখিল ইহারাও পিছু লইয়াছে। তারপর সারাটা পথ তাহারা এই নাছোড়বান্দা অনুচর দুটিকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই, ভীমভাই বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে এবং তিলু নৃত্যভঙ্গিমায় ঘুঙুর ঝঙ্কৃত করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে।

শিবির সন্নিধানে পৌঁছিয়া ভিস্তিদ্বয় বাঁক নামাইয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে ভীম ও তিলুর দিকে ফিরিল।

প্রথম ভিস্তিঃ (হাত নাড়িয়া) এই—যাঃ—পালাঃ—আর এগুবি কি ঠ্যাং ভেঙে দেব!

দ্বিতীয় ভিস্তিঃ দেখছিস না এটা সিপাহীদের ছাউনি—এখানে এলে সিপাহীরা ধরে ঘাড় মটকে দেবে—

যেন বড়ই সমাদরসূচক কথা, তিলু উজ্জ্বল মধুর হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

তিলুঃ সি সি—পিণ্টু কালা থিলি—সী।

এই সময় দুইজন সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথম সিপাহীঃ কি হয়েছে? এরা কারা?

প্রথম ভিস্তিঃ (হতাশভাবে) আর কও কেন। ঝরণাতলা থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে—এত তাড়াবার চেষ্টা করছি কিছুতেই যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় সিপাহীঃ বেদে বেদেনী মনে হচ্ছে।

ভীমভাই সম্মুখে আসিয়া নিজের বুকে হাত রাখিল।

ভীমভাইঃ মি গুরগুট—থালা থালা মাণ্ডি। (তিলুকে দেখাইয়া) হাণ্ডি মাসোমা চিল্লু—সী।

তিলু হাস্যোদ্ভাসিত মুখে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে করতাল ঊর্ধ্বে তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। ভীমভাই অমনি বাঁশীতে সুর ধরিল।

সিপাহীরা ইহাদের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকজন সিপাহী আসিয়া জুটিল, সকলে মিলিয়া এই বিচিত্র জীব-দুটিকে ঘিরিয়া ধরিল। তিলু তখন উৎসাহ পাইয়া নাচের সহিত গান ধরিল—

তিলুঃ

চিচিন্ থুলা পিচিন্ থুলা পিণ্টি থুলা রি
আণ্ডি গালা ভাণ্ডি বালা হাল্লাহালা সী—
গিজিং ঘিয়া গিজিং ঘিয়া—

ক্রমে গীতবাদ্যের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ছাউনিতে যে যেখানে ছিল আসিয়া জুটিল। চক্রায়িত দর্শক-মণ্ডলীর হাসি মস্করার মধ্যে তিলুর কটাক্ষ-বিভ্রম-বিলোল নৃত্যগীত চলিতে লাগিল।

সর্দার তেজ সিং নিজ শিবিরে গিয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে এই অনভ্যস্ত আওয়াজ কানে যাইতে তিনি ভ্রূকুটি করিয়া উঠিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলেন।

শিবিরবৃত্তের অপর প্রান্তে সিপাহীর দল জমা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার ভ্রূকুটি আরও গভীর হইল। তিনি সেই দিকে চলিলেন।

সিপাহীদের মজলিশ তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তিলু নাচিতে নাচিতে কখনও একটি সিপাহীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিতেছে, কখনও অন্য একটির বুকে করতালের টোকা মারিয়া দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছে। তেজ সিং আসিতেই সিপাহীদের হল্লা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল, তাহারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তিলুর চপলতা কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না, তেজ সিংকে দেখিয়া তাহার রণ-ভঙ্গিমা যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে প্রথমে তাঁহাকে ঘিরিয়া একপাক নাচিয়া লইল, তারপর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তরলকণ্ঠে গাহিল—

তিলুঃ

আওলা দুলা সি যাওলা থুলা রি
গিজিং ঘিয়া গিজিং ঘিয়া—

তেজ সিং প্রথমটা একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি অনুমান করিলেন, ইহারা যাযাবর বেদে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই—যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ানো এবং নাচিয়া গাহিয়া পয়সা কুড়ানোই ইহাদের পেশা। তেজ সিং মনে মনে স্থির করিলেন, নাচ শেষ হইলে ইহাদের শিবিরে লইয়া গিয়া

প্রশ্ন করিবেন, হয়তো ইহারা বারবটিয়াদের সন্ধান জানিতে পারে।

নাচ গান চলিতে লাগিল, তেজ সিং স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে এই মুগ্ধ-জনতার পশ্চাতে এক বিচিত্র ছায়া-বাজির অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। শিবিরগুলির ব্যবধান পথে চারিটি মানুষ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত বন্দুকগুলি সরাইয়া ফেলিতেছিল, হাতে হাতে বন্দুকগুলি শিবির-চক্রের অপর পারে অদৃশ্য হইতেছিল। মানুষগুলি আর কেহ নয়, প্রতাপ, নানাভাই, প্রভু ও পুরন্দর।

শিবিরের পশ্চাদ্ভাগে মোতি ও আরও সাতটি ঘোড়া দাঁড়াইয়া ছিল, বন্দুকগুলি তাহাদেরই একটির পিঠে লাদাই হইতেছিল। অবশেষে সমস্ত বন্দুক ঘোড়ার পিঠে লাদাই হইল, কেবল চারিজন শিকারীর হাতে চারিটি বন্দুক রহিয়া গেল। প্রতাপ বাকি তিনজনকে ইশারা করিল, তারপর সকলে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল।

ওদিকে নাচগানও শেষ হইয়াছিল, ভীমভাই ও তিলু নত হইয়া তস্‌লিম করিতেই তেজ সিং বলিলেন—

তেজ সিংঃ তোমরা আমার সঙ্গে এস—বক্‌শিশ পাবে।

তিলু এবার বিশুদ্ধ সহজবোধ্য ভাষায় কথা কহিল।

তিলুঃ মাফ করবেন সর্দারজী, আপনিই আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন।

সকলে চমকিয়া দেখিল, ভীমভাই ও তিলুর হাতে দুটি পিস্তল—বাঁশী ও করতাল কখন প্রাণঘাতী-অস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ভীমভাইঃ তোমরা কেউ গণ্ডগোল কোরো না। বলতে নেই গণ্ডগোল করলেই বিপদ ঘটবে।

ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া তেজ সিং বলিলেন—

তেজ সিংঃ এ কি! কে তোমরা?

তিলুঃ পিছন ফিরে চেয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

সকলে পিছন দিকে ফিরিয়া যাহা দেখিল তাহাতে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। চারিটি বন্দুক তাহাদের দিকে স্থির লক্ষ্য করিয়া আছে। তেজ সিং ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। এই ফাঁকে ভীম ও তিলু সিপাহীদের দল হইতে বাহির হইয়া দস্যুদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ বন্দুক হইতে চোখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল—

প্রতাপঃ সিপাহীদের বলছি, তোমরা ছাউনি ছেড়ে চলে যাও—নইলে বন্দুক ছুঁড়ব। প্রথমেই সর্দার তেজ সিং জখম হবেন।

সিপাহীরা পিছু হটিল। অস্ত্রহীন সিপাহীর মত অসহায় প্রাণী আর নাই। তেজ সিং কিন্তু বাঘের মত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া গর্জন করিলেন—

তেজ সিংঃ খবরদার—কেউ পালিও না। ওরা পাঁচজন, আমরা পঞ্চাশজন। এস, সবাই একসঙ্গে ওদের ওপর লাফিয়ে পড়ি—

সিপাহীরা দ্বিধাভরে ফিরিল। প্রতাপ বলিল—

প্রতাপঃ সাবধান, কেউ এদিকে এগিয়েছ কি আগে সর্দারকে মারব! যদি সর্দারের প্রাণ বাঁচাতে চাও, সব ছাউনির বাইরে যাও।

সিপাহীরা তথাপি ইতস্তত করিতেছিল, ভীমভাই হঠাৎ পিস্তল তুলিয়া শূন্যে আওয়াজ করিল। আর কেহ দাঁড়াইল না, মুহূর্তমধ্যে ছাউনির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল তেজ সিং ক্রুদ্ধ হতাশায় চক্ষু আরক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রতাপ বন্দুক নামাইয়া তেজ সিংয়ের সম্মুখীন হইল।

প্রতাপঃ সর্দার তেজ সিং, আপনি আমাদের বন্দী, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

তেজ সিং প্রজ্বলিত চক্ষে প্রতাপের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

তেজ সিংঃ তুমি প্রতাপ সিং? (প্রতাপ মাথা ঝুঁকাইল) রাজপুত হয়ে তুমি এমন শঠতা করবে ভাবিনি—ভেবেছিলাম যুদ্ধ করবে।

প্রতাপঃ আপনি যোদ্ধা, আপনিই বলুন, পঞ্চাশজনের সঙ্গে পাঁচজনের যুদ্ধ কি সম্ভব? না—ন্যায়সঙ্গত? কিন্তু ও আলোচনা পরে হবে।—নানাভাই, সর্দারের চোখ বাঁধো। কিছু মনে করবেন না, তলোয়ারটি দিতে হবে।—পুরন্দর, ঘোড়া নিয়ে এস।

সর্দার তলোয়ার ফেলিয়া দিলেন। পুরন্দর ঘোড়া আনিতে গেল। নানাভাই তিলুর মাথা হইতে লাল বস্ত্রখণ্ডটি তুলিয়া লইয়া সর্দারের চোখ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। সর্দার বাধা দিলেন না, সগর্ব নিষ্ক্রিয়তায় বক্ষ বাহুবন্ধ করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন।

ভীম ও তিলু পরস্পরের পানে চাহিয়া বিগলিত হাস্য বিনিময় করিল।

তিলুঃ (চুপিচুপি) বাপ্‌গো নাগিনা—গির্জিং ঘিয়া।

ভীম মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

ভীমভাইঃ থালা থালা মাণ্ডি—গুরগুট্।

দস্যুদের গুহা-ভবনের সম্মুখ।

সারি সারি আটটি ঘোড়া আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে অবতরণ করিল; তেজ সিংকে নামাইয়া তাঁহার চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল।

প্রতাপঃ (ঈষৎ হাসিয়া) সর্দারজী, এই আমাদের আস্তানা। আমরা পরের ধন লুট করি বটে কিন্তু নিজেরা ভোগ করি না তা বোধ হয় বুঝতে পারছেন।

তেজ সিং উত্তর দিলেন না, গর্বিত ঘৃণায় চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন—

তেজ সিংঃ এইখানে আমাকে বন্দী থাকতে হবে?

প্রতাপঃ হ্যাঁ। তবে যদি আপনি কথা দেন যে পালাবার চেষ্টা করবেন না তাহলে আপনাকে বন্দী করে রাখবার দরকার হবে না।

তেজ সিংঃ তোমরা কাপুরুষ বেইমান, তোমাদের আমি কোনও কথা দেব না।

প্রতাপের মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ধীর স্বরেই উত্তর দিল—

প্রতাপঃ সর্দার তেজ সিং, আমরা অপমানে অভ্যস্ত নই। কেন যুদ্ধ না করে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম সেকথা আগে বলেছি। নিরপরাধ সিপাহীদের হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে নির্গুণ রাজশক্তি দুষ্টের দমন না করে দুষ্টের পালনে আত্মনিয়োগ করেছে তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

তেজ সিংঃ কাপুরুষের মুখে নীতির কথা শোভা পায় না। যদি যুদ্ধে হারিয়ে আমাকে বন্দী করতে পারতে তাহলে বুঝতাম।

প্রতাপের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ প্রখর দৃষ্টিতে তেজ সিংয়ের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—

প্রতাপঃ আপনি আমার সঙ্গে অসিযুদ্ধে রাজী আছেন?

তেজ সিংঃ আছি। একটা তলোয়ার—

প্রতাপঃ ভীম, সর্দারকে তলোয়ার দাও।

ভীম তেজ সিংকে তলোয়ার দিল, প্রতাপ নিজের কোমর হইতে অসি কোষমুক্ত করিল।

প্রতাপঃ আমি শপথ করছি যদি আপনি আমাকে পরাস্ত করতে পারেন তাহলে বিনা শর্তে মুক্তি পাবেন, আমার সঙ্গীরা কেউ আপনাকে ধরে রাখবে না। আর আপনি শপথ করুন—যদি পরাস্ত হন তাহলে পালাবার চেষ্টা করবেন না।

তেজ সিংঃ শপথ করছি।

অতঃপর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় যোদ্ধা প্রায় সমকক্ষ, তেজ সিংয়ের অসি-বিদ্যায় পটুত্ব বেশী, প্রতাপের বয়স কম। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল; ক্রমে তেজ সিং ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিজের আসন্ন অবসন্নতা অনুভব করিয়া তিনি অন্ধবেগে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ তখন সহজেই তাঁহাকে পরাভূত করিয়া ধরাশায়ী করিল।

প্রতাপ হাত ধরিয়া তেজ সিংকে ভূমি হইতে তুলিল; কিছুক্ষণ দুইজনে নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তেজ সিংয়ের দৃষ্টিতে পরাভবের তিক্ততার সহিত সম্ভ্রম মিশিল।

তেজ সিংঃ প্রতাপ সিং, তোমার কাছে পরাস্ত হয়েছি। আমার শপথ মনে রাখব।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে চারিদিক মুহ্যমান। পাহাড়ের অঙ্গ হইতে উত্তাপ প্রতিফলিত হইতেছে। ছায়া বিবরসন্ধী সর্পের মত পাথরের খাঁজে খাঁজে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় নির্জন পার্বত্যপথ দিয়া এক পথিক চলিয়াছিল। পথিক অন্ধ, যষ্টি ধরিয়া ধীরপদে চলিতেছিল। তাহার দেহ দীর্ঘ ও ঋজু, কিন্তু বয়স ও দারিদ্র্যের প্রকোপে কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ভিক্ষুক বলিয়া মনে হয়।

অন্ধ ভিক্ষুক থাকিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিতেছিল—

ভিক্ষুকঃ প্রতাপ বারবটিয়া—প্রতাপ বারবটিয়া—তুমি কোথায়?

জনহীন আবেষ্টনীর মধ্য হইতে জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর আসিতেছিল না; কিন্তু ভিক্ষুক সমভাবে হাঁকিয়া চলিয়াছে—

ভিক্ষুকঃ প্রতাপ বারবটিয়া! তুমি কোথায়?

বিসর্পিল পথে ভিক্ষুক এইভাবে অনেকদূর চলিল।

পথের পাশে একস্থানে কয়েকটি বড় বড় পাথরের চাঁই একত্র হইয়া আপন ক্রোড়দেশে একটু ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ছায়ার কোটরে বসিয়া পুরন্দর আপন মনে আঙুলে আঙুল জড়াইয়া খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না তাহার কোনও কাজ আছে; গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের অফুরন্ত অবকাশ এমনি হেলা-ফেলায় কাটাইয়া দেওয়াই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অলস নৈষ্কর্মের মধ্যেও তাহার চক্ষুকর্ণ যে সজাগ হইয়া আছে তাহা সহজে লক্ষ্য করা যায় না।

দূর হইতে কঠিন পথের উপর লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ কানে যাইতেই পুরন্দর সোজা হইয়া বসিল; পরক্ষণেই সে ভিক্ষুকের উচ্চ চিৎকার শুনিতে পাইল—

ভিক্ষুকঃ প্রতাপ বারবটিয়া! তুমি কোথায়?

পুরন্দর একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল কিন্তু উঠিল না, যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। ক্রমে ভিক্ষুক লাঠির শব্দ করিতে করিতে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। পুরন্দর তথাপি নড়িল না, কেবল তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ভিক্ষুককে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ভিক্ষুক তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার পর পুরন্দর নিঃশব্দে উঠিল, পা টিপিয়া

টিপিয়া গিয়া পিছন হইতে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল।

ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিল—

ভিক্ষুকঃ কে তুমি? প্রতাপ বারবটিয়া?

পুরন্দর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষুকের মুখ এবং মণিহীন অক্ষিকোটর ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল।

পুরন্দরঃ তুমি অন্ধ?

ভিক্ষুকঃ হ্যাঁ, তুমি কে?

পুরন্দরঃ আমি যে হই, প্রতাপ বারবটিয়ার সঙ্গে তোমার কী দরকার?

ভিক্ষুকঃ দরকার আছে—বড় জরুরী দরকার।

পুরন্দরঃ কী দরকার আমায় বলবে না?

ভিক্ষুকঃ তুমি যদি প্রতাপ বারবটিয়া হও তোমাকে বলতে পারি?

পুরন্দরঃ আমি প্রতাপ নই, কিন্তু তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি। যাবে?

ভিক্ষুকঃ যাব। তার কাছে যাব বলেই তো বেরিয়েছি। কিন্তু আমি অন্ধ—

পুরন্দরঃ বেশ, আমার সঙ্গে এস।

পুরন্দর ভিক্ষুকের যষ্টির অন্য প্রান্ত তুলিয়া নিজমুষ্টিতে ধরিয়া আগে আগে চলিল, ভিক্ষুক তাহার পশ্চাৎবর্তী হইল।

ওয়াইপ্।

গুহার সম্মুখে একখণ্ড প্রস্তরের উপর প্রতাপ ও তেজ সিং পাশাপাশি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পিছনে তিলু, ভীম, নানাভাই ও প্রভু দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে কিছুদূরে অন্ধ ভিক্ষুক ঋজু দেহে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—

ভিক্ষুকঃ প্রতাপ বারবটিয়া, তোমার দেশের লোক যদি না খেয়ে মরে যায় তাহলে তুমি কেন রাজদ্রোহী হয়েছ? অন্ন যদি চাষীর পেটে না গিয়ে মহাজনের গুদামে জমা হয়, তবে কিসের জন্য তুমি দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছ?

প্রতাপঃ তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?

ভিক্ষুকঃ আমি মিঠাপুর গ্রামের লোক। মিঠাপুর এখান থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে। গ্রামের যিনি জমিদার তিনিই মহাজন। এবার ফসল ভাল হয়নি তাই জমিদার খাজনার বাবদ প্রজার সমস্ত ফসল বাজেয়াপ্ত করে নিজের আড়তে তুলেছেন, আর চতুর্গুণ মূল্যে তাই প্রজাদের বিক্রি করছেন। প্রজাদের যতদিন ক্ষমতা ছিল, গাই-বলদ-কাস্তে-লাঙল বিক্রি করে নিজের তৈরি শস্য মহাজনের কাছ থেকে কিনে খেয়েছে। কিন্তু এখন আর তাদের কিছু নেই—তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। মহাজনও তাদের শস্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে শহরে মাল চালান দিচ্ছেন; অসহায় দুর্বল চাষীরা অনাহারে মরছে। প্রতাপ বারবটিয়া, তাই আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি—আমি জানতে চাই এর প্রতিকার কি তুমি করবে না?

শুনিতে শুনিতে প্রতাপের মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে তেজ সিংয়ের দিকে ফিরিল, কন্ঠস্বর যথাসম্ভব নম্র করিয়া বলিল—

প্রতাপঃ সর্দারজি, আপনি রাজকর্মচারী, এর প্রতিকার আপনিই করুন। এই লোকটির চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন ওদের কি অবস্থা হয়েছে। দেশে রাজা আছে, আইন আছে, আদালত আছে—এই ক্ষুধার্তদের প্রাণ বাঁচাবার ন্যায়সংগত রাস্তা আপনি বলে দিন।

তেজ সিং মাথা হেঁট করিলেন।

তেজ সিংঃ আইনের কোনও হাত নেই।

প্রতাপঃ তাহলে এতগুলো মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য আপনারা কিছুই করতে পারেন না?

তেজ সিং হেঁট মুখে রহিলেন, উত্তর দিলেন না। প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপঃ বেশ, তাহলে আমরাই ওদের প্রাণরক্ষা করব। রাজশক্তি যখন পঙ্গু তখন রাজদ্রোহীরাই রাজার কর্তব্য পালন করবে। ভীম, তৈরি হও তোমরা।

ভীম, নানা, প্রভু ও পুরন্দর যাত্রার আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। তেজ সিং মুখ তুলিলেন।

তেজ সিংঃ কি করতে চান আপনারা?

প্রতাপঃ ক্ষুধার্তের অন্ন ক্ষুধার্তকে ফিরিয়ে দেব। কাজটা আইনসঙ্গত হবে না। কিন্তু আইনের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য আমাদের কাছে বেশী। আপনি আসবেন আমাদের সঙ্গে? ভয় নেই। আপনাকে ডাকাতি করতে হবে না; শুধু দর্শক হিসাবে যাবেন। আমরা কিভাবে ডাকাতি করি স্বচক্ষে দেখলে হয়তো আমাদের খুব বেশী অধম মনে করতে পারবেন না।

তেজ সিং উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তেজ সিংঃ বেশ, যাব আপনাদের সঙ্গে।

প্রতাপ তিলুর দিকে ফিরিয়া ইঙ্গিত করিল।

প্রতাপঃ তিলু—

তিলুঃ এই যে প্রতাপভাই—

তিলু দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রতাপ তখন দূরে দণ্ডায়মান ভিক্ষুকের কাছে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিল।

প্রতাপঃ ভাই, আমরা যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি তুমি এইখানেই থাকো। তুমি ক্ষুধার্ত, তিলুবেন তোমাকে খেতে দেবেন।

অন্ধের অক্ষিকোটর হইতে জল গড়াইয়া পড়িল, সে কম্পিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—

ভিক্ষুকঃ জয় হোক—তোমাদের জয় হোক।

ডিজল্ভ্।

মিঠাপুর গ্রামের জমিদার-মহাজনের কোঠাবাড়ির সম্মুখভাগ। খর্বাকৃতি পুষ্টোদর শেঠজী বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, তিনটি গরুর গাড়িতে শস্যের বস্তা লাদাই হইতেছে। কুলী মজুর ছাড়াও দশ-বারো জন লাঠিয়াল সশস্ত্রভাবে দাঁড়াইয়া এই লাদাই-কার্য তদারক করিতেছে।

গ্রাম্যপথের অপর পাশে মাঠের উপর একদল গ্রামবাসী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের শীর্ণ শরীরে বস্ত্রের বাহুল্য নাই, চোখে হতাশ-বিদ্রোহের ধিকিধিকি আগুন। জীবন-ধারণের একমাত্র উপকরণ চোখের সম্মুখে স্থানান্তরিত হইতেছে অথচ তাহাদের বাধা দিবার ক্ষমতা নাই।

গরুর গাড়িতে বস্তা চাপানো সম্পূর্ণ হইলে শেঠ হাত নাড়িয়া ইশারা করিলেন; তখন বৃহৎ শৃঙ্গধর বলদের দ্বারা বাহিত শকটগুলি চলিতে আরম্ভ করিল। লাঠিয়ালেরা গাড়িগুলির দুই পাশে সারি দিয়া চলিল।

এই সময় গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া প্রথম গরুর গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চোখে উন্মাদের দৃষ্টি; হস্ত আস্ফালন করিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল—

গ্রামবাসীঃ না—যেতে দেবো না—আমাদের ফসল নিয়ে যেতে দেবো না। আমরা খাবো কি? আমাদের ছেলে বৌ খাবে কি?

বারান্দার উপর শেঠ শুনিতে পাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে হুকুম দিলেন—

শেঠঃ মার্ মার্—হতভাগাকে মেরে তাড়িয়ে দে—

একজন লাঠিয়াল আগাইয়া আসিয়া লাঠির গুঁতা দিয়া হতভাগ্যকে পথের পাশে ফেলিয়া দিল।

সহসা বন্দুকের গুড়ুম শব্দ হইল। লাঠিয়ালটা পায়ে আহত হইয়া 'বাপরে' বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

ছয়জন অশ্বারোহী আসিয়া গরুর গাড়ির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ছয়জনের মধ্যে চারজনের হাতে বন্দুক। প্রতাপের কোমরে পিস্তল, তেজ সিং নিরস্ত্র। প্রতাপ সঙ্গীদের বলিল—

প্রতাপঃ তোমরা এদের আটকে রাখো—আমরা মহাজনের সঙ্গে কথা কয়ে আসি। আসুন সর্দারজি।

প্রতাপ ও তেজ সিং ঘোড়া হইতে নামিয়া বাড়ির বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শেঠ বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, মাত্র দুই জন নিরস্ত্র লোক দেখিয়া তাহার সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অনেক লোক লস্কর লাঠিয়াল আছে, দুইজন লোককে তাঁহার ভয় কি? তিনি রুক্ষদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিলেন। প্রতাপ কাছে আসিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল—

প্রতাপঃ আপনিই কি গ্রামের শেঠ?

শেঠঃ হ্যাঁ। তোমরা কে?

প্রতাপ উত্তব না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন কবিল—

প্রতাপঃ এই যে ফসল চালান দিচ্ছেন এ কি আপনার ফসল?

শেঠঃ সে খবরে তোমার দরকার কি? কে তুমি?

প্রতাপঃ (সবিনয়ে) প্রতাপ বারবটিয়া।

ঝাঁটার প্রহারে মাকড়সা যেমন কুঁকড়াইয়া যায়, নাম শুনিযা শেঠও তেমনি কুঁচকাইয়া গেলেন, প্রতাপেব পিস্তলটার প্রতি হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল।

প্রতাপঃ প্রজারা খেতে পাচ্ছে না, এ সময় ফসল চালান দেওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে?

শেঠঃ আমি—আমার—এঁ—প্রজারা দাম দিতে পারে না—তাই—

প্রতাপ একটু হাসিল; তাহার একটা হাত অবহেলা ভরে পিস্তলের মুঠের উপর পড়িল।

প্রতাপঃ হুঁ। আপনি প্রজাদের ফসল বাজেয়াপ্ত করে সেই ফসল দশগুণ দরে তাদেরই বিক্রি করছেন। এখন তারা নিঃস্ব। তাই তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আপনি বাইরে মাল চালান দিচ্ছেন—

ভয়ে শেঠের নাভি পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সামান্য গ্রাম্য মহাজন, চাষীদের উপর যতই দাপট হোক, প্রতাপ বারবটিয়ার সহিত বাক্-যুদ্ধ করিবার সাহস তাঁহার নাই। তিনি একেবারে কেঁচো হইয়া গিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলিলেন—

শেঠঃ আমার দোষ হয়েছে—কসুর হয়েছে, এবারটি আমায় মাফ্ করুন। আপনি যা বলবেন তাই করব।

প্রতাপ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ক্ষণেক বিবেচনা করিল।

প্রতাপঃ আপনি প্রজাদের কাছ থেকে যে লাভ করেছেন তাতে আপনার বকেয়া খাজনা শোধ হয়ে গেছে? সত্যি কথা বলুন।

শেঠঃ অ্যাঁ—হ্যাঁ, শোধ হয়ে গেছে।

প্রতাপঃ তাহলে এখন আপনার ঘরে যা ফসল আছে তা উপরি। কত ফসল আছে?

শেঠঃ তা—তা—

প্রতাপঃ সত্যি কথা বলুন। নইলে ফসল তো যাবেই, আপনার ঘর-বাড়িও আস্ত থাকবে না।

শেঠঃ পাঁচশো মন আছে—পাঁচশো মন।

প্রতাপঃ বেশ, এই পাঁচশো মন ফসল ন্যায্য অধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

শেঠঃ (ক্রন্দনোন্মুখ) সবই যদি ফিরিয়ে দিই তবে সারা বছর আমি খাব কি?

প্রতাপঃ পাঁচজনের মত আপনিও কিনে খাবেন। এখন আসুন আমার সঙ্গে।

ওদিকে গরুর গাড়িগুলি এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, লাঠিয়ালেরা সম্মুখে বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, আহত লাঠিয়ালটা আহত গ্রামবাসীর পাশে বসিয়া মৃদু কুন্থন করিতেছিল। এখন শেঠ মহাশয় প্রতাপ ও তেজ সিংয়ের মধ্যবর্তী হইয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রতাপঃ আপনার লাঠিয়ালদের সরে যেতে বলুন।

শেঠঃ (হাত নাড়িয়া) ওরে তোরা সব সরে যা।

লাঠিয়ালেরা বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া সরিয়া গেল। আহত লাঠিয়ালটা হামাগুড়ি দিয়া তাহাদের অনুগামী হইল।

প্রতাপঃ এবার বলুন—প্রজাদের দিকে ফিরে বলুন—

প্রতাপ নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল, শেঠ মন্ত্র পড়ার মত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

শেঠঃ ভাই সব—তোমাদের পাঁচশো মন ফসল আমার কাছে গচ্ছিত আছে—তোমাদের যখন ইচ্ছে তোমরা সে ফসল নিয়ে যেয়ো (ঢোক গিলিয়া)—দাম দিতে হবে না। উপস্থিত এই তিন গরুর গাড়ি মাল তোমরা নিয়ে যাও—

প্রজারা ক্ষণকালের জন্য নিশ্চল হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তারপর চিৎকার শব্দে গগন বিদীর্ণ করিয়া গরুর গাড়ি তিনটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রতাপ তেজ সিংয়ের পানে চাহিয়া পরিতৃপ্তির হাসি হাসিল। তেজ সিং মাথা হেঁট করিলেন।

ফেড্ আডট্।

ফেড্ ইন্।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

চিন্তার পরপে সূর্যাস্ত হইতে বিলম্ব নাই। বারান্দার কিনারায় দাঁড়াইয়া চিন্তা একজন পথিকের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে। সন্ধ্যার পর পরপে আর কেহ আসে না, এই লোকটি বোধ হয় শেষ রাহী।

জল পান শেষ করিয়া পথিক যখন মুখ তুলিল তখন দেখা গেল, সে কান্তিলাল। কান্তিলাল আজ সুযোগ পাইয়া একাকী পরপে আসিয়াছে।

মুখ মুছিতে মুছিতে সে চিন্তার দিকে চোখ বাঁকাইয়া বেশ একটু ভঙ্গিমা সহকারে হাসিল।

কান্তিলালঃ কি পানিহারিন্, পুরোনো রাহীকে চিন্তেই পারছ না নাকি?

চিন্তা কান্তিলালকে বিলক্ষণ চিনিয়াছিল, সে গম্ভীর বিরক্তমুখে বলিল—

চিন্তাঃ জল খেলে, এবার নিজের কাজে যাও।

কান্তিলাল বারান্দার কিনারায় বসিল।

কান্তিলালঃ সূর্যি ডুবতে চলল, এখন আর আমার কাজ কি? কথায় বলে, দিনের চাকর রাতের নাগর। এস না দু'দন্ড বসে কথা কই—

চিন্তাঃ আমি সরকারের চাকর, যতক্ষণ সূর্য আকাশে থাকবে ততক্ষণ রাহীদের জল দিয়ে সেবা করা আমার কাজ। কিন্তু এখন আর আমি কারুর চাকর নই—

কান্তিলালঃ আমি সেই কথাই তো বলছি পানিহারিন্! এখন তোমারও কাজ ফুরিয়েছে আমারও কাজ ফুরিয়েছে— একটু আমোদ করার এই তো সময়। নাও, বোসো এসে—আজ আর এপথে কেউ আসবে না।

কান্তিলাল পদদ্বয় বারান্দার উপর তুলিয়া আরও জুত করিয়া বসিল।

চিন্তাঃ যাও বলছি—নইলে—

কান্তিলাল এতক্ষণ নরম সুরে কথা বলিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল মিষ্ট কথায় চিঁড়া ভিজিবে না তখন সে মনের জঘন্যতা উদ্ঘাটিত করিয়া হাসিল।

কান্তিলালঃ অত ছলাকলায় দরকার কি পানিহারিন্! তুমিও জানো আমি কি চাই আর আমিও জানি তুমি কি চাও—

চিন্তা বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—

চিন্তাঃ যাও—ভাল চাও তো এখনও যাও—

কান্তিলালঃ আর যদি না যাই? কি করবে? জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারবে? বেশ—চলে এস—দেখি তোমার গায়ে কত জোর—

বলিয়া কান্তিলাল কৌতুকভরে বাহ্বাস্ফোট করিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার হাসি দীর্ঘস্থায়ী হইল না; এই সময় একটি বলিষ্ঠ হস্ত আসিয়া তাহার কর্ণধারণপূর্বক এমন সজোরে নাড়া দিল যে কান্তিলালের হাসি মুদারাগ্রাম ছাড়িয়া কাতরোক্তির তারাগ্রামে গিয়া উঠিল।

কান্তিলালঃ কে রে তুই? ছাড়্ ছাড়্—

কর্ণধারণ করিয়াছিল নানাভাই। নানাভাইয়ের সাজপোষাক সাধারণ পথিকের মতই, উত্তরীয়ের একপ্রান্তে একটি মধ্যমাকৃতি পুঁটুলি পিঠের উপর ঝুলিতেছে। নানা চিন্তার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—

নানাভাইঃ পানিহারিন্, লোকটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?

চিন্তা নীরবে ঘাড় নাড়িল। কান্তিলালের কান তখনও নানার আঙুলের জাঁতিকলে ধরা ছিল, সে উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে তর্জন করিল—

কান্তিলালঃ কে তুই? এত বড় আস্পর্ধা—

নানাভাই কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কান্তিলালকে কান ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইল।

নানাভাইঃ আমিও তোর মত একজন রাহী কিন্তু তোর মত ছোটলোক নই। যা, আর এখানে দাঁড়ালে বেইজ্জত হয়ে যাবি।

কান্তিলালঃ বেইজ্জত?

নানাভাইঃ হ্যাঁ, তোর নাক কান কেটে নেব।—যা!

নানাভাই কান ছাড়িয়া দিল। কান্তিলাল দেখিল আততায়ীর চেহারা যেমন নিরেট, চোখের দৃষ্টিও তেমনি কড়া। সে আর বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিল না, পদাহত কুক্কুরের মত পলায়ন করিল। যাইবার সময় চিন্তার পানে একটা বিষাক্ত অপাঙ্গ-দৃষ্টি হানিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া গেল—

কান্তিলালঃ আচ্ছা—

কান্তিলাল অদৃশ্য হইয়া গেলে নানাভাই পুঁটুলি নামাইয়া বারান্দার ধারে বসিল।

নানাভাইঃ চিন্তাবেন, দেশে পাজি লোকের অভাব নেই, তুমি সাবধানে থাকো

তো?

চিন্তাঃ ভয় নেই, দরকার হলে আমার কাটারি আছে। কিন্তু তোমার পুঁটুলিতে ও কী নানাভাই?

নানাভাইঃ আর বল কেন? তিলুবেনের কুড়্মুড়া* খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই অনেক সন্ধান করে নিয়ে যাচ্ছি।

চিন্তাঃ (হাসিয়া) আহা বেচারা!—নানাভাই, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। আজ সকালে ঝরণায় জল ভরতে গিয়ে—। কিন্তু আগে তোমায় জলপান দিই, তারপর বলব—

ডিজল্ভ্।

রাত্রিকাল। দস্যুদের গুহার অভ্যন্তর। কয়লার গন্গনে আগুনের সম্মুখে বসিয়া তিলু মোটা মোটা বাজরির রুটি সেঁকিতেছে। নানাভাই ছাড়া আর সকলে আগুন ঘিরিয়া বসিয়াছে; কারণ দিনের বেলা যতই গরম হোক, রাত্রে এই পাহাড়ের অধিত্যকায় বেশ ঠান্ডা পড়ে। হাতে কোনও কাজ নাই, তাই সকলে মিলিয়া তিলুকে খেপাইতেছিল; এমন কি তেজ সিংও গম্ভীরমুখে এই কৌতুকে যোগ দিয়াছিলেন।

পুরন্দরঃ (উদ্বিগ্নমুখে) নানাভাই এখনও ফিরল না—

প্রভুঃ হুঁ—রাত কম হয়নি।

ভীমভাই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

ভীমভাইঃ বলতে নেই হয়তো ধরা পড়ে গেছে—

তিলু দুই হাতে রুটি গড়িতে গড়িতে ক্রুদ্ধ চোখে তাহার পানে চাহিল।

তিলুঃ যা তা বোলো না। নানাভাই এখনি ফিরে আসবেন। তিনি বলে গেছেন তাঁর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

তেজ সিংঃ কাজটা ভাল হয়নি তিলুবেন। নানাভাইয়ের মত একজন দুর্দান্ত ডাকাতকে মুড়ি আনতে পাঠানো—(দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িলেন)—

প্রতাপঃ (উদাসকণ্ঠে) হয়তো সেই লজ্জাতেই নানাভাই দল ছেড়ে চলে গেছেন। হাজার হোক বীরপুরুষ তো। তাকে মুড়ি আনতে বলা—(মাথা নাড়িল)—

সকলেই দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িল। তিলুর মুখ কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল, সে হাতের রুটি রাখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—

তিলুঃ আমি বলিনি—আমি বলিনি নানাভাইকে মুড়ি আনতে। আমি খালি বলেছিলাম—

পুরন্দরঃ তুমি যা বলেছিলে সে তো আমরা সবাই শুনেছি। সেকথা শোনবার পর নানাভাইয়ের মত একজন কোমলপ্রাণ ডাকাত কি করে আর স্থির থাকতে পারে! সে না গেলে আমি যেত্যম—

ভীমভাইঃ কেউ না গেলে শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হয়। বলতে নেই—

তিলু ব্যাকুলনেত্রে সকলের মুখের পানে চাহিতে চাহিতে তেজ সিংয়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারিল সকলে তাহাকে লইয়া তামাশা করিতেছে। তিলুর সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ভীমভাইয়ের উপর। একদলা বাজরির নেচি তুলিয়া লইয়া সে ভীমভাইকে ছুঁড়িয়া মারিল।

এই সময় গুহামুখে মানুষের গলাব আওয়াজ হইল; আওয়াজ গুহার মধ্যে

* কুড়্মুড়া—মুড়ি

প্রতিধ্বনিত হইয়া ভয়ঙ্কর শুনাইল।

আওয়াজঃ হুঁশিয়ার!

সকলে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ভয়ের কারণ ছিল না; পরক্ষণেই নানাভাই আলোকচক্রের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধা।

নানাভাইঃ প্রতাপ বারবটিয়া, একজন স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়—

বলিয়া চোখের কাপড় খুলিয়া দিল। সকলে চমৎকৃত হইয়া দেখিল—চিন্তা।

প্রতাপঃ (হর্ষোৎফুল্ল) চিন্তা!

তিলু একঝাঁক ছাতারে পাখির মত আনন্দকূজন করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া চিন্তাকে জড়াইয়া ধরিল।

ওয়াইপ্।

চিন্তার প্রথম গুহায় আগমনেব আনন্দ-সংবর্ধনা কথঞ্চিত শান্ত হইয়াছে। সকলে আবার আগুন ঘিরিয়া বসিয়াছে এবং পরম তৃপ্তির সহিত মুড়ি চিবাইতেছে। চিন্তার একপাশে প্রতাপ; অন্যপাশে তিলু তাহার একটা বাহু দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে, যেন ছাড়িয়া দিলেই সে পায়রার মত উড়িয়া যাইতে পারে।

চিন্তা চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া সকলকে দেখিতেছে; তাহার মুখে অসূয়া-বিদ্ধ হাসি।

চিন্তাঃ তোমাদের দেখলে হিংসে হয়। আমিও যদি এখানে এসে থাকতে পারতাম!

সকলে অপ্রতিভভাবে নীরব রহিল; ভীমভাই এক খাবলা মুড়ি মুখে ফেলিয়া অর্ধমুদিত নেত্রে চিবাইতে চিবাইতে বলিল—

ভীমভাইঃ আমাদেরই কি সাধ হয় না চিন্তাবেন। তুমি এলে, বলতে নেই, তিলুর রান্না থেকে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ মুখবদল হত।

সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিলুও হাসিল। চিন্তা নিশ্বাস ফেলিল।

চিন্তাঃ যা হবার নয় তা ভেবে আর কি হবে? আমাকে কিন্তু রাত পোহাবার আগেই ফিরতে হবে। কে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

পুরন্দরঃ সে জন্যে ভেবো না বেন। আমরা সবাই মিছিল করে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

প্রতাপঃ তার এখনও অনেক দেরি আছে। মিছিল করবার দরকার নেই, আমি আর মোতি চিন্তাকে খুব শীগ্‌গির পৌঁছে দিতে পারব। আকাশে চাঁদ আছে—

ভীম আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভীমভাইঃ হুঁ হুঁ—আকাশে চাঁদ আছে। বলতে নেই কথাটা এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি। দীর্ঘ বিরহের পর তরুণ তরুণীর যখন মিলন হয় তখন তারা কিঞ্চিৎ নিরিবিলি খোঁজে। চল, আমরা সব বাইরে গয়ে বসি।

প্রতাপঃ ভীম, পাগলামি কোরো না—বোসো। চিন্তা, কোনও খবর আছে নাকি?

চিন্তাঃ খবর দিতেই তো এলাম। চিঠিতে অত কথা লেখা যায় না, নানাভাই বললেন মুখে সব কথা না বললে হবে না—তাই—

প্রতাপঃ কি কথা?

চিন্তা একটু নীরব থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

চিন্তাঃ আজ সকালে একটা ব্যাপার ঘটেছে। আমি রোজ যেমন জল ভরতে যাই তেমনি ঝরণায় গিয়ে দেখি—

ডিজল্‌ভ্‌।

ভোরের আলোয় ঝরণার সঞ্চিত জলাশয় ঝিলমিল করিতেছে। চিন্তা কলস কাঁখে জল ভরিতে আসিতেছে, প্রায় জলের কিনারা পর্যন্ত পেঁছিয়া চিন্তা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখা গেল, একটা অর্ধনিমজ্জিত পাথরের আড়ালে প্রায় এক কোমর জলে দুইটি যুবক যুবতী দাঁড়াইয়া আছে—যুবকের বাঁ হাত যুবতীর ডান হাতের সহিত শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহারা চিন্তাকে দেখিতে পায় নাই, তীরের দিকে পিছন ফিরিয়া ধীরে ধীরে গভীর জলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

চিন্তার কটি হইতে কলস পড়িয়া গেল; সে অস্ফুট চিৎকার করিয়া ছুটিতে ছুটিতে জলের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। ইহারা দুইজন যে মৃত্যুপণে আবদ্ধ হইয়া হাতে হাত বাঁধিয়া জলে নামিতেছে তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।।

জলের মধ্যে দুইজন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। চিন্তাকে দেখিযা তাহাদের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; তাহারা যেন মনের মধ্যে মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গিয়াছিল, এখন বাধা পাইয়া আবার জীবন্ত-লোকে ফিরিয়া আসিল।

চিন্তা দুই হাত নাড়িয়া তাহাদের ডাকিল।

যুবক যুবতী কাতরনেত্রে পরস্পরের পানে চাহিল। কি করিবে এখন তাহারা; একব্যক্তি দাঁড়াইয়া দেখিতেছে; এ অবস্থায় আত্মহত্যা করা যায় না। তাহারা কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া ধীরে ধীরে তীরের পানে ফিরিযা আসিতে লাগিল।

ওয়াইপ্‌।

যুবক যুবতী তীরে আসিযা একটি পাথবের উপর বসিয়াছে, যুবক লজ্জিতমুখে হাতের বন্ধন খুলিযা ফেলিতেছে। তাহাদের যুবক যুবতী না বলিয়া কিশোর কিশোরী বলিলেই ভাল হয; ছেলেটির বযস কুড়ির বেশী নয়, মেয়েটির পনেরো ষোলো। দু'জনেই সুশ্রী, মুখে বয়সোচিত সরলতা মাখানো।

চিন্তা অদূরে আর একটি পাথরের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে দেখিতে দেখিতে বলিল –

চিন্তাঃ তোমাদের বাড়ি কোথায়?

ছেলেটি কুণ্ঠা-লাঞ্ছিত মুখ তুলিল।

ছেলেটিঃ দহিসার গ্রামে—এখান থেকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে—

চিন্তাঃ তোমরা একাজ করতে যাচ্ছিলে কেন?

ছেলেটিঃ (কাতর স্বরে) আমাদের আর উপায় ছিল না বেন। আমি প্রভাকে বিয়ে করতে চাই—প্রভাও আমাকে—

প্রভা কুমারী-সুলভ গর্বে একটু ঘাড় বাঁকাইল।

চিন্তাঃ তারপর?

ছেলেটিঃ প্রভার বাপু পাশের গাঁয়ের মহাজনের কাছে অনেক টাকা ধার করেছেন, শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। বুড়ো মহাজন বলেছে তার সঙ্গে প্রভার বিয়ে দিতে হবে, নইলে সে প্রভার বাপুর জমিজমা ঘরবাড়ি সব দখল করে নেবে।

চিন্তাঃ প্রভার বাপু রাজী হয়েছেন?

ছেলেটিঃ হুঁ—কাল বিয়ে।

চিন্তাঃ তাই তোমরা আত্মহত্যা করতে এসেছ—

চিন্তা উঠিয়া গিয়া তাহাদের মাঝখানে বসিল, দু'হাতে দু'জনের স্কন্ধ জড়াইয়া লইয়া বলিল—

চিন্তাঃ শোনো, তোমরা আত্মহত্যা কোরো না—গ্রামে ফিরে যাও—

দু'জনে অবাক হইয়া চিন্তার মুখের পানে চাহিল।

চিন্তাঃ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মহাজনের সঙ্গে বিয়ে আমি রদ করবার চেষ্টা করব। যদি না পারি, বিয়ের পর তোমবা যা ইচ্ছে কোরো—

গুহামধ্যে চিন্তা গল্পবলা শেষ করিয়া কহিল—

চিন্তাঃ আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি। এখন তাদের জীবন মরণ তোমাদের হাতে।

প্রতাপ আগুনের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—

প্রতাপঃ কাল বিয়ে?

চিন্তাঃ হ্যাঁ, আজ রাত পোহালে কাল বিয়ে।

প্রতাপ তেজ সিংয়ের দিকে ফিরিল।

প্রতাপঃ সর্দারজি, আপনি কি বলেন? মহাজনের সঙ্গে বিয়ে হতে দেওয়া উচিত?

তেজ সিং অপ্রতিভভাবে ক্ষণেক ইতস্তত করিলেন।

তেজ সিংঃ না।

প্রতাপঃ কিন্তু আইনে এর কোনও দাবাই আছে কি?

তেজ সিংঃ না।

প্রতাপঃ তাহলে জোর করে এ বিয়ে ভেঙে দিই?

তেজ সিংঃ হ্যাঁ।

সকলের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভীমভাই নানাভাইয়ের পেটে একটি গোপন কনুইয়ের গুঁতা মারিয়া চোখ টিপিল।

পরদিন সন্ধ্যা। দাহিসার গ্রামে প্রভার পিতৃ-ভবনে সানাই বাজিতেছে। প্রভাব পিতা মধ্যবিত্ত ভদ্র-গৃহস্থ। তাঁহার বাড়ির উন্মুক্ত অঙ্গনে বিবাহমণ্ডপ রচিত হইয়াছে—গ্রাম্যরীতিতে যতদূর সম্ভব সুসজ্জিত হইযাছে। গ্রামেব নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা একে একে আসিয়া আসরে বসিতেছেন। ববের আসন এখনও শূন্য রহিযাছে।

বাড়ির অন্দরে একটি ঘরে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বধূ-বেশিনী প্রভাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সকলে মাঙ্গলিক-গীত গাহিতেছে, কেহ বা বধূকে সাজাইয়া দিতেছে, কিন্তু কাহারও মুখে হাসি নাই। প্রভা চুপটি করিয়া বসিয়া আছে, মাঝে মাঝে চকিতা হরিণীর মত সশঙ্ক-চোখে সকলের মুখের পানে তাকাইতেছে। সে মনে মনে বড় ভয় পাইয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কাল যখন ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল তখন তাহার মুখে এমন ভয়ের ছাপ পড়ে নাই।

বাড়ির সদরে বারান্দার এক কোণে একটি ঘরের মধ্যে বর ও বরযাত্রীদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বরের সহিত নাপিত পুরোহিত এবং গুটিকয়েক প্রৌঢ় বরযাত্রী আসিয়াছে। বর রূপচন্দ মহাজনের চেহারাটি পাকানো বংশ-যষ্টির মত, গোঁফ অধিকাংশ

পাকিয়া গিয়াছে, গালের শুষ্কচর্ম কুঞ্চিত হইয়া ভিতর দিকে চুপ্‌সাইয়া গিয়াছে। তিনি বেশ-ভূষা সমাপ্ত করিয়া এখন মুখের প্রসাধনে মন দিয়াছেন। কিন্তু মুখখানা কিছুতেই মনের মত হইতেছে না। নাপিত তাঁহার মুখের সম্মুখে একটি ছোট আয়না ধরিয়া রাখিয়াছে, তিনি তাহাতে মুখ দেখিতেছেন এবং নানা ভঙ্গী করিয়া, কি উপায়ে মুখখানাকে উন্নত করা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

একটি থালার উপর অনেকগুলি পান রাখা ছিল, বর মহাশয় তাহাই এক থাবা তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন, তবু যদি গাল দুটি পরিপুষ্ট দেখায়! অতঃপর চুলের কি করা যায়? মাথায় না হয় পাগড়ি থাকিবে কিন্তু গোঁফের অম্লান পরিপক্কতা ঢাকা পড়িবে কি রূপে? বিভ্রান্তভাবে গোঁফের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে শেঠ নাপিতকে শুধাইলেন—

রূপচন্দঃ কি করি বল্‌না রে! গোঁফজোড়া যে বড্ড সাদা দেখাচ্ছে। কামিয়ে দিবি?

হঠাৎ দ্বারের নিকট হইতে অট্টহাস্যে প্রশ্নের জবাব আসিল। শেঠ চমকিয়া দেখিলেন, একজন পাহাড়ী ঝোলা কাঁধে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে কাজল, চুলে ধনেশ পাখির পালক। পাহাড়ী হাসিতে হাসিতে বলিল—

পাহাড়ীঃ বল কি শেঠ? এ কি বাপের শ্রাদ্ধ করতে এসেছ যে গোঁফ কামিয়ে ফেলবে? আরে ছি ছি ছি! তোমার নতুন বৌ দেখলে বলবে কি?

শেঠ রূপচন্দ নবজাগ্রত কৌতূহলের সহিত আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিলেন।

রূপচন্দঃ পাহাড়ী মনে হচ্ছে! জড়ি-বুটি কিছু জানো নাকি?

পাহাড়ী ঘরে প্রবেশ করিল।

পাহাড়ীঃ তা জানি বৈকি। আমার এই ঝোলার মধ্যে এমন চীজ আছে, তোমাকে পঁচিশ বছরের ছোকরা বানিয়ে দিতে পারি শেঠ—পঁচিশ বছরের ছোকরা।

রূপচন্দঃ অ্যাঁ—তা—বোসো বোসো। পণ্ডিতজি, লগনের এখনও দেরি আছে তো?

পুরোহিতঃ এখনও দু'ঘড়ি দেরি আছে।

পাহাড়ীঃ আমি এক ঘড়ির মধ্যে তোমার ভোল বদলে দেব শেঠ। কিন্তু তোমার সঙ্গীদের বাইরে যেতে বল, এসব যন্তর-মন্তর একটু আড়ালে করতে হয়—

রূপচন্দঃ বেশ তো—বেশ তো। তোমরা সব আসরে গিয়ে বোসো, পান তামাক খাও। লগন্ হলে আমাকে খবর দিও।

সঙ্গীরা সকলে বাহির হইয়া গেল। পাহাড়ী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শেঠের সম্মুখে আসিয়া বসিল। শেঠের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে সে ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া একটি ভীষণদর্শন ছোরা বাহির করিয়া সহসা শেঠের বুকের উপর ধরিল।

পাহাড়ীঃ চুপটি করে থাকো শেঠ। নইলে তোমার চেহারা এমন বদ্‌লে যাবে যে কিছুতেই মেরামত হবে না।

পাহাড়ী স্বয়ং প্রতাপ।

রাত্রি হইয়াছে, বিবাহমণ্ডপে আলো জ্বলিতেছে। বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর সমাগমে আসর ভরিয়া গিয়াছে। বরযাত্রী কয়জন একস্থানে সংঘবদ্ধ হইয়া বসিয়াছেন এবং পান বিড়ি সেবন করিতেছেন।

কন্যার বাপ অবগুণ্ঠিতা কন্যাকে অন্দর হইতে আনিয়া আসরে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিলেন। পুরোহিত কিছু মন্ত্র পড়িলেন, তারপর হাঁকিলেন—

পুরোহিতঃ এবার বরকে নিয়ে এস।

বরযাত্রীরা উঠি উঠি করিতেছেন এমন সময় বর নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের পাগড়ি হইতে মুখের উপর শোলার ঝালর ঝুলিতেছে। সকলে সরিয়া গিয়া বরের পথ ছাড়িয়া দিল—বর গিয়া কন্যার সম্মুখে পিঁড়ির উপর বসিলেন।

বরের মুখ যদিও কেহই দেখিতে পাইল না, তবু তাঁহার যুবজনোচিত অঙ্গ-সঞ্চালন দেখিয়া সকলেই একটু বিস্মিত হইল। একজন বরযাত্রী অন্য একটি বরযাত্রীর কানে কানে বলিল—

বরযাত্রীঃ পাহাড়ী ভেল্‌কি দেখিয়ে দিয়েছে—একেবারে ঠাট বদলে দিয়েছে—অ্যাঁ!

অতঃপর বিবাহবিধি আরম্ভ হইল, পুরোহিত আড়ম্বর সহকারে অতি দ্রুত মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

মণ্ডপের আনাচে-কানাচে পাঁচটি লোক উপস্থিত ছিল, কিন্তু কেহ তাহাদের ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। তাহারা গ্রামের লোক নয়, কিন্তু অপরিচিত লোক দেখিয়া কেহ কিছু সন্দেহ করে নাই; বরযাত্রীরা ভাবিয়াছিল, তাহারা কন্যাপক্ষীয় লোক এবং কন্যাপক্ষীয়েরা ভাবিয়াছিল, বরযাত্রী ছাড়া আর কে হইতে পারে। বিবাহ বাসরে এরূপ ভ্রান্তি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

নানাভাই, প্রভু, ভীমভাই, পুরন্দর ও তেজ সিং একটি একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহক্রিয়া দেখিতেছিলেন; প্রতাপ বর-কন্যার আসনের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার আর পাহাড়ী-বেশ নাই, ঝোলা অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল কোমর হইতে একটি মধ্যমাকৃতি থলি ঝুলিতেছে।

পুরোহিত বর-বধূর হস্ত সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার উপর একটি নারিকেল রাখিয়া প্রবল বেগে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

ওয়াইপ্‌।

অর্ধঘণ্টা মধ্যে বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হইল।

পুরোহিত ও কন্যার পিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পুরোহিত সভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

পুরোহিতঃ বিবাহবিধিঃ সমাপ্তা। সজ্জনগণ, নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করুন।

সভা হইতে মৃদু হর্ষধ্বনি উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহা নীরব হইল। সকলে দেখিল, একজন অপরিচিত ব্যক্তি বর-বধূর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; ঈষৎ হাসিয়া সে বর ও বধূর মুখ হইতে আবরণ সরাইয়া দিল।

অপরিচিত ব্যক্তির এই স্পর্ধায় সকলেই অসন্তুষ্ট হইত কিন্তু বরের মুখ দেখিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। এ তো বৃদ্ধ মহাজন রূপচন্দ্র নয়; পাহাড়ীর ভেল্‌কিবাজিও শুষ্ক মহাজনকে কুড়ি বছরের কমকান্তি যুবকে পরিণত করিতে পারে না। তাছাড়া যুবকটি গ্রামের সকলেরই পরিচিত। প্রথম বিমূঢ়তার চটকা ভাঙিলে সভা হইতে একজন বলিয়া উঠিল—

একজনঃ আরে এ যে চন্দু—আমাদের পাড়ার চন্দু!

প্রতাপ নত হইয়া প্রভার কানে প্রশ্ন করিল—

প্রতাপঃ বেন, চোখ তুলে দেখ। বর পছন্দ হয়েছে?

প্রভা একবার শঙ্কা-নিবিড় চোখ দুটি তুলিল, ক্ষণেকের জন্য বিস্ময়ানন্দে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল, তারপর সে চক্ষু নত করিল।

বরযাত্রিগণ এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এবং নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে বরাসনে যে-ব্যক্তি বসিয়া আছে সে আর যে হোক রূপচন্দ মহাজন নয়। তাঁহারা একজোটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একজন সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন—

বরযাত্রীঃ একি—এসব কী! আমাদের বর কোথায়?

প্রতাপের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মণ্ডপের প্রবেশপথের দিকে দেখাইল।

ছিন্নবাস আলুথালু বেশে শেঠ প্রবেশ করিতেছেন। এখনও তাঁহার হাত হইতে দড়ি ঝুলিতেছে। প্রতাপ তাঁহার মুখ বাঁধিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই অবস্থা হইতে তিনি বহুকষ্টে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন। কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি বরাসনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বর-বধূর দিকে জ্বলন্ত অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি শেষে কন্যার পিতার পানে চাহিলেন।

রূপচন্দঃ দাগাবাজ জোচ্চোর! আমাকে এই অপমান! তোর সর্বনাশ করব আমি। তোর ভিটে-মাটি চাটি করব—

প্রতাপ শান্তকণ্ঠে কহিল—

প্রতাপঃ রাগ কোরো না শেঠ, যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

শেঠ শীর্ণদেহ ধনুকের মত বাঁকাইয়া প্রতাপের পানে ফিরিলেন।

রূপচন্দঃ তুই কে রে—তুই কে? অ্যাঁ—পাহাড়ী!

প্রতাপের মুখ গম্ভীর হইল, সে গলা চড়াইয়া সকলকে শুনাইয়া বলিল—

প্রতাপঃ পাহাড়ী নই—আমি প্রতাপ বারবটিয়া।—শেঠ, আমি একলা আসিনি—আমার সঙ্গিরা এই সভাতেই আছে, সুতরাং কেউ গোলমাল করবার চেষ্টা কোরো না।—এই ঘাটের মড়ার সঙ্গে প্রভাবেনের বিয়ে দিলে শুধু প্রভার বাপের নয়, গাঁসুদ্ধ লোকের অধর্ম হত। আমরা সেই অধর্ম থেকে তোমাদের রক্ষা করেছি। কিন্তু এমন কাজ ভবিষ্যতে আর কোরো না।—মহাজন, তোমার টাকা তুমি ফেরত পাবে, এখন বাড়ি ফিরে যাও। মনে থাকে যেন, প্রভার বাপের ওপর যদি কোনও জুলুম হয় আবার আমরা ফিরে আসব।—প্রভাবেন, এই নাও তোমার বিয়ের যৌতুক, এই দিয়ে তোমার বাপুর ঋণ শোধ কোরো।

প্রতাপ কোমর হইতে থলি লইয়া প্রভার কোলের উপর একরাশ মোহর ঢালিয়া দিল। সভাসুদ্ধ লোক হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

চাঁদনী রাত্রি। সুদূরপ্রসারী আবছায়া-প্রান্তরের উপর দিয়া প্রতাপের দল ফিরিয়া চলিয়াছে, ছয়টি ঘোড়া পাশাপাশি ছুটিতেছে। তাহাদের সম্মুখে নবোদিত পূর্ণচন্দ্র পূর্বগগনে স্থির হইয়া আছে।

ছুটিতে ছুটিতে একটি ঘোড়া দল হইতে পৃথক হইয়া গেল—সে মোতি। প্রতাপ তাহার পৃষ্ঠ হইতে হাত নাড়িয়া বলিল—

প্রতাপঃ তোমরা ফিরে যাও—আমি কাল সকালে ফিরব।

প্রতাপ ক্রমে দল হইতে দূরে সরিয়া গেল। দলের পাঁচটি ঘোড়া পাশাপাশি চলিয়াছে—মাঝখানে তেজ সিং। নানা তাঁহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

নানাভাইঃ তৃষ্ণার্ত বিরহী জলের সন্ধানে চল্‌ল।

ভীমভাই বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

ভীমভাইঃ বলতে নেই পরের বিয়ে দেখলে মনটা কিঞ্চিৎ খারাপ হয়ে যায়। আমারও তিলুর জন্যে—

ভীমের ঘোড়া সকলকে ছাড়াইয়া আগে বাড়িল।

চন্দ্র আকাশে হাসিতেছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

চিন্তার পরপের সম্মুখ দিয়া পথের যে অংশ গিযাছে, একজন অশ্বারোহী সেই চড়াই-পথে পরপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চাঁদের আলোয় দূর হইতে দেখিলে মনে হয় বুঝি প্রতাপ, কিন্তু কাছে আসিলে দেখা যায়—কান্তিলাল। খর্বাকৃতি ঘোড়ার পশ্চাদ্ভাগে খেজুর ছড়ি দিয়া তাড়না করিতে করিতে কান্তিলাল অভিসারে চলিয়াছে।

পরপের দৃষ্টিসীমার মধ্যে পেঁছিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল, ঘোড়ার রাশ ধরিয়া রাস্তা হইতে কিছু দূরে একটি শুষ্কবৃক্ষের শাখায় তাহাকে বাঁধিল; তারপর আপন-মনে দন্ত বিকীর্ণ করিয়া হাসিতে হাসিতে লঘুপদে পরপের দিকে চলিল।

পরপের বারান্দার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঘরের দ্বার রুদ্ধ। কান্তিলাল পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দায় উঠিতে যাইবে এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষুরধ্বনি পরপের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কান্তিলাল ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তারপর দ্রুত ফিরিয়া গিয়া একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপকে মোতির পৃষ্ঠে আসিতে দেখা গেল। কান্তিলাল ঝোপের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া প্রতাপকে দেখিল, কিন্তু আবছায়া-আলোতে ঠিক চিনিতে পারিল না। প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠ হইতে বারান্দায় নামিয়া মোতিকে ছাড়িয়া দিল, তারপর দ্বারে গিয়া টোকা মারিল।

প্রতাপঃ চিন্তা, দোর খোলো—আমি প্রতাপ।

ঝোপের আড়ালে কান্তিলালের চোখদুটা ধক্‌ করিয়া উঠিল। প্রতাপ! প্রতাপ বারবটিয়া! সে আবার ঝোপের ফাঁক দিয়া দেখিল, সম্মুখেই মোতি দাঁড়াইয়া আছে। হ্যাঁ, প্রতাপের ঘোড়াই তো বটে! কান্তিলালের সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় শক্ত হইয়া উঠিল।

ওদিকে চিন্তা দ্বার খুলিয়াছিল; প্রতাপ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কান্তিলাল উত্তেজনা-প্রজ্বলিত চোখে শুষ্ক অধর লেহন করিল।

ঘরের ভিতরটি প্রদীপের মৃদু-আলোকে স্নিগ্ধ হইয়া আছে। প্রতাপ ও চিন্তা বাহুতে বাহু জড়াইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। প্রতাপের মুখে একটু করুণ হাসি, চিন্তার সদ্য-ঘুমভাঙা চোখে বিস্ময়ানন্দের কিরণ। প্রতাপ যে আজই আবার আসিবে তাহা সে আশা করিতে পারে নাই।

চিন্তাঃ কী হল—প্রভার বিয়ে?

প্রতাপঃ হয়ে গেল—(চিন্তার সপ্রশ্নদৃষ্টির উত্তরে) হ্যাঁ, ঠিক লোকের সঙ্গেই। কিন্তু—

চিন্তাঃ কিন্তু কি?

প্রতাপঃ কিন্তু নয়, সবই ঠিক হয়েছে। কিন্তু ফিরে আসবার পথে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—তাই তোমার কাছে চলে এলাম চিন্তা। আজ আবার নতুন করে মনে হল—আমার জীবন কোন্‌ পথে চলেছে—কোথায় চলেছি আমরা—

প্রতাপের মন কোনও কারণে—কিংবা অকারণেই—বিক্ষুব্ধ হইয়াছে বুঝিয়া চিন্তা

নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। যাহারা দুর্গম পথে একেলা চলে তাহাদের মনে এরূপ সংশয় মাঝে মাঝে উদয় হয়, চিন্তা জানিত। তাহার নিজের মনেও কতবার কত বিক্ষোভ জাগিয়াছে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক; প্রিয়জনের কাছে হৃদয়ভার লাঘব করিতে পারিলেই তাহা কাটিয়া যায়।

বাহিরে কান্তিলাল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, প্রতাপ বাহিরে আসিল না তখন সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঝোপ হইতে বাহির হইল, সিধা বারান্দার দিকে না গিয়া একটু ঘুরিয়া পরপের পিছন দিকে চলিল।

ঘরের পিছনের দেওয়ালে সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র গবাক্ষ; নিম্নে চারিদিকে শুষ্কপত্র ছড়ানো রহিয়াছে; কান্তিলাল অতি সাবধানে গুঁড়ি মারিয়া জানালার নীচে উপস্থিত হইল। ভিতর হইতে কথাবার্তার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। কান্তিলাল কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর প্রতাপ ও চিন্তা ঝুলার উপর বসিয়াছে। প্রতাপ বলিয়া চলিয়াছে—

প্রতাপঃ যেদিন প্রথম এ পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেদিন জানতাম না কোথায় এ-পথ শেষ হবে—তারপর কতদিন কেটে গেল—আজও জানি না এ পথের শেষ কোথায়। তুমি জানো চিন্তা?

চিন্তাঃ ঠিক জানি না! কিন্তু পথে চলাই কি একটা লক্ষ্য নয়?

প্রতাপঃ হয়তো তাই—হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পথেই চলতে হবে। নিজের জন্যে ভাবি না, কিন্তু তোমার কথা ভেবে বড় দুঃখ হয় চিন্তা! তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম। আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম, তুমি হয়তো কোনও গৃহস্থকে বিয়ে করে স্বামী-সংসার নিয়ে সুখী হতে—

চিন্তাঃ (শান্তস্বরে) আমার জীবনকে তোমার জীবন থেকে আলাদা করে দেখছো কেন? তুমি কি আমাকে মনের মধ্যে নিজের করে নাও নি?

প্রতাপ বাহু ধরিয়া চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল—

প্রতাপঃ আমায় মাপ কর চিন্তা। আমারই ভুল—আমারই ভুল।

জানালার নীচে কান্তিলাল পূর্ববৎ শুনিতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় এরূপ ধরনের কথাবার্তা সে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই; দুইজন যুবক-যুবতীর মধ্যে নির্জন গভীররাত্রে যে এরূপ আলোচনা চলিতে পারে ইন্দ্রিয়সর্বস্ব কান্তিলালের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও দুরূহ।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ আবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল—

প্রতাপঃ তোমার আমার কথা ছেড়ে দিলেও আর একটা কথা আছে চিন্তা। সারা পৃথিবী জুড়ে নির্ধনের ওপর ধনীর এই উৎপীড়ন চলেছে, আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন তার কতটুকু প্রতিকার করতে পারি? বুকের রক্ত দিতে পারি, জীবন আহুতি দিতে পারি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কতটুকু ফল হবে? মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মত আমাদের এই প্রাণপণ চেষ্টা নিমেষে শুকিয়ে যাবে।

চিন্তা ক্ষণেক নীরব রহিল।

চিন্তাঃ তবে কি এর কোনও উপায় নেই?

প্রতাপঃ আমি অনেক ভেবেছি, কোনও কূল-কিনারা পাইনি। চিন্তা, আমাদের রোগ যেখানে ওষুধও সেখানে। মানুষের সমাজে যতদিন অবস্থার প্রভেদ আছে ততদিন ধনী দরিদ্রকে নির্যাতন করবে, শক্তিমান দুর্বলকে পীড়ন করবে।

চিন্তাঃ তবে?

প্রতাপঃ যদি কখনও এমন দিন আসে যখন মানুষে মানুষে অবস্থার ভেদ থাকবে না, সকলে আপন আপন শক্তি অনুযায়ী কাজ করবে আর সমান বৃত্তি পাবে—সেইদিন

মানুষের দুঃখের যুগ শেষ হবে। সেদিন কবে আসবে জানি না—হয়তো কোনদিনই আসবে না।

চিন্তাঃ আসবে। কিন্তু যতদিন না আসে?

প্রতাপঃ (ঈষৎ হাসিয়া) ততদিন আমরা লড়াই করে যাব। তুমি এই পরপ থেকে আমার কাছে পায়রার দূত পাঠাবে, আর আমি রাত্রে চোরের মত এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

ঘরের মধ্যে যখন এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছিল, কান্তিলাল ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। অনবধানে একটি শুষ্ক-পত্রের উপর পা পড়িতেই মচ্ করিয়া শব্দ হইল। কান্তিলাল আর দাঁড়াইল না, ক্ষিপ্রপদে পলায়ন করিল।

ঘরের ভিতর প্রতাপ ও চিন্তা আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল। প্রতাপ লাফাইয়া আসিয়া জানালার বাহিরে গলা বাড়াইল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কান্তিলাল তখন দ্রুতগতিতে নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছিয়াছে।

চিন্তা প্রতাপের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রতাপ ফিরিয়া বলিল—

প্রতাপঃ কেউ নেই। কিন্তু ঠিক মনে হল—

চিন্তাঃ কোনও জন্তু-জানোয়ার হবে।

ওদিকে কান্তিলাল তখন নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিযা চলিয়াছে। তাহার মুখে বিজযীর হাসি। খেজুর ছড়ি দিয়া ঘোড়াটাকে পিটাইতে পিটাইতে সে নিজমনেই বলিতেছে—

কান্তিলালঃ চল্ চল্, ছুটে চল্। আর যাবে কোথায় বারবটিয়া—আর যাবে কোথায় পানিহারিন্!

পরপের কক্ষে প্রতাপ চিন্তার কাছে বিদায় লইতেছিল।

প্রতাপঃ এবার যাই চিন্তা। রাত শেষ হয়ে এল, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।

চিন্তা একটু হাসিল। প্রতাপ দ্বারেব দিকে ফিরিতেছিল, চিন্তা বলিল—

চিন্তাঃ একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।

প্রতাপঃ (ফিরিয়া) কী খবর?

চিন্তাঃ সর্দার তেজ সিংয়ের স্ত্রী মর-মর। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে তিনি অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন, এখন একেবারে শয্যা নিয়েছেন। দু'চার দিনের মধ্যে তিনি যদি স্বামীকে ফিরে না পান তাহলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না।

প্রতাপ কিছুক্ষণ চিন্তা-তন্ময় চোখে চিন্তাব পানে চাহিয়া রহিল। তারপর অস্ফুটস্বরে আপনমনেই বলিল—

প্রতাপঃ বাঁচানো যাবে না—

ডিজল্ভ্।

পরদিন প্রভাত।

দস্যুদের গুহামুখে প্রতাপ ও তেজ সিং মুখোমুখি দাঁড়াইযা আছেন। প্রতাপের একহাতে তেজ সিংয়ের তরবারি, অন্যহাতে সে একটি সজ্জিত অশ্বের বল্গা ধরিয়া আছে। কিছুদূরে তিলু ভীম প্রমুখ আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

প্রতাপঃ এই নিন আপনার তলোয়ার—এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে সটান বাড়ি যাবেন।

তেজ সিংঃ তুমি আমাকে বিনা শর্তে মুক্তি দিচ্ছ?

প্রতাপঃ একটিমাত্র শর্ত আছে—আপনি পথে কোথাও দাঁড়াবেন না, সিধা বাড়ি যাবেন।

তেজ সিং তরবারি কোমরে বাঁধিলেন।

তেজ সিংঃ কেন আমাকে হঠাৎ মুক্তি দিচ্ছ জানি না, কিন্তু এ অনুগ্রহ আমার চিরদিন মনে থাকবে।

প্রতাপঃ আশা করি আমাদের খুব মন্দ ভাববেন না।

তেজ সিংঃ আমি যা চোখে দেখেছি তারপরও যদি তোমাদের মন্দ ভাবি তাহলে ভগবানের চোখে অপরাধী হব। চললাম তিলুবেন, চললাম ভাই সব—তোমাদের কোনো দিন ভুলব না।

তেজ সিং লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে উঠিলেন। তিলুর চোখ দুটি একটু ছলছল করিল।

তিলুঃ আমার বাবা রতিলাল শেঠ মামুদপুরে থাকেন, তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয় বলবেন আমি ভাল আছি।

ভীমভাইঃ আর বলতে নেই যদি সম্ভব হয়, তিলুর জন্যে কিছু কুড়্মুড়া পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

বিদায়ের বিষণ্ণতার উপর হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল।

তেজ সিংঃ বেশ, চিন্তাবেনের কাছে পাঠিয়ে দেব। চললাম, আমাকে ভুলো না। যদি কখনও দরকার হয় স্মরণ কোরো।

তেজ সিং বিদায়-সম্ভাষণে দুই করতল যুক্ত করিলেন। তাঁহার ঘোড়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ডিজল্ভ্।

দিবা তৃতীয় প্রহর।

চিন্তাব পরপের সম্মুখে দুইটি ডুলি আসিয়া থামিল। একটিতে শেঠ গোকুলদাস বিরাজ করিতেছেন, অপরটি শূন্য। ডুলি ঘিরিয়া কান্তিলাল প্রমুখ ছয় জন বন্দুক-ধারী অশ্বারোহী তো আছেই, উপরন্তু আরও দশ-বারো জন সশস্ত্র পদাতি।

গোকুলদাস কান্তিলালের দিকে চোখের ইশারা করিয়া বলিলেন—

গোকুলদাসঃ দ্যাখ ঘরে আছে কি না।

কান্তিলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া পরপের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরের মধ্যে চিন্তা পায়রা দুটিকে শস্য দিতেছিল, তাহারা খুঁটিয়া খাইতেছিল। বাহিরে বহু জনসমাগমের শব্দে সে গলা বাড়াইয়া দেখিল গোকুলদাসের দল, কান্তিলাল ঘরের দিকে আসিতেছে।

কান্তিলাল বারান্দার নিকট আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইল। চিন্তার মুখ অপ্রসন্ন হইল, কিন্তু সে তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জলের ঘটি হস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গোকুলদাসের অভিমুখে অগ্রসর হইল। কান্তিলাল তাহার অনুসরণ করিল না, ঐখানে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

চিন্তা গোকুলদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি জলপানের কোনও চেষ্টা না করিয়া নির্নিমেষ সর্প-চক্ষু দিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তা নীরসস্বরে বলিল—

চিন্তাঃ জল নাও—

গোকুলদাস পূর্ববৎ অজগরের সম্মোহন-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর

সহসা বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিলেন—

গোকুলদাসঃ তুই প্রতাপ বারবটিয়ার গোয়েন্দা!

চিন্তার হাত্ত হইতে ঘটি পড়িয়া গেল। সে সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পদাতি লোকগুলি তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে; পলাইবার পথ নাই।

গোকুলদাস ডুলি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অনুচরদের হুকুম দিলেন—

গোকুলদাসঃ এর হাত চেপে ধর।

দুইজন পদাতি চিন্তার দুই হাত চাপিয়া ধরিল; তখন গোকুলদাস তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন—

গোকুলদাসঃ শয়তান ছুঁড়ি, তোর সব কেচ্ছা জানি। প্রতাপ বারবটিয়া তোর নাগর—রাত্রে লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসে! আর তুই পায়রা উড়িয়ে তাকে খবর পাঠাস্! অ্যাঁ!

চিন্তাঃ (রুদ্ধস্বরে) আমি কিছু জানি না।

গোকুলদাসঃ জানি না?—দে তো ওর হাতে মোচড়, কেমন জানে না দেখি।

পদাতিদ্বয় চিন্তার হাতে মোচড় দিল, চিন্তা যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

গোকুলদাসঃ এখনি হয়েছে কি, তোর অনেক দুর্গতি করব। তুই সরকারের নিমক খাস আর বারবটিয়ার গোয়েন্দাগিরি করিস! ভাল চাস্ তো বল, প্রতাপ বারবটিয়া কোথায় থাকে—তাহলে তোকে ছেড়ে দেব। বলবি?

চিন্তাঃ আমি কিছু জানি না।

গোকুলদাস পদাতিদের ইশারা করিলেন, তাহারা আবার চিন্তার হাতে মোচড় দিল। এবার চিন্তা চিৎকার করিল না, অধর দংশন করিয়া নীরব রহিল।

গোকুলদাসঃ বলবি?

চিন্তাঃ আমি কিছু জানি না।

গোকুলদাস হাসিলেন; তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

গোকুলদাসঃ ওর মুখ বেঁধে ডুলিতে তোল্।

পদাতিরা চিন্তার মুখ বাঁধিয়া দ্বিতীয় ডুলির মধ্যে ফেলিল।

গোকুলদাসঃ তুই ভেবেছিস, তুই না বললে তোর নাগরকে ধরতে পারব না? তোকে যখন ধরেছি তখন সে যাবে কোথায়!—কান্তিলাল, একটা পায়রা ধরে আন্।

কান্তিলালঃ এই যে শেঠ, এনেছি।

সে ইতিমধ্যে চিন্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া দুটি পায়রার মধ্যে একটিকে ধরিয়াছিল, পোষা পায়রা, ধরিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

গোকুলদাস কুর্তার পকেট হইতে এক চিল্তা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজে লেখা ছিল—

প্রতাপ বারবটিয়া,

তোমার প্রণয়িনী পরপওয়ালীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। যদি তার প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা করতে চাও, তবে কাল সূর্যোদয়ের আগে আমার দেউড়িতে এসে ধরা দাও। যদি না দাও, সূর্যোদয়ের পর তোমার প্রণয়িনীকে আমার ভৃত্য কান্তিলালের হাতে সমর্পণ করা হবে।

—গোকুলদাস শেঠ

চিঠি কপোতের পায়ে বাঁধিয়া তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর গোকুলদাস নিজ ডুলিতে প্রবেশ করিলেন।

গোকুলদাসঃ নে, জলদি ফিরে চল্। দেখি এবার বারবটিয়া কোথায় যায়!

দুইটি ডুলি লইয়া দলবল আবার নিম্নাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

ওয়াইপ্।

শৈলরেখাবন্ধুর পশ্চিমদিগন্তে দিনান্তের অস্তরাগ লাগিয়াছে। গুহামুখে দাঁড়াইয়া প্রতাপ কপোতের পা হইতে চিঠি খুলিতেছে। আর সকলে তাহার চারিপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

কপোতটিকে তিলুর হাতে দিয়া প্রতাপ সাগ্রহে চিঠি খুলিল। চিঠির সম্বোধন পড়িয়াই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি পড়া যখন শেষ হইল তখন তাহার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে।

সকলেই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল; নানাভাই বলিয়া উঠিল—

নানাভাইঃ কী হল প্রতাপভাই?

প্রতাপের অবশ হস্ত হইতে চিঠিখানা মাটিতে খসিয়া পড়িল। সে উত্তর দিতে পারিল না, একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

নানাভাই ভূপতিত চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, আর সকলে উদ্বিগ্নমুখে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

ডিজল্ভ্।

দিবালোক প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণা-প্রতিপদের চাঁদ এখনও উঠে নাই।

গুহার সম্মুখে মোতির রাশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতাপ। তাহার কোমরে দুটি পিস্তল, আর কোনও অস্ত্র নাই। সে সঙ্গিদের সম্বোধন করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিতেছে—

প্রতাপঃ আমি ধরা দিতে চললাম। আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না। তোমাদের উপদেশ দেবার মত কোনও কথাই এখন খুঁজে পাচ্ছি না—তোমরা পরামর্শ করে যা ভাল বোঝ, কোরো। আর আমার শেষ অনুরোধ, আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে বৃথা রক্তপাত কোরো না। বিদায়!

প্রতাপ একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিল, তিলুর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিল, তারপর মোতির পৃষ্ঠে চড়িয়া অবলীয়মান আলোর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ডিজল্ভ্।

গোকুলদাসের প্রাসাদের নিম্নতলে একটি প্রকোষ্ঠে চিন্তা বন্দিনী রহিয়াছে। তাহার দুই হাত শৃঙ্খলিত, সে দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া শুষ্কচোখে শূন্যে চাহিয়া আছে। তাহার মাথার উপর প্রায় ছাদের কাছে একটি ক্ষুদ্র গরাদহীন গবাক্ষ; গবাক্ষপথে চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রকোষ্ঠের দৃঢ় লৌহদ্বারের বাহিরে কান্তিলাল ও আর একজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। কান্তিলালের সর্বাঙ্গে জরাজনিত উত্তাপের অস্থিরতা। যেন খাঁচায় ইঁদুর ধরা পড়িয়াছে, আর ক্ষুধিত বিড়াল খাঁচার চারিপাশে পাক খাইতেছে।

ওয়াইপ্।

উপল-কঠিন প্রান্তরের উপর দিয়া প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে ছুটিয়া চলিয়াছে; পাথরের উপর মোতির ক্ষুরধ্বনি নাকাড়ার মত দ্রুতচ্ছন্দে বাজিতেছে। চাঁদের কিরণে দৃশ্যটি

স্বপ্নময়। মোতির পিছনে দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে।

ওয়াইপ্‌।

গুহার মধ্যে চারিটি পুরুষ ও একটি নারী অগ্নি ঘিরিয়া নীরবে বসিয়া আছে। আজ রন্ধনের আয়োজন নাই, চটুল হাস্য পরিহাস নাই। তিলু একপ্রান্তে বসিয়া আছে, তাহার গণ্ড বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

পুরুষদের মধ্যে ভীমভাইয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়। অন্য সকলে হতাশ গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে কিন্তু ভীম যেন এই প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। সে দুই জানু বাহুবদ্ধ করিয়া আগুনের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার অবশ হইয়া গিয়াছে।

সহসা পুরন্দর মুখ তুলিল।

পুরন্দরঃ এখানে থেকে আর লাভ কি?

প্রভু মাথা নাড়িল।

প্রভুঃ কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে—

নানাভাইঃ তার চেয়ে প্রতাপ যেখানে ধরা দিতে গেছে সেই শহরে—

পুরন্দরঃ কিন্তু প্রতাপভাই মানা করে গেছেন।

প্রভুঃ রক্তপাত আমরা করব না। কিন্তু রক্তপাত না করেও ওদের উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

নানা ও পুরন্দর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। প্রভু ভীমের দিকে ফিরিয়া দেখিল তাহাদের কথা ভীমের কানে যায় নাই। প্রভু বলিল—

প্রভুঃ ভীম, তুমি কি বল?

ভীম চমকিয়া উঠিল?

ভীমভাইঃ অ্যাঁ! কী?

প্রভুঃ আমরা শহরে যেতে চাই; প্রতাপের কাছাকাছি থাকলেও হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারব।—তিলুবেন, তুমি কি বল?

তিলু কথা বলিল না, কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। ভীমের মুখভাব কিন্তু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

ভীমভাইঃ শহরে! কিন্তু—যদি কেউ আমাদের চিনতে পারে?

তিলু ও আর সকলে একটু অবাক হইয়া ভীমের পানে তাকাইল। প্রভু বলিল—

প্রভুঃ প্রতাপের শহরে আমাদের কে চিনবে? আমরা কেউ ও শহরের লোক নই। তা ছাড়া আমরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকব; সেখানে লছমন আছে, সে আমাদের লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করবে।

ভীম যেন এখনও নিঃসংশয় হইতে পারে নাই, এমনিভাবে স্খলিতস্বরে বলিল—

ভীমভাইঃ তা—তা—এখানেও তো আর নিরাপদ নয়—শহরে যদি—

ওয়াইপ্‌।

সম্মুখদিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে বসিয়া আছে; মোতি গিরিকান্তার পার হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মুখে ফেনা, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে।

চন্দ্র মধ্যাকাশে। মোতির ছায়া তাহার পেটের নীচে পড়িয়াছে। প্রতাপ মোতির

গ্রীবার উপর হাত রাখিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছে—

প্রতাপঃ মোতি, আরও জোরে চল্ বেটা—এখনও অর্ধেক পথ বাকি।

ওয়াইপ্।

চিন্তার কারাকক্ষের দ্বারমুখে কান্তিলাল পায়চারি করিতে করিতে পাহারা দিতেছে, অন্য প্রহরীটা দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। দূরে কোতোয়ালীর ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজিল।

গোকুলদাসের চোখে নিদ্রা ছিল না, তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। কান্তিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোকুলদাসঃ কি রে, আছে তো ছুঁড়ি?

কান্তিলাল নৃশংস-হাস্যে হস্ত বাহির করিল।

কান্তিলালঃ যাবে কোথায় শেঠ? চাবি দাও, খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি।

গোকুলদাস কোমর হইতে চাবি দিলেন, কান্তিলাল তালা খুলিয়া দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। ফাঁক দিয়া উভয়ে দেখিলেন, চিন্তা দেয়ালে ঠেস দিয়া পূর্ববৎ বসিয়া আছে, একটু নড়েও নাই।

দ্বারে তালা লাগাইয়া গোকুলদাস আবার চাবি কোমরে ঝুলাইলেন।

গোকুলদাসঃ বারবটিয়া যদি সূর্যোদয়ের আগে ধরা না দেয়—

কান্তিলালের চক্ষু লোভে জ্বলিয়া উঠিল, সে সৃক্কণী লেহন করিল।

ওয়াইপ্।

মোতি চলিয়াছে। ফেনায় ঘর্মে তাহার সর্বাঙ্গ আপ্লুত।

সম্মুখে পাহাড়ের একটা চড়াই। মোতি একটা নালা লাফাইয়া পার হইয়া গেল, তারপর চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিল। ছায়া এখন তাহার সম্মুখে; সে যেন নিজের ছায়াকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে।

প্রতাপঃ আর একটু, আর একটু মোতি! এই পাহাড়টা পার হলেই—

ডিজল্ভ্।

পূর্বাকাশে একটুখানি আলোর ঝিলিক দেখা দিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে এখনও তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে নাই। পশ্চিম গগনে চন্দ্র প্রভাহীন।

মোতি এখন সমতল বালুময় ভূমি দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; শহরের উপকণ্ঠে পেঁছিতে আর দেরি নাই।

কিন্তু সমস্ত রাত্রি অবিশ্রাম ছুটিবার পর মোতির বিপুল প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এতক্ষণ সে যন্ত্রবৎ ছুটিয়াছে, উচ্চনীচ উদ্ঘাত কিছুই তাহার গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সহসা তাহার গতিবেগ প্রশমিত হইল, তাহার তীরের ন্যায় ঋজু-গতি এলোমেলো হইয়া গেল। তারপর ক্লান্ত পা'গুলি দুমড়াইয়া মোতি মাটির উপর পড়িয়া গেল।

প্রতাপ ছিটকাইয়া দূরে পড়িল। বালুর উপর তাহার আঘাত লাগিল না, সে দ্রুত উঠিয়া মোতির কাছে আসিয়া বুকভাঙা স্বরে ডাকিল—

প্রতাপঃ মোতি!

মোতি আর উঠিল না। তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া আসিতেছিল; সে বিকৃত-নাসারন্ধ্র হইতে কয়েকটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর তাহার দেহ স্থির হইল।

প্রতাপ মোতির গ্রীবার উপর লুটাইয়া পড়িল।

প্রতাপঃ মোতি—বেটা!

ডিজল্ভ্।

পূর্বাকাশ সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। পাখি ডাকিতেছে।

গোকুলদাসের প্রাসাদভূমিতে বহু সিপাহী সান্ত্রী; প্রতাপ বারবটিয়াকে ধরিবে বলিয়া সকলের সশস্ত্র ও সতর্কভাবে রাত কাটিয়াছে। ইহারা সকলেই গোকুলদাসের বেতনভুক্। হয়তো ইহাদের মধ্যে প্রতাপের দলভুক্ত দুই চারিটি লোক গুপ্তভাবে আছে; কিন্তু কাহারও আচরণ দেখিয়া তাহা সন্দেহ হয় না। তাহারা অন্য সকলের সহিত পাহারা দিয়াছে, হয়তো চিন্তাকে উদ্ধার করিবার উপায় খুঁজিয়াছে, কিন্তু আদেশদাতা নেতার অভাবে কিছুই করিতে পারে নাই।

চিন্তার অবরোধ-কক্ষের সম্মুখের অলিন্দে দাঁড়াইয়া গোকুলদাস বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার ললাটে নিষ্ফল ক্রোধের ভ্রূকুটি।

চক্রবাল-রেখায় ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হইল।

গোকুলদাস মনে মনে গর্জন করিলেন—বারবটিয়া আসিল না। শয়তান ধরা দিল না। আচ্ছা, তবে রাজপুতনীটাই তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

কান্তিলাল ও অন্য প্রহরীটা গোকুলদাসের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি ফিরিয়া বলিলেন—

গোকুলদাসঃ কাহ্না, তুই কোতোয়ালীতে যা—কোতোয়ালকে ডেকে নিয়ে আয়! বল্বি যে আমি প্রতাপ বারবটিয়ার দলের একটা মেয়েকে ধরেছি—শীগ্গির এসে তাকে গ্রেপ্তার করুক।

কাহ্নাঃ যো হুকুম।

কাহ্না চলিয়া গেলে কান্তিলাল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—

কান্তিলালঃ শেঠ, আমার বক্শিশ।

গোকুলদাস বিকৃতমুখে হাসিয়া চাবি তাহার হাতে দিলেন।

গোকুলদাসঃ এই নে তোর বক্শিশ।

অধৈর্য-স্খলিতহস্তে কান্তিলাল দ্বারের তালা খুলিল। দু'হাতে দ্বার ঠেলিয়া যেই সে প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি ভিতর হইতে পিস্তলের আওয়াজ হইল। কান্তিলালকে প্রবেশ করিতে হইল না, সে চৌকাঠের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল। গোকুলদাস চিৎকার করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

আওয়াজ শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল; কিন্তু তাহারাও দরজার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কারাকক্ষের মধ্যে প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে; প্রতাপের দুই হাতে দুটি পিস্তল।

প্রতাপঃ আমরা তোমাদের হাতে ধরা দেব না। কোতোয়ালের হাতে আমরা ধরা দেব। তফাৎ থাকো—এগিয়েছ কি মরেছ।

সমবেত সান্ত্রীরা প্রতাপের উগ্রমূর্তি দেখিল, তাহার হাতের পিস্তল দেখিল, কান্তিলালের মৃতদেহ দেখিল, তারপর পিছু হটিল।

এই সময় সদলবলে কোতোয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি দ্বারের সম্মুখস্থ হইতেই প্রতাপ পিস্তল দুটি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল—

প্রতাপঃ আমি প্রতাপ বারবটিয়া, ইনি আমার স্ত্রী চিন্তাবাঈ। আমাদের বন্দী করুন।

ফেড আউট্।

ফেড ইন্।

দুই দিন গত হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। শহরের পথে লোকারণ্য। সকলেই যেন একটা কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছে। এই জনতার মধ্যে একস্থানে নানাভাইকে দেখা গেল, বহিরাগত গ্রাম্য-দর্শকের মত সে কৌতূহলভরে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। অন্যত্র একটি পানের দোকানের পাশে ভীমভাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে দুঃস্বপ্ন দেখার বিভীষিকা। ইহাদের দেখিয়া অনুমান হয়, প্রতাপের দল শহরে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে।

সহসা জনতার চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইল। সকলে দেখিল, একদল সিপাহী কুচকাওয়াজ করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পিছনে একটি অশ্ববাহিত শকট। শকটের পিছনে আবার একদল সিপাহী। শকটের আকৃতি বাঘের খাঁচার মত, উপরের ছাদ ও চারিদিক মোটা মোটা লোহার গরাদ দিয়া ঘেরা। এই শকটের মধ্যে চিন্তা ও প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের বাহু পরস্পর শৃঙ্খল দিয়া বদ্ধ।

জনসংঘ ক্ষুব্ধমুখে বিদ্রোহভরা চোখে দেখিতে লাগিল। সেনা-রক্ষিত কারাগারের শকট বন্দীদের লইয়া চলিয়া গেল।

নানাভাই গ্রামিক-সুলভ সরলতায় পাশের একটি নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল—

নানাভাইঃ বাবুজী, ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

নাগরিক তিক্তস্বরে বলিল—

নাগরিকঃ আদালতে। সাহুকারেরা আইন অমান্য করবে না, রীতিমত বিচার করে ওদের ফাঁসি দেবে।

ডিজল্‌ভ্।

বিচারভবনের সম্মুখের বিস্তৃত মাঠে বিপুল জনতা সমবেত হইয়াছে। কোতোয়ালীর অগণ্য সিপাহী বিচারগৃহ রক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে জনতরঙ্গ বিচারগৃহের দিকে ঝুঁকিতেছে আবার সিপাহীদের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ইহারা বিদ্রোহী নয়, উত্তেজিত নাগরিক জনমণ্ডলী; ইহারা কেবল দেখিতে চায় শুনিতে চায় কী ভাবে প্রতাপ বারবটিয়ার বিচার হইতেছে।

বিচারগৃহের মধ্যেও তিল ফেলিবার ঠাঁই নাই। গোকুলদাস প্রমুখ মহাজনগণ আগে হইতেই বিচারকক্ষ জুড়িয়া বসিয়াছেন। বিচারকের আসন যিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন তিনি একটি শীর্ণকায় তির্যকচক্ষু বৃদ্ধ, শেঠগণের দিকে একচক্ষু রাখিয়া তিনি বিচারের অভিনয় করিতেছেন। তিনি জানেন, আসামীদের ফাঁসির হুকুম তাঁহাকে দিতেই হইবে; অথচ দেশের বিপুল জনমত কাহার প্রতি সহানুভূতিশীল তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তাই বিচারাসনে বসিয়া তাঁহার ক্ষীণ-দেহ থাকিয়া থাকিয়া

কাঁপিয়া উঠিতেছে।

আসামীর কাঠগড়ায় প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। বিচারের অভিনয় দেখিয়া প্রতাপের মুখে মাঝে মাঝে চকিতে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া যাইতেছে।

কাট্।

শহরের দরিদ্র-অঞ্চলে একটি জীর্ণ কুটির। ইহা লছমনের বাসস্থান; সম্প্রতি প্রতাপের দস্যুদল এই গৃহেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

কুটিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ; কিন্তু পাশের একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ জানালায় দাঁড়াইয়া তিলু উৎকণ্ঠিতভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে।

এই সময় বৃদ্ধ লছমনকে আসিতে দেখা গেল। তিলু তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল।

তিলুঃ কি খবর লছমনভাই?

লছমনের ক্লান্ত দেহ-যষ্টি নুইয়া পড়িতেছিল; সে দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যস্থলে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। ঘরের এককোণে কেবল ভীম জানু বাহুবদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল।

তিলু লছমনের সম্মুখে বসিযা ব্যগ্রস্বরে আবার প্রশ্ন করিল—

তিলুঃ লছমনভাই, কিছু খবর পেলে?

লছমনঃ কী আর খবর পাব বেন? আমি বুড়োমানুষ, ভিড়ের মধ্যে তো ঢুকতে পারিনি, বাইরে থেকে যেটুকু খবর পেলাম—

তিলুঃ কী খবর পেলে?

লছমনঃ শয়তানেরা শুধু প্রতাপ আর চিন্তাকে ধরেই সন্তুষ্ট নয়, দলের আর সবাইকে ধরতে চায়।

ভীমভাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

তিলুঃ (সংহতকণ্ঠে) তারপর?

লছমনঃ প্রতাপকে হাকিম হুকুম করেছিল—তোমার দলে কে কে লোক আছে তাদের নাম কর। প্রতাপ তার মুখের মত জবাব দিয়েছে, বলেছে—'কত নাম করব, দেশের সমস্ত লোক আমার দলে। বাইরে জনসমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছ না? ওরা সব আমার দলে। আজ শুধু ওদের গর্জন শুনছ, একদিন ওরাই বন্যা হয়ে তোমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

বলিতে বলিতে লছমনের নিষ্প্রভ চক্ষু চক্‌চক্ করিয়া উঠিল, তিলু রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ভীমভাইয়ের মুখে কিন্তু কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, সে যেন কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, এমনিভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

কাট্।

আদালতের সম্মুখে অসংখ্য নরমুণ্ড পূর্ববৎ ভীড় করিয়া আছে।

বিচারকক্ষের অলিন্দে একজন তক্‌মা-পরা রাজপুরুষ দেখা দিল। সে হাত তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—

রাজপুরুষঃ প্রতাপ বারবটিয়ার বিচার আজ মুলতুবি রইল। কাল আবার বিচার হবে এবং রায় বেরুবে।

জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কুটিরের কক্ষে তিলু ভীমভাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে নাড়া দিতেছিল আর বলিতেছিল—

তিলুঃ কী হয়েছে তোমার? সবাই বাইরে গেছেন আর তুমি ঘরে বসে আছ? প্রতাপভাইয়ের এই বিপদে তোমার কি কিছুই করবার নেই?

ভীমভাইঃ কি করব?

তিলুঃ কি করবে তা কি আমি মেয়েমানুষ তোমাকে বলে দেব? মরদ হয়ে তুমি এমন ভেঙে পড়েছ—ছি ছি ছি—

ভীমভাইঃ বিরক্ত কোরো না—আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।

বলিয়া ভীমভাই জানুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

এই সময়ে নানাভাই, প্রভু ও পুরন্দর ফিরিয়া আসিল। সকলেরই মুখ গম্ভীর বিষণ্ন। নানাভাই লছমনের কাছে বসিয়া সনিশ্বাসে বলিল—

নানাভাইঃ ওদের ছাড়বে না সাহুকারেরা—ফাঁসি দেবে।

প্রভুঃ আজ মোকদ্দমা মুলতুবি রাখবার কারণ কি জানো? ওদের ভয় হয়েছে, ফাঁসির হুকুম দেবার পর বেশী দিন দেরি করলে দেশের লোক ক্ষেপে গিয়ে প্রতাপকে জোর করে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। তাই কাল ফাঁসির রায় দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দেবে। আজ রাত্রেই ওরা ফাঁসির আয়োজন ঠিক করে রাখবে, তারপর শহরের লোক তৈরি হবার আগেই কাজ শেষ করে ফেলবে।

ভীমভাই তড়িৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার দুইচোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

ভীমভাইঃ কাল ফাঁসি দেবে? কাল?

পুরন্দরঃ আমারও তাই মনে হয়। ফেরবার সময় দেখলাম, গরুর গাড়ি বোঝাই করে বড় বড় তক্তা আর শালের খুঁটি নিয়ে গিয়ে আদালতের সামনে মাঠে ফেল্‌ছে—বোধ হয় ঐখানেই ফাঁসির মঞ্চ খাড়া করবে।

ভীমভাইয়ের কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ শব্দ বাহির হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তিলু চেঁচাইয়া উঠিল—

তিলুঃ কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ভীমভাইঃ এখানে আর নয়—বাইরে।—শহরের বাইরে—

বলিতে বলিতে ভীম দ্বারের বাহিরে অদৃশ্য হইল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রতাপ-চিন্তা ধরা পড়িবার পর হইতে ভীমভাইয়ের অদ্ভুত আচরণে সকলের মনেই খটকা লাগিয়াছিল, তবু ভীমভাইকে প্রাণভয়ে ভীত কাপুরুষ মনে করিতে সকলেরই মনে সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কিন্তু এখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সকলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। তিলু মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

তিলুঃ ছি ছি ছি—আমার অদৃষ্টে এই ছিল! কাপুরুষ—আমার স্বামী কাপুরুষ—

ডিজল্‌ভ্‌।

আদালতের সম্মুখস্থ ময়দানে ছুতারমিস্ত্রীরা কাজ করিতেছে; তক্তা ও খুঁটির

সাহায্যে একটি চতুষ্কোণ-মঞ্চ গড়িয়া উঠিতেছে। মঞ্চটি দুই হাত উচ্চ, লম্বায়-চৌড়ায় প্রায় দশহাত। মঞ্চের মধ্যস্থলে দুইটি মজবুত খুঁটি খাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ছুতারদের হাতুড়ির ঠকাঠক্ আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হইতেছে।

ময়দানের প্রান্তে দাঁড়াইয়া একটি গাছের আড়াল হইতে ভীমভাই এই দৃশ্য দেখিল, তারপর পিছু ফিরিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যা হয় হয়। শহরের উপকণ্ঠে রাজপথের পাশে একটি অর্ধশুষ্ক পল্বল। একদল ধোপা এই পল্বলে কাপড় কাচিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ তরুমূলে তাহাদের গর্দভগুলি একটি বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

শহরের দিক হইতে ভীমভাইকে আসিতে দেখা গেল। সে এখনও দৌড়াইতেছে, কিন্তু তাহার গতি তেমন দ্রুত নয়।

গর্দভদের নিকটবর্তী হইয়া ভীমভাই থামিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল রজকেরা আপনমনে কাপড় কাচিতেছে। সে তখন পথ হইতে একটি কঞ্চি তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে একটি গাধার নিকটবর্তী হইল।

নিদ্রালু গাধাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ভীমভাই বিনা আয়াসে তাহার পিঠে উঠিয়া বসিল। গাধা আপত্তি করিল না। ভীমভাই তাহার পশ্চাদ্দেশে কঞ্চির আঘাত করিতেই গাধা দুল্‌কি চালে চলিতে আরম্ভ করিল।

ধোপারা কিছুই লক্ষ্য করিল না।

ডিজল্‌ভ্।

পরদিন মধ্যাহ্ন। বিচারগৃহের সম্মুখে তেমনি বিপুল জনসমাগম হইয়াছে। আজ সরকারী প্রহরীর সংখ্যা অনেক বেশী; ফৌজী কুর্তাপরা বন্দুকধারী সান্ত্রীর দল বিচারগৃহটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

যে মঞ্চটি কাল প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছিল তাহা যে সত্যই ফাঁসির মঞ্চ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মঞ্চের উপর যুগল খুঁটির শীর্ষে আড়া লাগিয়াছে, আড়া হইতে পাশাপাশি দুইটি দড়ি ঝুলিতেছে। একজন যমদূতাকৃতি ঘাতক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া দড়ি দুটিকে টানিয়া-টানিয়া তাহাদের ভারসহন ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

কিন্তু পরিহাস এই যে বিচার এখনও শেষ হয় নাই। বিচারকক্ষে হাকিম মহোদয় রায় দিবার পূর্বে বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কখনও নথিপত্র উল্টাইয়া দেখিতেছেন, কখনও কলম লইয়া কাগজে কিছু লিখিতেছেন। মামলার সমস্ত কার্য শেষ হইয়াছে, এখন কেবল দণ্ডাদেশ দেওয়া বাকি। ঘরসুদ্ধ লোক রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আসামীর কাঠগড়ায় প্রতাপ ও চিন্তা নির্লিপ্ত মুখে দাঁড়াইয়া। হাকিমের আদেশ কি হইবে তাহা তাহারা জানে, তাই সে বিষয়ে তাহাদের কোনও ঔৎসুক্য নাই।

অবশেষে বিচারক মহাশয় প্রতাপ ও চিন্তার প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাত করিয়া গলা-খাঁকারি দিলেন।

বিচারকঃ প্রতাপ বারবটিয়া, চিন্তা পানিহারিন্, গুরুতর অভিযোগে তোমাদের বিচার হয়েছে—তোমরা রাজদ্রোহিতা এবং নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত। বিচারে তোমাদের অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। আমি তাই ধর্মাসনে বসে দণ্ডাজ্ঞা

প্রচার করছি—তোমাদের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

ডিজল্‌ভ্‌।

নগরের উপকণ্ঠে একদল অশ্বারোহী সৈনিক অতিদ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা কে, লক্ষ্য করিবার পূর্বেই ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

ডিজল্‌ভ্‌।

বিচারালয়ের সম্মুখে মঞ্চ ঘিরিয়া জনসমুদ্র আবর্তিত হইতেছে। এই জনাবর্তে নানাভাই আছে, প্রভু, পুরন্দব আছে, লছমন ও তিলু আছে; তাহারা ঘূর্ণিচক্রের উপর খড়কুটার মত মঞ্চের আশেপাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিন সারি সিপাহী মঞ্চকে ঘিরিয়া দাঁড়াইযাছে এবং ঘূর্ণ্যমান জনতাকে মঞ্চ হইতে পৃথক রাখিয়াছে।

কোতোয়ালের অধীনে একদল বন্দুক-কিরিচধারী সান্ত্রী বিচারকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল; তাহাদের মধ্যস্থলে চিন্তা ও প্রতাপ। তাহারা সদলবলে জনতাকে বিভিন্ন করিযা মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইল। কোতোয়াল প্রতাপ ও চিন্তাকে লইয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন—আর সকলে নীচে রহিল।

আবর্তনশীল জনতা সহসা নিশ্চল হইয়া ঊর্ধ্বমুখে মঞ্চের পানে চাহিয়া রহিল। সমস্ত জনসংঘের মিলিত নিশ্বাসে একটা মর্মরধ্বনি উঠিল।

তিলু মঞ্চের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল; প্রতাপ ও চিন্তাকে ফাঁসির মঞ্চের উপর দেখিয়া তাহার আত্মগোপনের প্রবৃত্তিও আর রহিল না, সে কাঁদিয়া ডাকিল—

তিলুঃ প্রতাপভাই! চিন্তাবেন!

তিলুকে দেখিয়া প্রতাপ ও চিন্তার মুখে কোমল স্নেহার্দ্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; তাহারা অন্যান্য সঙ্গিদের দেখিবার আশায় জনতার মধ্যে চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল। নানা, প্রভু, লছমন ও পুরন্দরের সঙ্গে চোখাচোখি হইল। চোখের ইশারায় সকলে বিদায় লইল।

ইতিমধ্যে জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সজ্ঞান কোনও চেষ্টা না থাকিলেও, জোয়ারের তরঙ্গের মত জনতার উচ্ছ্বাস মঞ্চের প্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া পড়িতেছিল, আবাব প্রহরীদের বাধা পাইয়া পিছু হটিতেছিল। দেখিয়া কোতোয়াল মহাশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। বিলম্ব করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। তিনি জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রতাপ ও চিন্তার গলায় জল্লাদ দড়ির ফাঁস পরাইল। জনারণ্য নিশ্বাস লইতে ভুলিয়া গেল, কেবল সহস্রচক্ষু হইয়া চাহিয়া রহিল।

সহসা জনসংঘের রুদ্ধশ্বাস নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ঘোর রবে তূর্যধ্বনি হইল। সকলে চমকিয়া দেখিল, একদল অশ্বারোহী সিপাহী জনব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, তাহার অগ্রে সর্দার তেজ সিং ও ভীমভাই।

তেজ সিং ও ভীম ঘোড়া হইতে লাফাইয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন। ভীম কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া ছুটিয়া গিয়া প্রতাপকে জড়াইয়া ধরিল।

ওদিকে তিলু মঞ্চের নিম্নে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মঞ্চের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, তেজ সিং চিনিতে পারিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন। তিলু দরবিগলিত নেত্রে গিয়া চিন্তার কণ্ঠলগ্না হইল।

তেজ সিংয়ের হাতে একখণ্ড কাগজ ছিল; সেই কাগজ ঊর্ধ্বে আন্দোলিত করিয়া

তিনি জনতাকে সম্বোধন করিলেন—

তেজ সিংঃ আমি সর্দার তেজ সিং—রাজার পরোয়ানা এনেছি। আমাদের মহানুভব রাজা চিন্তাবাঈ এবং প্রতাপ সিংয়ের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই পরোয়ানার দ্বারা মহামহিম রাজা সর্দার প্রতাপ সিংকে তাঁর রাজ্যের প্রধান কোতোয়াল নিযুক্ত করেছেন। আজ থেকে এ রাজ্যের রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মিলন হল। যিনি প্রজার পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি রাজার প্রতিভূ হলেন; যিনি এতদিন গোপনে-গোপনে অসহায়কে সাহায্য করেছেন, দরিদ্রকে ধনীর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছেন, তিনি আজ প্রকাশ্যে রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ সেই মহাকর্তব্য পালন করবেন। আজ থেকে আমাদের নবজীবনের আরম্ভ হল। জয়—সর্দার প্রতাপ সিংয়ের জয় হোক!

বিরাট জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রতাপ ও চিন্তা তেজ সিংয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইযাছিল, তাহারা যুক্তকরে গণ-দেবতাকে অভিবাদন করিল।

উপসংহারে দেখা গেল, তিলু ও ভীমভাই ফাঁসির রজ্জুদুটির প্রান্ত একত্র করিয়া গ্রন্থি দিয়া উহাকে ঝুলায় পরিণত করিয়াছে এবং তাহার উপর বসিয়া পরমানন্দে দোল খাইতেছে।

ফেড আউট্।

ছায়াপথিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিরো

এক

স্ত্রী হোন বা পুরুষ হোন, তাঁহার যদি রূপ থাকে তবে তিনি মনে মনে সে বিষয়ে সচেতন থাকিবেন এবং গর্ব অনুভব করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আমি কয়েকজন রূপবান পুরুষকে জানি, তাঁহারা আমাদের মত সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেশ একটু অনুগ্রহপূর্বক কথা বলিয়া থাকেন। আর মেয়েদের তো কথাই নাই; তাঁহারা সর্বদা নিজেদের চেহারার সামনে অদৃশ্য আয়না ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং ঘুরিয়া তাহাই দেখিতেছেন।

কদাচিৎ এই বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিপর্যয় দেখা যায়। সোমনাথ এইরূপ একটি বিপর্যয়। তাহার ডালিম-ফাটা রঙ্, সুঠাম গঠন, নাক মুখ চোখ অনবদ্য; অথচ আশ্চর্য এই যে সে দিনান্তে একবারের বেশী দুইবার আয়নায় মুখ দেখে না; রূপবান বলিয়া গর্ব অনুভব করা দূরের কথা, সে এজন্য বেশ একটু কুণ্ঠিত। বেশী কথা কি, সিনেমার নায়ক সাজিয়া সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিবার কল্পনা আজ পর্যন্ত তাহার মাথায় আসে নাই।

সে মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থ সন্তান; কলিকাতার একটি ব্যাঙ্কে একশত পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকরি করে। তাহার জন্মকর্ম সবই পশ্চিমাঞ্চলে; লক্ষ্ণৌ তাহার মাতৃভূমি না হইলেও ধাত্রীভূমি বটে। মাত্র দুই বৎসর সে চাকরি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার বয়স এখন ছাব্বিশ বৎসর; বর্তমানে সে যে পরিমাণ মাহিনা পাইতেছে তাহাতে বিবাহ করিলে দাম্পত্যজীবন সুখময় না হইতে পারে এই বিবেচনায় সে এখনও বিবাহ করে নাই।

সোমনাথের মাতা পিতা কেহ জীবিত নাই; একমাত্র আপনার জন আছেন—দিদি। তিনি বোম্বাইয়ে থাকেন; জামাইবাবু সেখানে বড় চাকরি করেন।

সব দেখিয়া শুনিয়া সোমনাথের চরিত্র সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে সে নিরভিমান সাবধানী সচ্চরিত্র এবং ভালমানুষ। এরূপ চরিত্রের মানুষ জীবনে উন্নতি করিতে পারে কিনা সে গবেষণার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি এ নশ্বর জগতে ভাগ্যই বলবান।

একদিন সোমনাথ সিনেমা দেখিতে গিয়াছিল। সিনেমা সে বেশী দেখিত না, তার উপর শিক্ষাদীক্ষার গুণে বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছবির প্রতি তাহার পক্ষপাত বেশী। বিশেষত এই ছবিটি বোম্বাই শহরে তৈয়ার হইয়া বছরখানেক যাবৎ কলিকাতার এই চিত্রগৃহে এমন শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল যে অর্ডিনান্স্ জারি না করিয়া তাহাকে বন্ধ করার কোনও উপায় দেখা যাইতেছিল না। এই ছবির গান গৃহস্থ বাড়ির পোষা-পাখিও কপ্‌চাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই জনমতের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া সোমনাথও ছবিটি দেখিতে আসিয়াছিল।

সন্ধ্যার শো আরম্ভ হইতে তখনও মিনিট কুড়ি দেরি আছে; সোমনাথ চিত্র-গৃহের দরদালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবিগুলি দেখিতেছিল। ইনি অশোককুমার, উনি দেবীকারাণী; ইনি লীলা চিটনীস্, উনি পৃথ্বীরাজ। প্রত্যেকেই যেন এক একটি রাজপুত্র, রাজকন্যা! কী তাঁহাদের বেশবাস, কী তাঁহাদের মুখের ভাবব্যঞ্জনা!

দরদালানে আরও অনেক চিত্র-দর্শনাভিলাষী নরনারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে, সোমনাথ লক্ষ্য করিল, একটি লোক ক্রমাগত তাহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং চকিত আড়চোখে তাহার পানে তাকাইতেছে। লোকটি বাঙালী নয়, তাহার মাথায় কালো রঙের টুপি এবং গায়ে লংক্লথের লম্বা কোট। বোধহয় গুজরাতী। সোমনাথ

একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

ছবি আরম্ভ হইতে যখন আর মিনিট পাঁচেক বাকি আছে তখন সোমনাথ প্রেক্ষা-গৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। এই সময় লোকটি আসিয়া তাহার বাহুস্পর্শ করিল, ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলিল—'মশাই, আপনি হিন্দী উর্দু বলতে পারেন?'

বিস্মিত হইয়া সোমনাথ বলিল—'পারি বৈকি।' বলিয়া পালিশ করা লক্ষ্ণৌয়া উর্দুতে বলিল,—'আমি লক্ষ্ণৌয়ে জীবন কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার অনুমতি করুন।'

উর্দু শুনিয়া লোকটি বিস্ময়ে কয়েকবার দ্রুত চক্ষু মিটিমিটি করিল, তারপর আগ্রহভরে বলিল—'আমার নাম কুলীনচন্দ্র অমৃতলাল, আমি এই হাউসের ম্যানেজার। আপনার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে, আমার অফিসে আসবেন কি?'

সোমনাথ বলিল—'কিন্তু ছবি যে এখনি আরম্ভ হবে।'

লোকটি হাসিযা বলিল—'তা হলেই বা। আপনি তো এ ছবি অনেকবার দেখেছেন। আজকাল যারা ছবি দেখে তারা সব রিপিট্ অডিয়েন্স্।'

সোমনাথ বলিল—'আমি এ ছবি আগে দেখিনি।'

লোকটি ক্ষণেক অবিশ্বাসভরে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—'আপনার টিকিট আমি রিফণ্ড্ করিয়ে দিচ্ছি। আমার অফিসে চলুন, আমি পাস লিখে দেব, যবে ইচ্ছে যখন ইচ্ছে ছবি দেখবেন। আজ আমার সঙ্গে কথা কইতে হবে।'

সোমনাথ বলিল—'বেশ চলুন।'

চিত্রগৃহের দ্বিতলে সম্মুখের দিকে অফিস-ঘব, কুলীনচন্দ্র সোমনাথকে সেইখানে লইয়া গিয়া আদর করিয়া বসাইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার আলমারি, কাচ-ঢাকা প্রকাণ্ড টেবিল, চামড়ার গদিমোড়া চেয়ার। কুলীনচন্দ্র ভৃত্যকে দুই পেয়ালা চা আনিবার হুকুম দিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

কুলীনচন্দ্র লোকটি কথায় অতিশয নিপুণ। ভাঙা ভাঙা বাংলায় সে কথা বলিতে লাগিল, নিজের উদ্দেশ্য প্রকট না করিয়া সোমনাথের নিকট হইতে তাহার সমস্ত পরিচয় আদায় করিয়া লইল। সোমনাথের লুকাইবার কিছু ছিল না, সে অকপটে সমস্ত উত্তর দিল।

পরিচয় গ্রহণ করিয়া কুলীনচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে চায়ে চুমুক দিল, শেষে বলিল—'আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আপনি বোম্বাই যেতে রাজি আছেন?'

সোমনাথ সবিস্ময়ে বলিল—'বোম্বাই!'

কুলীনচন্দ্র বলিল—'তবে সব খুলে বলি। বোম্বাইয়ে ন্যাশনল্ পিক্চার্স নামে একটি বড় ফিল্ম কোম্পানী আছে, এই কোম্পানীর কর্তা হচ্চেন শ্রীনারায়ণ পিলে। পিলে সাহেব আমার খুব বন্ধু, আমার হাউসে ছাড়া তাঁর ছবি কোথাও দেখানো হয় না।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'এখন যে ছবি চল্‌ছে সে তাঁরই ছবি?'

'হ্যাঁ। তিনি খুব ভাল ছবি তৈরি করেন। এক বছরের কমে তাঁর ছবি হাউস থেকে নড়ে না—দেখতেই তো পাচ্চেন।'

'আপনার প্রস্তাব কি?'

'নারায়ণ পিলে সাহেব আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি নতুন আর্টিস্ট চান। ক্রমাগত একই আর্টিস্টের মুখ দেখে দেখে দর্শকদের চোখ পচে যায়, তাই মাঝে মাঝে রকমফের করতে হয়। আপনাকে আজ দেখেই আমার মনে হল, আপনি যদি সিনেমায় নামেন খুব নাম করতে পারেন।'

সোমনাথ স্তম্ভিত হইয়া বলিল—'কিন্তু আমি যে জীবনে কখনও অভিনয় করিনি—

সখের থিয়েটারেও না!'

'তাতে কোনও ক্ষতি নেই, পিলে সাহেব তালিম দিয়ে ঠিক করে নেবেন। তিনি বলেন, ভাল চেহারার গাধা পেলেও তিনি পিটিয়ে ঘোড়া করে নিতে পারেন।'

কথাটা তাহার পক্ষে কতদূর সম্মানসূচক তা বিবেচনা করিবার মত মনের অবস্থা সোমনাথের ছিল না, সে অত্যন্ত বিব্রতভাবে বলিল—'তা ছাড়া সিনেমাতে দেখেছি সকলেই গান গায়; আমি তো গাইতে জানি না।'

'একেবারেই জানেন না?'

সোমনাথ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'শীতকালে স্নানের সময় মাঝে মাঝে গেয়েছি বটে কিন্তু তার বেশী নয়।'

কুলীনচন্দ্র বলিল—'তাতেও কিছু আসে যায় না। আজকাল সব গানই ভাল গাইয়েকে দিয়ে প্লে-ব্যাক্ করিয়ে নেওয়া হয়। শুনুন, আমি আপনাকে সেকেণ্ড্ ক্লাস গাড়িভাড়া দিচ্ছি, আপনি বোম্বাই গিয়ে পিলে সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন। আমি বলছি আপনার বরাত ফিরে যাবে। এখানে সোয়াশ' টাকা মাহিনা পাচ্ছেন, ওখানে শুরুতেই পাঁচশ' টাকা পাবেন।'

লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু সোমনাথ মাথা-ঠাণ্ডা লোক, সে তৎক্ষণাৎ রাজি না হইয়া বলিল—'আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। কাল আমি জবাব দেব।'

কুলীনচন্দ্র বলিল—'ভাল। কিন্তু এমন সুযোগ হারাবেন না সোমনাথবাবু।'

বাসায় ফিরিয়া সোমনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিল। সে যে কাজ এখন করিতেছে তাহাতে মাহিনা কম, টিকিয়া থাকিতে পারিলে দশ বছরে আড়াইশ' টাকা বেতন হইবে; জীবনের শেষের দিকে হয়তো কিছু স্বচ্ছলতার মুখ দেখিতে পাইবে। তার চেয়ে এই আকস্মিক সুযোগ গ্রহণ করিয়া যদি দু'চার বছরে জীবনের স্বচ্ছলতার খোরাক যোগাড় করিয়া লইতে পারে তো মন্দ কি? টাকা ভাল জিনিস না হইতে পারে, কিন্তু অভাব তার চেয়েও মন্দ জিনিস। আজ সে অবিবাহিত, তার গুরুতর কোনও অভাব নাই। কিন্তু পরে?

অবশ্য বোম্বাই গেলেই যে কাজ জুটিবে এমন কোনও কথা নাই, পিলে মহাশয় তাহাকে পছন্দ না করিতে পারেন। কিন্তু কুলীনচন্দ্রের কথা শুনিয়া মনে হয়, কাজ পাইবার সম্ভাবনা বেশ প্রবল। সম্ভাবনা না থাকিলে গুজরাতী ভাই গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া তাহাকে বোম্বাই পাঠাইতে চাহিত না। সুতরাং চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি। যদি কাজ নাও হয় পরের খরচে বোম্বাই বেড়ানো তো হইবে। সেখানে দিদি আছেন—

অনেক চিন্তার পর সোমনাথ মনস্থির করিল, এক মাসের ছুটি লইয়া বোম্বাই যাইবে। যদি সেখানে পাকা ব্যবস্থা হয় তখন বিনা বেতনে ছুটির মেয়াদ বাড়াইয়া লইলেই চলিবে; কিম্বা অবস্থা বুঝিয়া ব্যাঙ্কের কাজে ইস্তফা দেওয়াও চলিতে পারে।

পরদিন বৈকালে সোমনাথ কুলীনচন্দ্রের সহিত দেখা করিল, বলিল—'আমি রাজি আছি।'

কুলীনচন্দ্র দু'হাতে তাহার করগ্রহণ করিয়া বলিল—'বেশ বেশ। এর পরে যখন প্রকাণ্ড হিরো হবেন তখন আমাকে মনে রাখবেন। আসুন, পিলে সাহেবের কাছে আপনার পরিচয়পত্র লিখে দিই।'

দুই

বোম্বাই পেঁাছিয়া সোমনাথ দিদির বাড়িতে উঠিল। বোম্বাই সে আগে দেখে

নাই, সমুদ্রবেষ্টিত তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে শহর দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

সমুদ্রের উপর শহরের শ্রেষ্ঠাংশে জামাইবাবুর বাসা। তিনি রেলওয়ে বিভাগের বড় চাক্‌রে, সাহেবী কায়দায় থাকেন। দিদির বয়স ত্রিশ পার হইয়া গেলেও সন্তানাদি হয় নাই, স্বামী-স্ত্রী প্রায় নিঃসঙ্গভাবে বাস করেন।

জামাইবাবু খুশি হইয়া বলিলেন—'যাক, তুমি এসেছ, বাড়ির একঘেয়েমী একটু কমবে।' স্ত্রীকে বলিলেন—'আর কি, ভাই সিনেমার হিরো হতে চলল, তুমিও এবার হিরোইন হয়ে নেমে পড়।'

দিদি মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—'হিরোইন তুমি হওগে যাও, আমি কোন্ দুঃখে হতে যাব? তোর জামাইবাবু ছবিতে নামলে দিব্যি মানাবে, না রে সোমু?'

জামাইবাবুর চেহারাটি গুড়ের নাগরির মত, কিন্তু চেহারা সম্বন্ধে কোনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিনি গায়ে মাখেন না। বলিলেন—'কম বয়সে আমার পানেও লোকে ফিরে ফিরে চাইত, খাস ক'রে মেয়েরা। সে যাক, সোমনাথ, তোমাকে একটা উপদেশ দিই। সিনেমার মহিলারা শুনেছি লোক ভাল নয়, নিজের চরিত্রের প্রতি যদি মমতা থাকে একটু সাবধানে চোলো।'

দিদি বলিলেন—'সে আর ওকে বলতে হবে না। কিন্তু যাই বল, ও যখন হিরো হয়ে নামবে, ছবি দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে।' বলিয়া সপ্রশংস স্নেহরসে সোমনাথকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

জামাইবাবু বলিলেন—'সেই কথাই তো বলছি। তোমারই যখন চোখ জুড়িয়ে যাবে তখন অন্য মেয়েদের কি অবস্থা হবে ভাবো।'

দিদি স্বামীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন—'মা গো, আজকাল যারা হিরো সাজে তারা কি পুরুষ মানুষ? যত সব পিলেরোগা হাড়গিলের দল।'

জামাইবাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—'কাবুলিওয়ালা ছাড়া আর কাউকে তোমার দিদি পুরুষ বলেই জ্ঞান করেন না।' বলিয়া তিনি অফিসে চলিয়া গেলেন। দিদি ও জামাইবাবুর মধ্যে প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রীতি থাকিলেও সর্বদাই কথা কাটাকাটি হইয়া থাকে।

পরদিন সকালবেলা সোমনাথ নারায়ণ পিলের সহিত দেখা করিতে গেল। ন্যাশনল্ পিকচার্সের স্টুডিও বোম্বাই শহরের মধ্যেই। জামাইবাবু অফিস যাইবার পথে সোমনাথকে নিজের মোটরে স্টুডিওর ফাটক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

ফাটকে পাঠান সান্ত্রীর পাহারা। সোমনাথ পূর্বে কখনও সিনেমা স্টুডিওর সিংহ-দ্বার পার হয় নাই, সে মনে একটু উদ্বেগ লইয়া প্রবেশ করিল। পাঠান দ্বারপাল তাহাকে মোটর হইতে নামিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বাধা দিল না।

অনেকখানি জমির উপর স্টুডিও। মাঝখানে ইস্টিশানের মত প্রকাণ্ড উঁচু একটা করোগেটের ছাউনি; আশে পাশে পিছনে ছোট বড় অনেকগুলি বাড়ি। কোনও বাড়ির দ্বারে লেখা—'মিউজিক', কোনও বাড়িতে—'এডিটিং', কোথাও বা—'মেক-আপ'। অনেক লোক চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সকলেরই ব্যস্তসমস্ত ভাব; কিন্তু চেঁচামেচি হট্টগোল নাই। সোমনাথ দেখিল, কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ রঙীন কাপড় পরিয়া মুখে রঙ্ মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা সম্ভবত অভিনেতা অভিনেত্রী। এই সময় একটা ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। রঙ্ মাখা কুশীলবগণ তাড়াতাড়ি গিয়া ইস্টিশানে ঢুকিয়া পড়িল।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সোমনাথ দেখিল একটা বড় বাড়ির সম্মুখে লেখা আছে—'অফিস'। পিলে মহাশয়কে এইখানেই পাওয়া যাইবে বিবেচনা করিয়া সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

একটি ঘরে টেবিল চেয়ার সাজানো, পিলে মহাশয়ের দর্শনভিক্ষু কয়েকজন লোক সেখানে বসিয়া আছে। সোমনাথ প্রবেশ করিতেই একজন ছোকরা সেক্রেটারি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার কি দরকার?'

সোমনাথ সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া কুলীনচন্দ্রের পরিচয়পত্র তাহাকে দিল। সেক্রেটারি বলিল—'আপনি বসুন, আমি 'বস্'কে খবর দিচ্ছি।'

সেক্রেটারি ভিতর দিকে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল—'বস্ এখন ভারি ব্যস্ত আছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

সোমনাথ বসিয়া রহিল। দর্শনপ্রার্থীরা একে একে দেখা করিয়া প্রস্থান করিল; আরও নূতন দর্শনপ্রার্থী আসিল। সোমনাথের মনে হইল, সে যেন মধ্যযুগের ইংলণ্ডে রাজ-সন্দর্শনে আসিয়াছে, anti-chamber-য়ে প্রতীক্ষা করিতেছে, সমন আসিলেই রাজ-দর্শন করিয়া ধন্য হইবে।

ক্রমে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সোমনাথ বিরক্ত হইয়া উঠিল। দর্শনপ্রার্থীরা, যাহারা পরে আসিয়াছিল, তাহারাও কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে, অথচ তাহার ডাক পড়িল না। ঘরে অন্য কেহ নাই, সেক্রেটারিও কিছুক্ষণ যাবৎ অদৃশ্য হইয়াছে। সোমনাথ ভাবিল, আর রাজ-দর্শনে কাজ নাই, ফিরিয়া যাই। এরা কি রকম লোক, খোসামোদ করিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়া দেখা করে না?

সোমনাথ তখনও জানিত না, সিনেমা-সমাজের ইহাই এটিকেট্। যে দেখা করিতে আসিয়াছে তাহাকে দীর্ঘকাল বসাইয়া রাখিতে হইবে, বা 'আজ দেখা হইবে না' বলিয়া বারবার হাঁটাহাঁটি করাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাহার কদর কিছু নাই। সিনেমা-ওয়ালাদের টাকা আছে, তাই গরজ নাই। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব?

সোমনাথ উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ভিতরের দরজার দিকে চোখ তুলিয়া অবাক হইয়া গেল। দ্বারের কাছে একটি অপূর্ব মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে এবং মোহ-ভরা চোখে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সোমনাথ ভাবিল, ছবি নাকি? বিচিত্র কবরীবন্ধ, দীঘল সুঠাম দেহে অপরূপ আভরণ, মুখখানি যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম। কিন্তু ছবি নয়। পরক্ষণেই মৃদু হাস্যে কুন্দদন্ত ঈষৎ মোচন করিয়া তরুণী সোমনাথের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, মধুপ-গুঞ্জরের মত মিষ্ট ইংরাজীতে বলিলেন—'আপনিই কি মিস্টার সোমনাথ—কলকাতা থেকে আসছেন?'

সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোমনাথ বলিল—'হ্যাঁ।'

তরুণীর মোহ-মোহ চক্ষু দুটি যেন বিগলিত হইয়া গেল, তিনি বলিলেন—'আমি মিসেস পিলে, আমার নাম চন্দনা দেবী।'

নামটা যেন চেনা চেনা। তারপর সোমনাথের মনে পড়িয়া গেল, বহু প্রাচীরপত্রে ঐ নাম ঐ মুখ সে দেখিয়াছে—সিনেমা রাজ্যের অমুকুটিত সম্রাজ্ঞী চন্দনা দেবী। সোমনাথ করতল যুক্ত করিয়া নত হইয়া নিজ কৃতার্থতা জ্ঞাপন করিল।

চন্দনা দেবী বলিলেন—'আমার স্বামী এখনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন; আমিও থাকতাম, কিন্তু সেটে আমার কাজ আছে। আশা করি আবার দেখা হবে—টা টা!'

একটু হাসিয়া একটু ঘাড় নাড়িয়া কুহকময়ী বাহিরের দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সোমনাথের মনের ঘোর ভাঙ্গ করিয়া কাটিবার আগেই সেক্রেটারি আসিয়া বলিল—'আসুন—'বস্' আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

বসিবার ঘরের পর সেক্রেটারির ঘর, তারপর 'বসের' ঘর। দ্বারের ভারি পর্দা সরাইয়া সেক্রেটারি সোমনাথের প্রবেশের পথ করিয়া দিল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সোমনাথের

নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ঘরে গুরুভার একটা সুগন্ধ সাঁঝাল্ ধোঁয়ার মত ভারি হইয়া বসিয়াছে। ঘরটি আধা-আলো আধা-অন্ধকার। সোমনাথের ইন্দ্রিয়গ্রাম এই নূতন পরিবেশে অভ্যস্ত হইলে সে দেখিল ঘরের কোণে টেবিলের সম্মুখে একটি লোক বসিয়া আছে।

লোকটিকে দেখিয়া সোমনাথ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইনিই নারায়ণ পিলে—নটীশিরোমণি চন্দনা দেবীর স্বামী এবং দিগ্বিজয়ী চিত্র-প্রণেতা! গায়ের রং হুঁকার খোলের চেয়েও কালো; শীর্ণ খর্ব চেহারা, মুখখানি দেখিয়া মনে হয় একতাল কাদা কেহ দুই হাতে থাসিয়া স্কন্ধের উপর বসাইয়া দিয়াছে; এই কাদার তালের মধ্যে একজোড়া রক্তবর্ণ তির্যকচক্ষু; সর্বোপরি পরিধানে গাঢ় নীলরঙের কোট প্যাণ্ট্।

সোমনাথ ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া পিলে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'আসুন, এই চেয়ারে বসুন।'

হঠাৎ সোমনাথের একটি উপমা মনে পড়িল; লোকটি যেন একটি কালো রঙের ফাউণ্টেন পেন। গলায় সোনালি রঙের টাই উপমাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া দিয়াছে। সোমনাথ পরে জানিতে পারিয়াছিল উপমাটি তাহার নূতন আবিষ্কার নয়, সিনেমা-সমাজের অনেকেই আড়ালে পিলে সাহেবকে ফাউণ্টেন পেন বলিয়া উল্লেখ করে।

সোমনাথ পিলে সাহেবের সম্মুখের চেয়ারে বসিল; কিছুক্ষণ দুইজনে দৃষ্টি বিনিময় হইল। পিলে সাহেবের চক্ষু তির্যক ও রক্তবর্ণ হইলেও পর্যবেক্ষণে অপটু নয়, সৌষ্ঠবহীন মুখখানাতে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। পর্যবেক্ষণ শেষ করিয়া তিনি আস্তে আস্তে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। নেহাত মামুলি কথা, এমন কি অসংলগ্ন ও উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে হয়; তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গীও একটু নির্জীব ধরনের। সোমনাথ বসিয়া শুনিতে লাগিল—

'কুলীনভাই আপনাকে পাঠিয়েছেন—কুলীনভাই আমার প্রিয় বন্ধু। তাঁর আলাদা চিঠিও আমি এয়ার মেলে পেয়েছি।...আপনি সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রিতে নতুন লোক, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান...নতুন রক্ত আমাদের দরকার, কিন্তু ভদ্রসন্তানকে এ পথে আনতে শঙ্কা হয়...সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রি দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে—প্রতিভা নেই, শিক্ষা নেই, চরিত্র নেই। এই সিনেমা জগৎ খুঁজলে আপনি এমন লোক পাবেন না যাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করা যায়। সবাই অর্থলোভী জোচ্চোর, চরিত্রহীন লম্পট। আপনি এ লাইনে নতুন আসছেন তাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি—'

এই সময় সোমনাথ টের পাইল পিলে সাহেবের মুখ দিয়া ভক্ ভক্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। সকালবেলাই তিনি মদ্যপান করিয়াছেন। পরে সোমনাথ জানিতে পারিয়াছিল, পিলে সাহেব অহোরাত্র মদে চুর হইয়া থাকেন। ঘরে তীক্ষ্ণ সুগন্ধি দ্রব্য ছড়াইবার উদ্দেশ্য বোধহয় পিলে সাহেবের মুখনিঃসৃত মদের গন্ধকে চাপা দেওয়া।

পিলে সাহেব শান্ত কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন—'ছবি তৈরি করার একটা নেশা আছে, তার ওপর কাঁচা পয়সার লোভ...দুনিয়ার যত ঠক বদমায়েস এইখানে এসে জুটেছে। তাদের একমাত্র গুণ তারা মন জুগিয়ে কথা বলতে পারে। ভালো লোক এখানে আমল পায় না, যারা আসে তারা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। ভদ্রলোকের জায়গা এ নয়। অথচ এই চিত্রশিল্পের যে কী অসীম সম্ভাবনা তা বলা যায় না—'

পিলে সাহেবের মনে বোধহয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বহু গ্লানি সঞ্চিত হইয়াছিল; তিনি সম্ভবত নূতন লোক পাইলে এইভাবে হৃদয়ভার লাঘব করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন বাধা পড়িল। দরজায় টোকা দিয়া, একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইনি

জীবরাজ নাগর। গোলগাল মানুষ, পিলে সাহেবের সহকারী ডিরেক্‌টর। পিলে সাহেব ছবির ডিরেক্‌টর হইলেও কখনও সেটে যান না, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নাগর মহাশয় সেটের যাবতীয় কাজ করেন।

নাগর বলিলেন—'একটা শট্‌ কি করে নেব বুঝতে পারছি না।'

পিলে সাহেবের মুখের অলস নির্জীব ভাব মুহূর্তে কাটিয়া গেল। তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন—'কোন্‌ শট্‌?'

'হিরোইন যাতে রাজাকে প্রণাম করছেন। ডায়লগ্‌ নেই, শুধু একটু ফোঁপানো।'

'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—'

পিলে লাফাইয়া উঠিয়া মাঝখানে দাঁড়াইলেন; সোমনাথের উপস্থিতি কেহই গ্রাহ্য করিল না।

পিলে নাগরকে বলিলেন—'তুমি মেঝেয় শোও।'

জীবরাজ নাগর তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর লম্বা শুইয়া পড়িলেন।

পিলে বলিলেন—'এবার দ্যাখো এটা মিড শট্‌—ক্যামেরা এইখানে বসবে। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছেন—মেয়ে খবর পেয়ে ছুটে তাঁকে দেখতে আসছেন—কেমন? এইবার দ্যাখো—মেয়ে চারিদিকের মৃতদেহের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছেন, এইবার রাজাকে দেখতে পেলেন, এইভাবে ছুটে এসে তাঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে পড়লেন, তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাঁর পায়ের ওপর এমনি ভাবে—বুঝলে?' পিলে নাগরের জুতাপরা পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

সোমনাথ চমৎকৃত হইয়া দেখিতে লাগিল। রাজকুমারীর প্রত্যেকটি ভঙ্গী প্রত্যেকটি মুখভাব এই কদাকার লোকটি এমন নিঃসংশয় ভাবে অভিব্যক্ত করিল যে সোমনাথ বিস্মিত হইয়া গেল। জীবরাজ নাগর গাত্রোত্থানপূর্বক গা ঝাড়া দিয়া প্রস্থান করিবার পর সে বলিল—'আপনি অভিনয় করেন না কেন?'

পলকের জন্য পিলের তিক্ত অন্তর প্রকাশ পাইল; তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—'পাবলিক অভিনয় চায় না, সুন্দর চেহারা চায়। হয়তো কোনও দিন আমি অভিনয় করব, যেদিন আমার চেহারার উপযুক্ত পার্ট পাব। কিন্তু ও কথা যাক।'

দেরাজ হইতে একটা ছাপা ফর্ম বাহির করিয়া বলিলেন—'আপনাকে আমি নেব। আপনি নতুন লোক, কিন্তু লোক আমি তৈরি করে নিতে পারি। নিন কন্‌ট্রাক্টে সই করুন।'

সোমনাথ চুক্তিপত্র পড়িয়া দেখিল, তিন মাসের জন্য পাঁচশত টাকা বেতনে তাহাকে অভিনেতা নিযুক্ত করা হইল; কোম্পানীর অপ্‌শান থাকিবে তিনমাস পরে দীর্ঘতর মেয়াদে তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিবে। আপত্তিজনক কিছু না পাইয়া সোমনাথ দস্তখৎ করিয়া দিল।

পিলে বলিলেন—'অবশ্য আমি একটা risk নিচ্ছি। আপনার ফটোগ্রাফিক টেস্ট আর গলার সাউন্ড টেস্ট নিতে হবে, যদি ভাল না আসে তাহলে আপনাকে ব্যবহার করতে পারব না। আমার দেড় হাজার টাকা অকারণে খরচ হবে।'

সোমনাথ বলিল—'আমার টেস্ট যদি পছন্দসই না হয় আমি কিছুই দাবি করব না।'

পিলে উঠিয়া তাহার করমর্দন করিলেন—'Thank you. I think I am going to like you. কাল এই সময় আসবেন, আপনার টেস্ট নেবার ব্যবস্থা করে রাখব।'

পরদিন সোমনাথের টেস্ট লওয়া হইল। এমন বিষম পরীক্ষা তাহার জীবনে কখনও আসে নাই। সামনে ক্যামেরা, মাথার উপর মাইক ঝুলিতেছে, চারিদিকে চোখ-ধাঁধানো উগ্র আলো; তাহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া ডায়লগ্‌ বলিতে হইবে।

সোমনাথ সবই নির্দেশমত করিল বটে কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইবার পর তাহার দৃঢ় ধারণা হইল সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। সিনেমার হিরো হওয়া তাহার কর্ম নয়। নিজের অক্ষমতায় মনমরা হইয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

দুইদিন পরে পিলে সাহেবের সেক্রেটারি টেলিফোনে খবর দিল—'টেস্ট ভাল হয়েছে—আপনি আসুন।'

সোমনাথের চিত্রজীবন আরম্ভ হইল।

তিন

পিলে সাহেব সোমনাথকে জানাইলেন, যে ছবিটি সদ্য আরম্ভ হইয়াছে তাহাতেই সে নায়কের ভূমিকা পাইবে। ছবির শুটিং আরম্ভ হইয়া গিয়াছে অথচ নায়ক নির্বাচিত হয় নাই ইহাতে সোমনাথ আশ্চর্য হইল। কিন্তু পিলে সাহেব গল্পটি যখন তাহাকে শুনাইলেন তখন সোমনাথ বুঝিল, নায়ক নামমাত্র, নায়িকা চন্দনা দেবীই ছবি জুড়িয়া আছেন। ইহাতে দুঃখিত না হইয়া সে বরং মনে মনে হাঁফ ছাড়িল। প্রথম ছবিতে তাহার ঘাড়ে বেশী ঝুঁকি পড়িবে না।

পিলে সাহেব তাহাকে কয়েকদিন তালিম দিলেন। তারপর সে রঙীন কাপড় পরিয়া মুখে রঙ্ মাখিয়া ক্যামেরার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

কাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে স্টুডিওর সকলের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় হইল। সিনেমাক্ষেত্র জগন্নাথক্ষেত্র—হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাতী, কেহই পুণ্যক্ষেত্র হইতে বাদ পড়ে নাই। একটি যুবকের সহিত সোমনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মিল, সে কমিক অ্যাক্টর পাণ্ডুরঙ্ যোশী। পাণ্ডুরঙ্ ভাঁড়ামি করে বটে কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান লোক।

বলা বাহুল্য কর্মসূত্রে চন্দনা দেবীর সঙ্গেও তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, কিন্তু স্ত্রীচরিত্রে অজ্ঞতার জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক চন্দনা দেবীকে সে ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না। তিনি সর্বদাই হাসিমুখে কথা বলেন, কখনও কখনও অন্তরঙ্গভাবে ব্যক্তিগত কথাও বলেন, অথচ মনে হয় তাঁহার প্রচ্ছন্ন মন ধরা দিতেছে না; তাঁহার সুন্দর চোখে যখন আন্তরিকতা জ্বলজ্বল করিতেছে তখনও সন্দেহ হয় তিনি অভিনয় করিতেছেন।

তাই বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথাও সোমনাথের মনে আসিল না। স্বামীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে কোনও ত্রুটি দেখিতে পায় নাই। পিলে সাহেবের অফিস ঘরে যখনই চন্দনা দেবী দেখা দেন, স্বামীর চেয়ারের হাতলে বসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া কথা বলেন, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন হওয়া উচিত তেমনই সহজ প্রীতির সম্পর্ক। সিনেমা অভিনেত্রীদের নামে যে সকল দুর্নাম আছে তাহা অন্যের পক্ষে সত্য হইতে পারে কিন্তু চন্দনা দেবী সম্বন্ধে কখনই সত্য নয়।

এদিকে ছবির কাজ চলিতেছে। সোমনাথকে প্রায়ই সেটের উপর চন্দনা দেবীর সহিত প্রেমালাপ করিতে হয়, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে হয়। চন্দনা দেবীর প্রেমাভিনয় বিখ্যাত; হাসি চাহনি বাচনভঙ্গীর দ্বারা তিনি এমন রোমাঞ্চকর সম্মোহ সৃষ্টি করিতে পারেন যে, দর্শক মাত্রেরই রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে বয়সের দোষে সোমনাথের যদি চিত্ত চঞ্চল হইত তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না; কিন্তু সোমনাথের একটি রক্ষাকবচ ছিল; বিবাহিতা নারী সম্বন্ধে তাহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে পরস্ত্রী মাতৃবৎ। উপরন্তু সোমনাথ পিলে সাহেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ

করিয়াছিল, মনে মনে তাঁহাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং গুরুপত্নী সম্বন্ধে তাহার মন যে সম্পূর্ণ অন্য ভাব পোষণ করিবে তাহা বলা বাহুল্য।

পিলে সাহেবও তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও সরল বিনীত স্বভাব দেখিয়া তাহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন—'Somnath, my boy, leave everything to me. I'll make you the greatest leading man India has yet produced.'

নূতন কাজে মাসখানেক বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। অবস্থা বুঝিয়া সোমনাথ ব্যাঙ্কের চাকরিতে ইস্তফা দিল।

হিরোর অধিকারে সে স্টুডিওতে একটি নিজস্ব ঘর পাইয়াছিল। ঘরটি টেবিল চেয়ার আয়না কৌচ প্রভৃতি দিয়া পরিপাটিভাবে সাজানো। কাজের ফাঁকে সে এই ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিত। পান্ডুরঙ্ যোশীও ফুরসত পাইলেই আসিয়া তাহার সহিত আড্ডা জমাইত।

একদিন দুপুরবেলা পান্ডুরঙ্ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—'বন্ধু, আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। জানতে পেরেছি তোমার বরাত খুলেছে।'

সোমনাথ কৌচে কাৎ হইয়া নভেল পড়িতেছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল—'সে কি, কী হয়েছে?'

তাহার পাশে বসিয়া পান্ডুরঙ্ ভর্ৎসনার সুরে বলিল—'কেন মিছে ছলনা করছ দোস্ত। দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, আমাদের দেখেই সুখ। এতে লুকোচুরির কি আছে?'

'কি দেবী? কার কথা বলছ?'

'দেবী এ স্টুডিওতে কটা আছে?'

'চন্দনা দেবীর কথা বলছ?'

পান্ডুরঙ্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোমনাথের পানে চাহিল। সে সোমনাথের মন বুঝিতে আসিয়াছিল, সম্ভব হইলে বন্ধুভাবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার ইচ্ছাও ছিল; কিন্তু সোমনাথের ভাব দেখিয়া তাহার ধোঁকা লাগিল। সে বলিল—'হ্যাঁ, সেই দেবীর কথাই হচ্চে। ওর সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ঠিক করে আমায় বল দেখি।'

সোমনাথ বলিল—'ধারণা তো বেশ ভালই। মন্দ মনে করার কোনও কারণ হয়নি।'

পান্ডুরঙ্ ভ্রূ তুলিল—'হুঁ! কাল যখন তোমরা সেটের উপর অভিনয় করছিলে, উনি পিছন দিক থেকে এসে তোমার কাঁধে হাত দিয়ে মাথার ওপর গাল রেখেছিলেন, তখনও কিছু মনে হয়নি?'

'না। অভিনয়—অভিনয়। তার আবার মনে হবে কি?'

পান্ডুরঙ্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর সোমনাথের কৌটা হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—'ভাই, সিনেমা সমুদ্রে তুমি নতুন ডুবুরি, হালচাল সব জানো না। আমি পুরোনো পাপী, দেবীকে অনেক দিন থেকে দেখছি। দেবী গভীর জলের মাছ।'

সোমনাথ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল—'পান্ডুরঙ্, যা বলবে পরিষ্কার করে বল, আমি অত বাঁকা কথা বুঝতে পারি না।'

পান্ডুরঙ্ কয়েকবার সিগারেটে টান দিয়া বলিল—'আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। দেবীর বয়স কত তোমার মনে হয়?'

সোমনাথ বলিল—'জানি না। পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বোধ হয়?'

পান্ডুরঙ্ বলিল—'দেবীর বয়স কম-সে-কম পঁয়ত্রিশ বছর। মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। তিনি গত পনেরো বছর ধরে ছবিতে হিরোইন সাজছেন, তার আগে দু'বছর

মাইনর পার্ট করেছেন। সুতরাং বয়স কত হিসেব করে দ্যাখো।'

সোমনাথের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না, তবু সে বলিল—'তাই যদি হয় তাতেই বা দোষ কি? বরং প্রশংসার কথা।'

পান্ডুরঙ্ বলিল—'ভাই, দোষ আমি কাউকে দিচ্ছি না। সতেরো বছর বয়স থেকে পেটের দায়ে ভাঁড়ামি করছি, এটুকু বুঝেছি কোনও কাজের জন্যেই কাউকে দোষ দেওয়া যায় না, সবই নিয়তির খেল্লা। আমি বুঝতে পেরেছি দেবীর মন তোমার দিকে ঢলেছে। তুমি যদি রাজি থাকো অভিনন্দন জানাচ্ছি; আর যদি রাজি না থাকো সাবধান হয়ো।'

সোমনাথ বলিল—'ও সবে আমার রুচি নেই এবং তোমার অনুমান যে ঠিক তাতেও আমার সন্দেহ আছে।'

পান্ডুরঙ্ হাসিল—'এসব বিষয়ে আমার ভুল হয় না। দেবীর মনে রঙ্ ধরেছে। এর আগেও বার তিনেক দেখেছি কিনা।' বলিয়া সংক্ষেপে দেবীর পূর্বতন কয়েকটি রোমান্সের উল্লেখ করিল।

শুনিয়া সোমনাথ সবিস্ময়ে বলিল—'বল কি। মিঃ পিলে জানতে পারেননি?'

'উহু। ঐখানেই দেবীর মাহাত্ম্য। এমন সাফাই হাতে কাজ করেন ধরা-ছোঁয়া যায় না; কিন্তু এও বলে দিচ্ছি, ফাউণ্টেন পেনের কাছে দেবী যেদিন ধরা পড়বেন সেদিন ওঁর নায়িকা জীবন শেষ হবে।'

'কেন?'

'দেবীর রূপ আছে, বুদ্ধি আছে, আর্টিস্টও ভাল, কিন্তু ওঁকে খাড়া করে রেখেছে পিলে। পিলে ছাড়া আর কেউ দেবীকে ব্যবহার করতে পারবে না। তাই বলছি, পিলে যদি কোনও দিন দেবীকে তাড়িয়ে দেয় তখন ওঁর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে। দেবীও সেকথা জানেন, তাই এত লুকোচুরি।'

এই আলোচনার পর সোমনাথ একটু সতর্ক হইল। পান্ডুরঙ্ যে ইঙ্গিতজ্ঞ ব্যক্তি তাহা ক্রমে তাহার অনভিজ্ঞ চোখেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। চন্দনা দেবী প্রথম দর্শনেই সোমনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অতি কৌশলে সূক্ষ্ম প্রলোভনের জাল পাতিয়া ছিলেন, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি সোমনাথ অত মিহি ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই। চন্দনা দেবীও অনুভব করিয়াছিলেন যে সোমনাথ আনাড়ি। তাঁহার লিপ্সা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন চন্দনা দেবী বেশ স্পষ্ট ইসারা দিলেন; এমন ইসারা যে অন্ধ ব্যক্তিও দেখিতে পায়।

ছবির শুটিং অর্ধেকের অধিক শেষ হইয়াছে, পিলে সাহেব হুকুম দিলেন আউট-ডোর শুটিং আরম্ভ করিতে হইবে। বোম্বায়ের বাহিরে কিছু দূরে অনেক রমণীয় নিসর্গদৃশ্য আছে, পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ, সমুদ্র কিছুরই অভাব নাই; স্থির হইল জঙ্গল-প্রধান একটি স্থানে গিয়া ছবি তোলা হইবে। নায়ক নায়িকা জঙ্গলের মধ্যে লুকোচুরি খেলিবে এবং ডুয়েট গান গাহিবে।

স্থানটি শহরের বাহিরে প্রায় বিশ মাইল দূরে। যথাসময়ে মোটর সহযোগে শুটিং পার্টি ওকুস্থান অভিমুখে যাত্রা করিল। কর্মকর্তা নাগর; পিলে অভ্যাসমত আসেন নাই। অভিনেতাদের মধ্যে কেবল চন্দনা দেবী এবং সোমনাথ, তাছাড়া যন্ত্র এবং যন্ত্রী তো আছেই।

একটি ছোট মোটরে কেবল সোমনাথ ও চন্দনা চলিয়াছেন। আর কেহ নাই। দুজনেই রঙ্ মাখিয়া দৃশ্যোপযোগী বেশ পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, খোলা জায়গায় প্রসাধনের সুবিধা নাই। চন্দনা দেবীর চোখে বিলাতী কাজল, চোখের পক্ষ্মগুলি দীর্ঘ ও ছায়ানিবিড় দেখাইতেছে।

ধাবমান গাড়ির বায়ুপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়া দু'একটি কথা হইতেছে; মাঝে মাঝে চন্দনা দেবী পাশে উপবিষ্ট সোমনাথের প্রতি অলস অপাঙ্গদৃষ্টি করিতেছেন। গাড়ি যখন মোড় ফিরিতেছে তখন একজন অন্যের গায়ে হেলিয়া পড়িতেছেন, কাঁধে কাঁধে ঠেকাঠেকি হইতেছে। সোমনাথ কিন্তু অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য হাসিমুখে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া চিত্তচাঞ্চল্যের কোনও লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে না। চন্দনা দেবী তখন মোহ-মোহ দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে তাহাকে দেখিতেছেন, দৃষ্টির অকথিত তিরস্কার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, এমন সুযোগ পেয়েও তুমি অবহেলা করছ? তুমি মানুষ না পাথর?

হঠাৎ চন্দনা প্রশ্ন করিলেন—'আপনার বয়স কত?'

সোমনাথ চকিতে তাঁহার দিকে ফিরিল, বলিল—'ছাব্বিশে পড়েছি।'

চন্দনা কিছুক্ষণ স্বপ্নালু চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'ছাব্বিশ বছর বয়সে মানুষের মন কেমন হয় তা কে জানে। খুব বেশী বুড়ো মনে হয় কি?'

'না—যদি বাধা না থাকে, আপনার বয়স কত?'

চন্দনা সরলভাবে বলিলেন—'আগামী ২৭শে আমার জন্মদিন—বাইশ বছর পুরবে।'

চোখে পাছে অবিশ্বাস ফুটিয়া ওঠে তাই সোমনাথ তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর চন্দনা বলিলেন—'মিঃ পিলের বয়স কত জানেন?'

সোমনাথ সাবধানে বলিল—'ঠিক বলতে পারি না—চল্লিশের কাছাকাছি হবে বোধ হয়।'

'মিঃ পিলের বয়স পঞ্চান্ন।' চন্দনা একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন; তাঁহার কাঁচুলি বাঁধা বক্ষস্থল উত্থিত হইয়া আবার পতিত হইল।

সোমনাথ চুপ করিয়া রহিল। বাকি পথটা আর কোনও উল্লেখযোগ্য কথা হইল না।

ওকুস্থলে পৌঁছিয়া সকলে কাজে লাগিয়া গেল। স্থানটি সত্যই ছবির মত; চারিদিকে গাছপালা, কোথাও জন মানব নাই—যুবক যুবতীর প্রণয় লীলার উপযুক্ত ক্রীড়াভূমি। যন্ত্রপাতি সাজাইয়া ছবি তুলিতে গিয়া কিন্তু এক বাধা উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহারা কেবলি আসিয়া সূর্যকে ঢাকিয়া দিতে লাগিল। প্রখর একটানা সূর্যালোক না পাইলে ফটোগ্রাফ্ ভাল হয় না। জীবরাজ নাগর কয়েকবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন—'মেঘ কেটে না গেলে কিছু হবে না। অপেক্ষা করতে হবে।'

চন্দনা গাছতলায় একটি টুলের উপর বসিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ যেন চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন; শেষে বলিলেন—'উপায় কি? কিন্তু বসে বসেই বা কি করা যায়? চলুন মিঃ সোমনাথ, ঐদিকের জঙ্গলটা explore করে আসা যাক।—নাগরজি, সময় হলে মোটরের হর্ণ বাজাবেন, আমরা ফিরে আসব।'

সোমনাথ আপত্তি করিল না। খোলা জায়গায় সূর্যের ঝাঁঝ বেশী, এখানে বসিয়া থাকার চেয়ে বনের ছায়ায় তবু ঠাণ্ডা পাওয়া যাইবে।

দু'জনে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যতই দূরে যাইতে লাগিলেন বন ততই ঘন হইতে লাগিল। জংলী গাছপালার গাঢ় পত্রাবরণের নীচে একটি সজল স্নিগ্ধতা বিরাজ করিতেছে। বনভূমির উপর যেন চিত্রমৃগের অজিন বিছানো। আলোর রঙ্ ক্রমে সবুজ হইয়া আসিল।

একটি গানের কলি গুঞ্জন করিতে করিতে চন্দনা চলিয়াছেন, পাশে সোমনাথ। থাকিয়া থাকিয়া চন্দনা সোমনাথের দিকে হরিণায়ত দৃষ্টি ফিরাইতেছেন; কথাবার্তা

কিছু হইতেছে না।

একটি গাছের ডাল হইতে সপুষ্প অর্কিডের লতা ঝুলিয়া ছিল, চন্দনা সেটি তুলিয়া খোঁপায় দিলেন। বলিলেন—'এই রকম বনে এলে আমার মনে হয় আমি যেন বনের প্রাণী—সংসার নেই, সংস্কার নেই, একেবারে আদিম মানবী। আপনার মনে হয় না?'

সোমনাথ বলিল—'কই এখনও তো মনে হচ্ছে না। দেখুন দেখুন, জল—!'

দ্রুত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সোমনাথ দেখিল, বনের নামাল জমির উপর তরু-বেষ্টিত একটি ছোট্ট জলাশয়। কাকচক্ষু জল, তল পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।

দু'জনে জলাশয়ের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। চন্দনা জলে হাত ডুবাইয়া বলিলেন—'আঃ, কী ঠাণ্ডা জল!' তাঁর চোখে সহসা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, 'আমি স্নান করব। আপনি করবেন?'

সোমনাথ বলিল—'সে কি, মেক-আপ ধুয়ে যাবে যে।'

'গলা পর্যন্ত জলে নামব, মেক-আপ ভিজবে না।'

'কিন্তু কাপড়-চোপড়? এখানে তো বদ্‌লানোও যাবে না।'

চন্দনা অচপল দৃষ্টি সোমনাথের মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন—'কাপড়-চোপড় কিনারায় থাকবে।'

সোমনাথ প্রথমটা বুঝিতে পারিল না; তারপর একঝলক রক্ত আসিয়া তাহার রঙ্-মাখা মুখখানাকে আরও লাল করিয়া দিল। অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া সে কষ্টে গলা দিয়া আওয়াজ বাহির করিল—'না, আমি নাইব না।'

'নাইবেন না?'

'না।'

চন্দনা ভ্রূর একটি ভঙ্গী করিলেন—'বেশ, আমি একাই নাই তাহলে। এমন জল পেয়ে আমি ছেড়ে দেব না।'

চন্দনার কথাগুলো অদ্ভুত ইঙ্গিতপূর্ণ শুনাইল। সোমনাথ তাড়াতাড়ি জলের কিনারা হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—'আমি ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়াচ্ছি, আপনি স্নান করুন।'

সোমনাথ একটা গাছের ডাল ধরিয়া জলের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে পিছন হইতে জলের শব্দ আসিতে লাগিল। চন্দনা দেবী বৃন্দাবনের গোপিনীর ন্যায় লজ্জা সরম তীরে রাখিয়া জলে নামিয়াছেন। সোমনাথ আরও একটু দূরে—শব্দের এলাকার বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। অমনি পিছন হইতে আওয়াজ আসিল—'বেশী দূরে চলে যাবেন না—আমার কাপড়-চোপড় কেউ যদি চুরি করে নিয়ে যায়—'

সোমনাথের প্রবল ইচ্ছা হইল একবার পিছু ফিরিয়া তাকায়; কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা দমন করিয়া ঘাসের উপর বসিল এবং তপ্তমুখে একটা সিগারেট ধরাইল।

দশ মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর দূর হইতে মোটর হর্ণের ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

চার

অপরাহ্নে যখন সোমনাথ বাড়ি ফিরিল তখন তাহার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করিতেছে।

এ এমন কথা যে দিদির কাছে বলা যায় না। অথচ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ বিশেষ দরকার; নিজের বুদ্ধিতে সব দিক রক্ষা করিয়া বেড়াজাল হইতে বাহির হইতে

পারিবে এমন সম্ভাবনা নাই। চন্দনা দেবী প্রবীণা শবরী, এত অল্পে শিকার ছাড়িয়া দিবেন না।

বাড়ি ফিরিয়া একটা সুরাহা হইল। দিদি মোটরে চড়িয়া বাজার করিতে গিয়াছিলেন; জামাইবাবু একাকী বারান্দায় বসিয়া চা সহযোগে জলযোগ করিতেছিলেন। সোমনাথ স্থির করিল জামাইবাবুকে ব্যাপারটা বলিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিবে। জামাইবাবুকেও বলিতে লজ্জা করিবে; কিন্তু উপায় নাই।

সোমনাথের জন্য চা জলখাবার আসিল। দু'জনে কিছুক্ষণ পানাহারে নিবিষ্ট রহিলেন। সোমনাথ কথাটা কিভাবে পাড়িবে মনে মনে গুছাইয়া লইতেছে এমন সময় জামাইবাবু বলিলেন—'কলকাতা থেকে দাদা চিঠি লিখেছেন—রত্না কাল আসছে।'

রত্না জামাইবাবুর ছোট বোন; আই.এ. পরীক্ষা দিয়া মেজদার কাছে বোম্বাই বেড়াইতে আসিতেছে। রত্না তাহার দুই দাদা ও বৌদিদিদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তাই সকলের আদরিণী।

সোমনাথ অবশ্য রত্নাকে ছেলেবেলা হইতে দেখিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। রত্না বড় গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করা সোমনাথের সাধ্য নয়। তবে দিদির এই স্বল্পভাষিণী স্বাধীন মনের ননদটিকে সে মনে মনে খুব পছন্দ করিত।

সে জিজ্ঞাসা করিল—'কার সঙ্গে আসছে?'

জামাইবাবু হাসিলেন—'কার সঙ্গে আবার—একলা আসছে। রত্নার শরীরে কি ভয়-ডর আছে? তাছাড়া পথের হাঙ্গামাও কিছু নেই; দাদা হাওড়ায় গাড়িতে তুলে দিয়েছেন, কাল দুপুরে আমি ভি. টিতে নামিয়ে নেব।'

দু'একটা সাধারণ কথার পর সোমনাথ গলা ঝাড়া দিয়া বলিল—'জামাইবাবু, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে—' বলিয়া লজ্জাবিব্রত মুখে কতকটা অসংলগ্নভাবে চন্দনা দেবীর উপাখ্যান বলিল।

শুনিয়া জামাইবাবুর মুখ গম্ভীর হইল। মনে মনে কিছুক্ষণ তোলাপাড়া করিয়া তিনি শেষে বলিলেন—'গোড়া থেকেই আমার ভয় ছিল। অবশ্য তুমি যদি শক্ত থাকতে পারো তাহলে কোনও ভয় নেই; কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে 'বসের' স্ত্রীকে তো আর অপমান করা যায় না। যা হোক, যথাসম্ভব সাবধানে চলবে। যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।'

পথনির্দেশ হিসাবে জামাইবাবুর পরামর্শ খুব মূল্যবান না হইলেও তাঁহার সহানুভূতি পাইয়া সোমনাথের মনের অস্বস্তি অনেকটা লাঘব হইল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া প্রাতরাশ গ্রহণের সময় দিদি হঠাৎ বলিলেন—'এবার সোমুর বিয়ে দেওয়া দরকার।'

সোমনাথের সন্দেহ রহিল না যে রাত্রে দিদি জামাইবাবুর কাছে সবই শুনিয়াছেন; কিন্তু বিবাহ করিলেই তো সকল সমস্যার সমাধান হইবে না! উপস্থিত যে শিরে সংক্রান্তি।

সোমনাথ সাড়াশব্দ না দিয়া টোস্ট চিবাইতেছে দেখিয়া দিদি আবার বলিলেন—'তোর যদি মনে মনে কোনও মেয়ে পছন্দ থাকে তো বল্, সম্বন্ধ করি।'

সোমনাথ দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল কোনও মেয়ের প্রতি তাহার পক্ষপাত নাই, কাহাকেও সে এ পর্যন্ত হৃদয় দান করে নাই। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল; দিদি ও জামাইবাবু একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তারপর দিদি বলিলেন—'হ্যাঁরে, রত্নাকে তোর কেমন লাগে?'

নিঃসংশয় প্রশ্ন এবং ইহার পশ্চাতে একটা প্রস্তাব আছে। সোমনাথ আড়চোখে

জামাইবাবুর পানে চাহিল; তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিল দিদি তাহার অনুমোদন পাইয়াই প্রশ্ন করিয়াছেন। সে কিছুক্ষণ নীরবে অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব ভোজন করিয়া সতর্ক-ভাবে বলিল—'রত্না ভারি ভাল মেয়ে—বুদ্ধিমতী মেয়ে।' তাহার কথার সুরে মনে হইল বিবাহের প্রস্তাবের সহিত এই মন্তব্যের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চরিত্র সমালোচনা।

সোমনাথ আসল কথাটা এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া জামাইবাবু হাসিলেন—'রত্নাকে কি সোমনাথের পছন্দ হবে? ওর পেছনে এখন হুরী-পরীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে! রত্না তো কালো মেয়ে।'

দিদি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন—'কালো কেন হতে যাবে? রত্না উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।'

মহিলারা যাদের ভালবাসেন তাহারা কখনও কালো হয় না, সব উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

জামাইবাবু বলিলেন—'তবে আমিও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।'

দিদি রাগিয়া বলিলেন—'বাজে কথা বলো না, রত্না তোমার চেয়ে ঢের ফরসা। আর অমন মুখ চোখ ক'টা পাওয়া যায়? কিরে সোমু, বিয়ে করবি?'

সোমনাথ পূর্বে কখনও রত্নাকে নিজের বধূরূপে কল্পনা করে নাই; এখন কল্পনা করিয়া তাহার মনটি আনন্দে সরস হইয়া উঠিল। রত্না সুন্দরী নয় কিন্তু বধূরূপে সে পরম কমনীয়া। মনে মনে রত্নাকে চন্দনা দেবীর পাশে দাঁড় করাইয়া রত্নাকে মোটেই ছোট মনে হইল না।

দিদি আবার প্রশ্ন করিলেন—'কি বলিস, রাজি আছিস?'

বিবাহে অমত থাকিবার আর কোনও কারণ ছিল না, সে এখন পাঁচশত টাকা মাহিনা পাইতেছে। সোমনাথ সলজ্জ হাসিয়া বলিল—'আমি রাজি হলেই চলবে?'

দিদি বলিলেন—'না, রত্নারও মত নিতে হবে। তোর মতটা নিয়ে রাখলুম! আমার বিশ্বাস রত্না অমত করবে না।' বলিয়া ভ্রাতার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া হাসিলেন।

জামাইবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, যেন অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—'আমাদের সময় এত মন-জানা-জানি ছিল না; থাকলে কী ভালই হত!'

দিদি বলিলেন—'হতই তো।'

প্রাতরাশ শেষ করিয়া সোমনাথ স্টুডিও চলিয়া গেল। আজও আবার আউট-ডোর শুটিং আছে; ডুয়েট গান কাল শেষ হয় নাই।

আজ কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোনও হাঙ্গামা হইল না। জীবরাজ নাগর গাড়িতে তাহাদের সহগামী হইলেন এবং ওকুস্থলে পৌঁছিয়া আকাশ সারাদিন এমন নির্মেঘ হইয়া রহিল যে বনের মধ্যে যাইবার কোনও সুযোগই হইল না। পুরা দিন সবেগে শুটিং চলিল।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ দেখিল রত্না আসিয়াছে। বারান্দায় বসিয়া দিদি, রত্না ও জামাইবাবু গল্প করিতেছেন।

সোমনাথ রত্নাকে মাঝে বছরখানেক দেখে নাই। উনিশ বছর বয়সে রত্না আগের মতই ছোট খাটো আছে, কিন্তু বেশ গোলগাল হইয়াছে। মুখের সুডৌল দৃঢ়তার উপর যেন আর একটু লাবণ্যের আভা ফুটিয়াছে। সমতল অবঙ্কিম ভ্রূর নীচে চক্ষু দুটি আগের মতই শান্ত এবং অচপল। আর, দিদির কথাই ঠিক; রত্না কালো নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

রত্না উঠিয়া সোমনাথকে প্রণাম করিল, সোমনাথ একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল—'কেমন আছ?'

রত্না উত্তর না দিয়া সহজভাবে বলিল—'তুমি যে বম্বে চলে এসেছ সে খবর আমরা বৌদির চিঠিতে পেলুম।'

কথার অন্তর্নিহিত বক্রোক্তিটা স্পষ্ট। রত্নারা কলিকাতায় থাকে, সোমনাথও এতদিন

কলিকাতায় ছিল, অথচ চলিয়া আসিবার আগে তাহাদের সঙ্গে দেখা করে নাই। সোমনাথ আমতা-আমতা করিয়া বলিল—'হঠাৎ চলে আসতে হল—'

সে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। দিদি বলিলেন—'রত্না, সোমুর চা-জলখাবার এখানেই আনতে বল্।'

রত্না ভিতরে গিয়া নিজেই সোমনাথের খাদ্য পানীয় আনিয়া দিল। ভাবগতিক দেখিয়া সোমনাথ বুঝিল, প্রস্তাবিত বিবাহের কথা এখনও রত্নার কাছে উত্থাপিত হয় নাই, সোমনাথ বৌদিদির ভাই এই সম্পর্কে রত্না তাহার আদর যত্ন করিতেছে।

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে বাক্যালাপ চলিবার পর রত্না সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—'নতুন কাজ লাগছে কেমন? বেশ মন বসছে তো?' তাহার গলার মধ্যে যেন ক্ষীণ ব্যঙ্গ লুকাইয়া আছে।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলিল—'লাগছে একরকম। আসল আকর্ষণ টাকা।' তারপর যাহাতে কথাটা আর বেশীদূর না গড়ায় (জামাইবাবু কি বলিয়া বসিবেন কিছুই বলা যায় না) তাই বলিল—'আই.এ. পাস করে তুমি বি.এ. পড়বে তো?'

'আগে পাস তো করি।'

'পাস তুমি করবেই। তারপর?'

দিদি বলিলেন—'তারপর বিয়ে, তারপর ঘর-সংসার। নে, তোকে আর ন্যাকামি করতে হবে না। ওর লেখাপড়ার পালা শেষ হয়েছে।'

রত্নার শান্ত চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল।

পরদিন পুরুষেরা কাজে বাহির হইয়া গেলে দিদি রত্নার কাছে কথা পাড়িলেন। রত্না মন দিয়া শুনিল, হাঁ-না কিছু বলিল না; তাহার মুখখানি আর একটু গম্ভীর হইল মাত্র।

দিদি উত্তরের জন্য জেদাজেদি করিলে সে বলিল—'আমায় একটু ভাববার সময় দাও।'

'এতে ভাববার কি আছে? সোমুকে কি তোর পছন্দ নয়?'

রত্না দিদির মুখের উপর চোখ পাতিয়া বলিল—'বৌদি, তুমি চাও? মেজদা চান?'

দিদি বলিলেন—'আমাদের চাওয়া-না-চাওয়ার কথা নয় রত্না। তোর চাওয়াটাই আসল।'

'তবে আমাকে একটু সময় দাও।'

এইখানে কথা মুলতুবি রহিল। দিদি নিরাশ হইলেন, কিন্তু আর চাপাচাপি করিতে পারিলেন না।

অতঃপর এক হপ্তা কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সোমনাথের ভাগ্য লইয়া দুইটি নারীর মধ্যে অলক্ষ্যে যে দড়ি-টানাটানি চলিতেছে তাহার পুরা খবর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিলেন না। পাণ্ডুরঙ্ চন্দনা দেবীকে গভীর জলের মাছ বলিয়াছিল বটে কিন্তু রত্নার তুলনায় চন্দনা দেবী চুনোপুঁটি।

স্টুডিওতে শুটিং স্থগিত আছে, কাজ-কর্ম কিছু ঢিলা পড়িয়াছে। এমন মাঝে মাঝে হয়; একটা সেটের কাজ শেষ হইবার পর নূতন সেট্ আরম্ভ হইবার ফাঁকে দু'চারদিন বিশ্রাম পাওয়া যায়। তখন কেবল ছুতার মিস্ত্রিদের খটাখট শব্দে স্টুডিও মুখরিত হইতে থাকে।

দ্বিপ্রহরে সোমনাথ নিজের ঘরের কৌচে শুইয়া ঝিমাইতেছিল। হঠাৎ দ্বারে টোকা দিয়া যিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া সোমনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। চন্দনা এ পর্যন্ত তাহার কক্ষে পদার্পণ করেন নাই; সোমনাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—'আসুন আসুন।'

চন্দনা দেবীর হাবভাব আজ অন্য রকমের, যেন একটু লজ্জিত ও জড়সড়। তিনি বলিলেন—'আপনাকে বিরক্ত করিনি তো? এক মিনিটের জন্য দরকার—'

'বিলক্ষণ—বসুন।'

চন্দনা একটি চেয়ারের প্রান্তে বসিলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন—'কাল আমার জন্মদিন। বাড়িতে সামান্য ডিনারের আয়োজন করেছি। আপনি আসতে পারবেন কি?'

সোমনাথ বিদ্যুদ্বেগে চিন্তা করিল। রাত্রে বাড়িতে নিমন্ত্রণ—নূতন ফাঁদ নয় তো? কিন্তু জন্মদিনের নিমন্ত্রণে অন্যান্য অতিথিও আসিবেন, পিল্লে সাহেবও অবশ্য উপস্থিত থাকিবেন? সুতরাং ভয়ের কারণ নাই।

সে হৃদ্যতা দেখাইয়া বলিল—'যাব বৈ কি, নিশ্চয় যাব।'

চন্দনা দেবী কৃতজ্ঞ হাসি হাসিলেন—'ধন্যবাদ। আমার বাড়ি কোথায় বোধহয় জানেন না। শহরের বাইরে বান্দ্রায় থাকি, একেবারে সমুদ্রের কিনারায়; কিন্তু আপনাকে বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে না, কাল রাত্রি আটটার সময় আমি বান্দ্রা স্টেশনে মোটর পাঠিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ।'

চন্দনা দেবী হাসিমুখে বিদায় লইলেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে সোমনাথের মনটা খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। সাবধানের মার নাই। তাছাড়া রত্না অবশ্যই জানিতে পারিবে। সে কি মনে করিবে কে জানে! হয়তো—

বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ আড়ালে জামাইবাবুকে নিমন্ত্রণের কথা বলিল। জামাইবাবু বলিলেন—'কি আপদ, তুমি নেমন্তন্ন কাটিয়ে দিলে না কেন?'

'এখন যদি কোনও ছুতো ক'রে—'

'এখন আর ভাল দেখাবে না, নেমন্তন্ন যখন স্বীকার করেছ তখন যেতে হবে। ভাল কথা, একটা কিছু উপহার নিয়ে যেও।'

উপহারের কথা সোমনাথের মনে আসে নাই, সে বলিল—'আচ্ছা। তাহলে যাওয়াই স্থির?'

জামাইবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ। তবে অন্য অতিথিদের সঙ্গে ফিরে এস, দেরি কোরো না। আর, যদি বিপদ হয় আমি তোমাকে রক্ষে করব—ভেবো না।'

জামাইবাবু কি করিয়া তাহাকে বিপদে রক্ষা করিবেন তাহা কিছু ভাঙিয়া বলিলেন না; কিন্তু তাঁহার উপর সোমনাথের অগাধ বিশ্বাস ছিল, সে আশ্বস্ত হইল।

পরদিন শনিবার স্টুডিওতে ছুটি। কারণ, যেদিন মহালক্ষ্মীর মাঠে ঘোড়দৌড় থাকে সেদিন কোনও স্টুডিওতে ভাল করিয়া কাজ হয় না; বেশীর ভাগ অভিনেতা অভিনেত্রীর একটা না একটা অসুখ হইয়া পড়ে, যাঁহারা দয়া করিয়া স্টুডিওতে আসেন তাঁহাদের মনও সারাদিন এমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া থাকে যে কোন কাজই হয় না। বুদ্ধিমান চিত্র-প্রণেতারা তাই রেসের মরসুমের কয় মাস শনিবারে স্টুডিও বন্ধ রাখেন।

সকালের দিকে সোমনাথ বাজারে গিয়া একটি রূপার ফুলদানী কিনিয়া আনিল, চন্দনা দেবীকে উপহার দিতে হইবে। তারপর সারাদিন সে বাড়িতে রহিল। রত্না আসার পর তাহার সারাদিন বাড়িতে থাকা এই প্রথম। রত্নার সহিত নানাসূত্রে তাহার অনেক-বার দেখা হইল কিন্তু রত্না স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কথা কহিল না; সে যেন নিজেকে নিজের মধ্যে বেশী করিয়া গুটাইয়া লইয়াছে। সোমনাথ বুঝিয়াছিল রত্না বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার মনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ তাহা সোমনাথ অনুমান করিতে পারে নাই। দিদিও কিছু বলেন নাই।

সন্ধ্যার পর সোমনাথ যখন সাজসজ্জা করিয়া রূপার ফুলদানীটি পকেটে পুরিয়া

বাহির হইবার উপক্রম করিল তখন রত্না একবার সপ্রশ্ন নেত্রে তাহার পানে তাকাইল। সোমনাথ কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানিত না। সোমনাথ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—'আচ্ছা দিদি, আমি তাহলে বেরুই। কখন ফিরব তা—'

দিদি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—'তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা জেগে থাকব।'

সোমনাথ চলিয়া গেলে রত্না তাহার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দিদির পানে ফিরাইল। দিদির পেটের মধ্যে অনেক কথা গজগজ করিতেছিল, আর চাপিয়া রাখা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি বলিলেন—'আয় রত্না, আমার ঘরে চল, তোর চুল বেঁধে দিই।

পাঁচ

সংস্কার এমনই জিনিস যে অতি উগ্র জৈবধর্মকেও পোষ মানাইতে পারে। তাহা না হইলে সোমনাথ আজিকার দুর্নিবার প্রলোভন কখনই কাটাইয়া উঠিতে পারিত না। সংস্কারের প্রতি আজকাল আমরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। তাহাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে সংস্কারের পরিবর্তে এমন কিছুই পাই নাই যাহাকে দিশারী রূপে গ্রহণ করিতে পারি। বিজ্ঞান আমাদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র কাড়িয়া লইয়া হাতে আণবিক বোমা ধরাইয়া দিয়াছে।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় সোমনাথ চন্দনা দেবীর বাড়িতে গিয়া পেঁীছিল। বাগান-ঘেরা চমৎকার ছোট বাড়ি, সমুদ্রের বাতাস ও কল্লোলধ্বনি সর্বদা তাহাকে স্পন্দিত করিয়া রাখিয়াছে।

চন্দনা পরম সমাদরে সোমনাথকে ড্রয়িংরুমে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ড্রয়িংরুমে অন্য কোনও অতিথি নাই। সোমনাথ মনের অস্বস্তি এই বলিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিল যে সে নির্ধারিত সময়ের আগে আসিয়াছে, অন্য অতিথিরা এখনও আসিয়া পেঁীছিতে পারেন নাই।

আজ চন্দনা দেবীর বেশভূষা অতি লঘু এবং সংক্ষিপ্ত, কোনও আড়ম্বর নাই। সাবানের ফেনার মত অর্ধ স্বচ্ছ লেসের শাড়ি গায়ে জড়াইয়া আছে; ব্লাউজ নামমাত্র। অলঙ্কারের মধ্যে কানে দুইটি হীরার দুল এবং গলায় মুক্তার কণ্ঠি। নিটোল বাহু দুটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ, শুধু অঙ্গুলির প্রান্তে নখের উপর কিউটেক্সের গভীর শোণিমা। পায়ে মখমলের নরম শ্লিপার। সোমনাথের মনে হইল, চন্দ্রালোকিত রাত্রে তাজমহলের উপর যদি সূক্ষ্ম কুজ্ঝটিকার আবরণ নামিয়া আসে তবে বুঝি এমনই দেখিতে হয়। তাজমহলের বয়স অনেক, কিন্তু সেজন্য তাহার সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। চন্দনার বয়স যদি সত্যই পঁয়ত্রিশ বৎসর হয় তাহাতেই বা কী ক্ষতি হইয়াছে? যৌবনের সহিত বয়সের সম্পর্ক কি?

সোমনাথ সলজ্জভাবে ফুলদানীটি পকেট হইতে বাহির করিল, মনে মনে যে বাঁধা-গৎ সাধিয়া রাখিয়াছিল তাহাই আবৃত্তি করিয়া বলিল—'আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, আজকের এই দিনটি বারবার আপনার জীবনে ফিরে আসুক।'

চন্দনা দেবী এমনভাবে ফুলদানীটি গ্রহণ করিলেন যেন উহা অমূল্য নিধি। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—'কি বলে ধন্যবাদ জানাব? আপনার এই উপহারটিকে আশ্রয় করে আজকের রাত্রের স্মৃতি চিরদিন আমার মনে ফুলের মত ফুটে থাকবে।'

কবিত্বপূর্ণ এই অত্যুক্তিতে সোমনাথ অভিভূত হইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে এমন সময় একটি উর্দিপরা ভৃত্য ট্রের উপর দুটি পূর্ণ পানপাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। ভৃত্যটির মুখে কোনও ভাব নাই, সে বোবা-কালা। চন্দনা দেবী জীবনে

যত সৎকার্য করিয়াছেন এই বোবা-কালা ভৃত্যটির নিয়োগ তাহার অন্যতম। সৎকার্য করিলেই পুণ্য ফল আছে; এই নির্বাক ভৃত্যটি তাঁহার একান্ত অনুগত, বাড়ির আভ্যন্তরিক যাবতীয় কাজ সে একাই করে এবং ঘরের কথা বাহির হইতে দেয় না।

ভৃত্যকে চন্দনা ইঙ্গিত করিতেই সে পানপাত্র দুইটি নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

সোমনাথ সন্দিগ্ধভাবে বলিল—'ওটা কি?'

চন্দনা একটি পানপাত্র তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিলেন—'কক্‌টেল—নিন।'

'সর্বনাশ! আমি তো মদ খাই না।'

চন্দনা তরল কৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'মদ নয়, ওতে একটু ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় মাত্র, নেশা হয় না। দেখুন না, আমিও খাব।'

অগত্যা সোমনাথ পাত্র হাতে লইল। চন্দনা দেবী নিজের পাত্রটি তাহার পাত্রে একবার ঠেকাইয়া তাহার চোখে চোখ রাখিয়া পাত্রে অধর স্পর্শ করিলেন। সোমনাথও নিজের পাত্রে চুমুক দিল, দেখিল শীতল পানীয় উপাদেয় বটে কিন্তু ঝাঁঝ আছে। ভয়ে ভয়ে সে বাকিটুকু শেষ করিয়া পাত্র রাখিয়া দিয়া বলিল—'আপনার অন্য অতিথিরা কই এখনও এলেন না?'

চন্দনা দেবী কুহককলিত কণ্ঠে বলিলেন—'অন্য অতিথি নেই, আপনিই একমাত্র অতিথি।'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল—'অ্যাঁ, আর মিঃ পিলে?'

চন্দনা দেবীর অধর প্রান্ত একটু প্রসারিত হইল, তিনি বলিলেন—'মিঃ পিলে বাড়িতেই আছেন। দেখবেন তাঁকে?'

সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়া চন্দনা সোমনাথকে বাড়ির এক কোণের একটি ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরে মৃদুশক্তির আলো জ্বলিতেছে, টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল ও গেলাস; একটি কৌচের উপর পিলে সাহেব উন্মূলিত বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছেন। ঘরের বদ্ধ বাতাস মদের গন্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দনা দেবী পাশে দাঁড়াইয়া স্বামীর গায়ে কয়েকবার নাড়া দিলেন কিন্তু পিলে সাহেব সাড়া দিলেন না, অনড় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সোমনাথ দেখিল, চন্দনার মুখ নিবিড় বিতৃষ্ণায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সোমনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'এটা নতুন কিছু নয়। প্রাত্যহিক ব্যাপার। আপনার বোধ হয় দম বন্ধ হয়ে আসছে, চলুন এ নরক থেকে বাইরে যাই।'

সোমনাথ আবার ড্রয়িংরুমে আসিয়া বসিল। কক্‌টেলের গুণে তাহার মাথার মধ্যে একটু রুমঝুম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু পিলে সাহেবের অবস্থা দেখিয়া তাহার নেশা ছুটিয়া গেল। প্রতিভাবান মানুষ কি করিয়া নিজেকে এমন পশুতে পরিণত করিতে পারে? চন্দনা দেবীর জন্য তাহার অন্তর সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। যাহার স্বামী এমন অমানুষ সে যদি পতিব্রতা না হয়, দোষ কাহার?

চন্দনা দেবীও তার পাশে বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে ব্যথাবিদ্ধ হাসি। সোমনাথের একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া তিনি করুণস্বরে বলিলেন—'আমার দাম্পত্য জীবন কেমন মধুর দেখলেন তো?'

সোমনাথ চন্দনার হাত চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'চন্দনা দেবী, আমি—আমি কি বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছি না—আপনি—'

'আমিও মানুষ, আমারও রক্ত মাংসের শরীর, এইটুকু যদি আপনি মনে রাখেন তাহলেই আমি ধন্য হব সোমনাথবাবু!'

চন্দনার মুখ দেখিয়া সোমনাথ সসঙ্কোচে তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রদান করিতে সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু যে উগ্র দাবী চন্দনার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সে পূরণ করিবে কি প্রকারে? তাহার অন্তর ছি ছি করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের মুখে এরূপ অভিব্যক্তি সে পূর্বে কখনও দেখে নাই।

চন্দনা তাহার দিকে চাহিয়া প্রজ্বলিত চক্ষে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় দূরের একটা ঘরে টিং টিং করিয়া ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল।

চন্দনার মুখের ভাব নিমেষে পরিবর্তিত হইল, ঘড়ির দিকে চকিতে দৃষ্টি হানিয়া তিনি অধরে একটু হাসি টানিয়া আনিলেন—'চলুন, ডিনারের সময় হয়েছে।'

ভোজনকক্ষে টেবিলের উপর দু'জনের ডিনার সজ্জিত ছিল; সোমনাথ চন্দনার সহিত মুখোমুখি বসিল। বোবা-কালা ভৃত্য পরিবেশন করিল। সোমনাথ পূর্বে সাহেবী খানা খাওয়ার রীতি পদ্ধতি জানিত না, কিন্তু এ কয়মাস দিদির বাড়িতে থাকিয়া টেবিলের আদব কায়দা তাহার রপ্ত হইয়াছে, সে কোনও অসুবিধা বোধ করিল না।

আহারের প্রচুর আয়োজন; একটির পর একটি আসিতেছে। ডিনার শেষ হইতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল।

চন্দনা টেবিল হইতে উঠিয়া ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন, ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। চন্দনা বলিলেন—'চলুন, ও ঘরে কফি দিয়েছে। আপনি আমার বাড়ি এখনও সবটা দেখেননি। আসুন দেখাই।'

বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর চন্দনা আলো জ্বালিয়া দেখাইলেন; গৃহকর্ত্রীর মহার্ঘ রুচি ও সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন প্রত্যেক ঘরেই বিদ্যমান। লাইব্রেরি ঘরটি সোমনাথের সবচেয়ে পছন্দ হইল; সে লুব্ধ মনে ভাবিল, কবে তাহার এত টাকা হইবে যে নিজের বাড়ি এমনি ভাবে সাজাইতে পারিবে!

সর্বশেষে চন্দনা একটি ঘরের আলো জ্বালিয়া বলিলেন—'এটি আমার শোবার ঘর।'

সবুজ আলোতে ঘরটি স্বপ্নালু হইয়া আছে। খাটের উপর শুভ্র বিছানা যেন সংশয়ক্লান্ত মানুষকে সস্নেহে নিজের কোমল ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছে। সোমনাথ মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার চোখে যেন ঘোর লাগিয়া গেল।

সহসা সোমনাথ অনুভব করিল তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া চন্দনা তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

'সোমনাথ!'

সোমনাথ মোহাক্রান্ত মনে অনুভব করিল, আর দুই দিক রক্ষা করিয়া চলিবার উপায় নাই; হয় চন্দনাকে অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, নয়তো—

সে অস্ফুট স্বরে বলিল—'মিঃ পিলে ওঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন আমি ভুলতে পারছি না—'

এই কথার সূত্র কোথায় গিয়া শেষ হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় বাধা পড়িল। অদূরে একটা ঘরে টিং টিং করিয়া ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। সোমনাথ যেন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল—'কিসের ঘণ্টি বাজছে?'

চন্দনা অধর দংশন করিলেন—'টেলিফোন।'

টেলিফোন বাজিয়াই চলিল। তখন চন্দনা শয়নকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সোমনাথ তাঁহার অনুগমন করিল।

টেলিফোন তুলিয়া চন্দনা রুক্ষস্বরে বলিলেন—'হ্যালো!'

অপর প্রান্ত হইতে কি কথা আসিল সোমনাথ শুনিতে পাইল না। চন্দনা কিছুক্ষণ

শুনিয়া বিস্মিত চক্ষু তাহার দিকে ফিরাইলেন।

'আপনাকে কে ডাকছে।'

সোমনাথ গিয়া ফোন ধরিল—'হ্যালো!'

জামাইবাবু বলিলেন—'কি হে, খবর কি? কেমন আছ?'

জামাইবাবুর কণ্ঠস্বর সোমনাথের কর্ণে সুধাবৃষ্টি করিল। সে একবার আড়চোখে চন্দনার প্রতি চাহিয়া বাংলা ভাষায় বলিল—'ভাল নয়।'

'তাহলে শীগ্‌গির চলে এস। আমার ভয়ানক অসুখ করেছে, বাড়িতে ডাক্তার ডাকবার লোক নেই। আর দেরি কোরো না, বুঝলে?'

সোমনাথ বুঝিল। টেলিফোন রাখিয়া দিয়া সে অত্যন্ত বিপন্নভাবে চন্দনার দিকে ফিরিল—'আমাকে এখনি যেতে হবে। আমার আত্মীয়—যাঁর বাড়িতে আমি থাকি—তাঁর হঠাৎ অসুখ করেছে, ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছেন—' মুক্তির আশায় সোমনাথ কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিল।

চন্দনার মুখখানা একেবারে সাদা হয়ে গেল। তিনি আবার অধর দংশন করিয়া বলিলেন—'কফি খেয়ে যাবেন না?'

'মাফ্ করবেন, আর এক মিনিট দেরি করা চলবে না। আমি না গেলে ডাক্তার ডাকা পর্যন্ত হবে না। অনুমতি দিন।'

ট্রেনে বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সোমনাথের মন আবার অশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। মুক্তি সে পাইয়াছে বটে কিন্তু সমস্যা যেন আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বাড়িখানা বারবার তাহার মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। অনবদ্য রসবোধের দ্বারা সজ্জিত একটি সুখের নীড়; তাহাতে একটা মাতাল অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে। আর, একটি স্ত্রীলোক—, স্ত্রীলোকটি কি করিতেছে? চন্দনা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু সোমনাথ তাহাকে অন্তর হইতে ঘৃণা করিতে পারিল না। হয়তো ইহা তাহার পুরুষোচিত দুর্বলতা; পুরুষ যে-নারীর ভালবাসা পাইয়াছে —তা সে ভালবাসা যতই নিকৃষ্ট হোক—তাহাকে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারে না। বেদনার সহিত সোমনাথের মনে হইল, ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে চন্দনা হয়তো এমন মন্দ হইত না।

বাড়ি পৌঁছিয়া সোমনাথের মন আবার শান্ত হইয়া গেল। এ বাড়ির আবহাওয়া যেন একেবারে ভিন্ন, এখানে দিদি আছেন—রত্না আছে—! মুক্তির আনন্দ তাহাকে নূতন করিয়া পুলকিত করিয়া দিল।

দিদি এবং জামাইবাবু ড্রয়িংরুমে ছিলেন, রত্না শয়ন করিতে চলিয়া গিয়াছিল। সোমনাথ আসিয়া ভক্তিভরে জামাইবাবুর পদধূলি লইল। জামাইবাবু হাসিয়া উঠিলেন—'যাক, ঠিক সময় উদ্ধার করেছি তাহলে!'

দিদি কিন্তু হাসিলেন না, বলিলেন—'হাসির কথা নয়। সোমু, কি হয়েছে সব খুলে বল্, লজ্জা করিসনি।'

বিশদ ব্যাখ্যা করিবার বিষয় নয়, তবু সোমনাথ লজ্জা চাপিয়া যথাসাধ্য খোলসা করিয়া বলিল।

শুনিয়া দিদি বলিলেন—'না, এসব ভাল কথা নয়। কথায় বলে মন না মতি। তুই এ কাজ ছেড়ে দে।'

সোমনাথ বলিল—'কন্‌ট্রাক্ট আছে, ছবি শেষ না হলে ছাড়ব কি করে। ওদিকে ব্যাঙ্কের কাজও ছেড়ে দিয়েছি—'

দিদি স্বামীকে বলিলেন—'তাহলে তুমি বাপু যাহোক কর।'

জামাইবাবু বলিলেন—'বেশ যাহোক, তোমার সুন্দর ভাই জট পাকাবে আর আমি জট ছাড়াব!'

দিদি বলিলেন—'ওর দোষ কি? সব দোষ ঐ বজ্জাত মেয়েমানুষটার।'

জামাইবাবু বলিলেন—'তবু ভাল, মেয়েমানুষের দোষ দেখতে পেলে। যাহোক, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। সোমনাথ, তুমি যে অবিবাহিত একথা মহিলাটি জানেন?'

'বলতে পারি না—কখনও কথা হয়নি।'

'হুঁ। তিনি ঠিক বুঝেছেন তুমি কুমার ব্রহ্মচারী, তাই তোমার তপোভঙ্গ করবার এত আগ্রহ। এখন, তাঁকে যদি কোনও রকমে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তুমি বিবাহিত, তোমার ঘরে একটি প্রেমময়ী ভার্যা আছেন, তাহলে তিনি হয়তো তাঁর মোহিনী মায়া সম্বরণ করিতে পারেন।'

দিদি বলিলেন—'বেশ তো সোমু, তুই কালই কথায় কথায় ওকে বল্‌না যে তোর বিয়ে হয়েছে—'

সোমনাথ দ্বিধাভরে বলিল—'এতদিন বলিনি, এখন বললে কি—'

জামাইবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'কোনও কাজই হবে না। একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ হাজির করতে হবে, নইলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। শোনো, মহিলাটি সোমনাথকে ডিনারের নেমন্তন্ন করেছিলেন, সোমনাথ তার পাল্‌টা দিক, মহিলাটিকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসুক—তারপর বৌ দেখিয়ে দিক—'

বিদ্যুৎ চমকের মত সোমনাথ বুঝিতে পারিল জামাইবাবুর গূঢ় অভিপ্রায় কি; কিন্তু দিদি অত সহজে বুঝিলেন না, বলিলেন—'কি আবোল তাবোল বলছ? বৌ কোথায় যে দেখিয়ে দেবে।'

জামাইবাবু হৃদয়ভারাক্রান্ত একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের উপর চিৎ হইয়া কড়ি বরগা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সোমনাথ অপ্রতিভভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল —'আমি কিছু জানি না। দিদি, তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমি শুতে চললুম।'

সোমনাথ পলায়ন করিল। দিদি এতক্ষণে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিলেন—'হ্যাঁগা, কি বলছ স্পষ্ট করে বল না। রত্না—?'

জামাইবাবু ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দিলেন—'রত্না যদি একদিনের জন্যে বৌ সাজতে রাজি থাকে আমার আপত্তি নেই। ছোঁড়াকে কোনও রকমে বাঁচাতে হবে তো?'

দিদি কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'রত্না কি রাজি হবে? ওকে কোনও কথা বলতে আমার সঙ্কোচ হয়। বিয়ের কথায় ভাববার সময় দাও বলে সময় চাইলে, তারপর তো কিছুই বলেনি—'

জামাইবাবু ঊর্ধ্ব হইতে দৃষ্টি নামাইয়া বলিলেন—'বলে দ্যাখো যদি রাজি হয়। আর এ কথাটাও রত্নাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে সোমনাথের মত স্বামী পাওয়া যে-কোনও মেয়ের পক্ষে ভাগ্যের কথা।'

দিদি বলিলেন—'ও কথা আমি তাকে বলতে পারব না, বলতে হয় তুমি বোলো। তবে এক রাত্রির জন্যে বৌ সাজতে বলে দেখতে পারি। যদি রাজি হয় খুব মজা হয় কিন্তু।'

দিদির প্রাণে এখনও রোমান্সের রঙের খেলা মুছিয়া যায় নাই, জামাইবাবু তো বর্ণচোরা আম। তিনি একটা হাই তুলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—'আমারও ঘুম পাচ্ছে।'

দিদি ঘড়ি দেখিলেন, পৌনে বারোটা, তিনি বলিলেন—'তুমি শোও গে, আমি

আসছি।' এত রাত্রে কি রত্না জাগিয়া আছে? যদি জাগিয়া থাকে আজ রাত্রেই কথাটার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা ভাল।

রত্নার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দিদি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রত্না সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে এবং অলস-হস্তে খোঁপা খুলিতেছে। তাহার চুল খুলিয়া শোয়া অভ্যাস, খোঁপা বাঁধা অবস্থায় সে ঘুমাইতে পারে না।

দিদি বলিল—'ওমা, তুই এখনো ঘুমোসনি?'

রত্না বলিল—'এই শুতে যাচ্ছি।'

দিদি রত্নার বিছানায় বসিয়া বলিলেন—'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে রত্না—'

রত্না বলিল—'কথা আমি সব শুনেছি।'

দিদি গালে হাত দিলেন—'অ্যাঁ, কি করে শুনলি? আড়ি পেতেছিলি নাকি?'

রত্না শান্ত স্বরে বলিল—'আড়ি পাতবার দরকার হয়নি। এ বাড়িতে রাত্তির বেলা ফিস্ ফিস্ করে কথা কইলেও শোনা যায়। আমি তো রোজ রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমাদের নাক ডাকার শব্দ শুনি।'

'শুনেছিস্ তাহলে? ভালই হল। তা কি বলিস্?'

দ্রুত অঙ্গুলি দ্বারা চুলের বিনুনি খুলিতে খুলিতে রত্না চোখ না তুলিয়াই বলিল—'মেজদার যখন ইচ্ছে তখন তাই হবে, কিন্তু এসব আমার ভাল লাগে না।'

ছয়

টেলিফোনে সোমনাথ চন্দনা দেবীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিল। বলিল—'অসভ্যর মত ডিনার শেষ হবার আগেই চলে এসেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছেন কি?'

চন্দনা দেবী সোমনাথের গলা শুনিয়া প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'আপনার আত্মীয় কেমন আছেন?'

সোমনাথ যেখানে বসিয়া টেলিফোন করিতেছিল, জামাইবাবু তাহার অদূরে বসিয়াছিলেন, সোমনাথ তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল—'আমার আত্মীয়ের মৃগী রোগ আছে, জানতাম না। হঠাৎ আক্রমণ হয়। উপস্থিত ভাল আছেন।'

জামাইবাবু শ্যালকের উদ্দেশে মুখ বিকৃত করিলেন।

সোমনাথ টেলিফোনে বলিল—'আজ রাত্রে আমার বাড়িতে আপনাকে আসতে হবে—অসমাপ্ত ডিনার সম্পূর্ণ করার জন্যে। আসবেন কি?'

চন্দনার কণ্ঠস্বর এতক্ষণ অপেক্ষাকৃত নিরুৎসুক ছিল, এখন তাহা আগ্রহে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—'আপনি কি আমাকে ডিনারের নেমন্তন্ন করছেন?'

'হ্যাঁ। আপনাকে আর মিঃ পিলেকে।'

চন্দনা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'মিঃ পিলেকে তো আপনি দেখেছেন। সন্ধ্যের পর তিনি—'

'তবে আপনি একাই আসুন।'

চন্দনার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, সুযোগ হারাইয়া সোমনাথ পস্তাইতেছে—তাই—। তবু নিশ্চয় হওয়া ভাল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আর কাকে নেমন্তন্ন করলেন?'

সোমনাথ বলিল—'আর কেউ না। আসবেন তো?'

চন্দনা গদগদ স্বরে বলিলেন—'আসব।'

'ধন্যবাদ—অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলিয়া সোমনাথ চন্দনাকে নিজের ঠিকানা দিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দিদি রত্নাকে সাজাইতে বসিলেন। জাফরান রঙের নূতন বেনারসী শাড়ি আজই দিদি কিনিয়া আনিয়াছেন, তাহাই পরাইয়া, চুলে অশোক ফুলের বেণী জড়াইয়া, সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন; মুখখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কোমল হাসিলেন—'সিঁদুর প'রে কি মিষ্টি যে তোকে দেখাচ্ছে রত্না! কিন্তু তুই মন শক্ত করে রাখিসনি। মনে ক'র না একটা খেলা।'

'তাই মনে করবার চেষ্টাই তো করছি বৌদি, কিন্তু পারছি কই?'

'কেন পারবি না! মনটাকে একটু হাল্‌কা কর, নরম কর, তাহলেই পারবি।'

'তুমি তো জানো কি বিচ্ছিরি প্যাঁচালো আমার মন।'

'বালাই ষাট্‌, তোর মন বিচ্ছিরি প্যাঁচালো হতে যাবে কেন? তোর গঙ্গাজলের মত মন।' বলিয়া দিদি সস্নেহে তাহার গণ্ডে চুম্বন করিলেন। রত্নার চোখ একটু ছলছল করিল।

দিদি বলিলেন—'কিন্তু মনে থাকে যেন, শুধু বৌ সাজলেই হবে না, বৌয়ের মত অভিনয় করা চাই। নইলে সব ভেস্তে যাবে।'

'কি করব বলে দাও।'

'কি আর করবি, লজ্জা লজ্জা ভাবে ওর সঙ্গে কথা কইবি, কাছে ঘেঁষে দাঁড়াবি—মোট কথা ও যে তোর জিনিস তা যেন বেশ বোঝা যায়। খুব শক্ত হবে না—দেখিস্‌ তখন।' দিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় চন্দনা দেবীর মোটর আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। সোমনাথ নিজে গিয়া মোটরের দরজা খুলিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইল। আজ চন্দনার বেশভূষা সম্পূর্ণ অন্য রকমের—আগাগোড়া লালে লাল। যেন সর্বাঙ্গে অনুরাগের ফাগ মাখিয়া তিনি অভিসারে আসিয়াছেন।

ড্রয়িংরুমের দ্বারে পৌঁছিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; ড্রয়িংরুমে লোক থাকিবে তিনি কল্পনা করেন নাই। আজ চন্দনা দেবী মনে অনেক আশা লইয়া আসিয়াছিলেন। নির্জন গৃহে দুইটি নরনারীতে নিভৃত নৈশ আহার—তারপর অজানা পরিবেশের মধ্যে নূতনের আস্বাদ—

সোমনাথ মৃদুকণ্ঠে পরিচয় করাইয়া দিল—'ইনি আমার দিদি, ইনি জামাইবাবু, আর ইনি—' সোমনাথ সলজ্জ হাস্যে ঘাড় হেঁট করিল।

পূর্ণ এক মিনিট পরে চন্দনা দেবী কথা কহিলেন; তাঁর মুখে একটি অম্লকষায় হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুই করতল যুক্ত করিয়া সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—'আজ আমার আশ্চর্য হবার দিন। সোমনাথবাবু যে এমন ভাগ্যবান পুরুষ তা আমাকে জানাননি।'

সোমনাথ বলিল—'উপলক্ষ্য হয়নি তাই বলিনি—'

জামাইবাবু বলিলেন—'সোমনাথ ভারি চালাক ছোকরা; মেয়ে মহলে পাছে কদর কমে যায় তাই বিয়ের কথা কাউকে বলতে চায় না।'

সকলে উপবিষ্ট হইলেন। চন্দনা বলিলেন—'সোমনাথবাবু যদি এত স্বার্থপর না হতেন তাহলে আপনাদের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আমার আগেই হত।'

ক্ষণকালের জন্য একটা কেলেঙ্কারীর আশঙ্কা সোমনাথের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াছিল, কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত হইল। চন্দনা দেবী প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়াছেন, এখন আর সুনিপুণা অভিনেত্রীর অভিনয়ে কেহ খুঁত ধরিতে পারিবে না।

কিন্তু তবু দুই পক্ষের মনেই যেখানে গলদ আছে সেখানে আলাপের ধারা খুব

স্বচ্ছন্দ হয় না; এইখানে জামাইবাবু অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইলেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্য বাক্যালাপের গতি শ্লথ হইতে দিলেন না, গল্প রসিকতা ফষ্টিনষ্টি করিয়া আসর জমাইয়া রাখিলেন। জামাইবাবু যে এতটা মজলিসি লোক সে পরিচয় সোমনাথ পূর্বে পায় নাই।

সোমনাথ ও রত্না পাশাপাশি একটি কৌচে বসিয়াছিল, কোনও প্রকার বাড়াবাড়ি না করিয়া দু'জনে নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল। সোমনাথের যদি বা অভিনয়ের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, রত্নার কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবু উভয়ের মধ্যে রত্নাই বোধহয় সহজ অভিনয় করিতেছিল। সোমনাথের একটু আড়ষ্টতা মাঝে মাঝে তাহাকে আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিতেছিল।

জামাইবাবুর বাক্‌চাতুরী শুনিতে শুনিতে চন্দনা তাঁহার অর্ধ-নিমীলিত নেত্র তাহাদের পানে ফিরাইতেছিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কোন্ চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না; কিন্তু ঐ মদভঙ্গুর দৃষ্টি রত্না ও সোমনাথকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল। রত্না তখন যেন নিজের পত্নীত্ব ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই সোমনাথের দিকে ঘেঁষিয়া বসিতেছিল।

জামাইবাবুর বাক্যস্রোতের বিরামস্থলে চন্দনা দেবী একবার বলিলেন—'সোমনাথ-বাবু, আপনার স্ত্রীকে সিনেমায় নামান্ না কেন? আমার বিশ্বাস উনি অভিনয় করলে বেশ নাম করতে পারবেন।'

সোমনাথ ইতস্তত করিয়া বলিল—'অভিনয়ে ওঁর রুচি নেই।'

চন্দনা তখন রত্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্যিই আপনার অভিনয়ে রুচি নেই?'

রত্না একটু মুখ টিপিয়া থাকিয়া বলিল,—'অভিনয় দেখতে বেশ লাগে কিন্তু অভিনয় করবার প্রতিভা আমার নেই।'

চন্দনা একটু হাসিলেন।

যথাসময়ে সকলে ডিনার টেবিলে গিয়া বসিলেন। এখানেও গৃহস্থের পক্ষ হইতে গৃহস্বামীই আসর সরগরম করিয়া রাখিলেন। চন্দনা দেবীরও ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি এই নিমন্ত্রণ খুব উপভোগ করিতেছেন। জামাইবাবুর চটুলতায় তাঁহার কলহাস্য থাকিয়া থাকিয়া উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

ডিনার শেষে ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া আসিয়া চন্দনা আর বসিতে চাহিলেন না। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, তিনি মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'আমি এবার যাব, অনেক দূর যেতে হবে। আপনাদের আতিথ্যের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনাদের সংসর্গে এসে অনেক নতুন আলো দেখতে পেয়েছি—' তাঁহার মুখের হাসি ক্রমে চোখা অম্লরসে ভরিয়া উঠিল, তিনি সোমনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনাকে আর ধন্যবাদ দেব না, শুধু বন্ধুভাবে সাবধান করে দিই। যার ঘরে নব-পরিণীতা বধূ তার কিন্তু বাইরের দিকে মন যাওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, গুড্ নাইট্।

এইভাবে পরিহাসচ্ছলে বিষোদ্গার করিয়া চন্দনা বিদায় লইলেন।

সকালে প্রাতরাশের টেবিলে, নীরবে আহার সম্পন্ন হইতেছিল। জামাইবাবু খবরের কাগজে চোখ বুলাইতেছিলেন; সোমনাথ আহার শেষ করিয়া উঠি-উঠি করিতেছিল, আজ তাহাকে ন'টার মধ্যে স্টুডিও পৌঁছিতে হইবে কারণ আবার পুরা দমে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ রত্না বলিল—'মেজদা, আমি কলকাতায় ফিরে যাব, ব্যবস্থা করে দাও।'

জামাইবাবু ভ্রূ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন; রত্না বলিল—'এখানে আর আমার মন টিকছে না, পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় হল—'

জামাইবাবু শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কবে যেতে চাও?'

রত্না বলিল—'যদি টিকিট পাওয়া যায়—আজই।'

জামাইবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর কফির পেয়ালা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'বেশ, অফিসে গিয়ে টিকিটের চেষ্টা করব। যদি পাওয়া যায় ফোনে তোমাকে জানাব, তুমি তৈরি হয়ে থেকো।' বলিয়া অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলেন।

কাল চন্দনা চলিয়া যাইবার পর বাড়ির সকলের মনের উপর যে অনির্দিষ্ট অস্বচ্ছন্দতা নামিয়া আসিয়াছিল এখন যেন তাহা আরও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। কী যেন সহজেই হইতে পারিত অথচ হইল না; সোমনাথ মনের মধ্যে একটা চাপা ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। সে নিঃশব্দে স্টুডিও চলিয়া গেল।

স্টুডিওতে সারাদিন কাজ চলিল। ভাগ্যক্রমে চন্দনা দেবীর আজ কাজ ছিল না, তাঁহার সহিত দেখা হইল না। বৈকালের দিকে মিঃ পিলে তাহাকে অফিসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সোমনাথের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। গত কয়েকদিন যাবৎ সে পিলে সাহেব সম্বন্ধে একটা অহেতুক সংকোচ অনুভব করিতেছিল; যদিও তাহার কোনই দোষ ছিল না তবু সে সহজভাবে পিলে সাহেবের সম্মুখীন হইতে পারিতেছিল না।

অফিসে উপস্থিত হইলে পিলে সাহেব কিন্তু তাহার সহিত কাজের কথাই বলিলেন। একটা দৃশ্যে সোমনাথের অভিনয় কিছু নিরেশ হইয়াছিল, সেই দৃশ্যটি রি-টেক করিতে হইবে। কি ভাবে সোমনাথ দৃশ্যে অভিনয় করিবে পিলে সাহেব তাহা নূতন করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

অফিস ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সোমনাথ দ্বারের নিকট একবার ফিরিয়া চাহিল। দেখিল পিলে সাহেব রক্তাক্ত তির্যক চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছেন; দৃষ্টিতে যেন বিষ মেশানো। চোখাচোখি হইতেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

সোমনাথের মন আবার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেহ কি তাঁহাকে কিছু বলিয়াছে? কিন্তু কি-বলিবে? বলিবার আছে কি?

বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ দেখিল, রত্নার সুট্‌কেস ও হোল্‌ডল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিরাজ করিতেছে। টিকিট পাওয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই।

রত্না বলিল—'চল তোমাকে খেতে দিই। বৌদির মাথা ধরেছে, শুয়ে আছেন।'

খাবার ঘরে রত্না সোমনাথকে চা জলখাবার দিল। খাইতে খাইতে সোমনাথ বলিল—'রত্না, ঐ ব্যাপারের জন্যেই কি তুমি হঠাৎ চলে যাচ্ছ?'

রত্না চুপ করিয়া রহিল। সোমনাথ বলিল—'তোমার যাবার দরকার ছিল না। আমিই এ বাড়িতে বাইরের লোক, যেতে হলে আমারই যাওয়া উচিত।'

রত্না বলিল—'সে কথা নয়, আমিই চলে যেতে চাই। তোমাকে উদ্ধার করা তো হয়ে গেছে এখন আমি গেলেই বা ক্ষতি কি?' বলিয়া একটু হাসিল।

সোমনাথ বলিল—'চন্দনা যাবার সময় যে-কথা বলে গেল তা কি তুমি বিশ্বাস করেছ?'

'না। ওটা শুধু প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা।'

সোমনাথ রত্নার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল কিছু বোঝা যায় না। রত্নার মুখ

দেখিয়া কিছুই বোঝা যায় না কেন? সোমনাথ একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আমার জন্যে তোমার বোম্বাই বেড়ানোটাই নষ্ট হয়ে গেল।'

রত্না বলিল—'ও কথা থাক। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। তুমি বোধ হয় দু'এক বছরের মধ্যে কলকাতায় যেতে পারবে না। যখন যাবে তখন হয়তো আমি কলকাতায় থাকব না।'

'থাকবে না কেন?'

রত্না এবার একটু জোর করিয়া হাসিল—'শোনো কথা। মেয়ে কি চিরদিন বাপের বাড়ি থাকে? কোথায় চলে যাব তার ঠিক কি?'

সোমনাথের মুখে আর কথা যোগাইল না। দিদি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন ইহা তাহারই জবাব। রত্না অস্পষ্ট কিছু রাখিয়া যাইতে চায় না, চলিয়া যাইবার আগে কাটা-ছেঁড়া জবাব দিয়া যাইতে চায়।

বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। জামাইবাবু আসিয়া রত্নাকে বলিলেন—'তৈরি আছো? তাহলে আর দেরি নয়। ঠিক আটটায় ট্রেন।'

রত্না চলিয়া যাইবার পর ঠিক একমাস পরে সোমনাথের ছবি শেষ হইল। এই একমাসের মধ্যে চন্দনা দেবীর সহিত অনেকবার দেখা হইয়াছে, কিন্তু চন্দনা দেবীর ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। সোমনাথের উপর আর কোনও নূতন চেষ্টা হয় নাই, চন্দনা দেবী নিশ্চয়রূপে তাহার আশা ছাড়িয়াছেন। জামাইবাবু ভাল বুদ্ধি বাহির করিয়াছিলেন। সব চেয়ে সুখের বিষয় চন্দনা রাগ করিয়া থাকেন নাই। যাহার সহিত সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিতে হইবে তাহার সহিত প্রীতির বিচ্ছেদ ঘটিলে কাজ করিয়া সুখ থাকে না। বিশেষত এই একটি ছবিতে কাজ করিয়া সোমনাথ বুঝিয়াছিল অভিনয়ে তাহার সত্যকার যোগ্যতা আছে, এ কাজ সে ভাল-ভাবেই করিতে পারিবে।

যাহোক, সোমনাথের প্রথম ছবি শেষ হইল।

ছবির শেষ শট্ লওয়া হইয়া গেলে পিলে সাহেবের সেক্রেটারি সোমনাথের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, গম্ভীর মুখে বলিল—'মিঃ পিলে অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবেন না।'

চন্দনা দেবী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। সোমনাথ তাঁহার দিকে ফিরিতেই তিনি হঠাৎ পিছু ফিরিয়া নাগরজির সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন।

সোমনাথ কিছু বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ স্টুডিওর আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি মুখের রং ধুইয়া পিলে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেল।

পিলে সাহেব নিজের ঘরে বসিয়া আছেন; কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া সোমনাথ চমকিয়া উঠিল; সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ক্রোধের ফুল্‌কি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। তিনি সোমনাথের পানে চাহিলেন, মনে হইল রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতেছে।

সোমনাথ টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি তাহার সম্মুখে একখণ্ড কাগজ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'এই নাও তোমার ছাড়পত্র। তোমাকে আর আমার দরকার নেই।'

সোমনাথ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল।

'আমাকে আর দরকার নেই?'

পিলে হুংকার দিয়া উঠিলেন—'না। তোমাকে আমি ভদ্রলোক মনে করেছিলাম কিন্তু

দেখছি তুমি জঘন্য চরিত্রের লোক। অসভ্য—বর্বর—'

দৃঢ়ভাবে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সোমনাথ বলিল—'আমার নামে আপনি কী শুনেছেন বলবেন কি?'

'তোমার যদি একতিল লজ্জা থাকত তাহলে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে না। আমার স্ত্রীকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাকে অপমান করবার চেষ্টা করেছিলে, প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছিলে। দুশ্চরিত্র স্কাউণ্ড্রেল।'

'এ কথা কে আপনাকে বলেছে?'

'কে বলেছে? যাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়েছিলে সেই বলেছে। যাও—বেরোও এখনি আমার স্টুডিও থেকে—'

চন্দনা দেবী বলিয়াছেন। তাহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া নিজের চরিত্র ঢাকা দিয়াছেন। ইহাই বুঝি তাঁহাদের রীতি। সোমনাথের ইচ্ছা হইল, চন্দনার সমস্ত ছলা-কলার ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া কে প্রকৃত অপরাধী তাহা পিলে সাহেবকে জানাইয়া দেয়; কিন্তু তাহাতে কী লাভ হইবে? পিলে সাহেব বিশ্বাস করিবেন না, শুধু এই কদর্য কলহ আরও ক্লেদ পঙ্কিল হইয়া উঠিবে।

'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। নমস্কার।'

পিলে সাহেব প্রতিনমস্কার করিলেন না, তর্জনী তুলিয়া দ্বারের দিকে নির্দেশ করিলেন।

ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সোমনাথ দেখিল, পর্দাঢাকা দ্বারের পাশ হইতে একটা চওড়া শাড়ির পাড় চকিতে সরিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে

এক

সোমনাথ অগাধ জলে পড়িল। যে কাজের স্থায়িত্বের ভরসায় সে ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিল তাহাও গেল। এখন সে কী করিবে, কোথায় যাইবে? সোমনাথের মনে হইল, অদৃষ্ট তাহাকে লইয়া নিষ্ঠুর পরিহাস করিয়াছে, যে অবলম্বনের উপর ভর করিয়া সে ভাসিয়া ছিল, তাহা ভুলাইয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তীরে লইয়া যাইবার ছলে গভীর জলে ঠেলিয়া দিয়াছে।

দিদি বলিলেন—'তুই অত মনমরা হচ্ছিস কেন? ও চাকরি গেছে ভালই হয়েছে। আরও কত সিনেমা কোম্পানী আছে, খবর পেলে তোকে লুফে নেবে।'

সোমনাথ কিন্তু ভরসা পাইল না। এখানে আসিয়া অবধি সে পিলে সাহেবের স্টুডিওতেই দিন যাপন করিতেছে, অন্য কোনও সিনেমা কোম্পানীর খোঁজ খবর রাখে নাই, কাহারও সহিত মুখ চেনাচেনি পর্যন্ত নাই। কে তাহাকে কাজ দিবে? সে-ই বা কোন্ মুখে অপরিচিতের কাছে উমেদার হইয়া দাঁড়াইবে? আর, কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে দিদির বাড়িতেই বা কতদিন নিষ্কর্মার মত বসিয়া থাকিবে? তার চেয়ে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যা-হোক একটা চেষ্টা করা ভাল। হয়তো চেষ্টা করিলে ব্যাঙ্কের কাজটা আবার পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপে নানা সংশয়ময় দুশ্চিন্তায় হপ্তাখানেক কাটিয়া যাইবার পর একদিন বৈকালে পাণ্ডুরঙ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—'বা দোস্ত, তুমি এখানে ছিপে রুস্তম হয়ে বসে আছ, আর আমি হাম্বারব ক'রে তোমাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আহ্লাদে সোমনাথ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম ভাই। কোত্থেকে আমার ঠিকানা পেলে?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'কেউ কি তোমার ঠিকানা বলে? যাকে জিগ্যেস করি সেই গুম হয়ে যায়! শেষে এক মতলব বের করলাম; ফাউণ্টেন পেনের সেক্রেটারিকে বললাম, তুমি আমার কাছে টাকা ধার করে কেটে পড়েছ। তখন ঠিকানা পাওয়া গেল। যাহোক, পিলে তোমাকে বিল্বিপত্র শুঁকিয়েছে জানি। এখন সব কেচ্ছা খুলে বল।'

সোমনাথ তখন সেই আউট-ডোর শুটিং-এর দিন হইতে আগাগোড়া কাহিনী শুনাইল। পাণ্ডুরঙ্ ঘোর বাস্তবপন্থী লোক, সে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—'ভুল করেছ বন্ধু, দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেই ভাল করতে। তাতে চাকরি যেত না, বরং উন্নতি হ'ত।'

সোমনাথ বলিল—'সে আমার দ্বারা হ'ত না পাণ্ডুরঙ্। তার চেয়ে চাকরি গেছে, মাথায় মিথ্যে কলঙ্ক চেপেছে এ বরং ভাল।'

পাণ্ডুরঙ্ একটু ম্লান হাসিল—'তুমি যে সুযোগ হেলায় ছেড়ে দিলে সেই সুযোগ পাবার জন্যে অনেক মিঞা জান্ কবুল করত। যেমন আমি; কিন্তু আমার পাথর-চাপা কপাল; আমাকে দেখলে দেবীদের হাসি পায়, প্রেম পায় না; কিন্তু সে যাক, এখন কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক করিনি, চুপ করে বসে আছি।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আমিও তাই ভেবেছিলাম। চল, আমার জানা কয়েকজন প্রডিউসার আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই। তোমার চেহারা আছে, কাজ জুটে যাবেই।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ পাণ্ডুরঙের দিকে চাহিয়া রহিল—'তুমি প্রকাশ্যভাবে আমাকে সাহায্য করলে তোমার 'অনিষ্ট হবে না? পিলে সাহেব বা চন্দনা দেবী যদি জানতে পারেন—'

'জানতে তারা পারবেই. কারণ সিনেমার রাজ্যে হরদম রেডিও চলছে, কে কি করছে কিছুই অজানা থাকে না।'

'তবে? তুমি তাদের চাকরি কর—'

'চাকরি করি তো কী? আমার বন্ধুর বিপদের সময় তাকে সাহায্য করব না? এই যদি চাকরির শর্ত হয় তাহলে ঝাড়ু মারি আমি চাকরির মুখে।'

সোমনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল—'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে—আমাকে সাহায্য করলে

তোমার চাকরি যাবে পাণ্ডুরঙ্।'

পাণ্ডুরঙ্ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—'ভাই, আমি সতেরো বছর বয়স থেকে সিনেমা করছি, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি—আবার না হয় নতুন ঘাটের জল খাব। তাতে বান্দা ভয় পায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে পিলের স্টুডিওতে সুখে আছি, লোকটা ছবি তৈরি করতে জানে; কিন্তু তাই বলে আমি তার কেনা গোলাম নই। নাও, চল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক, সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর প্রডিউসার সাহেবদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন?'

'তাঁরা তখন গুপ্ত বেহেস্তে গা ঢাকা দেন। সব প্রডিউসারের একটি করে গোপন বেহেস্ত আছে কিনা; কিন্তু তুমি সাধু সন্ন্যিসি মানুষ, এ সব বুঝবে না।'

দুই বন্ধু বাহির হইল। পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'একটা ট্যাক্সি ধরা যাক্।'

সোমনাথ বলিল—'কেন, ট্রামে-বাসে যাওয়া চলবে না?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ভাই সোমনাথ, তোমাকে একটা উপদেশ দিই, মনে রেখো। সিনেমার বড় সাহেবদের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাবে, ট্যাক্সিতে যাবে; নইলে কদর থাকবে না।'

'তুমি বুঝি ট্যাক্সি ছাড়া চল না?'

'হরগিস না। তাছাড়া ট্রামে-বাসে কি আমার চড়বার উপায় আছে? গাড়িসুদ্ধ লোক হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে থাকবে আর খিলখিল করে হাসবে। তোমারও ছবি বেরুক না, দেখবে তখন। রাস্তায় বেরুনো প্রাণান্তকর হয়ে উঠবে।'

একটা ট্যাক্সি ধরিয়া দু'জনে আরোহণ করিল; পাণ্ডুরঙ্ একটি স্টুডিওর ঠিকানা দিল, ট্যাক্সি চলিতে লাগিল। সোমনাথ পাণ্ডুরঙ্‌কে সিগারেট দিয়া নিজে একটা ধরাইল, প্রশ্ন করিল—'ছবি কতদিনে বেরুবে কিছু জানো?'

'ফাউণ্টেন পেন বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করেছে। তার মানে মাসখানেকের মধ্যেই বেরুবে।'

'বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, তবে এখন খুব বেশী নয়। ছবি বেরুবার হপ্তাখানেক আগে থেকে চেপে পাব্‌লিসিটি করবে। ফাউণ্টেন পেন হুঁশিয়ার লোক, বাজে খরচ করে না।'

সোমনাথ একটু বিমনা হইল। বিজ্ঞাপনই চিত্রশিল্পের জীবন। ছবির বিজ্ঞাপনে তাহার নাম কি ভাবে থাকিবে কে জানে?

ক্রমে ট্যাক্সি নির্দিষ্ট স্টুডিওতে পৌঁছিল। ভাগ্যক্রমেই হোক, বা ট্যাক্সির মাহাত্ম্যেই হোক, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, স্টুডিওর কর্তা রুস্তমজি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রুস্তমজি প্রবীণ বয়স্ক পার্সী, মাথায় ডাক-বাক্স টুপি, অনশনক্লিষ্ট গৃধ্রের মত মুখের ভাব, চোখ দুটি অতিশয় ধূর্ত। ইনি চিত্রশিল্পের নির্বাক যুগ হইতে এই কর্ম করিতেছেন, প্রায় পঞ্চাশটি ছবির জন্মদান করিয়াছেন। যদিও তন্মধ্যে মাত্র গুটি পাঁচেক ছবি ভাল হইয়াছে; তবু বাজারে তাঁহার বেশ নাম-ডাক আছে।

রুস্তমজি প্রথম কিছুক্ষণ পাণ্ডুরঙের সহিত আদিরসাশ্রিত রসিকতা করিলেন, তারপর কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ইনি আমার বন্ধু সোমনাথ, আমরা দু'জনে পিলের ছবিতে কাজ করেছি। ইনি হিরো ছিলেন। আপনার যদি হিরোর দরকার থাকে—'

ইতিমধ্যে রুস্তমজি তাঁহার ধূর্ত চোখ দিয়া সোমনাথকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন; বলিলেন—'চেহারা তো লা জবাব! কাজও নিশ্চয় ভাল করেছেন?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'খুব ভাল কাজ করেছেন। যেমন চেহারা তেমনি কাজ—দুই পাল্লা সমান ভারি।'

রুস্তমজি বলিলেন—'বটে? তুমি জামিন হচ্চ?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আলবৎ—জান জামিন ইমান জামিন। আমার সুপারিশ যদি মিথ্যে হয় ডালকুত্তা দিয়ে আমাকে খাওয়াবেন।'

রুস্তমজি হাসিলেন—'পাণ্ডুরঙ্, তুমি মারাঠী তো?'

'জি।'

'তবে এমন মোগলাই বচন-বিন্যাস শিখলে কোত্থেকে? মারাঠী ভাইরা তো এমন চোস্ত-জবান হয় না।'

'হুজুর, তবে শুনুন, আমার খানদানি কেচ্ছা বলি।—পেশোয়াদের আমলে মারাঠারা একবার দিল্লী দখল করেছিল জানেন বোধ হয়?

'জানি না, তবে হতে পারে। মারাঠীদের অসাধ্য কাজ নেই।'

'আমার পূর্বপুরুষ সেই মারাঠা পল্টনে ছিলেন। তিনি আর ফিরে এলেন না, দিল্লীতেই বসে গেলেন। সেই থেকে আমরা দিল্লীর বাসিন্দা।'

'বুঝেছি। তোমার বন্ধুও কি দিল্লীর বাসিন্দা?'

'না, উনি বাঙালী।'

রুস্তমজি বলিলেন—'মন্দ নয়। তুমি মারাঠী হয়ে দিল্লীর বাসিন্দা, উনি বাঙালী হয়ে বম্বের বাসিন্দা, আর আমি পার্সী হয়ে হিন্দুস্থানের বাসিন্দা। ভাল ভাল; কিন্তু উনি পিলের কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?'

সোমনাথ ও পাণ্ডুরঙ্ দৃষ্টি বিনিময় করিল, প্রশ্নের উত্তর সাবধানে দেওয়া প্রয়োজন।

সোমনাথ বলিল—'মিঃ পিলের সঙ্গে আমার মাত্র তিন মাসের কনট্রাক্ট্ ছিল—'

রুস্তমজি প্রশ্ন করিলেন—'পিলের অপ্‌শান ছিল না?'

'ছিল।'

'তবে সে ছেড়ে দিলে যে বড়?'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'তাঁর সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল; কিন্তু কাজের সম্পর্কে নয়।'

রুস্তমজি কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—'হুঁ। আপনার নাম ঠিকানা দিয়ে যান, যদি আমার দরকার হয় আপনাকে খবর দেব।—পাণ্ডুরঙ্, তুমি এখনও চন্দনার দিকে নজর দিচ্ছ না যে বড়?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'চাকরি যাবে হুজুর।'

রুস্তমজি বলিলেন—'তা বেশ তো। ফাউণ্টেন পেন যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয়, সটান আমার কাছে চলে আসবে। আমি তোমাকে বেশী মাইনে দেব।'

পাণ্ডুরঙ্ হাত জোড় করিয়া বলিল—'হুজুর মেহেরবান।'

স্টুডিও হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'বুড়ো ভারি ধড়িবাজ, আন্দাজ করেছে চন্দনা ঘটিত মনোমালিন্য। পিলের কাছে তোমার সম্বন্ধে সুলুক সন্ধান নেবে।'

সোমনাথ বলিল—'হুঁ। পিলে সাহেব বিশেষ ভাল সার্টিফিকেট দেবেন বলে মনে হয় না। এখানে কোনও আশা নেই পাণ্ডুরঙ্।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'তা বলা যায় না। যাহোক, কাল পরশু আমি আবার তোমাকে নিয়ে বেরুব, আরও দু'একজনের কাছে নিয়ে যাব। একটা না একটা লেগে যাবেই।'

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া পাণ্ডুরঙ্ সোমনাথকে অনেকগুলি চিত্রপ্রণেতার কাছে লইয়া গেল; কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা। চেহারা তো বেশ ভালই, কিন্তু পিলের

চাকরি ছাড়লেন কেন? নাম-ধাম রেখে যান, যদি দরকার হয় খবর দেব। সোমনাথের মনে হইল, কোনও অদৃশ্য শত্রু চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোনও দিক দিয়াই বাহির হইবার পথ নাই।

একদিন বাড়ি ফিরিবার পথে সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা পাণ্ডুরঙ্, আমার নামে ওরা কি বলেছে, যাতে আমি একেবারে অস্পৃশ্য হয়ে গেছি? তুমি কিছু শুনেছ?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'বড় সাংঘাতিক কথা বলেছে?'

'কি? চন্দনা সম্বন্ধে?'

'পাগল! ওরা জানে তাতে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না। সিনেমা রাজ্যে স্ত্রীলোক ঘটিত দুর্বলতা কেউ গ্রাহ্য করে না। ওরা রটিয়েছে যে তুমি মন দিয়ে কাজ কর না, আর অর্ধেক ছবি তৈরি হবার পর মোচড় দাও।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। এমন আর্টিস্ট আছে যারা অর্ধেক ছবি তৈরি হবার পর বাড়ি গিয়ে বসে থাকে, বলে বেশী টাকা দাও তো কাজ করব—নইলে করব না। এই বলে মোচড় দিয়ে বেশী টাকা আদায় করে। তারা জানে অর্ধেক ছবি তৈরি হয়ে গেছে, এখন তাকে বাদ দিয়ে নতুন করে ছবি তৈরি করতে গেলে অনেক খরচ। তাই এ রকম আর্টিস্টকে প্রডিউসারদের ভারি ভয়।'

'কিন্তু কন্‌ট্রাক্ট আছে যে!'

'থাকলই বা কন্‌ট্রাক্ট্। আর্টিস্ট বলে, আদালতে যাও। আদালতে গেলে দু'বছরের ধাক্কা। ততদিন ছবি বন্ধ রাখলে প্রডিউসারের সর্বনাশ হয়ে যাবে; তার চেয়ে বেশী টাকা দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া ভাল। তোমার নামে সেই অপবাদ দিয়েছে। ও অপবাদ যে আর্টিস্টের হয, তাকে কেউ কাঠি করে ছোঁয় না।'

সোমনাথ হতাশ স্বরে বলিল—'তবে আর চেষ্টা করে লাভ কি পাণ্ডুরঙ্? তার চেয়ে দেশে ফিরে যাই।'

পাণ্ডুরঙ্ সহজে হার মানে না, বলিল—'আর কিছুদিন দেখা যাক। বদনাম দিলেই সকলে বিশ্বাস করে না। ছবিটা বেরুলে সুরাহা হতে পারে।'

পরদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল। ছোট বিজ্ঞাপন, তাহাতে কেবল ছবির নাম ও চন্দনার হাসিমুখ আছে। অন্য কাহারও উল্লেখ নাই। চন্দনা দেবী যে শীঘ্রই আসিতেছেন এই খবরটি কেবল সাধারণকে জানানো হইয়াছে।

দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন আকারে বাড়িতে লাগিল। চন্দনার নাম ছাড়াও ক্রমে প্রযোজকের নাম, পরিচালকের নাম, সঙ্গীত পরিচালকের নাম, অন্যান্য আর্টিস্টদের নাম, এমন কি স্টুডিওর দারোয়ানটার পর্যন্ত নাম ছাপা হইল কিন্তু সোমনাথের নাম কুত্রাপি দেখা গেল না। একদিন মহাসমারোহ করিয়া খবরের কাগজের অর্ধেক পৃষ্ঠা জুড়িয়া চিত্রের মুক্তির দিন বিঘোষিত হইল—আগামী শনিবার বম্বের বিখ্যাত 'রসিক' সিনেমায় ছবি মুক্তিলাভ করিবে।

সোমনাথের মনের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী অকস্মাৎ কোন্ অশুভ মুহূর্তে তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া বিপরীত মুখে যাত্রা শুরু করিলেন, কোনও কারণ দেখাইলেন না, ত্রুটির ছিদ্র অন্বেষণ করিলেন না, কিন্তু সোমনাথের জীবনে সকলি গরল হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে রত্নার চিঠি আসিল। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, যখন বর্ষণ হয় তখন আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। চিঠিখানা হাতে পাইয়া সোমনাথের মনে হইল, দুঃখের বরষায় সত্যই তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া জল ঝরিতেছে। রত্নার চিঠি দিদিকে লেখা। দিদি বোধ হয় চিঠির বক্তব্য সোমনাথকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না

বলিয়া চিঠিখানি তাহার ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন।

সোমনাথ চিঠি খুলিয়া পড়িল।

শ্রীচরণেষু, ভাই বৌদি, শুনে সুখী হবে আমি পাস করেছি। ফল খুব ভাল হয়নি, টায় টায় পাস। ভাবছি থার্ড ইয়ারে ভর্তি হব।

বম্বেতে তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, তার উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিলাম। এখন দিচ্ছি। আমার মত নেই। সোমনাথবাবু যে পথে নেমেছেন সে পথে পতন অনিবার্য। তাছাড়া, যিনি বিয়ে করে বাইরের আক্রমণ থেকে চরিত্র রক্ষা করতে চান তাঁর চরিত্রকেও আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না।

ভালবাসা নিও।

ইতি—
তোমার রত্না

রত্নার হাতের লেখা খুব সুন্দর, ছোট ছোট সুগঠিত অক্ষরগুলি মুক্তাশ্রেণীর মত পাশাপাশি সাজানো; কোথাও অপরিষ্কার নাই, কাটাকুটি নাই, দ্বিধা সংশয় নাই। রত্নার হস্তাক্ষর যেন তাহার চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

তিক্ত অন্তরে সোমনাথ চিঠিখানি সরাইয়া রাখিয়া দিল। আর কতদিন এভাবে চলিবে? সংসারের অবহেলা ও অপমানের কি শেষ নাই?

দুই

শনিবার সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ চোরের মত চুপি চুপি ছবি দেখিতে গেল। স্টুডিওর চেনা লোক পাছে তাহাকে দেখিয়া ফেলে এ সঙ্কোচও তাহার মনে ছিল, কিন্তু 'রসিক' সিনেমা আজ লোকে লোকারণ্য, চন্দনার নূতন ছবি দেখিবার জন্য শহরসুদ্ধ ভাঙিয়া পড়িয়াছে; সোমনাথের সহিত চেনা কাহারও দেখা হইল না। টিকিট বিক্রয় অবশ্য বহু পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফুটপাতে কালাবাজারের কারবার চলিতেছিল। সোমনাথ দ্বিগুণ মূল্যে টিকিট কিনিয়া প্রেক্ষাগৃহে গিয়া বসিল।

ছবি আরম্ভ হইল। পরিচয় পত্রে মধুর বাদ্য-নিক্কণ সহযোগে প্রথমেই চন্দনা দেবীর নাম, তারপর আর সকলে। অন্যান্য নটনটীর সহিত সোমনাথের নামটাও আছে বটে, কিন্তু সে-ই যে এই চিত্রের নায়ক তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কিন্তু ছবি দেখিতে দেখিতে সোমনাথ তন্ময় হইয়া গেল। গল্পের বিষয়-বস্তুতে যত না হোক, তাহার প্রকাশভঙ্গীতে এমন একটি সরস মসৃণ নৈপুণ্য আছে যে দর্শকের মনকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং শেষ পর্যন্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখে। চন্দনার অভিনয় অতুলনীয় বলিলেও চলে; সোমনাথের ভূমিকা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার প্রিয়দর্শন আকৃতি ও সহজ অনাড়ম্বর অভিনয় মনের উপর দাগ কাটিয়া দেয়। দর্শকমণ্ডলী যে তাহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে তাহাও তাহাদের আচরণ হইতে বারবার প্রকাশ পাইল। চিত্রদর্শী জনতার অনুরাগ বিরাগ প্রকাশ করিবার এমন একটি নিঃসংশয় ভঙ্গী আছে যাহা বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না।

ছবি শেষ হইলে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সোমনাথ অশান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরিল। জামাইবাবু অফিসের কাজে দু'দিনের জন্য পুণা গিয়াছিলেন, দিদিও পুণা বেড়াইবার-

উদ্দেশ্যে সঙ্গে গিয়াছিলেন। সোমনাথ বাড়িতে একা। শূন্য বাড়ির ড্রয়িংরুমে সে একা বসিয়া রহিল। ভৃত্য আসিয়া আহারের তাগাদা দিল; সোমনাথের ক্ষুধা ছিল না, খাবার ঢাকা দিয়া রাখিতে বলিয়া সে আবার বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিল।

এখন সে কী করিবে? ছবি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সম্ভবত এই একই চিত্রগৃহে বৎসরাধিক কাল চলিবে। সোমনাথের অভিনয় ভাল হইয়াছে, এমন কি তাহার অভিনয় চিত্রটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে একথাও বলা চলে। অথচ তাহার কৃতিত্বের প্রাপ্য পুরস্কার সে কিছুই পাইল না, অজ্ঞাতনামা হইয়া রহিল। যে খ্যাতি ও স্বীকৃতির উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্ভর করিতেছে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইল। এখন সে কী করিবে?

একটা প্রবল অসহিষ্ণুতায় তাহার অন্তর ছটফট করিয়া উঠিল। না, আর এখানে নয়, যথেষ্ট হইয়াছে। কালই সে দেশে ফিরিয়া যাইবে। সেখানে যা হইবার হইবে। বোম্বাই আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে।

এই সময় টিং টিং করিয়া টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। এত রাত্রে কে টেলিফোন করে? সোমনাথ উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

'হ্যালো?'

একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর হিন্দীতে প্রশ্ন করিল—'সোমনাথবাবু বাড়িতে আছেন কি?'

'আমিই সোমনাথ। আপনি কে?'

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর দিল না, টেলিফোন রাখিয়া দিল। কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সোমনাথ ক্লান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ইহা বোধ হয় বোম্বাই রসিকতা; কিন্তু রসিক ব্যক্তিটি কে? কণ্ঠস্বর পুরুষের, সুতরাং চন্দনা নয়। তবে কি পিলে সাহেব? কিন্তু তিনি এমন অর্থহীন রসিকতা করিবেন কেন? দশ মিনিট এইরূপ চিন্তায় কানামাছির মত পাক খাইবার পর সোমনাথ শুনিতে পাইল, বাড়ির সম্মুখে একটি মোটর আসিয়া থামিয়াছে। পরক্ষণেই সদর দরজার ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। সোমনাথ গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, ডাক-বাক্স টুপিপরা ধূর্ত চক্ষু বৃদ্ধ রুস্তমজি দাঁড়াইয়া আছেন।

রুস্তমজি বলিলেন—'আমিই ফোন করেছিলাম!'

সোমনাথ সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইল। রুস্তমজি বাজে কথায় সময় নষ্ট করিলেন না, বলিলেন—'আপনার ছবি এইমাত্র দেখে এলাম। আমার ছবিতে আপনাকে হিরো সাজতে হবে। আমি হাজার টাকা মাইনে দেব।'

সোমনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে উত্তর দিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রুস্তমজি পকেট হইতে দশকেতা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া সোমনাথের সম্মুখে রাখিলেন—'এই নিন আপনার একমাসের মাইনে। আজ থেকে আপনি আমার কাজে বাহাল হলেন। আসুন, এই রসিদ দস্তখৎ করুন। পাকা কন্‌ট্রাক্ট পরে হবে।'

রুস্তমজি একটি ছাপা রসিদ ও ফাউন্টেন পেন সোমনাথের সম্মুখে ধরিলেন, সোমনাথ প্রায় অবশভাবে দস্তখৎ করিয়া দিল।

রুস্তমজি উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—'আজ আমি চললাম, রাত হয়েছে। কাল আপনি স্টুডিওতে যাবেন, তখন কথা হবে।'

দৃঢ়ভাবে সোমনাথের করমর্দন করিয়া রুস্তমজি বিদায় লইলেন।

সারা রাত্রি আনন্দে উত্তেজনায় সোমনাথের ঘুম হইল না। এ কী অভাবনীয় ব্যাপার! তাহার ভাগ্য-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল, এখন সেই প্রদীপ আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ইহাকেই

বলে পুরুষের ভাগ্য। রুস্তমজির আশা তো সে ছাড়িয়াই দিয়াছিল—কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে ভোলেন নাই। কি অদ্ভুত মানুষ! রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নিজে আসিয়া টাকা দিয়া গেলেন; কিন্তু এত রাত্রে নিজে আসিলেন কেন? কাল সকালে একবার খবর পাঠাইলেই তো সোমনাথ কৃতার্থ হইয়া যাইত! মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই রুস্তমজি।

শুধু মহাপ্রাণ নয়, রুস্তমজি যে অতি দূরদর্শী ব্যক্তি তাহা জানিতে সোমনাথের এখনও বাকি ছিল।

রাত্রি তিনটার সময় সে অনুভব করিল ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। মনে পড়িল রাত্রে আহার করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ভোজনকক্ষে গিয়া দেখিল তাহার খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তখন পেট ভরিয়া আহার করিয়া সে তৃপ্তমনে শুইতে গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে পাণ্ডুরঙ্ আসিল, বলিল—'কাল আসতে পারিনি। ছবি ভাল হয়েছে। তোমার কাজ দেখে সবাই মুগ্ধ। চল, আজ তোমায় ছবি দেখিয়ে আনি।'

সোমনাথ হাসিয়া বলিল—'ছবি আমি দেখেছি।' বলিয়া গত রাত্রির সমস্ত বিবরণ বলিল।

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আরে, ভারি ঘাগী বুড়ো তো! পাছে আর কেউ কন্ট্রাক্ট করিয়ে নেয়, তাই রাত্তিরেই এসেছে। তুমি এক হাজারে রাজি হয়ে গেলে? দম দিলে বুড়ো দু' হাজারে উঠ্‌তো।'

সোমনাথ বলিল—'না না। এক হাজারই যথেষ্ট, তার বেশী কে দেবে পাণ্ডুরঙ্?'

'এখন অনেকেই দেবে। সব ব্যাটা ছবি দেখবার জন্যে ওৎ পেতে ছিল। আমরা যখন দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন কেউ গ্রাহ্যই করেনি। এইবার দেখো না—সবাইকে নাকে দাঁড় দিয়ে ঘোরাবো।

'আর নাকে দাঁড় দেবে কি ক'রে—টাকা যে নিয়ে ফেলেছি।'

'হুঁ—কাজটা ভাল করনি। যাহোক, একটা কথা বলে রাখি, লম্বা কন্ট্রাক্ট কোরো না, একটা ছবির কন্ট্রাক্ট কোরো, বড় জোর দুটো। তোমার এখন সিতারা বুলন্দ্, টাকা রোজগারের মরসুম—এখন যদি বুড়ো রুসিবাবার ফাঁদে পড়ে যাও, তাহলে ঐ এক হাজার টাকাতেই জীবন কাটাতে হবে।'

পাণ্ডুরঙ্ নিঃস্বার্থ বন্ধু, তাহার কথা সোমনাথের মনে ধরিল; কিন্তু তবু, তাহার ঘোরতর দুঃসময়ে রুস্তমজিই আসিয়া প্রথম আশার আলো জ্বালিয়াছিলেন তাহাও সে ভুলিতে পারিল না।

পাণ্ডুরঙ্ চলিয়া গেলে সোমনাথ পর পর গোটা তিনেক টেলিফোন কল্ পাইল। সকলেই চিত্র-প্রণেতা, সকলেই মধুক্ষবিত কণ্ঠে তাহাকে স্টুডিওতে গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন; একজন এমন আভাসও দিলেন যে তিনি চুক্তিপত্র হাতে লইয়া বসিয়া আছেন, সোমনাথ গিয়া তাহাতে বেতনের অঙ্কটি বসাইয়া দিবে; কিন্তু সোমনাথ সকলকে সবিনয়ে জানাইল যে সে পূর্বেই চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং বারম্বার অনুরোধ জানাইলেন সোমনাথ যেন মুক্তি পাইলেই তাঁহাদের স্মরণ করে।

সোমনাথ বুঝিল তাহার কপাল খুলিয়াছে। এমন রাতারাতি কপাল খোলা সিনেমা ছাড়া আর কোনও ক্ষেত্রে হয় না।

স্নানাহার সারিয়া সোমনাথ বাহির হইল। প্রথমেই ব্যাঙ্কে গিয়া টাকাগুলি জমা দিতে হইবে। সোমনাথ কলিকাতায় যে ব্যাঙ্কে কাজ করিত সেই ব্যাঙ্কের একটি শাখা বম্বেতে ছিল, সোমনাথ পূর্ব-সম্পর্কের মমতায় সেই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখিয়াছিল।

টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া সোমনাথ রুস্তমজির স্টুডিওতে গেল। পাণ্ডুরঙের উপদেশ তাহার মনে ছিল, সে ট্যাক্সি চড়িয়া গেল।

রুস্তমজি আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন, বলিলেন—'আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তুমি আমাকে রুসিবাবা বলে ডেকো। এখানে সবাই তাই বলে। আমার স্ত্রী পুত্র কেউ নেই, সব মরে গেছে, স্টুডিওর ছেলেরাই আমার ছেলে।'

সোমনাথ বলিল—'যে আজ্ঞে।'

রুস্তমজি তখন বলিলেন—'দ্যাখো সোমনাথ, আমি ত্রিশ বছর সিনেমা করছি. ভুরু দেখে মানুষ চিনতে পারি। তোমাকে দেখে আমি বুঝেছি তুমি বড় ভাল ছেলে; কিন্তু শুধু ভালমানুষ হলেই চলে না; সিনেমায় হিরো হতে গেলে ঠাট্ চাই। তুমি একটা মোটর কিনে ফ্যালো।'

সোমনাথ অবাক হইয়া বলিল—'মোটর? কিন্তু আমার তো মোটর কেনার টাকা নেই। আজকাল নতুন মোটর কিনতে গেলে—'

রুসিবাবা বলিলেন—'নতুন মোটর কেনবার দরকার নেই, পুরোনো হলেও চলবে।'

সোমনাথ বলিল—'কিন্তু পুরোনো মোটরই বা কোথায় পাব?'

'সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি যোগাড় করে দেব। আমার জানা একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটর আছে, ভাল অবস্থায় আছে, অস্টিন টেন। আমি সস্তায় তোমায় কিনিয়ে দেব।'

সোমনাথ বিব্রত হইয়া বলিল—'কিন্তু মোটর কেনা কি নিতান্তই দরকার?'

রুস্তমজি বলিলেন—'দরকার। আমার স্টুডিওতে যে কেউ সাতশো টাকার বেশী মাইনে পায় তাকেই আমি মোটর কিনিয়ে দিয়েছি। ওতে স্টুডিওর ইজ্জত বাড়ে; তা ছাড়া, যার গাড়ি আছে তাকে পুলিসেও খাতির করে। তুমি ভেবো না। খুব সস্তায় গাড়ি পাবে; হাজারখানেকের মধ্যে। তাও নগদ টাকা দিতে হবে না, আমি মাসে মাসে তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব। তুমি জানতেও পারবে না।'

সোমনাথ আর না বলিতে পারিল না, রাজি হইল। রুস্তমজি তখন চুক্তিপত্রের খসড়া বাহির করিয়া সোমনাথকে দিলেন, বলিলেন—'একবার চোখ বুলিয়ে নাও, যদিও আপত্তি করার কিছু নেই।'

সোমনাথ পড়িয়া দেখিল, হাজার টাকা মাহিনায় পাঁচ বছরের চুক্তি, মাহিনা বাড়ার কোনও শর্ত নাই। পাণ্ডুরঙ্ তাহাকে পূর্বেই মন্তর দিয়াছিল, সে বাঁকিয়া বসিল—'আমি একটা ছবির জন্য কন্ট্রাক্ট করতে পারি, তার বেশী নয়।'

রুস্তমজি বোধ হয় মনে মনে আপত্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সোমনাথকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। নূতন অভিনেতার পক্ষে পাঁচ বছরের চুক্তি যে কতদূর ভাগ্যের কথা, যে শিল্পী দীর্ঘ চুক্তি করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ পাকা এবং নিরুদ্বেগ করিয়া লইতে চায় না তাহার ভাগ্য বিপর্যয় যে কিরূপ অবশ্যম্ভাবী, রুস্তমজি তাহা মসৃণ বাক্‌পটুতার সহিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন।

সোমনাথ কিন্তু ভিজিল না। তাহার এখন সিতারা বুলন্দ্, সে পাঁচ বছরের জন্য জীবন বন্ধক রাখিতে প্রস্তুত নয়। শিল্পীর জীবনে পাঁচ বৎসর যে অতি দীর্ঘ সময়, অনেক অভিনেতার শিল্প-জীবন পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া যায় তাহা তাহার অজানা ছিল না। ত্রিশ বছর বয়সের পর যাহারা নবীন হিরো সাজে তাহারা শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢুকিবার চেষ্টা করে এবং হাস্যাস্পদ হয়; সুতরাং বেলা থাকিতে থাকিতে ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া লইয়া আলোয় আলোয় বিদায় লওয়া ভাল।

অনেক ধস্তাধস্তির পর স্থির হইল, সোমনাথ এক হাজার টাকা মাহিনায় রুস্তমজির দুইটি ছবিতে হিরোর কাজ করিবে; তবে এই দুইটি ছবির কাজ যতদিন

শেষ না হয় ততদিন সে অন্য কাজ করিতে পারিবে না।

নূতন চুক্তিপত্র তখনই ছাপা হইয়া আসিল। সোমনাথ তাহাতে সহি করিয়া দিল। রুস্তমজি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—'সোমনাথ, তোমাকে যতটা গোবেচারি ভেবেছিলাম তুমি তা নও। যাহোক, এ ভালই হল, তুমিও খুশি হলে—আমিও খুশি হলাম। এবার মন দিয়ে কাজে লাগতে হবে।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'কাজ আরম্ভ হবে কবে?'

'মাসখানেকের মধ্যেই। আর সব ঠিক আছে, কেবল গল্পটা নিয়ে একটু গোলমাল চলছে।'

'গল্প লিখেছেন কে?'

'একজন বাঙালী। নাম জানো কি? ইন্দু রায়।'

সোমনাথ লাফাইয়া উঠিল। ইন্দু রায়! ইন্দু রায়ের নাম শিক্ষিত বাঙালী কে না জানে? সোমনাথ তাঁহার লেখার প্রগাঢ় ভক্ত। সে উল্লসিত হইয়া উঠিল।

'তিনি কি বোম্বাইয়ে থাকেন?'

'হ্যাঁ, প্রায়ই স্টুডিওতে আসেন। লেখক তো ভালই, কিন্তু বড় একগুঁয়ে। ক্রমে সকলের সঙ্গেই তোমার পরিচয় হবে।'

তিন

কাজ আরম্ভ না হইলেও সোমনাথ প্রত্যহ স্টুডিওতে যাতায়াত করিতে লাগিল। রুস্তমজি প্রায়ই তাহাকে নিজের অফিস ঘরে ডাকিয়া গল্প-গুজব করেন; বৃদ্ধের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বেশ গাঢ় হইয়া উঠিল। স্টুডিওর কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারীর সহিতও আলাপ হইল।

দিগম্বর শম্ভুলিঙ্গম স্টুডিওর খাজাঞ্চি ও হিসাবনবিশ। ইনি মদ্রদেশীয়, সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যাপারে অতিশয় পোক্ত; কিন্তু জন্মাবধি তেঁতুল গোলা রশম খাইয়াই বোধকরি শম্ভুলিঙ্গ মহাশয়ের অন্তর বাহির একেবারে টকিয়া গিয়াছিল। এমন কি তাঁহার চেহারাটাও তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় বক্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। সোমনাথের সহিত প্রথম আলাপে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—'আপনি ভাগ্যবান লোক, এই বয়সেই হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গেলেন। আর আমি এগারো বছর কাজ করছি—আমার মাইনে ছ'শো টাকা—যাক—সবই ভাগ্য। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

শম্ভুলিঙ্গ প্রসঙ্গে রুস্তমজি একদিন হাসিয়া বলিলেন—'শম্ভুলিঙ্গ খাঁটি লোক, পরের পয়সা ওর কাছে হারাম; কিন্তু লোকটা সুখী হবার ফন্দি জানে না। ওকে যদি গলা টিপে দু' পেগ মদ গিলিয়ে দিতে পারতাম তাহলে হয়তো—'

কিন্তু মদও শম্ভুলিঙ্গের কাছে পরধনের মতই অমেধ্য, তাই তাঁহাকে সুখী করা মানুষের সাধ্য নয়।

ইহারই ঠিক বিপরীত চরিত্র—চক্রধর রায়। লোকটি লাহোরের পাঞ্জাবী, চিত্র-পরিচালক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। রুস্তমজির সাম্প্রতিক কয়েকটি চিত্র পরিচালনা করিয়াছে। এমন দাম্ভিক ও আত্মপ্রসন্ন ব্যক্তি কম দেখা যায়। লোকটির চেহারা যেমন বাদশাহী আমলের মিনার গম্বুজ দিয়া তৈয়ার মনে হয়, অন্তরও তেমনি দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার স্তম্ভের উপর উদ্ধতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। নিজের প্রশংসা ও পরের নিন্দা ছাড়া তাহার মুখে অন্য কথা নাই। শিষ্ট সমাজে এরূপ ব্যক্তি একদণ্ডের তরেও আমল পাইত না, কিন্তু সিনেমা রাজ্যে নিজের ঢাক যে যত জোরে পিটাইতে

পারে তাহার কদর তত বেশী। তাই চক্রধর রায় এক গুণী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

প্রথম পরিচয়েই সোমনাথ বুঝিয়াছিল চক্রধর রায়ের সহিত তাহার পোট হইবে না। চক্রধরই পরবর্তী ছবি পরিচালনা করিবে ভাবিয়া সে একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিতে গেলে ঠোকাঠুকি অবশ্যম্ভাবী। অথচ রুস্তমজি চক্রধর সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করেন বলিয়াই মনে হয়। এরূপ অবস্থায় 'যা হইবার হইবে' ভাবিয়া সোমনাথ মনের অস্বাচ্ছন্দ্য দমন করিয়া রাখিয়াছিল।

তৃতীয় যে ব্যক্তির সহিত সোমনাথের পরিচয় হইল তিনি লেখক ইন্দু রায়। সোমনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, একটি কোটপ্যাণ্ট-পরা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আসিয়া স্টুডিওর ওয়েটিং রুমে বসিয়া থাকেন, তারপর রুস্তমজির সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাকে একটু কড়া মেজাজের লোক বলিয়া মনে হয়, কাহারও সহিত যাচিয়া কথা বলেন না, বরং নিজের চারিপাশে স্বতন্ত্রতার এমন একটি দৃঢ় গণ্ডী কাটিয়া রাখেন যে সহজে কেহ তাঁহার দিকে ঘেঁষিতে পারে না।

ইনি যে বাঙালী, তাহাই সোমনাথ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যখন জানিতে পারিল ইনিই ইন্দু রায়, তখন সাগ্রহে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিল। ইন্দুবাবু প্রথমে একটু গম্ভীর হইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার ছিপি আঁটা মন উন্মোচিত হইতে লাগিল। সোমনাথ দেখিল, ইন্দুবাবু আসলে বেশ মিশুক ও রসিক লোক, কিন্তু কোনও কারণে নিজেকে তিনি সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছেন। হয়তো মন খুলিয়া কথা বলিবার মত লোক পান না বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সোমনাথ উৎসাহভরে বলিল—'আপনার লেখা আমার বড় ভাল লাগে। এমন সহজ স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠতা আর কারুর লেখায় দেখতে পাই না।'

ইন্দুবাবু ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ সোমনাথকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ব্যঙ্গ-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন—'আমি পাঁচ বছর বোম্বাইয়ে আছি, কিন্তু এ ধরনের কথা কারুর মুখে শুনিনি। আপনি তাহলে বাংলা বই পড়েন।'

সোমনাথ বলিল—'আপনার সব বই পড়েছি।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'ভাল করেননি। বোম্বাইয়ের প্রডিউসারেরা যদি জানতে পারে আপনি বই পড়েন, তাহলে আপনার নামে ঢ্যারা পড়বে।'

এই বক্রোক্তিটুকুর ভিতর দিয়া সোমনাথ ইন্দুবাবুর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাইল। সেই যে কোন্ গুণী ওস্তাদ বড় মানুষের বাড়িতে গান গাহিতে গিয়া 'নাকেড়া' গাহিবার ফরমাস পাইয়াছিল, ইন্দুবাবুর অবস্থা অনেকটা তাহার মত। ভেড়ার শিংয়ে পড়িলে হীরার ধার ভাঙিয়া যায়, একদল অশিক্ষিত হস্তিমূর্খের মাঝখানে পড়িয়া ইন্দুবাবুরও অশেষ দুর্গতি হইয়াছে।

তাঁহার অন্তরের তিক্ততা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিবার জন্য সোমনাথ বলিল—'সিনেমা-শিল্প এখনও সাহিত্যের কদর জানে না সত্যি। ক্রমে জানবে বোধ হয়; কিন্তু আমি আপনার গল্পে কাজ করতে পাব ভেবে ভারি আনন্দ হচ্ছে।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'আনন্দটা বোধ হয় বাজে খরচ করলেন।'

সোমনাথ চকিত হইয়া বলিল—'কেন? আমি তো শুনেছি আপনার গল্পই এবার হবে!'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'আমার গল্প এরা কিনেছে বটে কিন্তু কিনেই তাকে মেরামত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। সুতরাং আমার গল্প শেষ পর্যন্ত কতখানি থাকবে তা বলতে পারি না।'

এই সময় চাকর আসিয়া ইন্দুবাবুকে রুস্তমজির ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। সোমনাথ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ইন্দুবাবুর লেখার উপর কলম চালাইতে পারে এমন প্রতিভাবান ব্যক্তি এখানে কে আছে? রুস্তমজি? চক্রধর রায়? সোমনাথ মনে মনে স্থির করিল, সুবিধা পাইলে সে এইরূপ আত্মঘাতী ধৃষ্টতার প্রতিরোধ করিবে।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল; ছবি আরম্ভ করিবার দিন আগাইয়া আসিতেছে। সোমনাথ টের পাইল, গল্প লইয়া ভিতরে ভিতরে একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিতেছে। একদিন দুপুরবেলা সে রুস্তমজির ঘরে অনাহূত প্রবেশ করিয়া দেখিল, রুস্তমজি, চক্রধর রায় ও ইন্দুবাবু বসিয়া আছেন। গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে; ঘরের আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথ চলিয়া যাইতেছিল, রুস্তমজি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন—'এসো সোমনাথ, তুমিও শোন।'

সোমনাথ একটু দূরে বসিল। ইন্দুবাবু যে বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বোঝা যায়, তবু তিনি সংযতভাবেই কথা বলিতেছেন—'নায়ক-নায়িকার ডুয়েট গান বাস্তব জগতে অসম্ভব হলেও নাটকে যে তা মানানসই করে দেখানো যায় একথা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু আমার এ গল্প সে-ধরনের নয়। আমার নায়ক-নায়িকা দু'জনেই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাদের দিয়ে ডুয়েট গাওয়ানো অসম্ভব। মাফ করবেন, সে আমি পারবো না।'

চক্রধর রায় মাতব্বরিভাবে বলিল—'ঐ তো আপনাদের দোষ, সিনেমার কিছুই বোঝেন না অথচ তর্ক করেন।'

ইন্দু রায় তীক্ষ্ন স্বরে বলিলেন—'আপনি আমার চেয়ে সিনেমা বেশী বোঝেন তার কোন প্রমাণ নেই।'

আলোচনা ক্রমশ ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম করিল। সোমনাথ বড় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। শেষে রুস্তমজি তর্কে বাধা দিয়া বলিলেন—'দেখুন ইন্দুবাবু, আপনি যা আপনার দিক থেকে বলছেন তা সত্যি হতে পারে কিন্তু সিনেমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখছি ডুয়েট না থাকলে ছবি চলে না।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'ডুয়েট থাকলেও অনেক সময় ছবি চলে না দেখা গেছে।'

চক্রধর বলিল—'সে অন্য কারণে, ছবি তৈরি করবার সময় আমাদের দেখতে হয় পাবলিক কি চায়। আমাদের দেশের পাবলিকের বুদ্ধি দশ বছরের ছেলের সমান। সেই হিসেব করে আমাদের ছবি তৈরি করতে হয়।'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'পাবলিকের বুদ্ধি দশ বছরের ছেলের সমান এ বিশ্বাস যদি আমার থাকত, তাহলে আর কিছু না লিখে শিশুসাহিত্য লিখতাম এবং আপনাদেরও উচিত ছেলে ভুলোনো রূপকথা নিয়ে ছবি তৈরি করা।'

চক্রধর বলিল—'ওসব বাজে কথা। আপনি গল্পের মধ্যে ডুয়েট রাখবেন কিনা বলুন। অন্তত দুটো ডুয়েট আমার চাই-ই।'

ইন্দুবাবু রুস্তমজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'দেখুন, গল্প আপনি কিনেছেন, গল্পের চিত্রস্বত্ব এখন আপনার। আপনার পাঁঠা আপনি ইচ্ছে করলে ল্যাজের দিকে কাটতে পারেন, আমার কিছু বলবার নেই; কিন্তু ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।' বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

চক্রধর কিছুক্ষণ ধরিয়া গল্প-লেখক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিহীন একগুঁয়েমি সম্বন্ধে গজ্ গজ্ করিয়া শেষে বলিল—'নতুন আইডিয়া গ্রহণ করবার ক্ষমতাই ওদের নেই। আমি মুন্সি বিস্মিল্লাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সে হুঁশিয়ার লোক, যা বলব তাই লিখে দেবে।'

রুস্তমজি বলিলেন—'তাই করতে হবে দেখছি। ইন্দুবাবু এমন অবুঝ লোক জানলে ওঁর গল্প আমি নিতাম না। যাহোক, হুটোপাটি করলে চলবে না, একটু ভেবে দেখি।'

চক্রধর উঠিয়া গেলে রুস্তমজি সোমনাথকে বলিলেন—'তুমি তো সব শুনলে। কি মনে হল?'

সোমনাথ বলিল—'গল্প না শুনে আমি কিছু বলতে প্যারি না।'

রুস্তমজি বলিলেন—'বেশ তো। গল্প এই রয়েছে, তুমি আজ বাড়ি নিয়ে যাও। ভাল করে পড়ে কাল এসে তোমার মতামত আমায় বলবে। তুমি যখন ছবির নায়ক, তখন তোমার মতটাও জানা ভাল।'

টাইপ-করা চিত্রনাট্যের ফাইল রুস্তমজি তাহাকে দিলেন। ফাইল লইয়া সোমনাথ বাড়ি গেল।

চিত্রনাট্যটি ইংরাজিতে লেখা, কারণ এখানে বাংলা কেহ বোঝে না। সংলাপগুলিও ইংরাজিতে, যথাসময় হিন্দীতে অনূদিত হইবে। তবু সোমনাথ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। ইংরাজিতে লেখার জন্য ইন্দুবাবুর স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু আখ্যানবস্তু চমৎকার। একেবারে নূতন ধরনের গল্প। একটি বেকার যুবক কি করিয়া সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এই লইয়া কাহিনী। প্রেমের কথাও আছে বটে—কিন্তু তাহা অন্তঃসলিলা; কোথাও ছ্যাবলামি নাই, ডুয়েট গাহিয়া বা ভাঁড়ামি করিয়া নিম্নস্তরের রসসৃষ্টির চেষ্টা নাই; কিন্তু তবু পদে পদে ঘটনার সংঘাতে বহু বিচিত্র চরিত্রের সংঘর্ষে নাটকীয় রস জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

পড়িয়া সোমনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই গল্প উহারা অদল-বদল করিতে চায়? ডুয়েট গান ঢুকাইয়া খেলো করিতে চায়? কখনই সে তাহা হইতে দিবে না। এজন্য রুস্তমজির সহিত ঝগড়া হইয়া যায় সেও ভাল।

পরদিন একটু সকাল-সকাল সোমনাথ স্টুডিওতে গেল। দেখিল, রুস্তমজি তখনও আসেন নাই বটে, কিন্তু ইন্দুবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া ইন্দুবাবু বলিলেন—'এই যে, কাল তো আপনি ছিলেন, সবই শুনেছেন। আজ আমি একটা হেস্তনেস্ত করব বলে এসেছি।'

'কিসের হেস্তনেস্ত?'

'আমি ভেবে দেখলাম, ওরা যদি অদল-বদল করতে চায় আমি গল্প দেব না। টাকা এনেছি, গল্প ফেরত নেব।'

সোমনাথ বলিল—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আগে আমি রুস্তমজির সঙ্গে দেখা করি, তারপর আপনি যা ইচ্ছে করবেন।'

ইন্দুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন?'

সোমনাথ বলিল—'আমি আপনার গল্প পড়েছি, আমার খুব ভাল লেগেছে। রুস্তমজি আমার মতামত জানবার জন্যে গল্প আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব যাতে গল্প অদল-বদল না হয়।'

ইন্দুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'আপনি চেষ্টা করতে চান করুন, কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা হবে। ঐ ব্যাটা চক্রধর রায় চক্কর ধরে বসে আছে, কাছে গেলেই ছোবল মারবে।'

'দেখা যাক।'

রুস্তমজির আসিতে দেরি হইতেছে, তাই দুজনে বসিয়া একথা সেকথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ইন্দুবাবু নিজের সিনেমাক্ষেত্রে আগমনের কাহিনী

বলিলেন—'কথায় বলে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে এ'ড়ে গরু কিনে। আমার হয়েছে তাই। বেশ ছিলাম সাহিত্য নিয়ে, হঠাৎ বোম্বাইয়ের এক নামজাদা ফিল্ম কোম্পানী ডেকে পাঠালো গল্প লেখার জন্যে। নাটকের দিকে আমার বরাবরই ঝোঁক—খুব মেতে উঠলাম। ভাবলাম এতদিনে একটা কাজের মত কাজ পেয়েছি; সিনেমা শিল্পকে উন্নত করে তুলব, ভদ্রলোকের পাতে দেবার যোগ্য করে তুলব। সব ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই চলে এলুম। যে কোম্পানী আমাকে এনেছিল তাদের অবস্থা তখন টল্‌মল করছে; পর পর চারখানি ছবি মার খেয়েছে, এবার মার খেলেই কোম্পানী লাটে উঠবে। প্রযোজক মহাশয়ের অবস্থা অতি করুণ। যাহোক, আমি তো গল্প লিখলাম। প্রযোজক মহাশয় অবশ্য গল্পটি সর্বাংশে পছন্দ করলেন না; কিন্তু বারবার ঘা খেয়ে তাঁর সারা গায়ে দরকচা, আমার গল্পে তিনি কলম চালাতে সাহস করলেন না। গল্প যেমন ছিল তেমনি ছবি হল।

'ছবিখানি উৎরে গেল—রৈ রৈ করে চলতে লাগল। কোম্পানীও দাঁড়িয়ে গেল। ব্যস্‌, আর যায় কোথায়! প্রযোজক মহাশয় মনে করলেন সব কৃতিত্ব তাঁরই। আশ্চর্য মানুষের আত্মপ্রতারণার ক্ষমতা। এতদিন যিনি কে'চো হয়ে ছিলেন, তাঁর আর মাটিতে পা পড়ে না। আমার দ্বিতীয় গল্প তিনি কেটেকুটে একেবারে শতচ্ছিন্ন ক'রে দিলেন।... লোকটি নির্বোধ নয়, বিষয়বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ; কিন্তু বিষয়বুদ্ধি আর সৃষ্টিপ্রতিভা যদি এক বস্তু হত তাহলে জগৎশেঠ জয়দেবের চেয়ে বড় কবি হতে পারত। ছবি যখন বেরুলো তখন লোকে আমাকেই গালাগালি দিতে লাগল। ছবি সাত দিনও চলল না। আমি রাগ করে চাকরি ছেড়ে দিলাম।

'তারপর থেকে ফ্রি লান্সিং করছি, ছবির বাজারে গল্প বিক্রি করি; কিন্তু অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। যিনিই গল্প কিনুন, তিনিই চান গল্পকে মেরামত করতে। যাঁর রসবোধ যত কম, মেরামত করবার বাতিক তাঁর তত বেশী। অথচ ছবি খারাপ হলে —বে'ড়ে ব্যাটাকে ধর্‌, সব দোষ গল্প-লেখকের। গত পাঁচ বছরে আমার সাতখানা গল্প ছবি হয়েছে, কিন্তু তার একখানাও পাতে দেবার মত হয়নি। মেরামত করে সবাই আমার গল্পের দফারফা করে দিয়েছে।

'একেই বলে চোরা গরুর দায়ে কপিলের বন্ধন; বাজারে বদনাম হয়ে যাচ্ছে—আমার গল্প চলে না। তাই ঠিক করেছি আর কাউকে গল্প বদলাতে দেব না। চুক্তিপত্রে শর্ত থাকবে—কেউ একটা কথা বদলাতে পারবে না। এতে আমার গল্প বিক্রি হয় ভাল, না হয় পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে যাব।'

লাঞ্চের পর রুস্তমজি স্টুডিওতে আসিলেন। প্রবীণ ব্যবসায়ীদের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের মনের অবস্থা বড় একটা ধরা যায় না; রুস্তমজির মেজাজ যে বিশেষ কোনও কারণে ভিতরে ভিতরে অগ্নিবৎ হইয়া আছে তাহাও কেহ লক্ষ্য করিল না। বিশেষ কারণটি সাধারণের অজ্ঞাত হইলেও বড়ই গুরুতর।

রুস্তমজি নিজের অফিস ঘরে প্রবেশ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ গিয়া হাজির হইল, ফাইলটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—'গল্প পড়েছি।'

রুস্তমজির মন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল, তিনি মনকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন—'হুঁ—কি মনে হ'ল?'

সোমনাথ দৃঢ়ভাবে বলিল—'চমৎকার গল্প। রুসিবাবা, এ গল্পে একটা কথা অদল-বদল করা চলবে না।'

এই সময় চক্রধর আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখ বাঁকাইয়া বলিল—'আপনি তো

বলবেনই; আপনিও বাঙালী কিনা।'

কথাটা এতই বর্বরোচিত যে সোমনাথ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আরক্ত মুখে চক্রধরের দিকে তাকাইয়া বলিল—'আপনাকে যখন প্রশ্ন করব তখন তার উত্তর দেবেন, Speak when you are spoken to—এখন আমি রুসিবাবার সঙ্গে কথা বলছি।'

চক্রধর এরূপ কড়া জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। সে এমন নিরেট অসভ্য যে আপত্তিকর কোনও কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে তাহা বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই।

কিন্তু রাগ জিনিসটা ছোঁয়াচে। রুস্তমজির মনের নিগৃহীত উষ্মা এই সূত্রে বাহির হইয়া আসিল, তিনি তিরিক্ষিভাবে বলিয়া উঠিলেন-'সোমনাথ, তুমি অবুঝের মত কথা বলছ। লেখক যা লিখবে, তাই ছবি করতে হবে? তাহলে ছবি করবার কি দরকার—বই বাঁধা দপ্তরীর কাজ করলেই হয়।'

সোমনাথ মনের উত্তাপ দমন করিয়া বলিল—'উপমাটা ভাল দিয়েছেন। চিত্র-প্রণেতার কাজ দপ্তরীর কাজের মতই, গল্পটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দর্শকের সামনে হাজির করা—তার বেশী নয়।'

চক্রধর গাল ফুলাইয়া বলিল—'আমরা মাছি-মারা দপ্তরী নই। আমরা ছবি তৈরি করি, লেখক আমাদের মনের মত গল্প লিখে দেয়; এই এখানকার রেওয়াজ। লেখকদের আমরা আশকারা দিই না।'

সোমনাথ রুস্তমজিকে বলিল—'ইনি যাদের কথা বলছেন তারা লেখক নয়—তারা মুহুরী। ইন্দুবাবু মুহুরী নন, তিনি প্রতিভাবান লেখক। তাঁর গল্প নষ্ট করবার অধিকার আমাদের নেই।'

রুস্তমজি টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন—'আলবৎ আছে। আমি গল্প কিনেছি—আমার যেমন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে অদল-বদল করব। কারুর কিছু বলবার নেই।'

সোমনাথ গোঁ-ভরে বলিল—'তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে—ছবি একদিনও চলবে না।'

রুস্তমজি আরক্ত-চোখে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন—'আমি ত্রিশ বছর ছবি তৈরি করছি, পঞ্চাশটা ছবি করেছি। তুমি কালকের ছেলে আমাকে শেখাতে এসেছ—কি ক'রে ছবি তৈরি করতে হয়!'

সোমনাথ এতক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিয়া ছিল, এবার আর পারিল না; সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আপনি পঞ্চাশটা ছবি করেছেন বটে কিন্তু কটা ভাল ছবি করেছেন?'

রুস্তমজিও লাফাইয়া উঠিলেন—'ভাল ছবি! আমার পঞ্চাশটা ছবিই ভাল। তুমি তার ভাল মন্দ কী বুঝবে—সিনেমার কী জানো তুমি?'

'আমি অনেক কিছু জানি যা আপনারা জানেন না। আপনার পঞ্চাশটা ছবির মধ্যে পাঁচটিও ওৎরায় নি। তার কারণ কি জানেন? আপনি লেখকের ওপর কলম চালান, খোদার ওপর খোদগারি করেন—' চক্রধরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—'এই সব অশিক্ষিত অপদার্থ লোকের পরামর্শে আপনি প্রতিভাবান লেখকের ওপর কলম চালাতে সাহস করেন।'

রুস্তমজি বলিলেন—'ব্যস্, যথেষ্ট হয়েছে। আমার ছবিতে আমি যা-ইচ্ছে করব—যার পছন্দ হবে না সে কাজ করবে না।'

সোমনাথ বলিল—'সেই কথা আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। আপনারা যদি গল্পে অদল-বদল করেন আমি ছবিতে কাজ করব না।'

'কি—এ বড় কথা? যাও, আমার ছবিতে তোমাকে কাজ করতে দেব না। এখনি

বিদেয় হও।'

চার

কোথাকার জল কোথায় গড়াইল।

মাথা ঠাণ্ডা হইলে সোমনাথ বিবেচনা করিয়া দেখিল, এতটা বাড়াবাড়ি না হইলেই ভাল হইত বটে, কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জা বা অনুতাপ অনুভব করিবার কোনও হেতু নাই। সত্যের জন্য, ন্যায়ের পক্ষে সে লড়িয়াছে। ইহাতে তাহার যদি ক্ষতি হয় তা হোক।

ক্ষতি হইবাব সম্ভাবনা আর বিশেষ ছিল না। তাহার প্রথম ছবিতে সে দর্শক-মন্ডলীর চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে; এখন যে-কোনও প্রযোজক তাহাকে লুফিয়া লইবে। সে রুস্তমজির কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে একবার খবর পাইলে হয়।

তবু তাহার মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। ঝগড়াঝাঁটি সে ভালবাসে না, অথচ অতর্কিতভাবে পরের ঝগড়া তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ইন্দুবাবুর সহিত পরে আর তাহার দেখা হয় নাই; তিনি হয়তো গল্প ফেবত লইয়াছেন।. .রুস্তমজির সহিত এত শীঘ্র এমন ভাবে ছাড়াছাড়ি হইবে কে ভাবিয়াছিল; কিন্তু যেখানে চক্রধর আছে সেখানে ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব।. এই সময় পান্ডুরঙ্ থাকিলে শুধু সৎ পরামর্শই দিত না, তাহার সহিত কথা বলিয়া সোমনাথের মন অনেকটা হাল্কা হইত; কিন্তু পান্ডুবঙ্কে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য কাজ। সে হয়তো আড্ডা দিতে বাহির হইয়াছে, কিম্বা কাজে গিয়াছে।

জামাইবাবু ও দিদি ইতিপূর্বে পুণা হইতে ফিরিযাছিলেন, কিন্তু সোমনাথ তাঁহাদেব কোনও কথা বলিল না। মিছামিছি তাঁহাদের উদ্বিগ্ন করিয়া লাভ নাই। একেবারে অন্য চাকবি যোগাড় করিয়া তাঁহাদের জানাইবে।

পরদিন সকালে সোমনাথ ব্যাঙ্কে গেল; সেখান হইতে এক হাজার টাকা বাহির করিয়া স্টুডিওতে উপস্থিত হইল।

আজ রুস্তমজি ঠিক সময়েই আসিযাছেন। এত্তালা দিয়া সোমনাথ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল।

একহাত কপালের উপব রাখিয়া রুস্তমজি নতমুখে টেবিলে বসিয়া আছেন; সোমনাথেব সাড়া পাইযাও তিনি মুখ তুলিলেন না। সোমনাথ একটু অপেক্ষা করিয়া গলাঝাড়া দিয়া বলিল—'আপনার টাকা এনেছি।'

রুস্তমজি মুখ তুলিলেন। সোমনাথ চমকিয়া দেখিল, তাঁহার গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে, মুখেব ফরসা রঙ্ পাঙাস বর্ণ; ধূর্ত চক্ষুদুটির ধূর্ততা আর নাই, রাঙা টক্‌টক্ করিতেছে। একদিনে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে তাহা সোমনাথ কখনও দেখে নাই। সে থতমত খাইয়া গেল।

'কিসের টাকা?'

'আপনি যে টাকা আগাম দিয়েছিলেন।'

রুস্তমজি কিছুক্ষণ তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন—'বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।—না, আগে দরজা বন্ধ করে দাও।'

দ্বার বন্ধ করিয়া সোমনাথ রুস্তমজির সম্মুখে বসিল।

রুস্তমজি আরও কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া বলিলেন—'কাল সারা রাত্রি ঘুমোই নি, স্রেফ মদ টেনেছি।'

সোমনাথ কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। একটা বিষম দুর্বিপাক ঘনাইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। সে নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

'—কাল তুমি রাগ করে চলে যাবার পর ইন্দুবাবু এলেন। তিনি তাঁর গল্প ফেরত চাইলেন। আমি বললাম—দেব না গল্প, আমি কিনেছি, গল্প আমার। তিনিও রাগারাগি করে চলে গেলেন।'

সোমনাথ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—'কিন্তু—'

হঠাৎ রুস্তমজির স্বর ভাঙিয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—'আমি ডুবতে বসেছি, আমার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, আর এই সময় তোমরা আমায় ফেলে পালাচ্ছ! কিন্তু তুমি সব কথা জানো না, তোমাকে দোষ দেওয়া অন্যায়। সোমনাথ, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তাই যে কথা কাউকে বলিনি তাই আজ তোমাকে বলছি—শোন।'

নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—'আমার স্ত্রী পুত্র নেই। স্ত্রী অনেক দিন গেছেন; ছেলেটা ছিল, সেও মদ খেয়ে বদ্ খেয়ালি করে মরেছে। তাদের জন্যে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু এই স্টুডিও আমার প্রাণ—আমার যক্ষের ধন। এ যদি যায়, আমি এক দিনও বাঁচবো না।

'তুমি কাল বলেছিলে আমি অনেক ছবি করেছি বটে কিন্তু ভাল ছবি একটাও করিনি। তোমার কথা মিথ্যে নয়। ভাল ছবি করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। প্রথম প্রথম দু'একটা ছবি কিছু পয়সা দিয়েছিল সেই পয়সায় এই স্টুডিও কিনেছিলাম। তারপর থেকে যত ছবি করেছি সব দু'কুড়ি সাত—কোনমতে খরচ উঠেছে, তার বেশী নয়।

'এইভাবে চলছিল, কিন্তু গত তিনটে ছবিতে খরচ ওঠেনি। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, নতুন ছবি করবার পয়সা নেই। বাইরে চাকচিক্য বজায় রেখেছি, কিন্তু ভেতরটা একেবারে ফোঁপ্‌রা হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় এসে ঠেকেছি যে স্টুডিও বাঁধা রেখে নতুন ছবি তৈরি করতে হবে। বুঝতে পারছ ব্যাপার? এবার যদি ছবি না ওৎরায় আমি ধনে-প্রাণে গেলাম।

'বাইরে বুঝতে দিই না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার অবস্থা পাগলের মত হয়েছে। কী করে ভাল ছবি তৈরি করব? কী করে মান-ইজ্জত বাঁচাব? আমি জানি—সত্যিকার ভাল ছবি তৈরি করবার ক্ষমতা আমার নেই, পঞ্চাশটা ছবি করে আমি তা বুঝতে পেরেছি। তবু ছবি তৈরি করতে আমি ভালবাসি, ওছাড়া অন্য কাজও কিছু জানি না—ছবি তৈরি করা আর বেঁচে থাকা আমার কাছে সমান।

'আমি মূর্খ, লেখাপড়া শিখিনি, সত্যিকার ভাল নাটক কাকে বলে তা আমি জানি না। ত্রিশ বছর আগে যখন একাজ আরম্ভ করেছিলাম তখন সকলেই আমার মত ছিল, সবাই বেঁড়ে ওস্তাদ, না-পড়ে পণ্ডিত; কিন্তু আজকাল সিনেমায় ভাল লোক আসছে, ভাল ছবি দিচ্ছে, দর্শকদের রুচির উন্নতি হচ্ছে। এখন আমার ছবি কেউ চায় না।

'চক্রধরকে নিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম ও হয়তো ভাল ছবি দিতে পারবে, কিন্তু দুটো ছবি যা তৈরি করেছে তাতেই বুঝতে পেরেছি, ও একটা windbag, একটা ধোঁয়ায়-ভরা ফানুস। ওর দ্বারা কোনও কালে ভাল ছবি হবে না!

'কাল আমি স্টুডিও বন্ধক রেখে আড়াই লাখ টাকা নিয়েছি, এই আমার শেষ পুঁজি। এখন এ ছবি যদি ভাল না হয় তাহলে আমার স্টুডিও লাটে উঠবে। তোমরাই বলে দাও, আমি কী করে ভাল ছবি তৈরি করব! ইন্দুবাবু ভাল গল্প লেখেন, তাঁর গল্প নিয়েছি। তুমি ভাল আর্টিস্ট, তোমাকে নিয়েছি। আর কি করব বল? টাকা খরচের ত্রুটি করব না, কিন্তু ছবি ভাল হবে কি?'

এই দীর্ঘ আত্মকথা শুনিয়া সোমনাথ বুঝিল—রুস্তমজির মানসিক অবস্থা এখন কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি যে কাল এত সহজে ধৈর্য হারাইয়াছিলেন তার কারণও সে বুঝিতে পারিল।

অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া সে বলিল—'রুসিবাবা, আমি একটা কথা বলব, আপনি শুনবেন?'

রুস্তমজি বলিলেন--'শুনব। তোমার কথা শুনব বলেই তো এত কথা তোমাকে বললাম।'

'আমার ওপর আপনি এ ছবি তৈরি কবার ভার ছেড়ে দিন।'

'তোমার ওপর?'

'হ্যাঁ আমার ওপর। আমি টেক্‌নিক কিছুই জানি না, কিন্তু সেজন্যে আট্‌কাবে না। যে গল্প আমরা পেয়েছি, আমার বিশ্বাস আমরা ভাল ছবি তৈরি করতে পারব।'

রুস্তমজি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আরক্ত চক্ষু সোমনাথের মুখের উপর স্থাপন করিলেন—'ছবি ওৎরাবে এ জামিন তুমি দিচ্ছ?'

মাথা নাড়িয়া সোমনাথ বলিল—'না। ছবি ওৎরাবে এ জামিন ভগবানও দিতে পারেন না। তবে ছবি ভাল হবে এ জামিন দিচ্ছি। রুসিবাবা, আমি নাটক লিখতে জানি না বটে, কিন্তু ভাল নাটক দেখলে চিনতে পারি। এ নাটক যত্ন ক'রে তৈরি করতে পারলে এমন জিনিস হবে যা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে হয়নি।'

রুস্তমজি দীর্ঘকাল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন, তারপর উঠিয়া আসিয়া সোমনাথের কাঁধের উপর হাত রাখিলেন; বলিলেন—'সোমনাথ, তুমিই ছবি কর। তোমার সিতারা এখন বুলন্দ্‌, হয়তো লেগে যেতে পারে। সিনেমা মানেই তো জুয়া খেলা—লাগে তাক্‌ না লাগে তুক্‌। যা হবার হবে, আর ভাবতে পারি না। আমার ভাবনার ভার তুমি নাও।' সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'সব ভার আমি নেব।—কিন্তু চক্রধর?'

'ওটাকে আজই দূর করে দিচ্ছি। তোমার যাকে পছন্দ তুমি নাও, গল্প যেমন ইচ্ছে রাখো; কেউ তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আমার শুধু ভালো ছবি চাই।'

সোমনাথ আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। এতক্ষণ সে মনে বেশ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অনুভব করিতেছিল, এখন দায়িত্ব ঘাড়ে লইবার পর সহসা তাহার মনে হইল সে একান্ত অসহায়। বিরাট পর্বতপ্রমাণ কাজের ভার সে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়াছে অথচ এ কাজের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা তাহার নাই, একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী পর্যন্ত নাই। সিনেমা জগতে কাজের লোক কাহাকেও সে চেনে না। এত বড় কাজ হাতে লইয়া শেষে কি ভরা-ডুবি করিবে! ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল!

রুস্তমজি বলিলেন—'কি ভাবছ? তোমার বর্তমান কন্‌ট্রাক্ট অবশ্য থাকবে না, নতুন কন্‌ট্রাক্ট হবে। তুমি যা চাও তাই দেব।'

সোমনাথ বলিল--'না, আমার আর কিছু চাই না, যা দিচ্ছেন তাই যথেষ্ট।'

রুস্তমজি বলিলেন—'তা হতে পারে না। নতুন কন্‌ট্রাক্টে তুমি এখন যা পাচ্ছ তাই পাবে, উপরন্তু ছবি থেকে যদি লাভ হয়, লাভের অর্ধেক তোমার। কেমন—রাজি?'

সোমনাথ বলিল—'রুসিবাবা, নিজের কথা আমি ভাবছি না। আপনার যা ইচ্ছে দেবেন, আমার কোনও দাবি নেই। আমি ভাবছি—'

এই সময় তাহার অনুক্ত ভাবনার উত্তর স্বরূপ দ্বারে টোকা পড়িল। রুস্তমজি দ্বার খুলিয়া দিলেন।

পান্ডুরঙ্‌ ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাব।—'হুজুর, গোস্তাকি মাফ করবেন। ফাউণ্টেন পেনের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। চন্দনা দেবীর

হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভেঙে দিয়ে এসেছি। এবার আমার একটা ব্যবস্থা করুন।'

রুস্তমজি হাসিয়া বলিলেন—'আমি কিছু পারব না। তোমাকে যে চাকরি দিতে পারে সে ঐ।' বলিয়া সোমনাথকে দেখাইলেন।

সোমনাথ ছুটিয়া আসিয়া পাণ্ডুরঙকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—'পাণ্ডু, তুমি এসেছ! বাঁচলাম।'

সেদিন অপরাহ্ণে নূতন চুক্তি-পত্র সোমনাথের দ্বারা সহি করাইতে আসিয়া দিগম্বর শম্ভুলিংগ বলিলেন—'আপনার কপাল বটে–এবেলা ওবেলা উন্নতি। আর আমি এগারো বছর ধ'রে—' বলিয়া তিন্তিড়ীর ন্যায় অম্ল-করুণ হাসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্দাক্রান্তা

এক

তোড়জোড় করিয়া ছবি আরম্ভ করিতে বর্ষা নামিল।

বোম্বাই বর্ষা—একেবারে চাতুর্মাস্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন মেঘগুলা পশ্চিমের সমুদ্র হইতে আরব্য উপন্যাসের জিনের মত উঠিয়া আসে এবং কয়েকদিন ঘোরাফেরা করিয়া বর্ষণের কিছু নমুনা দিয়া চলিয়া যায়। অতঃপর দিন দশেক পরে তাহারা দলে দলে পালে পালে ফিরিয়া আসিয়া সেই যে আসর জমকাইয়া বসে তখন তিন মাসের মধ্যে আর সূর্যের মুখ দেখিবার উপায় থাকে না। দিনগুলোকে তখন রাত্রির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে হয় এবং জল ও স্থলের প্রভেদ এতই অকিঞ্চিৎ-কর হইয়া যায় যে মানুষগুলোকে জলচর জীব বলিয়া মানিয়া লইতে আর কোনই কষ্ট হয় না।

কবি বলিয়াছেন—এমন দিনে তারে বলা যায়। কবির কথা মিথ্যা নয়, উপযুক্ত পাত্রপাত্রী পাইলে নিশ্চয় বলা যায়; একবার নয়, বারবার বলা যায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে ইনাইয়া বিনাইয়া বলা যায়; কিন্তু বলা ছাড়া আর কোনও উদ্যম-সাপেক্ষ কাজ করিবার ইচ্ছা বোধকরি কাহারও মনে উদয় হয় না। দেহ মনের এমন একটি আলস্যমন্থর জড়তা উপস্থিত হয় যে কবির শরণাপন্ন না হইয়াও বলিতে

ইচ্ছা করে—সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।

এই তো গেল আটপৌরে ব্যবস্থা। তার উপর মাঝে মাঝে যখন সাইক্লোন আসিয়া উপস্থিত হয় তখন বর্ষার ঢিলা আসর এক মুহূর্তে জমাট বাঁধিয়া যায়। তখন মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাতাস চৌদুনে ছুটিতে থাকে, দিগঙ্গনার নৃত্যে সভাতল আলোড়িত হইয়া ওঠে এবং আকাশের মৃদঙ্গ হইতে যে বোল্ উত্থিত হইতে থাকে তাহাকে কোনও মতেই ধামার বা দশকুশীর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

কিন্তু ইহা যেমন আকস্মিক তেমনি ক্ষণিক। আবার ধীরে ধীরে সভা ঝিমাইয়া পড়ে; ঝিল্লীরব শোনা যায়; কেতকীর গন্ধবিমূঢ় বাতাস নেশায় ঝিম্ হইয়া থাকে।

এদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে; জড় জগতে অণু পরমাণুও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সুতরাং মানুষকেও কিছু-না-কিছু করিতে হয়; কিন্তু সব কাজই মন্দাক্রান্তা ছন্দে বাঁধা, গুরুগম্ভীর মন্থরতায় আরম্ভ হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে চলিবার পর আবার শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়ে। পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল—

যাহোক, সোমনাথের কাজ একরকম ভালই চলিতেছিল। তাহার নূতন কাজে হাতেখড়ি, তাই সে আট ঘাট বাঁধিয়া কাজে নামিয়াছিল। পান্ডুরঙের সহিত সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া সে কাজ করিত, পান্ডুরঙ্ ছিল তার দক্ষিণ হস্ত। তা ছাড়া ইন্দুবাবু প্রায়ই সেটে আসিয়া বসিতেন এবং কালোপযোগী উপদেশ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। রুস্তমজি কদাচিৎ আসিয়া বসিতেন এবং নীরবে তাহাদের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেন। রুস্তমজির একটি মহৎ গুণ ছিল, একবার যাহার হাতে কার্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাহার কার্যে আর হস্তক্ষেপ করিতেন না।

সোমনাথ মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবার ছবির খরচ সে কিছুতেই দেড় লক্ষ টাকার উপরে উঠিতে দিবে না। রুস্তমজি অবশ্য আড়াই লক্ষ পর্যন্ত খরচ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সোমনাথ লক্ষ্য করিয়াছিল, ছবি নির্মাণ ব্যাপারে অনেক অনাবশ্যক খরচ হয়, অনেক টাকা—ন দেবায় ন ধর্মায়—যায়। এবার সে কিছুতেই তাহা ঘটিতে দিবে না। তাহার ছবি ভাল হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল; কিন্তু ভাল হইলেই ছবি চলিবে এমন কোনও কথা নাই। তাই খরচ যদি কম হয় তাহা হইলে লোকসানের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। লাভ যদি নাও হয়, অন্তত খরচটা উঠিয়া আসিতে পারে।

অত্যন্ত সতর্কভাবে সদা শঙ্কিতচিত্তে সোমনাথ কাজ করিয়া চলিল। মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে অতি সঙ্গোপনে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—হে ভগবান, আমি অতি অধম, কিন্তু যদি এতবড় সুযোগটা দিয়াছ, মাথায় পা দিয়া ডুবাইয়া দিও না।

এদিকে সোমনাথের পারিবারিক পরিস্থিতিতেও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জামাইবাবু হঠাৎ পুণায় বদ্‌লি হইলেন; ঘোর বর্ষার মধ্যে তিনি দিদিকে লইয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু বাড়িখানা ছাড়া হইল না। কারণ জামাই-বাবুর আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া সোমনাথের একটা আস্তানা চাই। সোমনাথ ভরা ভাদরে শূন্য মন্দিরে পড়িয়া রহিল।

মাঝে মাঝে পান্ডুরঙ্ আসিয়া তাহার বাসায় রাত্রিবাস করিয়া যাইত। দুই বন্ধু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছবির কথা আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তারপর সকালবেলা আবার একসঙ্গে কাজে বাহির হইত। রুস্তমজি সোমনাথকে একটি দ্বিতীয় পক্ষের মোটর কিনাইয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন হইলেও গাড়িটি বেশ কর্মক্ষম, এই ভরা বর্ষার মরসুমে ভারি কাজে লাগিতেছিল।

এই সময় সোমনাথের আর একটি উপসর্গ জুটিয়াছিল। এতদিন তাহার জীবনে চিঠি লেখালেখির কোন পাট ছিল না; এখন চারিদিক হইতে তাহার কাছে চিঠি

আসিতে আরম্ভ করিল। অধিকাংশ পত্রলেখকই অচেনা, কিন্তু দু'চারজন পরিচিত ব্যক্তিও আছেন। সোমনাথ বুঝিল তাহার প্রথম চিত্র সাধারণে প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে তাহার কীর্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অপরিচিত পত্র-লেখকগণ—তাঁহাদের মধ্যে তরুণীর সংখ্যা কম নয়—কেবল অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা আবার আর একটু দূরে গিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতায় সোমনাথের পরিচিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, এতদিন তাঁহারা তাহার খোঁজখবর লওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কিন্তু এখন কোনও অলৌকিক উপায়ে তাহার ঠিকানা আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা পত্রাঘাত করিতে শুরু করিলেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা ছাপাইয়া একটি ইঙ্গিত কিন্তু খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল; সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তাঁহারাও সিনেমায় যোগ দিয়া অবিনশ্বর কীর্তি অর্জন করিতে প্রস্তুত আছেন। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। তিনি সোমনাথের কলিকাতাস্থ ব্যাঙ্কের একজন কেরানী, শীঘ্রই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। যৌবনকালে তিনি সখের থিয়েটার করিতেন; এই ওজুহাতে তিনি সোমনাথকে ধরিয়া পড়িয়াছেন, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সোমনাথ তাঁহাকে সিনেমায় টানিয়া লয়। ভদ্রলোক একেবারে নাছোড়বান্দা।

এই সব অপ্রত্যাশিত পত্রবৃষ্টির ফলে সোমনাথ প্রথমটা কিছু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে পাণ্ডুরঙের উপদেশ পাইয়া ধাতস্থ হইল। পাণ্ডুরঙ বলিল—সিনেমায় সিদ্ধিলাভের ইহা একটি অনিবার্য পরিণাম এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে হইলে পত্রগুলির উত্তর না দেওয়াই সমীচীন। চিঠি লেখার অভ্যাস সোমনাথের কোনকালেই ছিল না, সে পরম আগ্রহের সহিত পাণ্ডুরঙের সারগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করিল।

কেবল একখানি চিঠি পড়িয়া সোমনাথ কিছু বিমনা হইল। কলিকাতা হইতে তাহার এক সমবয়স্ক বন্ধু লিখিয়াছে, বন্ধুটি আবার দূর সম্পর্কে জামাইবাবুর আত্মীয় হয়। বেচারা স্কুলের শিক্ষক, চিত্রাভিনেতা সাজিবার দুরভিসন্ধি তাহার নাই; নিতান্তই বন্ধুপ্রীতির বশবর্তী হইয়া চিঠি লিখিয়াছে। চিঠিখানি অংশতঃ এইরূপ—

'—ছবিটা চমৎকার হয়েছে; কলকাতার লোক হুমড়ি খেয়ে দেখছে। চন্দনা দেবীর ছবি অবশ্য জনপ্রিয় হয়, কিন্তু হিন্দী ছবি বাঙালীরা বেশী দেখে না। এবার বাঙালীরাও দেখছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, তুমি বাঙালী এবং তোমার অভিনয় সুন্দর হয়েছে। ছবিখানা বার তিনেক দেখেছি।

'একটা খবর দিই। যে তিন দিন আমি তোমার ছবি দেখতে গিয়েছিলাম সেই তিনদিনই রত্নাকে সিনেমায় দেখলাম; সেও ছবি দেখতে গিয়েছিল। রত্না সিনেমা পছন্দ করে না জানতাম। ব্যাপার কি? শুনলাম কিছুদিন আগে সে বোম্বাই গিয়েছিল। এর ভেতরে কোনও নতুন তত্ত্ব আছে নাকি? যদি থাকে, ইতর জনের দাবী এখন থেকে জানিয়ে রাখছি—'

বন্ধুসুলভ চটুলতা বাদ দিয়া খবরটা দাঁড়ায়—রত্না তিনবার তাহার ছবি দেখিতে গিয়াছিল; তিন বারের বেশীও হইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই, কেন গিয়াছিল? খুব বেশী ভাল না লাগিলে একই ছবি কেহ তিনবার দেখে না। রত্না স্বভাবতই সিনেমার প্রতি বিরূপ; তার উপর সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে সে সহসা সিনেমার অনুরাগিণী হইয়া পড়িবে এরূপ মনে করাও কঠিন। সোমনাথের প্রতি তাহার মন সদয় নয়। তবে, যে ছবিতে সোমনাথ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ছবি বারবার দেখিবার অর্থ কি? ছবিতে এমন কী অনিবার্য আকর্ষণ আছে যে রত্না না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছে না?

অনেক চিন্তা করিয়া সোমনাথ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পর-চিত্ত

অন্ধকার; উপরন্তু রমণীর মন চিরদিনই গভীর রহস্যে আবৃত। সোমনাথ বিমর্ষচিত্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, রত্নার ছবি দেখার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা তাহার কর্ম নয়।

দুই

কয়েকদিন ধরিয়া কোলাবা'র আবহ-মন্দির হইতে ভবিষ্যদ্‌বাণী হইতে ছিল—আরব সাগরের বায়ুমণ্ডলে সাম্য নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই একটা ঝড়ঝাপ্‌টা আশা করা যাইতে পারে। এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী নিয়মিত আবহ-মন্দির হইতে বাহির হইয়া থাকে এবং সংবাদপত্রে ছাপা নয়; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে এরূপ নজির না থাকায় কেহই উহা গ্রাহ্য করে না।

যাহোক, ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে। আবহবার্তা তিন দিনের বাসি হইয়া যাইবার পর একদিন অপরাহ্ণের দিকে একটা এলোমেলো বাতাস উঠিল। বৃষ্টি সারাদিন ধরিয়াই পড়িতেছিল, এখন যেন আর একটু চাপিয়া আসিল। ক্রমে যতই সন্ধ্যা হইতে লাগিল ততই অলক্ষিতে বায়ুর বেগ বাড়িয়া চলিল।

সারাদিন স্টুডিওতে সোমনাথের শুটিং ছিল। সন্ধ্যা ছ'টার সময় কাজ শেষ করিয়া সে বাহির হইল। পাণ্ডুরঙ্‌কে বলিল—'চল, আজ রাত্রে আমার বাসায় থাকবে।'

পাণ্ডুরঙ্‌ বলিল—'উহুঁ। আকাশের গতিক ভাল নয়, রাত্রে সাইক্লোন দাঁড়াতে পারে। আমার বৌটা খাণ্ডার, আজ রাত্রে যদি বাড়ি না ফিরি কাল আর আমাকে আস্ত রাখবে না।'

সোমনাথ বলিল—'বেশ, চল তাহলে তোমাকে বাসায় পেঁছে দিয়ে যাই।'

পাণ্ডুরঙ্‌কে বাসায় পেঁছাইয়া সোমনাথ যখন নিজের বাসায় ফিরিল তখন দিনের আলো আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। বায়ুর বেগ আর একটু বাড়িয়াছে। রাস্তায় গাড়ি ও মানুষের চলাচল অনেক কমিয়া গিয়াছে। কেবল রাস্তার আলোকস্তম্ভগুলি অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া ধারাস্নান করিতেছে।

গ্যারাজে মোটর বন্ধ করিয়া সোমনাথ তাড়াতাড়ি বাড়ির বারান্দায় আসিয়া উঠিল। বারান্দা অন্ধকার; জলের ছাট্‌ আসিয়া মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। সদর দরজার তালা বন্ধ ছিল; সোমনাথ পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সন্তর্পণে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

তালা খুলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ আসিল—'সোমনাথবাবু!'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার চক্ষু অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়াছিল; রাস্তা হইতে আলোর একটা ক্ষীণ আভাও আসিতেছিল। সোমনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, দ্বারের অনতিদূরে বারান্দার দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি স্ত্রীলোক সুট্‌কেসের উপর বসিয়া আছে। তাহার পাশে বর্ষাতি হোলড্‌অলের মত একটা কিছু পড়িয়া রহিয়াছে।

সোমনাথ শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—'কে?'

স্ত্রী মূর্তি উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি রত্না।'

মুহূর্তের জন্য সোমনাথের মাথাটা একেবারে খালি হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'রত্না!'

অন্ধকারে রত্নার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু তাহার কণ্ঠের তীক্ষ্ন অধীরতা গোপন

রহিল না—'হ্যাঁ। ব্যাপার কি? দাদা—বৌদি কোথায়?'

সোমনাথের মস্তিষ্ক আবার ইঞ্জিনের বেগে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। সে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কয়েকটা সুইচ টিপিয়া ঘরের ও বারান্দার আলো জ্বালিয়া দিল। তারপর আবার বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

রত্নার কাপড়-চোপড় বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টিতে শুষ্ক বিরক্তি। ক্ষিপ্র চক্ষে একবার সোমনাথের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া সে বলিল—'দাদা বৌদি কোথায়?'

সোমনাথ দুই হাতে রত্নার সুটকেস ও বিছানা তুলিয়া বলিল—'বলছি, আগে ভেতরে এস! একেবারে ভিজে গেছ যে। কতক্ষণ এসে বসে আছো?'

উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রত্না বলিল—'তিনটের সময় ট্রেন এসেছে; বাড়ি পৌঁছুতে চারটে বেজেছে। তারপর থেকেই বসে আছি।'

'কি সর্বনাশ! তিন ঘণ্টা বাইরে বসে আছ?'—সোমনাথ লটবহর এক পাশে নামাইয়া রাখিল।

'হ্যাঁ; কিন্তু দাদা বৌদি কি বোম্বাইয়ে নেই?'

'জামাইবাবু আজ দশ দিন হল পুণায় বদলি হয়ে গেছেন। কেন, তোমরা খবর পাওনি?'

রত্না কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠা ভরা চোখে সোমনাথের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—'না, আমি খবর পাইনি। আমি কলকাতায় ছিলাম না, এলাহাবাদে এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেছিলাম। সেখান থেকে আসছি।—তাহলে এখন তুমি একা বাড়িতে আছো?'

সোমনাথ বলিল—'হ্যাঁ।'

নতমুখে ক্ষণিক চিন্তা করিয়া রত্না মুখ তুলিল—'বাড়িতে চাকর-বাকরও কি নেই?'

সোমনাথ বলিল—'চাকর-বাকর? হ্যাঁ আছে বৈকি। একটা চাকর আর বামুন আছে। আমি সকালবেলাই বেরিয়ে যাই, তারাও খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা বেরোয়; কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসে। আজ কি জানি এখনও ফেরেনি। ওঃ—মনে পড়েছে—'

'কী?'

'আজ সকালে ওরা দু'জনে যোগেশ্বরীর গুহা দেখতে যাবে বলে ছুটি চেয়েছিল, সেখানে নাকি কোন্ সাধু এসেছেন। যোগেশ্বরী বেশী দূর নয়, কিন্তু ট্রেনে যেতে হয়। হয়তো ঝড়-বাদলে আটকে পড়েছে।'

'বেশ যা হোক। এখন আমি কি করি?' বলিয়া রত্না একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সোমনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'আপাতত ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলতে পারো।'

বিরক্তি-কণ্টকিত কণ্ঠে রত্না বলিল—'তা যেন পারি; কিন্তু আজ রাত্রে আমি থাকব কোথায়?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ রত্নার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল—'এ বাড়িতে থাকা কি চলবে না?'

রত্না উত্তর দিল না, গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। এমন মুশকিলে সে জীবনে পড়ে নাই।

সদর দরজাটা এতক্ষণ খোলাই ছিল, হাওয়ার দাপটে কপাট দুটা বারবার আছাড় খাইতেছিল। সোমনাথ গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলে রত্না মুখ তুলিল—'আজ রাত্রে পুণার ট্রেন পাওয়া যায় না?—পুণা তো কাছেই।'

সোমনাথ ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিল, নীরস কণ্ঠে বলিল—'পুণা এখান

থেকে একশো কুড়ি মাইল। ট্রেন যদি বা পাওয়া যায়, পৌঁছতে রাত দুপুর হবে। জামাইবাবুর ঠিকানা তোমায় দিতে পারি, কিন্তু এই ঝড়ের রাত্রে বাড়ি খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটাতে হবে। তোমার যদি তাতেই সুবিধে হয়—'

রত্না নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—'কাল সকালেই যাব তা হলে। কি শুভক্ষণেই বোম্বাইয়ে পা দিয়েছিলাম।' বলিয়া নিজের সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া স্নানঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল।

সোমনাথ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর সেও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়িতে অতিথি, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

আজ বারান্দায় রত্নাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষণকালের জন্য সোমনাথের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; তারপর বাঁধ-ভাঙা স্রোতের মত তাহার মনের মধ্যে অহেতুক আনন্দের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহাও ক্ষণকালের জন্য। রত্নার মুখের ভাব ও তাহার কথা বলার ভঙ্গী তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল যে সোমনাথ রত্নার দাদার শ্যালক এবং রত্না সোমনাথের দিদির ননদ; ইহার অধিক সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে নাই। মাঝে একটা নূতন সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রত্না তাহা এতই রূঢ়ভাবে ভাঙিয়া দিয়াছে যে তাহা স্মরণ করিতেও মন সংকুচিত হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল লৌকিক সম্বন্ধটুকু বজায় রাখিয়া চলাই ভাল; রত্না খবর না দিয়া এবং খবর না লইয়া বোম্বাই উপস্থিত হইয়া যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে তাহা যথাসম্ভব সহজ ও মামুলি করিয়া আনাই সোমনাথের কর্তব্য। অতীত প্রত্যাখ্যানের কাঁটা বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে করুক, বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না।

তিন

আধ ঘণ্টা পরে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া, রত্না স্নানঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল টেবিলের উপর এক পট্ চা এবং প্লেটের উপর রাশীকৃত পাঁউরুটি ও মাখন রহিয়াছে। রত্না একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—'এ কি, চাকর বামুন ফিরে এসেছে নাকি?'

সোমনাথ বলিল—'না; কিন্তু তাদের ভরসায় থাকলে আজ আর কিছু জুটবে না। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। নাও, আরম্ভ করে দাও।' বলিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

রত্নার মুখে একটু হাসি ফুটিল।

'তুমি আজকাল ঘরকন্নার কাজ খুব শিখেছ দেখছি!'

সোমনাথ চায়ের পেয়ালা তাহাকে দিয়া ঈষৎ গর্বের সহিত বলিল—'ঘরকন্নার কাজ আমি অনেকদিন থেকে জানি। খেয়ে দ্যাখো চা ঠিক হয়েছে কিনা।'

রত্না পেয়ালার প্রান্তে একবার ঠোঁট ঠেকাইয়া বলিল—'মন্দ হয়নি।' তাহার স্বর নিরুৎসুক।

দু'জনেরই বিলক্ষণ পেট জ্বলিতেছিল, সেই দুপুরবেলার পর আর কিছু পেটে পড়ে নাই। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া উভয়ে চা ও মাখন পাঁউরুটিতে মনোনিবেশ করিল। ক্ষুন্নিবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে দু' একটা কথা হইতে লাগিল—

'কলকাতার খবর কি?'

'ভালই।'

'তুমি কোন্ কলেজে ভর্তি হলে?'

'ভর্তি হইনি। তোমার কেমন চলছে?'

'মন্দ নয়। চন্দনাদের কোম্পানী ছেড়ে দিয়েছি, শুনেছ বোধহয়।'

'না—শুনিনি। এখন কোথায় কাজ করছ?'

'এখন নিজে ছবি তৈরি করছি।'

'ও।'.........

'আর চা নেবে? এখনও অনেকখানি আছে।'

'দাও।'

বাহিরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু ঘরের ভিতরটি শান্ত, কোনও চাঞ্চল্য নাই। দুইটি উদাসীন যুবক-যুবতী চা পান করিতেছে ও ছাড়া ছাড়া গল্প করিতেছে। তাহারা যেন এরোপ্লেনে চড়িয়া চলিয়াছে, বাহিরের প্রচণ্ড গতিবেগ ভিতরে অনুভব করা যায় না। যাত্রীদের মনে হয় তাহারা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

'লেখাপড়া কি ছেড়ে দিলে?'

'না। এবার কলেজে জায়গা পেলাম না।'

'ও। তোমাকে এবার একটু রোগা দেখাচ্ছে।'

'তা হবে। তোমার স্বাস্থ্য তো ভালই দেখছি।'

'হ্যাঁ। খাট্‌লে খুট্‌লে শরীর বেশ ভাল থাকে।'

'সত্যি। তার ওপর যদি মনের মত কাজ হয়।'

সোমনাথ একটু ফিকা হাসিল। কাজ মনের মত কিনা এ কথা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই।

চায়ের পর্ব শেষ হইলে রত্না বলিল—'এখনকার মত তো হল; কিন্তু রাত্তিরের কি ব্যবস্থা হবে?'

সোমনাথ বলিল—'সে তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হবে কি করে? বামুনের তো দেখা নেই।'

'তা হোক, হয়ে যাবে।'

রত্না ভ্রূ তুলিল—'তুমি রাঁধবে নাকি?'

'আমি কি রাঁধতে জানি না? খুব ভাল রাঁধতে জানি। খেয়ে দেখলে বুঝবে।'

'দরকার নেই আমার। বোম্বাই এসে অবধি অনেক দুর্গতি হয়েছে, তার ওপর তোমার রান্না সহ্য হবে না।' বলিয়া রত্না ভাঁড়ার ঘর তদারক করিতে গেল।

সোমনাথ ক্ষুণ্ণভাবে সিগারেট ধরাইল। কিছুক্ষণ পরে রত্না ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'খিচুড়ি আর ডিম ভাজা ছাড়া আর কিছু হবে না। শুধু চাল ডাল আর ডিম আছে।'

সোমনাথ বলিল—'আমার ভাঁড়ারের দৈন্য দেখে লজ্জা পেলাম। অবশ্য খিচুড়ি আর ডিম ভাজা আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমারই কষ্ট হবে।'

রত্না বলিল—'তা হোক। আমি কিছু মনে করব না।'

'সে তোমার মহত্ত্ব; কিন্তু রান্নাটা আমি করলেই ভাল হত। ভেবে দ্যাখো তুমি আমার অতিথি। তুমি রাঁধবে আর আমি খাব—এ যে বড় লজ্জার কথা।'

'আমি কাউকে বলব না।'

সোমনাথ বসিয়া রহিল; রত্না আঁচলটা গাছ-কোমর করিয়া জড়াইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

উনান ধরানোর কোনও হাঙ্গামা ছিল না, রান্নাঘরে গ্যাসের উনান। রত্না ক্ষিপ্রহস্তে যোগাড়যন্ত্র করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

রাত্রি দশটার সময় বসিবার ঘরের একটা সোফায় যথাসম্ভব লম্বা হইয়া শুইয়া সোমনাথ মুদিত চক্ষে ঝড়ের শব্দ শুনিতেছিল। বাহিরে বাতাসের মত্ততা বাড়িয়াই চলিয়াছে; মাঝে মাঝে তাহার উন্মত্ত পাক্‌সাটে বাড়িখানা মড় মড় করিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম দিক হইতে একটা গভীর একটানা গর্জন বাড়ির বন্ধ দরজা জানালা ভেদ করিয়া কানে আসিতেছে।

রত্না আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

'বাঃ বেশ মানুষ! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

সোমনাথ উঠিয়া বসিল।

'ঘুমোই নি। চোখ বুজে ঝড়ের মনের কথাটা শোনবার চেষ্টা করছিলাম।'

রত্নার চোখে বিদ্রূপ খেলিয়া গেল—'তাই নাকি? তা কী শুনলে?'

'এলোমেলো কথা, ভাল বুঝতে পারলাম না।'

'তাহলে এবার খাবে চল। খাবার তৈরি।'

দুজনে গিয়া খাইতে বসিল। তপ্ত খিচুড়ির ঘ্রাণ নাকে যাইতেই সোমনাথের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু সে তৃপ্তির ভাব গোপন করিয়া বিচারকের ভঙ্গীতে চামচের আগায় একটু খিচুড়ি তুলিয়া মুখে দিল।

রত্না জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন হয়েছে খিচুড়ি?'

সোমনাথের এবার জবাব দিবার পালা, তাহার অধরে একটি চকিত হাসি খেলিয়া গেল। সে আর এক চামচ মুখে দিয়া গম্ভীরভাবে বিবেচনাপূর্বক বলিল—'মন্দ হয়নি।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, তারপর হাসিয়া ফেলিল। তাহারই মুখের কথা এতক্ষণ পরে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিল। সোমনাথ ভাবিতে লাগিল—রত্না এত ভাল রাঁধিতে শিখিল কেমন করিয়া? আজকালকার মেয়েরা তো লেখাপড়া লইয়া থাকে কিম্বা সিনেমা দেখে; রান্নাঘরের খোঁজ রাখে না। রত্না কোন্ ফাঁকে এমন রাঁধিতে শিখিল? অথবা মেয়েদের হাতে কোনও সহজাত ইন্দ্রজাল আছে, তাহারা স্পর্শ করিলেই অন্ন-ব্যঞ্জন সুস্বাদু হইয়া ওঠে? অথবা সোমনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বামুন ঠাকুরের রান্না গলাধঃকরণ করিতেছে, তাই আজ রত্নার নিরেস রান্নাও তাহার সরস মনে হইতেছে? কিম্বা—

'ঝড় আর কতক্ষণ চলবে?'

'ঠিক বলতে পারি না। শুনেছি পাঁচ-ছয় ঘণ্টার বেশী থাকে না।'

'ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে—ঐ যে গোঁ গোঁ শব্দ?'

'ওটা সমুদ্রের গর্জন।'

'ও—' রত্না সোমনাথের পানে একটা তির্যক কটাক্ষপাত করিল—

'তা—সমুদ্রের মনের কথা কিছু শুনতে পাচ্ছ নাকি?'

'পাচ্ছি।'

'সত্যি? কি শুনলে?'

সোমনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'রাগ আর ভালবাসা—ভালবাসা আর রাগ।'

ক্ষণেকের জন্য দুজনের চোখে চোখে বিদ্যুৎ বিনিময় হইয়া গেল, তারপর দুজনেই চক্ষু সরাইয়া লইল।

আহারান্তে বসিবার ঘরে আসিয়া সোমনাথ বলিল—'তোমার শোবার ঘরে বিছানা পেতে দিয়েছি।'

রত্না চোখ মেলিয়া সোমনাথের মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর

দ্রূকুটি করিল।

'তোমার বিছানা পাতবার দরকার ছিল না। আমি নিজেই পেতে নিতে পারতাম।'

সোমনাথ বলিল—'তা পারতে জানি; কিন্তু আমারও তো কিছু করা চাই। যাহোক, সাড়ে দশটা বেজে গেছে, তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। একে ট্রেনের ক্লান্তি, তার ওপরে রান্নার পরিশ্রম।'

রত্না আর কোনও কথা না বলিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। খাটের উপর বিছানা পাতা, বিছানার পদপ্রান্তে একটি গায়ের চাদর সযত্নে পাট করা। রত্নার হোল্ড্অলে একজোড়া বেড্ রুম শ্লিপার ছিল, সে দুটি খাটের নীচে রাখা রহিয়াছে।

রত্না কিয়ৎকাল শয্যার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর উষ্ণ-অধীর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাহিরে সমুদ্রের রাগমিশ্রিত ভালবাসার দুরন্ত আফ্সানি কিছুতেই শান্ত হইতেছে না—বাড়িখানা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

ক্লান্ত হইয়া অবশেষে রত্না আলো নিভাইয়া শুইতে গেল; কিন্তু ঘর বড় অন্ধকার, অন্ধকারে বাহিরের শব্দগুলো যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। রত্না ফিরিয়া আসিয়া আবার আলো জ্বালিল, তারপর আলো জ্বালিয়া রাখিয়াই চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল।

সোমনাথও নিজের ঘরে আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। বিছানাটি ভারি ঠাণ্ডা, একটা গায়ের কাপড় হইলে ভাল হইত; কিন্তু নিজের গায়ের কাপড়টি সে রত্নাকে দান করিয়াছে। যাহোক যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয়, বিছানার চাদর টানিয়া গায়ে দিলেই চলিবে।

রত্না না মনে করে—সোমনাথের কাছে সে অনাদৃতা হইয়াছে। সোমনাথ কোন অবস্থাতেই রত্নাকে অনাদর করিতে পারিবে না; কিন্তু রত্না আসিয়া পর্যন্ত বারবার তাহাকে আঘাত হানিতেছে কেন? পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল—এক সন্ধ্যার বর-বধূ অভিনয়—তাহার জন্য তো সোমনাথ দায়ী নয়। আর বর্তমানে জামাইবাবু পুণায় বদলি হইয়াছেন, ইহার জন্যই বা তাহাকে কি প্রকারে দোষী করা যাইতে পারে? কিন্তু সে যা-ই হোক রত্না যে এই রাত্রে ইস্টিশানে গিয়া বসিয়া থাকে নাই, সে যে এই শূন্য বাড়িতে তাহার সহিত একাকী কাটাইতে সম্মত হইয়াছে ইহাই ভাগ্য বলিতে হইবে।

আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের সুখের রাত্রি, না দুঃখের রাত্রি? ঝড়ের ঝাপ্টায় বাসা-ভাঙা পাখি যেমন অন্ধভাবে উড়িয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় লয়, রত্না তেমনি তাহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছে; আবার কাল সকালে ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে উড়িয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু তবু, সুখের হোক আর দুঃখের হোক আজিকার রাত্রিটা সোমনাথের চিরদিন মনে থাকিবে। রত্না যখন পরের ঘরণী হইয়া বহু দূরে চলিয়া যাইবে, আর তাহাকে বিরক্তভাবেও স্মরণ করিবে না, তখনও আজিকার রাত্রিটি সোমনাথের মনে জাগিয়া থাকিবে।

চার

রাত্রি তখন একটা কি দেড়টা।

সোমনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। অন্ধকারে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সোমনাথ অনুভব করিল, চারিদিকে ভীষণ খট্খট্ ঝন্ঝন্ শব্দ

হইতেছে; যেন একদল ডাকাত যুগপৎ বাড়ির দরজা জানালাগুলোকে আক্রমণ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

ঘুমের মধ্যে এই শব্দগুলো সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতেছিল, সুতরাং তাহার ঘুম ভাঙার কারণ এই শব্দগুলো নয়। সোমনাথ কান পাতিয়া শুনিল, ঝড়ের শব্দের সহিত মিশিয়া আর একটা শব্দ হইতেছে—কেহ তাহার দরজায় ধাক্কা দিতেছে; ইহা ঝড়ের ধাক্কা নয়, মানুষের হাতের ধাক্কা!

এক লাফে বিছানা হইতে নামিয়া অন্ধকারেই সে দরজা খুলিয়া দিল।

'রত্না?'

জলে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিবার পর মাথা জাগাইয়া মানুষ যেমন হাঁপাইয়া নিশ্বাস টানে তেমনি ভাবে হাঁপাইয়া রত্না বলিল—'হ্যাঁ। আলো নিভে গেছে।'

'আলো নিভে গেছে?'

দ্বারের পাশেই আলোর সুইচ। সোমনাথ হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিল, কিন্তু আলো জ্বলিল না। সে বলিল—'ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে গেছে।'

রত্নার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কী হবে? বাড়ি কি ভেঙে পড়বে?'

'না না, তুমি ভয় পেয়ো না। সাইক্লোনে বাড়ি ভাঙ্তে পারে না। রাস্তায় কোথাও গাছের ডাল ভেঙে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে দিয়েছে, তাই আলো নিভে গেছে।'

রত্না বলিল—'তুমি কোথায়? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া দু'জনে কিছুক্ষণ হাত্ড়াইল; তারপর হাতে হাত ঠেকিল। সোমনাথ হাত ধরিয়া রত্নাকে ঘরের ভিতরে আনিল। রত্না কতকটা যেন নিজ মনেই ভাঙা গলায় বলিল—'আলো জেলে ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ চারিদিকে মড়্মড়্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল—দেখি আলো নিভে গেছে—'

সোমনাথ অনুভব করিল রত্নার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা, অল্প অল্প কাঁপিতেছে। সে সাহস দিয়া বলিল—'হঠাৎ অন্ধকারে ঘুম ভেঙেছে বলে ভয় পেয়েছ, নইলে ভয়ের কিছু নেই। এবার আস্তে আস্তে ঝড়ের বেগ কমবে।'

'যদি বাড়ে?'

'আর বাড়তে পারে না।—তুমি দাঁড়াও, আমি দেশলাই আনি। আমার জামার পকেটেই আছে।'

অনিচ্ছা ভরে রত্না হাত ছাড়িয়া দিল। সোমনাথ শয়নের পূর্বে গায়ের জামা খুলিয়া আল্নায় টাঙাইয়া রাখিয়াছিল, এখন ঠাহর করিয়া গিয়া জামাটা পাইয়া পরিয়া ফেলিল। তারপর পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল।

অমনি রত্না ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। দেশলায়ের আলোতে রত্নাকে দেখিয়া সোমনাথের বুকের ভিতরটা চমকিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই; গায়ে বিস্রস্ত বসনের উপর চাদরটা কোনও মতে জড়ানো। এ রত্না যেন তাহার পরিচিত আত্মপ্রতিষ্ঠ অচপল রত্না নয়; প্রকৃতির ভয়ঙ্কর প্রলয় মূর্তির সম্মুখে একান্ত অসহায় এক মানবী। প্রকৃতির বিরাট শক্তি দেখিয়া মানুষ কেবল অভিভূতই হয় না, নিজের অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রতাও অনুভব করে। তখন তাহার সঙ্কুচিত সত্তার অঙ্গ হইতে দর্পের আভরণও খসিয়া পড়িয়া যায়।

সোমনাথের ইচ্ছা হইল রত্নাকে ভীত শিশুর মত বুকে জড়াইয়া সান্ত্বনা দান করে; কিন্তু সে-ইচ্ছা দমন করিয়া সে একটু আশ্বাসজনক হাসি হাসিবার চেষ্টা করিল।

'অন্য সময় মনে হয় না যে দেশলায়ের কাঠিতে এত আলো হয়। কাঠি কিন্তু বেশী নেই—'

'অ্যাঁ! কি হবে তাহলে?' বলিতে বলিতে কাঠি নিভিয়া গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বালিয়া সোমনাথ বলিল—'তুমি এখানে এসে বোসো'—বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

'মোমবাতি নেই?'

'যতদূর জানি নেই। তবে মনে হচ্ছে একটা টর্চ আছে। তুমি যদি একটু একলা থাকো, আমি খুঁজে দেখতে পারি; বোধহয় দিদির ঘরে আছে।'

শঙ্কা-বিলম্বিতকণ্ঠে রত্না বলিল—'আচ্ছা, বেশী দেরি কোরো না।'

কয়েক মিনিট রত্না অন্ধকারে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, তারপর সোমনাথের ফিরিয়া আসার পদশব্দ শুনিতে পাইল।

'পেলে?'

উত্তরে সোমনাথ দপ্ করিয়া রত্নার মুখের উপর টর্চ জ্বালিয়া ধরিল। টর্চের আলো খুব উজ্জ্বল, প্রায় সাধারণ বিদ্যুৎ-বাতির সমান। সোমনাথ হাসিয়া বলিল—'এই নাও আলো। আর ভয় করছে না তো?'

রত্না আলোর দিক হইতে চোখ সরাইয়া লইয়া এবার ঘরের চারিদিকে তাকাইল। টর্চের ছটার বাহিরেও ঘরটি আলোকিত হইয়াছে। রত্নার অধরোষ্ঠ একবার কাঁপিয়া উঠিল, সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'না, ভয় আর করছে না—তবে—'

'তবে?' বলিয়া জ্বলন্ত টর্চটি শয্যার ওপর রাখিয়া সোমনাথ একপাশে বসিল।

রত্না একবার তাহার পানে তাকাইল, তারপর হঠাৎ বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্ত্রীজাতির স্নায়বিক বিপর্যয় সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না; কিন্তু সে বুঝিল, ইহা ভয়ের কান্না নয়, ভয়-ত্রাণের কান্না। হয়তো সেই সঙ্গে নিবিড়তর কোনও মনস্তত্ত্ব মিশিয়াছিল, হয়তো লজ্জা বা পশ্চাত্তাপের আগুনে হৃদয়ের অবরুদ্ধ বাষ্প উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা নির্ণয় করিবার মত বিশ্লেষণী শক্তি সোমনাথের ছিল না। তাহার হৃদয় স্নেহে ও করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। সে রত্নার পিঠের উপর হাত রাখিয়া ডাকিল—'রত্না—কেঁদোনা লক্ষ্মীটি—রত্না—'

রত্নার কান্না কিন্তু থামিল না।

মিনিট পনেরো পরে রত্নার ফোঁপানি যখন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখন সোমনাথ হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—'রত্না, এস এক কাজ করা যাক।'

রত্না চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। চোখের জলে ভিজিয়া মুখখানি আরও নরম হইয়াছে; সে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—'কী?'

সোমনাথ বলিল—'এস চা তৈরি করে খাওয়া যাক। ভারি মজা হবে কিন্তু। খাবে?'

রত্না ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সোমনাথ খাট হইতে নামিয়া বলিল—'আচ্ছা, তুমি তাহলে বোসো আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা তৈরি করে আনছি।'

রত্নাও খাট হইতে নামিল।

'না, আমি চা তৈরি করব।'

'বেশ, দুজনেই তৈরি করিগে চল। একলা ঘরে বসে থাকার চেয়ে সে বরং ভাল হবে।'

দুজনে রান্নাঘরে গিয়া টর্চের আলোতে চা তৈয়ার করিল, তারপর চায়ের বাটি হাতে আবার খাটে আসিয়া বসিল।

সোমনাথ এক চুমুক চা খাইয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—'বাঃ, কি সুন্দর চা

হয়েছে। তোমার ভাল লাগছে না?'

রত্না মৃদুস্বরে বলিল—'খুব ভাল লাগছে।'

প্রতি চুমুকের সঙ্গে চায়ের আতপ্ত মাধুর্য তাদের স্নায়ু শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

সোমনাথ ভারি উৎসাহ অনুভব করিতে লাগিল। সে উঠিয়া টর্চটাকে খাটের ছত্রিতে ঝুলাইয়া দিল, টর্চের আলো শূন্য হইতে চন্দ্র কিরণের মত শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িল।

রত্নার মুখখানি শান্ত। সে সহজকণ্ঠে বলিল—'তুমি চায়ের সঙ্গে সিগারেট খাও না?'

'খাই—চায়ের সঙ্গে সিগারেট জমে ভাল।'

'তবে খাচ্ছ না কেন?'

'খাবো?'

'খাও।'

সোমনাথের মনও মাধুর্যে ভরিয়া উঠিল। সে সিগারেট ধরাইল।

চা খাওয়া শেষ হইলে রত্না খাটের শিয়রের দিকে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। সোমনাথ বলিল—'রত্না, শুনতে পাচ্ছ, ঝড়ের শব্দ ক্রমে এগিয়ে আসছে?'

রত্না বলিল—'হুঁ।'

'এদিকে দুটো বেজে গেছে। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে।'

রত্না চোখ বুজিয়া বলিল—'হুঁ।'

'যাই বল, আজকের রাত্তিরটা মনে রাখবার মত। মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল।—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

মুদিতচক্ষে রত্না বলিল—'না, তুমি কথা বল আমি শুনি।'

সোমনাথ এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলিতেছিল, এখন আবার আত্ম-সচেতন হইয়া পড়িল। কথা বলিতে হইবে মনে হইলেই আর কথা যোগায় না। রত্নার শুনিতে ভাল লাগে এমন কী কথা সে বলিবে?

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিবে? ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা? কিম্বা—শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিভেছে সবে, জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে? কিন্তু না, রত্নাকে কবিতা শোনানো বর্তমান ক্ষেত্রে উচিত হইবে না, রত্না এরূপ আচরণের কদর্থ করিতে পারে। তবে এখন সে কি কথা বলিবে?

একটা কথা বলা যাইতে পারে, রত্না নিশ্চয় কিছু মনে করিবে না। সোমনাথ মনে মনে একটু ভণিতা করিয়া লইয়া বলিল—'আমার প্রথম ছবিটা বাজারে বেরিয়েছে—বেশ নাম হয়েছে।'

রত্না নীরব রহিল। সোমনাথ তখন সাহস করিয়া বলিল—'কলকাতাতেও ছবিটা চলছে। তুমি—তুমি দেখেছ নাকি?'

রত্না সাড়া দিল না। সোমনাথ উত্তরের জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া রত্নার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল রত্নার চক্ষু-পল্লব স্থির, শান্ত ভাবে নিশ্বাস পড়িতেছে। রত্না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিল। ক্লান্ত হইয়া রত্না ঘুমাইয়াছে, তাহাকে জাগানো উচিত হইবে না; কিন্তু এ-ঘরে সোমনাথের থাকা কি ঠিক হইবে? বরং সে গিয়া রত্নার বিছানায় শুইয়া কোনও মতে রাত্রিটা কাটাইয়া দিবে।

কিন্তু দ্বার পর্যন্ত গিয়া সোমনাথ আবার ফিরিয়া আসিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া রত্না যদি দেখে সোমনাথ নাই, সে হয়তো ভয় পাইবে—ঝড় কমিয়াছে বটে, কিন্তু থামে নাই—

সোমনাথ আবার সন্তর্পণে খাটের একপ্রান্তে উঠিয়া বসিল। রত্না নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে; তাহার একটি হাত গালের নিচে চাপা রহিয়াছে। সোমনাথ একবার সেই দিকে তাকাইল; তারপর বাহু দিয়া দুই হাঁটু জড়াইয়া লইয়া ঊর্ধ্বে আলোর দিকে চাহিয়া রহিল। এমনি ভাবে বসিয়াই সে বাকি রাতটা কাটাইয়া দিবে।

টর্চের ব্যাটারি দীর্ঘকাল জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। তাহারও চক্ষু যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে।

পরদিন বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙিয়া সোমনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল, রত্না কখন্ উঠিয়া গিয়াছে।

বাহিরে ঝড় স্তব্ধ হইয়াছে। বৃষ্টি পড়িতেছে না, আকাশ থমথম করিতেছে।

মুখ হাত ধুইয়া সোমনাথ যখন বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রত্না বাহিরে যাইবার সাজ পোষাক পরিয়া বসিয়া আছে। সে সোমনাথের মুখের পানে না তাকাইয়া বলিল—'আমি এখনি পুণা যাব।'

সোমনাথ নীরবে চাহিয়া রহিল। এ সেই পুরানো পরিচিত রত্না, কাল রাত্রে হঠাৎ যে-রত্নাকে দেখিয়াছিল সে-রত্না নয়। মুখের ডৌল দৃঢ় এবং নিঃসংশয়, কোথাও এতটুকু দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নাই। এই রত্নাই কি তাহার বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল? কাল রাত্রে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল তাহা কি সত্য, না স্বপ্নের মরীচিকা-বিভ্রম?

রত্না বলিল—'টাইম টেব্‌ল দেখেছি, সাড়ে আটটার সময় একটা ট্রেন আছে—'

সোমনাথ লক্ষ্য করিল, রত্না তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছে না; বোধহয় চোখে চোখ মিলাইতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু লজ্জা করিবার কিছু আছে কি?

রত্না আবার বলিল—'আর দেরি করলে ট্রেন পাব না। একটা গাড়ি কি ট্যাক্সি—'

সোমনাথ চোখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল—'চল, আমি তোমাকে স্টেশনে পেঁছে দিয়ে আসছি।'

মোটরে যাইতে যাইতে কেবল একবার কথা হইল; রত্না জিজ্ঞাসা করিল—'এ মোটর কার?'

সোমনাথ কেবল বলিল—'আমার।'

ট্রেন ছাড়িবার আধ মিনিট আগে রত্না গাড়ির জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া সোমনাথের জামার বুক-পকেটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—'তোমার আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ।' বলিয়া ভিতর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কাল গভীর রাত্রে সোমনাথের অন্তর-গহনে যে ভীরু ফুলটি সঙ্গোপনে ফুটিয়াছিল, তাহা এতক্ষণে সম্পূর্ণ শুকাইয়া টুপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ট্রেন চলিয়া গেল। আকাশে যে মেঘগুলো এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহারা আবার ধীরে ধীরে বর্ষণ শুরু করিল।

সোমনাথ ফিরিয়া গিয়া মোটরে স্টার্ট দিল; তারপর ক্লান্ত দেহমন লইয়া স্টুডিওর দিকে চলিল। আজও সারাদিন শুটিং আছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভুজঙ্গ-প্রয়াত

এক

দীপালী উৎসবের কিছুদিন পূর্বে সোমনাথের ছবি শেষ হইল। এই অপরান্ত প্রদেশে দীপালীই বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব ও নূতন খাতা। এই সময় শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় নূতন করিয়া ছুরি শানাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

চলচ্চিত্রও ব্যবসা। ছবি তৈয়ার হইলে তাহাকে সম্প্রদান করার পালা। কন্যা বয়স্থা হইলে যেমন পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হয়, ছবি তৈয়ার হইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা। চিত্র-জনকেরা তখন ঘটকের দ্বারস্থ হন। চিত্র সমাজে এই ঘটকের অখণ্ড প্রতাপ।

ভবানীর ভ্রূকুটি ভঙ্গী যেমন শিবই বোঝেন, গিরিরাজ বোঝেন না, তেমনি ছবি যাহারা প্রস্তুত করে অতি পরিচয়ের ফলে ছবির সৌন্দর্য বুঝিবার ক্ষমতা আর তাহাদের থাকে না। এইসূত্রে ছবির পরিবেশকেরা আসিয়া আসর জুড়িয়া বসেন। ইঁহারা ছবির জহুরী এবং দালাল। অর্থব্যয় করিয়া ছবি তৈয়ার করা ইঁহাদের কাজ নয়, আবার ছবিঘর প্রস্তুত করিয়া ছবি প্রদর্শন করাও ইঁহাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। ইঁহারা কেবল একজনের প্রস্তুত ছবি অন্য একজনকে সাধারণে প্রদর্শন করিবার অধিকার দিয়া দালালিটুকু আত্মসাৎ করেন। ধনিকতন্ত্রের আমলে অধিক পরিশ্রম না করিয়া এবং সর্বপ্রকার লোকসানের ঝুঁকি বাদ দিয়া অর্থ উপার্জনের যতগুলি পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ছবির ডিস্ট্রিবিউশন তাহাদের মধ্যে একটি।

সোমনাথের ছবি দেড় লাখ টাকার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু সে-কথা সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ্ ও রুস্তমজি ছাড়া আর কেহ জানিত না। ছবির কাট-ছাঁট শেষ হইলে একদা রাত্রিকালে রুস্তমজি, সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ্ ও ইন্দুবাবু নিভৃতে ছবিখানি আগাগোড়া দেখিলেন। দেখিয়া কিন্তু ছবির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কেহ কোনও মন্তব্য করিতে পারিলেন না। সোমনাথ গালে হাত দিয়া বসিল। ছবি যদি জনসাধারণের মুখরোচক না হয়? রুস্তমজির অন্য ছবিগুলি যে পথে গিয়াছে, এটিও যদি সেই পথে যায়? যে আশা-ভরসা ও উদ্যম লইয়া সে ছবি আরম্ভ করিয়াছিল এখন আর তাহার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নাই। যে গল্প তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল তাহাই এখন একেবারে আলুনি ও নিরামিষ মনে হইতেছে।

পাণ্ডুরঙ্ ও ইন্দুবাবুর অবস্থা তাহারই মত। কেবল রুস্তমজি ভরসা দিলেন— 'তুমি ভেবো না। আমি ব্যবস্থা করছি।

পরদিন সন্ধ্যার পর রুস্তমজির গুটিকয় বন্ধু স্টুডিওতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুস্তমজি তাঁহাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সকলেই চিত্র-পরিবেশক। সোমনাথ, পাণ্ডুরঙ্ ও ইন্দুবাবু নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

আহারের আয়োজন রাজকীয়; সঙ্গে তরল দ্রব্যেরও ব্যবস্থা আছে। সকলে লম্বা টেবিলে আহারে বসিলেন; নানাবিধ রঙ্গ পরিহাসের মধ্যে আহার চলিল। সকলেই জানিতেন এই নিমন্ত্রণের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু কেহই সে কথার উল্লেখ করিলেন না।

পানাহার শেষ হইলে রুস্তমজি সকলকে আহ্বান করিয়া স্টুডিওর প্রোজেক্‌শান

হলে লইয়া গেলেন। ছোট একটি প্রেক্ষা-গৃহ; ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছবি কেমন হইতেছে তাহা পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক স্টুডিওতেই এইরূপ একটি প্রেক্ষা-গৃহ থাকে।

লম্বাটে ধরনের একটি ঘর; তাহার একপ্রান্তে একটি পর্দা, অপর প্রান্তে কয়েকটি চেয়ার সাজানো। মাথার উপর টিম্ টিম্ করিয়া একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। সকলে উপবিষ্ট হইতেই আলো নিভিয়া গেল, ছবি দেখানো আরম্ভ হইল।

দুইঘণ্টা পরে ছবি শেষ হইলে সকলে আবার অফিস ঘরে আসিয়া সমবেত হইলেন। কেবল পান্ডুরঙ্ রুস্তমজির অনুমতি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

রুস্তমজি এবার অতিথিদের স্পষ্ট প্রশ্ন করিলেন—'ছবি কেমন লাগল আপনাদের?'

সকলেই পরস্পরের পানে আড়চোখে চাহিয়া মুখ কাঁচুমাচু করিলেন; তাঁদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সোমনাথের বুক দমিয়া গেল। ইঁহারা অবশ্য ব্যবসাদার লোক; কোনও ছবিকে মন খুলিয়া ভাল বলেন না, পাছে ছবির দর বাড়িয়া যায়; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁদের ভাব দেখিয়া মনে হইল, সত্যই তাঁহারা ছবি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছেন।

বাণ্ডুভাই নামক একজন প্রবীণ পরিবেশক জিজ্ঞাসা করিলেন—'ছবি কে ডিরেক্ট করেছে রুসিভাই?'

সোমনাথকে দেখাইয়া রুস্তমজি বলিলেন—'ইনি করেছেন।'

বাণ্ডুভাই তখন সোমনাথকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। লোকটি ঘোর অশিক্ষিত, কিন্তু মিষ্টভাষী। সোমনাথকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে প্রথম চেষ্টা হিসাবে ছবিটি মন্দ না হইলেও পাবলিকের চিত্তাকর্ষক ছবি তৈয়ার করা একদিনের কাজ নয়; অনেক অভিজ্ঞতার দরকার। ছবি কি ভাবে চিত্তাকর্ষক করিতে হয়, কি কি মালমশলা ভাল ছবির পক্ষে অপরিহার্য তাহা তিনি নানা উদাহরণ সহকারে সোমনাথের হৃদয়ঙ্গম করাইতে লাগিলেন। নিরুপায় সোমনাথ বিদ্রোহভরা অন্তর লইয়া নীরবে শুনিয়া চলিল।

সে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, ইন্দুবাবুকেও দুই তিন জন পরিবেশক ঘিরিয়া ধরিয়াছেন; ইন্দুবাবু প্যাঁচার মত মুখ করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছেন। শেষে আর বোধকরি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি রুস্তমজির নিকট বিদায় লইয়া বাড়ি চলিয়া গেলেন। গল্প রচনার সময় তাহাতে দুই একটি রিভলভার ও একটি নারীহরণ না থাকিলে যে সিনেমার গল্প একেবারেই অচল, একথা তিনি বেশীক্ষণ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না।

ওদিকে রুস্তমজিকে যাঁহারা পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার প্রতি করুণা-মিশ্রিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেছিলেন না এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে ছবি তৈয়ার করিতে কত খরচ হইয়াছে। শেষে একজন অনেকটা স্পষ্ট করিয়াই প্রশ্ন করিলেন—'ছবিতে নামজাদা আর্টিস্ট কেউ নেই, নাচ-গানও না থাকার সামিল; খরচ নিশ্চয়ই খুব কম হয়েছে।'

রুস্তমজি অম্লান বদনে বলিলেন—'ছবিতে আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়েছে।'

সকলেই ঠোঁট উল্টাইলেন—'বড় বেশী খরচ হয়েছে—নতুন লোকের হাতে কাজ দিলে ঐ হয়। অতটাকা ছবি থেকে উঠবে না রুসিভাই। আজ আমরা তাহলে উঠি।'

রুস্তমজি বলিলেন—'আমার আড়াই লাখ খরচ হয়েছে। আমি বেশী লাভ চাই না; তিন লাখ পেলেই আমি ছবি ছেড়ে দেব।'

আর কেহ উচ্চবাচ্য করিলেন না—'সাহেবজি' বলিয়া রুস্তমজিকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইলেন।

অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সোমনাথ সে-রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

দুই

পরদিন সকালবেলা সোমনাথ চা পান করিতে বসিয়াছে এমন সময় পাণ্ডুরঙ্ আসিল।

সে উপবেশন করিলে সোমনাথ তাহার দিকে টোস্টের প্লেট আগাইয়া দিয়া বলিল—'কি খবর? কাল অত তাড়াতাড়ি চলে গেলে যে?'

পাণ্ডুরঙ্ উত্তর দিল না, একটা খালি পেয়ালায় চা ঢালিয়া লইল; তারপর এক টুকরা টোস্টে কামড় দিয়া আপন মনে চিবাইতে লাগিল। পাণ্ডুরঙের ভাবভঙ্গী সোমনাথের অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছিল, সে বুঝিল পাণ্ডুরঙের পেটে কোনও কথা আছে। উৎসুকভাবে চাহিয়া সে বলিল—'কি, কথাটা কি?'

পাণ্ডুরঙ্ টোস্ট গলাধঃকরণ করিয়া এক চুমুক চা খাইল, তারপর বলিল—'ছবি ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ উচ্চকিত হইয়া উঠিল—'অ্যাঁ, কে বললে?'

পাণ্ডুরঙ্ একটু হাসিয়া বলিল—'আমার বৌ বল্‌লে।'

'তোমার বৌ? সে কি! তিনি জানলেন কি করে?'

'কাল রাত্রে বৌকে এনে প্রজেকশান হলে লুকিয়ে রেখেছিলাম; তোমরা দেখতে পাওনি। সে ছবি দেখেছে।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'বৌ কখনও কোনও ছবির প্রশংসা করে না! কিন্তু যে-ছবি তার ভাল লাগে সে-ছবির মার নেই।'

'এ ছবি তাঁর ভাল লেগেছে?'

'শুধু ভাল লেগেছে! সারা রাত্রি আমাকে ঘুমোতে দেয়নি কেবলই ছবির কথা বলেছে।'

সোমনাথ মনে মনে খুবই আনন্দিত হইল, কিন্তু তবু তাহার সংশয় ঘুচিল না। সে বলিল—'তুমি আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বাড়িয়ে বলছ না তো?'

পাণ্ডুরঙ্ সিগারেট ধরাইয়া বলিল—'বিশ্বাস না হয় তুমি নিজেই তাকে প্রশ্ন করে দেখবে চল।'

সোমনাথ সোৎসাহে উঠিয়া বলিল—'তাই চল। তাঁর মুখে শুনলে তবু ভরসা হবে। হাজার হোক তিনি নিরপেক্ষ দর্শক; কিন্তু ফন্দিটা তুমি খুব বার করেছিলে তো!'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'মনটা ভারি উতলা হয়েছিল ভাই। ছবি কেমন হয়েছে কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। অথচ বাইরের লোককেও দেখানো যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত বৌকে পাক্‌ড়াও করেছিলাম। অবশ্য মনে ভয় ছিল, ও যদি খারাপ বলে তাহলে আর রক্ষে নেই। তাই আগে থাকতে তোমাদের কিছু বলিনি।'

সোমনাথ হাসিয়া বলিল—'তিনি যদি খারাপ বলতেন তাহলে তুমি কি করতে?'

পাণ্ডুরঙ্ সরলভাবে বলিল—'চেপে যেতাম।'

দুই বন্ধু মোটর চড়িয়া বাহির হইল। পাণ্ডুরঙের বাসায় সোমনাথ পূর্বে কয়েক-বার গিয়াছিল, তাহার স্ত্রীকেও দেখিয়াছিল, দোহারা মজবুত গোছের স্ত্রীলোক, মুখশ্রী গোলগালের উপর মন্দ নয়; বয়স ত্রিশের নীচেই। কাছা দিয়া শাড়ি-পরা স্বল্পভাষিণী এই মারাঠী মহিলাকে সোমনাথের খুব রাশভারি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

দু'জনে যখন পোঁছিল তখন দুর্গাবাঈ ঝাঁটা হস্তে ঘর ঝাঁট দিতেছিলেন। অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ঝাঁটা সরাইয়া রাখিয়া তিনি হাসিমুখে সোমনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন; নিজেই বলিলেন—'আপনার ছবি কাল দেখে এসেছি। খুব ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ বলিল—'পাণ্ডুরঙের মুখে সেই কথা শুনে ছুটে এলাম। সত্যি ভাল হয়েছে?'

'সত্যি ভাল হয়েছে। এমন কি—' পাণ্ডুরঙের প্রতি ভ্রুকটাক্ষপাত করিয়া দুর্গাবাঈ বলিলেন—'উনিও এবার ভদ্রলোকের মত অভিনয় করেছেন।'

সোমনাথ হাসিয়া উঠিল—'দেখলে পাণ্ডুরঙ্। ভদ্রলোকের সঙ্গ-গুণে তুমিও ভদ্র-লোক হয়ে উঠেছ!'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'আমি যে স্বভাবতই ভদ্রলোক, অনুকূল অবস্থায় সেটা ফুটে উঠেছে মাত্র।'

সোমনাথ বলিল—'যাহোক, আমাদের হিরোইনকে আপনার কেমন লাগল?'

দুর্গাবাঈ বলিলেন—'সুন্দরী নয়, তবে বয়স কম। আর, ভারি মিষ্টি অভিনয় করেছে।'

'আর আমি?'

'আপনি তো সকলের কান কেটে নিয়েছেন।' বলিয়া স্বামীর প্রতি একটি স্মিত অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্গাবাঈ চা তৈয়ার করিতে গেলেন।

পাঁপর ভাজা সহযোগে দ্বিতীয় প্রস্থ চা পান করিতে করিতে সোমনাথ আবার প্রশ্ন করিল—'আচ্ছা, ছবির মধ্যে কোন্ জিনিসটা আপনার সবচেয়ে ভাল মনে হল?'

দুর্গাবাঈ নিঃসংশয়ে বলিলেন—'গল্প।'

'এ গল্প সকলের ভাল লাগবে?'

'লাগবে। আমি সাধারণ মানুষ, আমার যখন ভাল লেগেছে তখন সকলের ভাল লাগবে।'

'আপনাকে যদি আবার ছবি দেখতে অনুরোধ করি আপনি খুশি হয়ে দেখতে যাবেন?'

'যাব। আবার কবে দেখাবেন বলুন।'

সোমনাথ টেবিলে এক চাপড় মারিয়া বলিল—'ব্যস্, তাহলে আর ভাবনা নেই।'

পাণ্ডুরঙের বাসা হইতে স্টুডিও যাইতে যাইতে কিন্তু সোমনাথের মন আবার সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। একটি স্ত্রীলোকের ভাল লাগার উপর কি নির্ভর করা চলে! সকলের রুচি সমান নয়—

স্টুডিও পৌঁছিয়া দু'জনে রুস্তমজির কাছে গিয়া বসিল। পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'হুজুর, একটা বেয়াদপি করে ফেলেছি, মাফ করতে হবে।' বলিয়া স্ত্রীকে ছবি দেখানোর কথা বলিল।

রুস্তমজি ধূর্ত চক্ষে হাসি ভরিয়া বলিলেন—'তাতে কোনও দোষ হয়নি। তোমার বিবির ভাল লেগেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রুস্তমজি বলিলেন—'আমারও মনে হচ্ছে ছবিটা ভাল হয়েছে।'

সোমনাথ সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—'কি করে জানলেন? ওরা কিছু বলেছে নাকি?'

রুস্তমজি নিজের বুকে টোকা মারিয়া বলিলেন—'আমার মন বলছে ছবি ভাল হয়েছে। ওরা বরং উল্টো কথাই বলছে। আজ বাণ্ডুভাই ফোন করেছিল।'

'কি বললেন তিনি?'

'ছবির অনেক খুঁত কেড়ে শেষে বলল—'অল্ ইণ্ডিয়া রাইট্সের জন্যে দেড় লাখ

টাকা দিতে পারে।'

'মিনিমাম্ গ্যারাণ্টি?'

'না, একেবারে সরাসরি বিক্রি। কি বল তোমরা? ছেড়ে দেব?'

সোমনাথ ভাবিতে লাগিল, দেড় লাখ টাকায় ছবি ছাড়লে কিছুই লাভ থাকে না। কিন্তু লোকসানও হয় না। লোকসান না হওয়াটা কম কথা নয়।

সোমনাথ প্রশ্ন করিল—'আর অন্য ডিস্ট্রিবিউটাররা কোনও অফার দেননি?'

রুস্তমজি বলিলেন—'উঁহু। তাদের সাড়াশব্দ নেই। ওদের মধ্যে বাণ্ডুভাই তবু সমঝদার; সে বুঝেছে ছবি নতুন ধরনের হলেও তার মধ্যে জিনিস আছে। তার লোভ হয়েছে। চাপ দিলে দু'লাখ পর্যন্ত উঠতে পারে।'

সোমনাথ বলিল—'দু'লাখ যদি পাওয়া যায় তাহলে বোধহয় ছেড়ে দেওয়াই উচিত।'

রুস্তমজি পাণ্ডুরঙের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন—'তুমি কি বল?'

পাণ্ডুরঙ্ দ্বিধাভরে বলিল—'লাখ বেলাখের কথা আমি বুঝি না হুজুর। আপনি কি বলেন?'

রুস্তমজি বলিলেন—'ছবি যদি ভাল হয়ে থাকে, তাহলে ভয় পেয়ে সস্তায় ছেড়ে দেওয়া বোকামি; ব্যবসাদার হয়ে আমি ওদের কাছে ঠকে যেতে রাজি নই।'

'তাহলে কি করবেন?'

'আমি দর কমাব না। দেখি যদি ওরা রাজি হয়। যদি না হয় তখন অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'অন্য ব্যবস্থা কী করবেন?'

রুস্তমজি উত্তর দিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

তিন

তিন লাখ টাকা দিতে কিন্তু কেহই রাজি হইল না। বাণ্ডুভাই এক লাখ ষাট হাজার পর্যন্ত উঠিলেন; অন্য সকলে স্পষ্টই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

সোমনাথের মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। ছবির যথার্থ মূল্য জানিবার কি কোনও উপায় নাই? অন্ধের মত পরের নির্ধারিত মূল্যে নিজের জিনিস পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে? এত পরিশ্রম করিয়া শুধু দিনমজুরিটুকু লইয়া ঘরে ফিরিতে হইবে? আর কতগুলা দালাল তাহার কৃতিত্বের সুফল ভোগ করিবে? ইহাই কি ব্যবসায়ের দুর্লঙ্ঘ্য রীতি?

বাণিজ্য নীতির সহিত সোমনাথের নূতন পরিচয় ঘটিতেছিল। বাণিজ্য লক্ষ্মী যে ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে আঁকা-বাঁকা পথে চলেন, তাঁহার মাথা হইতে মণি হরণ করিতে হইলে যে শুধু দুর্দম সাহস নয়, অপরিসীম চাতুরীরও প্রয়োজন, এ অভিজ্ঞতা তাহার নাই।

রুস্তমজি একদিন সোমনাথকে বলিলেন—'তুমি বড় ঘাবড়ে গেছ দেখছি; অত ঘাবড়ালে ব্যবসা চলে না। ব্যবসায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। চল, আজ বাণ্ডুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বাণ্ডুভাই নিজের অফিসে পরম সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন; রুস্তমজিকে পান ও সোমনাথকে সিগারেট খাইতে দিলেন কিন্তু তাঁহার কথার নড়চড় হইল না। সবিনয়ে বলিলেন—'রুসিভাই, এ ছবির জন্যে আর বেশি দিলে আমার ছেলেপুলে খেতে পাবে না। তোমার খাতিরে দশ হাজার বেশী দিচ্ছি, আর পারব না।'

রুস্তমজি বলিলেন—'বেশ, ঐ টাকাই মিনিমাম্ গ্যারাণ্টি দাও।'

বাণ্টুভাই জিভ কাটিয়া বলিলেন—'মিনিমাম্ গ্যারাণ্টিতে ছবি নেওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি রুসিভাই। সবাই সন্দেহ করে, সবাই বলে আমি চুরি করি। কাজ কি ওসব ঝামেলায়।' বলিয়া মুখে বৈষ্ণবভাব প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রুস্তমজি উঠিয়া পড়িলেন—'বেশ, এখন দিচ্ছ না। এর পরে কিন্তু এত সস্তায় পাবে না।'

স্টুডিওতে ফিরিয়া আসিয়া রুস্তমজি বলিলেন—'সোমনাথ আজ তুমি বাড়ি যাও। আমি একটু ভেবে দেখি। কাল এর হেস্তনেস্ত করব।'

পরদিন সোমনাথ রুস্তমজির কাছে গিয়া বসিতেই তিনি বলিলেন—'ঠিক করে ফেলেছি। ছবি কাউকে দেব না, আমি নিজেই হাউস ভাড়া নিয়ে ছবি দেখাব।'

সোমনাথ কিয়ৎকাল হতবাক্ হইয়া রহিল, তারপর বলিল—'কিন্তু, তাতে আরও অনেক খরচ—'

'পাবলিসিটিতে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করব; তাছাড়া হাউসের ভাড়া আছে। সবসুদ্ধ বড় জোর পঞ্চাশ হাজার। যদি লেগে যায়—'

'যদি না লাগে?'

রুস্তমজি সোমনাথের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'তুমি ইয়ং ম্যান হয়ে ভয় পাচ্ছ? এতটুকু সাহস নেই?'

সোমনাথ বলিল—'নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি না রুসিবাবা; কিন্তু আপনার এই শেষ সম্বল, এ নিয়ে জুয়া খেলা উচিত নয়। বরং লাভ যদি নাও হয়—'

রুস্তমজি বলিলেন—'আমি জুয়াড়ী, সারা জীবন জুয়া খেলেছি। তোমাকে যখন ছবি তৈরি করতে দিয়েছিলাম তখনও জুয়া খেলেছিলাম। আজও জুয়া খেলব; লাগে তাক্ না লাগে তুক্। বাণ্টুভাই আজ আমাকে দমক দিচ্ছে; যদি পাশার দান পড়ে—ছবি উৎরে যায়—তখন আমি বাণ্টুভাইকে দমক দেব। এই তো জীবন।'

ইহার পর আর কিছু বলা যায় না। বৃদ্ধ জুয়াড়ী যখন সর্বস্ব পণ করিয়া জুয়ায় মাতিয়াছে তখন তাহাকে ঠেকানো অসম্ভব। সোমনাথ নিজের রক্তের মধ্যেও জুয়ার উত্তেজনা অনুভব করিল।

'বেশ, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

রুস্তমজি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেওয়ালী কবে?'

সোমনাথ বলিল—'আর দিন দশেক আছে।'

'যথেষ্ট। দেওয়ালীর দিন আমার ছবি রিলীজ করব।'

দেওয়ালীর দিন ছবি মুক্তিলাভ করিল।

প্রথম সপ্তাহে আয় হইল চৌদ্দ হাজার; দ্বিতীয় সপ্তাহে ছাব্বিশ হাজার।

যে সকল পরিবেশক পূর্বে গা ঢাকা দিয়াছিলেন তাঁহারা পাগলের মত রুস্তমজিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু রুস্তমজির এখন পায়া ভারি; তিনি কাহারও সহিত দেখা করিলেন না।

পাণ্ডুরঙ্‌কে ডাকিয়া রুস্তমজি একটি বিশ ভরির সোনার হার তাহার হাতে দিলেন—'এইটি তোমার বিবিকে দিও। তাঁর কথা শুনেই আমি এতবড় জুয়ায় নেমে-ছিলাম।' তারপর সোমনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'তোমাকে আর কী দেব? আমার যা কিছু সব তোমাকে দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

বাণ্টুভাই অবশেষে একদিন রুস্তমজিকে ধরিয়া ফেলিলেন। রুস্তমজি অফিস

ঘরে বসিয়া ছিলেন, বাণ্ডুভাই এক রকম জোর করিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

দুই বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন; শেষে বাণ্ডুভাই বলিলেন, 'রুসিভাই, তোমারই জিৎ। ছবির জন্যে কত টাকা চাও?'

রুস্তমজির মুখে বিজয় গর্বিত হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না; এই মুহূর্তের বিজয়ানন্দ যেন পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বাণ্ডুভাই আবার বলিলেন—'তুমি বলেছিলে তিন লাখ টাকায় ছবি বিক্রি করবে। আমি তিন লাখ দিতে রাজি আছি।'

রুস্তমজি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন।

'এখন আর তিন লাখে হবে না।'

'কত চাও?'

'পাঁচ লাখ।'

বাণ্ডুভাই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

'তার কমে হবে না?'

'না।'

'আমাকে একটু ভাববার সময় দেবে?'

রুস্তমজি বলিলেন—'ভাববার সময় নিতে পারো; কিন্তু ইতিমধ্যে কেউ যদি বেশী দিতে রাজি হয়, তখন আর পাঁচ লাখে পাবে না!'

বাণ্ডুভাই আর দ্বিধা না করিয়া পকেট হইতে চেক্‌বুক বাহির করিলেন।......

হিসাব করিয়া সোমনাথের ভাগে লাভের অংশ এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকা পড়িল। রুস্তমজি চেক লিখিয়া তাহার হাতে দিলেন এবং দুই হাতে তাহার করমর্দন করিলেন।

'যাও, কিছুদিন কোথাও বেড়িয়ে এস। তারপর নতুন ছবি আরম্ভ করবে।'

অফিস হইতে বাহিরে আসিয়া সোমনাথ চেকটি খুলিয়া দেখিল। এক লাখ ত্রিশ হাজার! সে এক লাখ ত্রিশ হাজার টাকার মালিক!

হঠাৎ তাহার মনটা কেমন যেন বিকল হইয়া গেল। টাকা রোজগার করা এত সহজ! শুধু একটু চাতুরী, আর একটু হটকারিতা—ইহার বেশী প্রয়োজন নাই? অথচ এই টাকার জন্য কোটি কোটি মানুষ মাথা কুটিয়া মরিতেছে!

তারপরই তাহার মনে প্রতিক্রিয়া আসিল। আর তাহার অন্ন-চিন্তা নাই। সে স্বাধীন—স্বাধীন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ললিত-লতা

এক

ইন্দুবাবুর সঙ্গে সোমনাথের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাহাকে নিজের বাসায় নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিতেন। ইন্দুবাবুর স্ত্রী রন্ধনে সুনিপুণা, তাঁহার হাতের চিংড়িমাছের মালাই-কারি ও কাঁকড়ার ঝাল খাইয়া সোমনাথ পরম তৃপ্তিলাভ করিত।

আহারের পর ইন্দুবাবু গড়গড়ার মাথায় খাম্বিরা তামাকুর তাবা চড়াইয়া নল হাতে লইয়া বসিতেন; তখন তাঁহার মুখ দিয়া নানা প্রকার মজার গল্প বাহির হইত। নিম্নোক্ত কাহিনীটি তিনি একদিন সোমনাথকে শুনাইয়াছিলেন। কাহিনীর মধ্যে কোনও প্রচ্ছন্ন হিত-উপদেশ ছিল কিনা তাহা বলা যায় না; সম্ভবত অভিজ্ঞতার বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা গল্পটি ইন্দুবাবুর জবানিতে প্রকাশ করিলাম।—

ছয় বছর আগে এ গল্পের আরম্ভ হয়েছিল। তখন আমি কলকাতায় থাকি। সাহিত্য-চর্চার ফাঁকে ফাঁকে গান গাইতাম। গলাটা তখন ভাল ছিল; রবিবাবুর গান গাইতে পারতাম।

সাহিত্যিক হিসেবে যত না হোক, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অবৈতনিক গায়ক রূপে কলকাতার অভিজাত সমাজে আমার বেশ মেলামেশা ছিল; কোথাও পার্টি বা জলসা হলেই আমার নেমন্তন্ন থাকত। সেই সূত্রেই দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টারের মেয়ে লতার সঙ্গে পরিচয় হয়। লতা কিছুদিন আমার কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখবার জন্যে খুব ঝুঁকেছিল; আমিও শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। লতার প্রাণে দুরন্ত আবেগ ছিল—কিন্তু তার গলায় সুর ছিল না—

একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখি, এটা লতা ও ললিতের গল্প; আমি দর্শক মাত্র। লতাকে তুমি চিনবে না; বড়লোকের মেয়ে এবং কলকাতার বিশিষ্ট অতি-আধুনিক সমাজের মুকুটমণি হলেও সাধারণের কাছে সে অপরিচিতা; কিন্তু ললিতের নাম নিশ্চয় শুনেছ; পর্দায় তাহার চেহারাও দেখেছ বোধহয়—বাংলা চিত্রাকাশের উজ্জ্বল পুং তারকা।

আগে লতার কথাই বলি। এমন আশ্চর্য মেয়ে আমি দেখিনি। তখন তার বয়স সতেরো কি আঠারো; একটু দুরন্ত গড়ন—দেখলে মনে হয় রজনীগন্ধার বোঁটায় একটি চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে; কিন্তু কী তার মনের তেজ, যেন আগুনের ফুল্‌কি। আর তেম্‌নি কি সরলতা! মনের কথা লুকোতে জান্‌ত না; মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন কথা বলে বসতো যে শ্রোতাদের কান লাল হয়ে উঠতো, তার বাবা লজ্জিত হয়ে পড়তেন; কিন্তু লতার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

মেয়েটাকে আমার বড় ভাল লাগত; ঠিক যেন শেক্সপীয়ারের মিরাণ্ডার সঙ্গে ক্লিওপেট্রা মিশেছে। সরলতা আর তেজ। মাঝে মাঝে ভাবতাম, এ মেয়ের জীবনের ধারা শেষ পর্যন্ত কোন্ বিচিত্র খাতে বইবে কে জানে! সাধারণ গতানুগতিক খাতে যে বইবে না তা অনেকটা অনুমান করেছিলাম।

তাকে দু'চার দিন গান শেখাতে গিয়েই বুঝতে পারলাম, গান গাওয়া তার কর্ম নয়। গলায় সুর নেই; ভগবান মেরেছেন; কিন্তু কথাটা তাকে বলতে সংকোচ হতে লাগল; হয়তো মনে কষ্ট পাবে।

একদিন সে নিজেই বলল—'মাস্টারমশাই, আমার গলায় সুর নেই—না? আমি গাইতে শিখব না?'

আমিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, বললাম,—'তোমার গলা বেশ মিষ্টি—কিন্তু—তুমি বাজনা বাজাতে শেখো না কেন? সেতার কিম্বা এস্রাজ—'

লতার চোখ জলে ভরে উঠল—'বাজনা বাজাতে আমার ভাল লাগে না। এত দুঃখু হচ্চে যে আমি গান গাইতে পারব না।'

বললাম—'আমারও দুঃখু হচ্চে লতা।'

লতা চোখ মুছে হাসবার চেষ্টা করল—'যাক গে, উপায় নেই যখন, তখন আর কেঁদে কি হবে। আপনি কিন্তু আসা বন্ধ করতে পারবেন না। অন্তত হপ্তায় একদিন আসতে হবে। গাইতে না পারি আপনার গান শুনতে তো পাব। বলুন আসবেন।'

খুশি হয়েই কথা দিলাম। না যাবার কোনও কারণ ছিল না; লতা ভারি যত্ন ক'রে খাওয়াতো। তাছাড়া ব্যারিস্টার সায়েবও খুব খাতির করতেন। ভদ্রলোক কম বয়সে বিলেত থেকে ফিরে কিছু মাতামাতি করেছিলেন,—শোর-গরু খেয়েছিলেন; তারপর পঞ্চাশোর্ধে আবার ঠাণ্ডা হয়ে জপতপ সন্ধ্যা আহ্নিক আরম্ভ করেছেন।

যাহোক, তারপর মাঝে মাঝে যাতায়াত করি। ক্রমে লতা গান শিখতে না পারার শোক ভুলে গেল; তবে আমি গেলে প্রত্যেক বারই দু' একটা গান না শুনে ছাড়ত না। সে সময় আমি বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় প'ড়ে মাঝে-মধ্যে সিনেমার গান প্লে-ব্যাক করতাম। বাংলা দেশের পুরুষ অভিনেতাদের যে গানের গলা নেই একথা অনেকেই জানে না, দর্শকেরা মনে করে অভিনেতাই বুঝি গান গাইছে। সিনেমার এইসব অজানা নতুন গান শুনতে লতা ভারি ভালবাসত।

একদিন তাকে একটা নতুন গান শুনিয়ে আমি বললাম—'শীগ্গির এই গানটা সিনেমায় শুনতে পাবে, একটি নতুন ছেলের মুখে।'

লতা জিগ্যেস করল,—'নতুন ছেলেটি কে?'

বললাম—'তার নাম ললিত, এই প্রথম ছবিতে হিরোর পার্ট পেয়েছে। ভারি ভাল ছেলে, আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে চিনি। তার বড় ইচ্ছে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে মেলা-মেশা করে।'

লতা বলল—'তবে তাঁকে নিয়ে আসেন না কেন?'

আমি বললাম—'সে সিনেমার অভিনেতা—তাকে তোমরা ভদ্রসমাজে মেশবার অযোগ্য মনে করতে পার, তাই সাহস ক'রে আনিনি।'

লতা বললে—'কিন্তু তিনি যদি ভদ্রলোক হন তাহলে অযোগ্য মনে করব কেন?'

বললাম—'তুমি না করলেও তোমার বাবা মনে করতে পারেন। বাজারে সিনেমার লোকের সুনাম নেই।'

লতার বাবা ঘরেই ছিলেন, আমি তাঁর পানে তাকালাম; কিন্তু তিনি হাঁ না কিছুই বললেন না। তাঁর নির্বিকার মুখ দেখেও বুঝতে পারলাম না তাঁর মনের ভাবটা কি। কারণ, লতা যাই বলুক, গৃহস্বামীর অমতে একজন আগন্তুককে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি না।

কিন্তু লতার চোখ একটু খর হয়ে উঠল। সে বলল—'সিনেমার লোক সবাই মন্দ হয়? তবে যে বললেন ইনি ভদ্রলোক।'

আমি বললাম—'ললিত যে ভদ্রলোক আমি তার জামিন হতে পারি।'

লতা বলল—'তবে কেন বাবা আপত্তি করবেন? উনি আপত্তি করলেও আমি শুনব না।'

লতার বাবা একটু হাসলেন, বললেন—'শুনলেন তো আধুনিকা মেয়ের কথা!' তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সহজ স্বরে বললেন—'আপনি তাকে নিয়ে আসবেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ললিতকে ভাল ছেলে বলেছিলাম, এ কথার মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি ছিল না। আমার গাঁয়ের ছেলে, আমি তাকে একরত্তি বেলা থেকে দেখেছি—যেমন শান্তশিষ্ট তেমনি বুদ্ধিমান। তার বাপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, তাই বাড়ির শিক্ষা-দীক্ষা ভালই হয়েছিল। আজকাল বেশীর ভাগ ছেলেরই মনে আদর্শ-বিভ্রাট ঘটেছে দেখা যায়। বিলিতী কালচার আর দেশী সংস্কৃতির ভেজালে এক কিম্ভূতকিমাকার চরিত্র তৈরি হয়; তারা হাত তুলে নমস্কার করবার বিদ্যেটাও ভুলে গেছে, আবার শেকহ্যান্ড করবার কায়দাটাও আয়ত্ত করতে পারেনি। ললিতের চরিত্রে কিন্তু দেশী বিলিতী সংস্কারের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম হয়েছিল। তার মনটা যেমন ছিল খাঁটি দেশী, তেমনি আচার-ব্যবহার দেখে তাকে সেকেলে ব'লে মনে হত না, বরং একটু বেশী মাত্রায় আধুনিক ব'লে মনে হত। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের, একাল ও সেকালের সুন্দর সমন্বয় হয়েছিল তার মনে।

ললিত কলকাতায় বি. এ. পড়ছিল, হঠাৎ তার বাবা মারা গেলেন। আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, ললিতকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হল। চাকরির সন্ধানে আমার কাছে এল। তখন আমিই চেষ্টা চরিত্র করে তাকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিলাম। তার চেহারা ভাল; একেবারে নব-কার্তিক না হলেও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের সঙ্গে এমন একটি মিষ্টি কমনীয়তা ছিল যে দেখলেই ভাল লাগে। তাকে সিনেমায় ঢোকাতে বেশী বেগ পেতে হয়নি, যদিও সে গান গাইতে জানত না।

প্রথম বছরখানেক শিক্ষানবিশীতে কেটে গেল, দু'একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করল। তারপর সে হিরোর পার্ট পেল।

এই সময় আমাদের গল্পের আরম্ভ। ললিত তখন ওয়েলেসলি অঞ্চলে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে। ভারি ছিমছাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাট; ললিতের সৌখীন স্বভাবের ছাপ তার প্রত্যেকটি টুকিটাকিতে পরিস্ফুট। একলা মানুষ, তাই মাইনে তখন খুব বেশী না পেলেও বেশ স্টাইলে থাকতো।

কিন্তু তার মনে একটা দুঃখ ছিল, সিনেমার লোকের সঙ্গে সে প্রাণ খুলে মেলা-মেশা করতে পারত না। কাজের সময় সে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করত, কিন্তু একটু ছুটি পেলেই আমার কাছে পালিয়ে আসত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আমার সঙ্গে গল্প করত, গিন্নীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। ক্রমে আমি তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলাম। জল বিনে মীন—তার শিক্ষা এবং রুচি যে পরিবেশ কামনা করে, সে পরিবেশ তার কর্মক্ষেত্রে নেই! তাই তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে; তাই আমার কাছে ছুটে ছুটে আসে।

কিন্তু আমাকেও কাজকর্ম করতে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে গল্প করলে আমারই বা চলে কি করে? বুদ্ধিটা প্রথমে আমারই মাথায় এসেছিল, ললিত মুখ ফুটে কোনও দিন কিছু বলেনি। আমি ভাবলাম, লতাদের সমাজে একবার যদি তাকে জুটিয়ে দিতে পারি তাহলে আর তার কোনও দুঃখ থাকবে না, নিজের মনের মত বন্ধু-বান্ধবী ও নিজেই যোগাড় করে নিতে পারবে। ও যে নিজেকে অভিজাত সমাজে বেশ ভালভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই ছিল না। ওর মত সুমার্জিত ব্যবহার অতি বড় সভ্য সমাজেও খুব বেশী পাওয়া যায় না।

কথাটা তুলতেই সে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল। তারপর একদিন বিকেলবেলা তাকে লতাদের বাড়ি নিয়ে গেলাম।

লতা তার গোলাপ বাগানে একটা ঝারি নিয়ে ফুলগাছের গোড়ায় জল দিচ্ছিল; আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সে একদৃষ্টে ললিতের মুখের পানে চেয়ে রইল। ললিত হাত তুলে নমস্কার করল। আমি দেখলাম, লতার হাতের ঝারিটা থেকে জল ঝরে তার পা ভিজিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। আমি সাহিত্যিক মানুষ, আমার মনে একটা কবিত্বময় প্রশ্ন উদয় হল—লতার পদমূলে অজ্ঞাতে যে-জল ঝরে পড়ছে তার ফলে লতার ফুল ধরবে নাকি?

সেদিন বেশীক্ষণ রইলাম না, লতা আর ললিতের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে এলাম। তাড়াতাড়ি চলে আসার কারণ আমার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটেছিল। কিছুদিন থেকে একটা উপন্যাসের প্লট আবছায়া ভাবে আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল; আজ লতার বাগানে, কি ক'রে জানি না, গল্পটাকে হঠাৎ আগাগোড়া চোখের সামনে দেখতে পেলাম। এমন আমার মাঝে মাঝে হয়; অবচেতন মন থেকে পরিপূর্ণ গল্পটি সমুদ্রোদ্ভবা উর্বশীর মত উঠে আসে। তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হ'য়ে যায়।' আর কিছু ভাল লাগে না; আমার বাসার ছোট্ট ঘরে কাগজ-কলম-সাজানো একটি টেবিল আমাকে টানতে থাকে।

সেদিন চলে এলাম। তারপর কিছুদিন আর লতাদের ওদিকে যাওয়া ঘটে ওঠেনি। নিজের উপন্যাসে মগ্ন হয়ে আছি। ললিত মাঝে দু'একবার এসেছিল; তার কাছে শুনলাম সে এখন ওদের সমাজে মিশে গেছে। এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল।

মাসচারেক পরে হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা ললিত এসে হাজির; মুখে উত্তেজনা-ভরা হাসি। বলল—'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, আজ আমাদের ছবির উদ্বোধন। চলুন ইন্দুদা, আপনাকে দেখিয়ে আনি। বৌদি, আপনিও চলুন না।'

গিন্নী যেতে পারলেন না। কোলের ছেলেটা বাল্‌সেছে; আমি একাই ললিতের সঙ্গে গেলাম। তার মুখে আমার গানগুলো কেমন ওৎরালো শোনবার ইচ্ছে হল।

বেরুবার সময় ললিত গিন্নীকে ব'লে গেল—'ইন্দুদা ছবি দেখে আমার বাসাতে খাওয়া-দাওয়া করে ফিরবেন। একটু রাত হবে, আপনি যেন ঘাবড়াবেন না।'

ছবিঘরে খুব ভিড়; উদ্বোধন রজনীতে যেমন হয়ে থাকে। তখনও ছবি আরম্ভ হয়নি; ললিত আমাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে একটা বক্সে বসিয়ে দিলে। দেখলাম, বক্স আর ব্যাল্‌কনি অভিজাত সমাজের স্ত্রীপুরুষে ভরা। ললিত তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গল্পগাছা করতে লাগল। সে বেশ জমিয়ে নিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আশ্চর্য হলাম না; ললিত যে-রকম মিষ্টি স্বভাবের ছেলে তাতে যে-কোনও সমাজে সে জনপ্রিয় হতে পারে।

ছবি আরম্ভ হল। দেখলাম ছবিটি ভালই হয়েছে, গানগুলি ললিতের মুখে বেশ মানিয়েছে। আর সব চেয়ে ভাল লাগল ললিতের সহজ সাবলীল অভিনয়। তার চেহারায় বোধহয় একটা জিনিস আছে, যাকে ইংরাজিতে বলে sex appeal; সেটা এক্ষেত্রে মেয়েদের কাছেই বেশী ধরা পড়বার কথা, আমার আন্দাজ মাত্র। মোট কথা মেয়েরা যে তাকে খুবই পছন্দ করেছিলেন তার পরিচয় সে-রাত্রে পেলাম; কিন্তু সে পরের কথা। ছবি দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে ললিতের কপাল খুলেছে, এবার তাকে নিয়ে পরিচালক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

ছবি শেষ হলে ললিত আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। ললিতের বাসায় মাত্র একটি চাকর, সে-ই রান্নাবান্না করে। বাসায় পেঁছে ললিত চাকরকে ছুটি দিয়ে দিলে; চাকর রাত্রির শো'তে মালিকের ছবি দেখতে যাবে।

টেবিলের ওপর খাবার সাজানো ছিল, আমরা খেতে বসলাম। ললিতের বাসায় তিনটি ঘর—শোবার ঘর—বসবার ঘর আর ডাইনিং রুম। ঘরগুলি ভারি সুরুচির সঙ্গে সাজানো। একটু বিলিতী ঘেঁষা কিন্তু উৎকট সাহেবিয়ানা নেই; দেশী আরামের সঙ্গে বিলিতী পরিচ্ছন্নতা মিশেছে; ভারি ভাল লাগল।

খেতে বসে ললিত খুব উৎসাহ আর উত্তেজনার সঙ্গে কথা কইতে লাগল। নবলব্ধ সিদ্ধি আর খ্যাতি মানুষকে আনন্দে অধীর করে তোলে, কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সে তার উদ্দীপ্ত আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে! থেকে থেকে একটা অস্বস্তির ভাব তার মুখে ফুটে উঠছে। কিছু বুঝতে পারলাম না; ভাবলাম ললিত ভারি বিনয়ী ছেলে, অহঙ্কারের লেশমাত্র তার শরীরে নেই; তাই সে এই হঠাৎ পাওয়া গৌরব হজম করতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না'; ললিতের মনের অবস্থাও বোধহয় অনেকটা সেই রকম।

খাওয়া শেষ করে উঠতে পৌনে এগারোটা বাজল। ভাবলাম, আর দেরি নয়, এবার উঠে পড়ি; কিন্তু ললিত কোথা থেকে এক গড়গড়া যোগাড় করেছিল; খাম্বিরা তামাক সেজে যখন গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দিলে তখন আর উঠতে পারলাম না। বসবার ঘরে কৌচের ওপর আড় হয়ে আবার গল্প আরম্ভ হল।

তারপর কখন এগারোটা বেজে গেছে; আমাদের আগড়ম বাগড়ম গল্প চলেছে। হঠাৎ এক সময় ললিত জিগ্যেস করল—'ইন্দুদা, আজ সিনেমায় লতাকে দেখেছিলেন?'

আমি বললাম—'লতাকে? কই না। সে এসেছিল নাকি?'

ললিত বলল—'হুঁ। আমার বড় ভয় করছে ইন্দুদা। সে হয়তো একটা কাণ্ড ক'রে বসবে।'

উঠে বসে বললাম—'কী কাণ্ড ক'রে বসবে? তোমাদের ব্যাপার তো আমি কিছুই জানি না। সব খুলে বল।'

ললিত একটা ঢোক গিলে বলল—'আপনি তো লতার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে এলেন। তারপর—তারপর অনেক ব্যাপার ঘটেছে।'

ললিতকে জেরা করে সব কথা বার করতে হল। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই লতার সমস্ত মন ললিতের ওপর গিয়ে পড়ে; যেন এতদিন ললিতের জন্যই সে পথ চেয়ে ছিল। লতা মনের কথা গোপন করতে পারে না, চেষ্টাও নেই। অল্পদিনের মধ্যেই ললিত বুঝতে পারল লতা তাকে পাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। ললিতের অবস্থা শোচনীয়। ললিত লতাকে খুবই পছন্দ করে; কিন্তু লতার দুরন্ত হৃদয়াবেগ দেখে তার ভয় করে—সে লতাকে এড়িয়ে চলে। আজ সিনেমায় ছবি শেষ হবার পর ক্ষণেকের জন্য তাদের দেখা হয়েছিল; লতা এমনভাবে একদৃষ্টে তার মুখের পানে তাকিয়েছিল যে ললিতের ভয় হয়েছিল বুঝি শহরসুদ্ধ লোকের সামনে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রে বসে। প্রবল নেশায় মানুষের যেমন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না লতার চোখে সেই দৃষ্টি। দু'একটা কথা বলেই ললিত পালিয়ে এসেছে।

ভালবাসার পাত্রকে নাটকের নায়করূপে দেখলে বোধ হয় অনুরাগ আরও বেড়ে যায়। সব শুনে আমি বললাম—'কিন্তু তোমার পালিয়ে বেড়াবার কী দরকার বুঝতে পারছি না। লতা যখন তোমাকে বিয়ে করতে চায় তখন তাকে বিয়ে করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তাকে তো তোমার অপছন্দ নয়?'

ললিত বলল—'আপনি বুঝছেন না ইন্দুদা। লতা খুব ভাল মেয়ে, তার মনে ছলা-কলা নেই—তাকে আমার বড্ড ভাল লাগে; কিন্তু ভাল লাগলেই তো চলে না। লতা বড় ঘরের মেয়ে, বড় মানুষের মেয়ে; আর আমি সিনেমা অ্যাক্টর। আমি কোন্ মুখে লতার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করব? তিনি বোধহয় লতার মনের ভাব

বুঝতে পেরেছেন, আজকাল আমাকে দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তা থেকেই বুঝতে পারি আমাকে তিনি লতার উপযুক্ত পাত্র মনে করেন না, হয়তো লতাকে আমার সঙ্গে মিশতে দিয়ে মনে মনে পস্তাচ্ছেন—'

এই সময় ঘড়ির ওপর চোখ পড়ল, দেখি সাড়ে এগারোটা। লতা এবং ললিতের প্রসঙ্গ খুবই জটিল হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু আর দেরি করা চলে না। আমি উঠে পড়লাম, বললাম—'দিব্যি জট পাকিয়েছ দেখছি। রাতারাতি এ জট ছাড়ানো যাবে না, একটু ভেবে-চিন্তে দেখতে হবে। আজ উঠি।'

ললিত আমার হাত ধরে মিনতি করে বলল—'আজ রাত্তিরটা থেকে যান না ইন্দুদা, কাল সকালে বাড়ি যাবেন। কত কথা যে বলবার আছে, আপনাকে বললে মনে বল পাব—'

বেচারা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে; কিন্তু আমাকে মাথা নেড়ে বলতে হল—'না ভাই, তোমার বৌদি ভীতু মানুষ আমি না ফিরলে সারারাত্রি ছেলে কোলে ক'রে বসে থাকবে। আজ ফিরতেই হবে।'

কিন্তু এত সহজে ফেরা হল না। চাদরটি গলায় দিয়ে বেরুবার উপক্রম করছি এমন সময় দরজায় খুট্ খুট্ করে টোকা পড়ল।

ললিত চমকে উঠে বলল—'কে?'

দরজার ওপার থেকে কিছুক্ষণ জবাব নেই; তারপর চাপা গলায় আওয়াজ এল—'দোর খোল—আমি লতা।'

ঘরের মাঝখানে বজ্রপাত হলেও এমন স্তম্ভিত হতাম না। লতা! এই রাত্রে লতা এসেছে ললিতের নির্জন বাসায়? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম ললিতের মুখের পানে; সেও ফ্যাল ফ্যাল করে আমার পানে তাকালো। তারপর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল—'কী করি আমি এখন?' তার ভাব দেখে মনে হল যেন সে চোর, কোণ-ঠাসা হয়েছে!

আমি বললাম—'দোর খুলে দাও—আর উপায় নেই। আমি পাশের ঘরে লুকোচ্ছি। আমাকে দেখলে লতা লজ্জা পাবে।'

আমি ললিতের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ওঘর থেকে শব্দ পেলাম, ললিত সদর দরজা খুলে দিলে; তারপর দরজা আবার বন্ধ হল। তারপর আর সাড়াশব্দ নেই।

আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল দরজার চাবির ফুটো দিয়ে আলো আসছে।

লোভ সামলাতে পারলাম না।

ললিত দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে, আর তার পানে চেয়ে লতা সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে; তার মুখের ওপর পড়েছে বিদ্যুৎ-বাতির লজ্জাবিদারী আলো। লতার সে মুখ আমি জীবনে ভুলব না। আমি সাহিত্যিক, প্রেম নিয়েই আমার কারবার; কিন্তু এমন তীব্র সর্বগ্রাসী প্রেম যে মানুষ অনুভব করতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি, তবু আমারই যেন দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল।

তারপর লতা ছুটে গিয়ে ললিতের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তারপর—সে কী চুম্বন! বিলিতী সিনেমাতেও এমন চুম্বন কখনও দেখিনি; যেমন দীর্ঘ তেমনি জ্বালাময়। অভিনয়ে ও জিনিস হয় না; একটি চুম্বনে নিজেকে সর্বস্বান্ত করে বিলিয়ে দেওয়া বাস্তবেও কদাচিৎ হয়।

ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হল।

কিছুক্ষণ কাটবার পর দু'জনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়—ছাড়া-ছাড়া ভাঙা-ভাঙা—লতাই বেশী কথা বলছে...তুমি আমাকে চাও না?... একটুও ভালবাসো না? কিন্তু আমি যে তোমাকে...

ললিত বলছে...লতা, আমি তোমাকে ভালবাসি...তোমাকে বিয়ে করতে চাই... কিন্তু তোমার বাবা...

আমি ফুটোতে কখনও চোখ লাগাচ্ছি, কখনও কান। লতা দু'হাত দিয়ে ললিতের গলা জড়িয়ে ধরেছে, ললিতও একটা বাহু দিয়ে তার কাঁধ বেষ্টন ক'রে ধরেছে; মুখোমুখি কথা হচ্চে—লতা বলছে...আমি আজ সারা রাত্রি তোমার কাছে থাকব... তাহলে তো বাবা আপত্তি করতে পারবেন না...আমার লজ্জা নেই, কিছু নেই, আমি তোমার কাছে থাকব—

ললিত একবার চকিতে শোবার ঘরের দোরের দিকে তাকালো। তারপর লতার কানে কানে কি বললো। লতাও বিস্ফারিত চোখে দোরের দিকে তাকালো, তারপর ক্ষোভে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কাম্ড়ে ধরল। বুঝলাম, আমার কথা হচ্চে—

ফুটো থেকে সরে গিয়ে ললিতের বিছানার ওপর বসলাম। যুবক যুবতীর দুর্বার হৃদয়াবেগ বেশী বয়সে সহ্য হয় না, স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যাহোক, মিনিট পাঁচেক বসে থাকবার পর সদর দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তার কিছুক্ষণ পরে ললিতের ভাঙা গলার আওয়াজ এল—'ইন্দুদা, বেরিয়ে আসুন, লতা চলে গেছে।'

তখন বারোটা বেজে গেছে। বেরিয়ে এসে দেখলাম ললিতের মুখখানা ফ্যাকাসে। সে কোচের ওপর বসে পড়ল, কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে বসে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল—'এই ভয়ই আমি করেছিলাম ইন্দুদা; কিন্তু এখন উপায় কি বলুন।'

বললাম—'বিয়ে করা ছাড়া উপায় নেই।'

'লতার বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?'

'চেষ্টা করব; কিন্তু আমি জানি তিনি রাজি হবেন না। তারপর কি করব?'

আমি একটু অধীর হয়ে পড়লাম। মনে মনে আদর্শবাদী হলেও আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করা আমার সহ্য হয় না। বললাম—'লতা তোমাকে যে সুযোগ দিয়েছিল তা যদি তুমি নিতে তাহলে সব সমস্যাই সহজ হয়ে যেত। এখনও সে পথ খোলা আছে—'

ললিতের ফ্যাকাসে মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। সে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল— 'ছি ইন্দুদা, আমাকে এমন ছোটলোক মনে করেন আপনি? বাপ-পিতাম'র রক্ত নেই আমার শরীরে? ম'রে গেলেও আমি তা পারব না।'

'তবে আর কোনও উপায় নেই।' বলে আমি চলে এলাম।

ললিত সে-রাত্রে যে ব্যবহার করেছিল তার জন্যে তাকে নিন্দে করবার কথা বোধহয় কারুর মনে উদয় হবে না; তার রক্তে বহু পূর্বপুরুষের সঞ্চিত শুচিতা তাকে যে শক্তি দিয়েছিল সে শক্তি সকলের নেই তা আমি জানি; কিন্তু তবু আমার মনটা সন্তুষ্ট হতে পারল না। লতা আর ললিতকে আমিই একত্র করেছিলাম; তাদের মন নিয়ে আজ যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে খানিকটা দায়িত্ব আমার আছেই। অথচ এই জটিলতার গ্রন্থিচ্ছেদ কি করে করব ভেবে পেলাম না। লতার ব্যবহার আমি সমর্থন করি না, তাকে আদর্শ মেয়ে বলেও মনে করি না; কিন্তু তাকে ঘৃণা করবার মত মনের জোরও আমার নেই। তার ঐকান্তিক আত্ম-বিস্মৃতি একটি সুখময় সৌরভের মত চিরদিন আমার মনে গাঁথা হয়ে থাকবে; কিন্তু ওদের মিলন ঘটাবার জন্যে আমি কি করতে পারি? লতার বাবাকে আমার কোনও কথা বলতে যাওয়া

ধৃষ্টতা। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, যদি আমি ললিতের বাসায় এত রাত্রি পর্যন্ত না থাকতাম তাহলে হয়তো জৈব নিয়মে সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যেত—বিধাতার ঘূর্ণি হাওয়া যেমন নিজের প্রচণ্ডতার বলেই পৃথিবীর বন্ধ কলুষভরা আবহাওয়াকে পরিষ্কার করে দেয় তেমনি ওদের জীবনের গুমট্‌ও কেটে যেত; কিন্তু বিধাতার বোধ হয় তা ইচ্ছে নয়।

এদিকে আমার ভাগ্যেও যে বিধাতার ঘূর্ণি হাওয়া ঘনিয়ে এসেছে তা তখনও টের পাইনি। দু'চার দিন কেটে গেল; ললিত বা লতার আর দেখা নেই। এদিকে উপন্যাসখানা শেষ করে ফেলেছি, এমন সময় বোম্বাই থেকে ডাক এল। ঘূর্ণি হাওয়ায় গাছের পাতা যেমন বোঁটা থেকে ছিঁড়ে উড়ে যায়, আমি তেমনি উড়ে এসে বোম্বাইয়ে পড়লাম। সেই থেকে বোম্বাইয়ে আছি। ইতিমধ্যে লতা বা ললিতের আর কোনও খবর পাইনি। তাদের জীবনের পরম সমস্যা কি করে সমাধান হল, অথবা সমাধান হল কিনা তার কিছুই জানি না।

কয়েক মাস আগে একবার কলকাতা যেতে হয়েছিল; গিয়ে দিন দশেক ছিলাম।

একদিন সকালবেলা ললিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ললিত এখন মস্ত আর্টিস্ট, অনেক টাকা রোজগার করে; কিন্তু সেই পুরানো বাসাতেই আছে।

আমি গিয়ে দেখি, ললিত সবে ঘুমিয়ে উঠেছে; চুল উস্কখুস্ক, দাড়ি কামায়নি, বসবার ঘরে একলা চা খাচ্ছে। আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধুলো নিলে।

ললিতের ঘরের আর সে ছিমছাম ভাব নেই। ললিতও এই পাঁচ বছরে অনেক বদলে গেছে। চেহারা যে খুব খারাপ হয়েছে তা নয়, কিন্তু কান্তি নেই। সব চেয়ে বেশী পরিবর্তন হয়েছে তার মনে: আগে যা তালশাঁসের মত কচি ছিল তাই আঁটির মত শক্ত হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনটাই আগে চোখে পড়ে।

ললিত প্রথমে আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করল, অভিনয় করতে লাগল যেন সে আগের মতই আছে: কিন্তু অভিনয় বেশীক্ষণ টিক্‌ল না, হঠাৎ এক সময় ভেঙে পড়ল। সে বলল—'ইন্দুদা, আপনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন। আমি বয়ে গেছি—মদ ধরেছি।' এই বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

বুঝতে আমি পেরেছিলাম। শুধু মদ নয়, সব রকম দোষই তার হয়েছে; কিন্তু তবু সে বেপরোয়া বেলেল্লা হয়ে যায়নি। আদর্শ ভ্রষ্ট হওয়ার লজ্জা আর ধিক্কার তার মনে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হয়ে সে আস্তে আস্তে সব কথা বলল। লতার বাবার কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কিন্তু তিনি রাজি হননি। তারপর হঠাৎ একদিন লতাকে নিয়ে তিনি বিলেত যাত্রা করেছিলেন। মাস ছয়েক আর তাঁদের কোনও খোঁজ খবর ললিত পায়নি। ছ'মাস পরে একেবারে মেয়ে জামাই নিয়ে লতার বাবা দেশে ফিরে এলেন। জামাই একজন নবীন বার-অ্যাট্-ল।

লতার বাবার বিচিত্র চরিত্রের কথা ভাবতে লাগলাম। বিপদে পড়লেই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে। তিনি কম বয়সে সাহেবিয়ানা করেছিলেন; মাঝে রক্তের জোর কমবার পর দেশের পুরোনো সংস্কৃতি তাঁকে টেনেছিল; কিন্তু যেই তিনি বিপদে পড়লেন অমনি ছুটে গেলেন যৌবনের পরিচিত ক্ষেত্রে। দলের পাখি একটু শঙ্কিত হলেই নিজের দলে ফিরে যেতে চায়।

লতার সঙ্গে তারপর আর ললিতের দেখা হয়নি। সমাজে মেশা ললিত ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম কিছুদিন সে বেশ শক্ত ছিল। তারপর একদিন কখন্ তার মনের মধ্যে একটা সুতো ছিঁড়ে গেল, সংস্কার আর তাকে তার আদর্শের কোলে ধরে রাখতে

পারল না; বাপ পিতামহের রক্ত ভেসে গেল। মন যতই শক্ত হোক, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন সময় আসে যখন মনে হয়—বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ, মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

যেদিন ললিত লতাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল সেদিন তার বিচার করিনি, আজও তাকে বিচার করবার স্পর্দ্ধা হল না।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছি, ললিত হঠাৎ বলল—'আচ্ছা ইন্দুদা, সে-রাত্রে যদি লতার কথা শুনতাম তাহলেই বোধহয় ভাল হত—না? অন্তত বয়ে যেতাম না।'

আমি বললাম—'ভাই, এ দুনিয়ায় কিসে যে ভাল হয় আর কিসে মন্দ হয় তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি। তবে দেখেছি, বেশীর ভাগ সময়েই ভাল করলে মন্দ হয়; কিন্তু তা বলে সবাই মিলে মন্দ করলেই যে মানবজাতি উদ্ধার হয়ে যাবে এ বিশ্বাসও আমার নেই। গীতায় শ্রীভগবানই খাঁটি কথা বলেছেন—মা ফলেষু।'

দোর পর্যন্ত এসে জিগ্যেস করলাম—'লতারা কোথায় আছে জানো?'

ললিত বলল—'শুনেছি ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডের বাড়িতেই আছে। লতার বাবা বিলেত থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই মারা গেছেন।' এই বলে সে একটু তিক্ত হাসল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ল্যান্‌স্‌ডাউন রোডের বাড়িতে লতাকে দেখতে গেলাম।

বাড়ি বাগান ঠিক আগের মতই আছে, কিছু বদলায়নি। লতাও ঠিক তেমনি আছে, তার স্বভাবে কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধু এই কয় বছরে তার দেহ-মন আরও পরিণত হয়েছে, পরিপূর্ণ হয়েছে।

আমাকে আগের চেয়েও বেশী আদর যত্ন করল। কত কথা জিজ্ঞাসা করল—বোম্বাইয়ে কেমন আছি—কি করচি—কত টাকা রোজগার করি—এই সব। আমাকে অনেকদিন পর পেয়ে তার যেন আনন্দ ধরে না। সরল প্রাণের অকুণ্ঠ আনন্দ।

কিছুক্ষণ পরে একটি বছর তিনেকের মেয়ে ছুটে এসে তার হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়ালো। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি, লতার মত নির্ভীক স্বচ্ছ দুটি চোখ। লতা বলল—'আমার মেয়ে। ওর নাম ললিতা।'

আমি চমকে লতার মুখের পানে তাকালাম। লতা আমার চোখের চকিত প্রশ্ন বুঝতে পারল; একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল—'আপনি যা ভাবছেন তা নয়—ও আমার স্বামীর মেয়ে।'

আমার কান লাল হয়ে উঠল। লতা তখন মেয়েকে বলল—'যাও ললি, খেলা করগে।'

ললিতা চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি সংকুচিতভাবে বললাম—'লতা, যা হতে পারত তার জন্যে তোমার মনে কি কোনও দুঃখ নেই?'

লতা সরলভাবে বলল—'আগে ছিল, এখন আর নেই। যা পাব না তার জন্যে কেঁদে কি হবে মাস্টারমশাই? কিন্তু ভুলিনি। ভুলতে চাইও না। তাই মেয়ের নাম রেখেছি ললিতা।'

তবু আবার জিগ্যেস করলাম—'তুমি মনের সুখে আছ?'

সে একটু যেন অবাক হয়ে বলল—'মনের সুখে থাকব না কেন?'

তারপর লতার স্বামী এলেন। ঢিলা পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরা সুপুরুষ যুবক। লতা পরিচয় করিয়ে দিল—'ইনি আমার মাস্টারমশাই—এ'র কথা তোমাকে

বলেছি—' বলে এমনভাবে স্বামীর মুখের পানে তাকালো যে বুঝতে পারলাম, সেই রাত্রির কথাও লতা স্বামীর কাছে গোপন রাখেনি।

লতার স্বামী হাসিমুখে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। শেষে স্ত্রীকে বললেন—'লতা, ওঁকে সহজে ছেড় না, রাত্রে ডিনার খেয়ে যাবেন। আমার এখন থাকবার উপায় নেই, বাইরের ঘরে মক্কেল বসে আছে; কিন্তু ওঁকে যদি গান গাইতে রাজি করতে পার তাহলে আমি যেন বঞ্চিত না হই। বাইরে খবর পাঠিও।'

সে-রাত্রে ডিনার খেয়ে তবে ওদের হাত থেকে ছাড়া পেলাম। লতা রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত সেদিন আমার গলা দিয়ে বেরুল না। রামপ্রসাদের 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা' গেয়ে ফিরে এলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্যাড্ সঙ্

এক

যে কাজ করিয়া মানুষ নিজে আনন্দ পায় এবং অন্যকে আনন্দ দিতে পারে, সে-কাজের একটা বিচিত্র নেশা আছে। উপরন্তু সেই কাজে যদি স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা। এরূপ কাজ করিবার সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

সোমনাথ নিজের কাজে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল; সিনেমা জগৎ একান্তভাবে তাহার নিজের জগৎ হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের চিন্তা তাহার মনে বড় একটা আসিত না। কদাচিৎ রত্নার কথা মনে আসিলেও সে তাহা জোর করিয়া দূরে সরাইয়া দিত। রত্না প্রাংশুলভ্য ফল, তাহার চিন্তায় উদ্বাহু হইয়া থাকিলে গাছের ফল মাটিতে পড়িবে না, কেবল মন খারাপ হইবে মাত্র। তার চেয়ে বরং যে-ফল ভাগ্যদেবী তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন তাহাই প্রসন্নমনে বহুমানে গ্রহণ করাই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা।

সোমনাথের পরিচালনায় প্রথম ছবি বাহির হইবার পর বৎসরের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ছবি বাহির হইয়া প্রথমটির মতই জনপ্রিয় হইয়াছে। সোমনাথ এখন তৃতীয় ছবির শুটিং লইয়া ব্যস্ত।

মাঘ মাসের আরম্ভ।

পৌষ মাঘ মাসে শীত পড়িবার কথা; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে সহ্যাদ্রির পশ্চিম

দিকে শীত বলিয়া কিছু পড়ে না; আমাদের দেশে আশ্বিন-কার্তিক মাসে যেরূপ ঠাণ্ডা পড়ে, সেইরূপ একটু মোলায়েম ঠাণ্ডা দেখা দেয় মাত্র; কিন্তু এ দেশের লোক, বোধ করি শীত ঋতুর মর্যাদা রক্ষার জন্যই, এই সময় মোটা মোটা গরম জামা পরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রে লেপ গায়ে দেয়।

ছবির শুটিং করার পক্ষে এই সময়টি অতি মনোরম; যদিও শনিবারে কোনও কাজ হয় না। শনিবারে মহালক্ষ্মীর মাঠে ঘোড়দৌড়; সেদিন সিনেমা সম্পর্কিত নরনারীর মন এবং পদদ্বয় অজ্ঞাতসারেই মাঠের অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সিনেমার স্টুডিওগুলি অধিকাংশই শনিবারে কাজ বন্ধ রাখিয়া রবিবারে কাজ করে।

এইরূপ একটা শনিবারে সোমনাথ ও পাণ্ডুরঙ্ স্টুডিওর অফিস ঘরে বসিয়া অলসভাবে গল্প করিতেছিল। শুটিং-এর কাজ সতৈল যন্ত্রের মত নিরুদ্বিগ্ন স্বচ্ছন্দতার সহিত চলিতেছে; আজ তাহাদের স্টুডিওতে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু অভ্যাসের টানে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং অলস বাক্যালাপে দিনটা কাটাইয়া দিতেছে। ঘোড়দৌড়ের প্রতি তাহাদের আসক্তি ছিল না।

অপরাহ্ণের দিকে একটি লোক দেখা করিতে আসিল। লোকটির নাম কুঞ্জবিহারী লাল। ভারী গড়ন, মাংসল মুখ, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু মাথার চুল অর্ধেক পাকিয়া গিয়াছে। লোকটিকে দেখিয়া খুব বুদ্ধিমান মনে হয় না; বড় বড় চোখে যেন একটা অসহায় হারাইয়া-যাওয়া ভাব। তাহার বেশবাস দেখিয়া তার আর্থিক অবস্থাও সমৃদ্ধ বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে না।

কুঞ্জবিহারী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই পাণ্ডুরঙ্ বলিয়া উঠিল—'আরে কুঞ্জবিহারী! কি খবর তোমার?'

কুঞ্জবিহারী হাসিয়া বলিল—'এই আপনাদের কাছে এলাম, যদি কোনও কাজ-টাজ থাকে—'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'কিন্তু শুনেছিলাম তুমি সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান খুলেছ।'

কুঞ্জবিহারী একটু লজ্জিতভাবে বলিল—'মুদির দোকান খুলেছিলাম সত্যি; কিন্তু বন্ধুবান্ধব সবাই ধারে জিনিস নিতে লাগল, তারপর টাকা দিলে না। দোকান উঠে গেল। তাই এখন আবার সিনেমায় ফিরে এসেছি। পেট তো চালাতে হবে যোশীজি।' তারপর সোমনাথকে বলিল—'আপনি নতুন ছবি আরম্ভ করেছেন, ভাবলাম খোঁজ নিয়ে আসি আমার জন্যে ছোটখাট পার্ট যদি কিছু থাকে।'

সোমনাথ পাণ্ডুরঙের পানে তাকাইল, উত্তরে পাণ্ডুরঙ্ একটু ঘাড় নাড়িয়া সঙ্কেত করিল যে কুঞ্জবিহারীকে লওয়া যাইতে পারে।

সোমনাথ তখন বলিল—'সব পার্টই প্রায় বিলি হয়ে গেছে। আপনি কাল আসবেন, দেখি যদি কিছু দিতে পারি।'

কুঞ্জবিহারী প্রস্থান করিলে সোমনাথ বলিল—'কি বল পাণ্ডুরঙ্? দুটি পার্টের এখনও লোক নেওয়া হয়নি, এক পাগলের পার্ট, আর এক পুলিস ইন্সপেক্টর। তোমার কুঞ্জবিহারী অভিনয় করে কেমন?'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'চলনসই।'

'পাগলের পার্ট ছোট হলেও শক্ত; ভাল লোক চাই। ও ইন্সপেক্টরই করুক তাহলে।'

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর কোনও রকমে চালিয়ে দেবে। কুঞ্জবিহারী অভিনয়ের বড় কিছু বোঝে না, কিন্তু লোকটা ভাল। এখন অনেক বদলে গেছে; সাত বছর আগে প্রথম যখন সিনেমায় ঢুকেছিল তখন ওর চরিত্র অন্যরকম ছিল—আরও উৎসাহ ছিল, উচ্চাশা ছিল—এখন যেন একেবারে নিভে গেছে।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাণ্ডুরঙ্

বলিল—'ওর জীবনের যতটুকু জানি তাতে বেশ একটি মজার ট্র্যাজি-কমেডি হয়, কমেডির ভাগই বেশী। কে জানে, হয়তো সব মানুষের জীবনই তাই, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না—'

গল্প আসন্ন বুঝিয়া সোমনাথ দুই পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিল।

অতঃপর চা পান করিতে করিতে পাণ্ডুরঙ্ কুঞ্জবিহারীর জীবনের যে কাহিনী বলিল তাহা এই—

কুঞ্জবিহারী হায়দ্রাবাদের লোক। পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া বেশী শেখেনি। প্রথম যখন বোম্বাই এসেছিল তখন শহুরে আদব কায়দাও ভাল জানতো না; কিন্তু কী তার আগ্রহ, কী তার উৎসাহ! তার দেহাতি ভাব দেখে হাসি পেলেও তার আগ্রহ আর উত্তেজনাকে এড়াবার উপায় ছিল না। সিনেমার হিরোর পার্ট করবে বলে সে বোম্বাই এসেছিল, হিরোর পার্ট না করে সে ছাড়বে না।

তখন কুঞ্জবিহারীর বয়স কম ছিল। মাথার চুল পাকেনি, চেহারাও ওরই মধ্যে ছিমছাম। কোনও রকম বদ্ খেয়াল ছিল না; একটা চৌলে ঘর ভাড়া করে থাকত, আর স্টুডিওতে স্টুডিওতে হিরো হবার উমেদারি করে বেড়াতো।

কিন্তু হিরো সাজতে গেলে গুণ চাই, নয়তো মুরুব্বি চাই। কুঞ্জবিহারীর কোনটাই ছিল না। তাই তাকে হিরোর পার্ট দিতে কেউ রাজি হল না। বাধ্য হয়ে কুঞ্জবিহারী ছোটখাট পার্ট করতে লাগল; কিন্তু সে আশা ছাড়ল না; হিরো সাজবার অবিচলিত লক্ষ্য নিয়ে জোঁকের মত লেগে রইল।

আমি তখনও পিলের স্টুডিওতে ঢুকিনি; কোথাও বাঁধা কাজ করি না। সব স্টুডিওতেই যাতায়াত ছিল। যেখানেই যেতাম, দেখতাম ডিরেক্টরের কাছে কুঞ্জবিহারী গরুড় পক্ষীর মত বসে আছে। সব ডিরেক্টরই মনে মনে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আমাদের ডিরেক্টরদের আর যে দোষই থাক না কেন, মোসায়েবকে স্পষ্ট কথা বলে বিদেয় করে দেবে এমন লোক তারা নয়। কুঞ্জবিহারীও অস্পষ্ট আশ্বাসের মিথ্যে কুহকে ভুলে তাদের পিছনে লেগে রইল।

এইভাবে বছর তিনেক কেটে গেল।

সিনেমা সমাজের সবাই খোলাখুলি ভাবে কুঞ্জবিহারীকে টিট্‌কিরি দিত; কিন্তু সে গায়ে মাখত না। আমার সঙ্গে তার খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল না; কিন্তু আমি কোনও দিন তাকে টিট্‌কিরি দিইনি বলেই বোধহয় সে মাঝে মাঝে আমার কাছে তার মনের কথা বলত। কখনও বলত—'যোশীজি, এবার সব ঠিক হয়ে গেছে; অমুক ডিরেক্টর পরের ছবিতে আমাকে হিরোর পার্ট দেবেন বলেছেন। তাঁর মেয়ের বিয়েতে আপনি তো গিয়েছিলেন; দেখেছিলেন তো আমার হাতেই তিনি সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার ওপর খুশি হয়েছেন। এবার আর ফস্কাবে না।' আবার কখনও বলত—'অমুক ডিরেক্টর বলেছেন, পরের ছবিতে ঠিক আমার মত চেহারার হিরো তাঁর চাই। এ ছবিতে তাই তাঁর খাতিরে ছোট পার্ট ক'রে দিচ্ছি।'

তার কথা শুনে হাসিও পেতো, আবার সবাই মিলে তাকে বানর বানাচ্ছে দেখে রাগও হত। একদিন আর থাকতে না পেরে আমি বললাম—'দ্যাখো কুঞ্জবিহারী, একটি কাজ যদি করো তা হলেই তুমি হিরো হতে পারবে, নইলে কোনও আশা নেই।'

আগ্রহভরে কুঞ্জবিহারী বলল—'কি কাজ?'

বললাম—'দেখেশুনে একটি সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করে ফ্যালো। তবেই তোমার বরাত ফিরবে।'

কুঞ্জবিহারী ভর্ৎসনার সুরে বলল—'যোশীজি, আপনিও আমাকে ঠাট্টা করছেন?'

বললাম—'ঠাট্টা করিনি, সত্যি কথা বলছি।' দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই ছিল, দু'

তিনটে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম—'এরা কী করে বড় হল? স্রেফ বৌয়ের জোরে। তুমিও যদি ত্রিভুবন-বিজয়ী হতে চাও, তাহলে লজ্জা ত্যাগ করতে হবে।'

কথাটা যে কুঞ্জবিহারীর মনে ধরেছিল তার প্রমাণ পেলাম মাস ছয়েক পরে। মাঝে কয়েক মাস তার দেখা পাইনি, ভেবেছিলাম সে বুঝি হতাশ হয়ে সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ একদিন একটা স্টুডিওতে গিয়ে দেখি, কুঞ্জবিহারী বসে আছে, তার সঙ্গে একটি তরুণী।

কুঞ্জবিহারীর মুখে গালভরা হাসি। আমাকে দেখে সগর্বে পরিচয় করিয়ে দিল—'ইনি আমার স্ত্রী—রোহিণী দেবী।'

রোহিণী দেবীর চেহারার চটক আছে, চোখে চটুল চাউনি, বয়স উনিশ-কুড়ি। তাকে সিনেমা ক্ষেত্রে আগে কখনও দেখিনি; অবাক হয়ে গেলাম।

কুঞ্জবিহারীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—'এটিকে কোত্থেকে যোগাড় করলে?'

কুঞ্জবিহারী তখন তার স্ত্রীর সংগ্রহের ইতিহাস বলল।

রোহিণী কুঞ্জবিহারীর গাঁয়ের মেয়ে—বিধবা। গাঁয়ের মেয়ে হলেও মনটা তার ছিল শহুরে—প্রগতিপন্থী। তার মামার বাড়ি শহরে, প্রায়ই সে মামার বাড়ি যেত, শহরের আবহাওয়াতে আধুনিক দুনিয়ার পরিচয় পেয়েছিল—ঘুরিয়ে কাপড় পরতে পারতো, গান গাইতে শিখেছিল—

রোহিণীর গানের কথায় কুঞ্জবিহারী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—'ওর স্যাড্ সঙ্ যদি একবার শোনেন যোশীজি, গলে যাবেন। অমন স্যাড্ সঙ্ সিনেমায় আর কেউ গাইতে পারে না।'

গাঁয়ের রসিক ছোকরারা রোহিণীর স্যাড্ সঙ্ শুনেছিল, সকলেরই তার ওপর নজর ছিল; কিন্তু বিধবাকে বিয়ে করতে কেউ রাজি ছিল না। তাই রোহিণীর জীবন যৌবন স্যাড্ সঙ্ সবই গাঁয়ের আবহাওয়ায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় কুঞ্জবিহারী গাঁয়ে ফিরে গেল। রোহিণীর সঙ্গে তার দেখা হল, স্যাড্ সঙ্ শুনে সে গলে গেল। আমি কুঞ্জবিহারীর মস্তিষ্কে যে বীজ বপন করেছিলাম তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু গাঁয়ে কুঞ্জবিহারীর খুড়ো আছেন, তিনি বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে মার-মার করে উঠলেন। গাঁয়ের মোড়ল তিনি, এমন অনাচার কখনই ঘটতে দেবেন না। রোহিণীর বাপের মনে যদি বা একটু ইচ্ছে ছিল, বেগতিক দেখে তিনিও রুখে দাঁড়ালেন, মেয়েকে দু'এক ঘা শাসন করলেন।

কুঞ্জবিহারী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাকে সিনেমার হিরো সাজতে হবে, রোহিণীর মত একটি বৌ তার চাইই। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখা শোনা হতে লাগল। রোহিণীও সিনেমার নামে পাগল। মিঞা বিবি রাজি, কাজেই কাজীরা আর কী করবেন? একদিন গভীর রাত্রে কুঞ্জবিহারী রোহিণীকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এল।

তারপর শহরে এসে আর্য সমাজী মতে তাদের বিয়ে হয়েছে।

আমি কুঞ্জবিহারীর পিঠ চাপড়ে বললাম—'সাবাস, এবার আর কেউ তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

তারপর কুঞ্জবিহারী মহা উৎসাহে স্ত্রীকে নিয়ে স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেখানে যাই, দেখি সস্ত্রীক কুঞ্জবিহারী উপস্থিত; কখনও ওজস্বিনী ভাষায় ডিরেক্টরকে স্যাড্ সঙের মহিমা বোঝাচ্ছে, কখনও বা প্রডিউসারকে রোহিণী দেবীর গান শোনাতে গিয়ে নিজেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছে। রোহিণীর গলাটি অবশ্য মন্দ নয়। তবে অশিক্ষিত গলা; মাজলে ঘষলে ভালই দাঁড়াতো।

দেখলাম ডিরেক্টরেরা বেশ নরম হয়েছেন; রোহিণীকে হিরোইনের ভূমিকায় ট্রাই দিতে অনেকেরই আপত্তি নেই; কিন্তু এদিকে কুঞ্জবিহারী বদ্ধপরিকর; নিজে হিরোর পার্ট না পেলে সে রোহিণীকে হিরোইনের পার্ট করতে দেবে না। ডিরেক্টরেরা কাজেই পিছিয়ে যাচ্ছেন। কুঞ্জবিহারীকে হিরো করার মত বুকের পাটা কারুর নেই।

কয়েক মাস এইভাবে কাটল। কুঞ্জবিহারীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। একদিন সে গাল-ভরা হাসি নিয়ে বলুল—'সব ঠিক করে ফেলেছি যোশীজি। আসছে হপ্তায় আমার ছবির মহরত।'

বললাম—'বল কি! কার ঘাড় মট্‌কালে?'

কুঞ্জবিহারী বলল—'একজন ফিনান্‌শিয়ার পাক্‌ড়েছি।'

'বেশ বেশ। শেষ পর্যন্ত হিরো হয়ে তবে ছাড়লে!'

সে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল—'একটু গোলমাল হয়েছে, এ ছবিতে আমি হিরো হব না। আমি ছবি ডিরেক্ট করব।'

'সে তো আরও ভাল। রোহিণী দেবী হিরোইন সাজবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর হিরো?'

'ফিনান্‌শিয়ারের ছেলেকে এবার হিরোর পার্ট দিতে হবে। তার বাবা টাকা দিচ্ছে—তাই—বুঝতেই তো পারছেন। এই একটা ছবি হয়ে যাক না, কিছু টাকা জমিয়ে নিই, তারপর নতুন কোম্পানী খুলব। কোম্পানীর নাম দেব কুঞ্জরোহিণী চিত্রশালা। তখন—'

সিনেমার সোনার খনির খাদে যাদের বাস, সোনালি স্বপ্ন দেখা তাদের অভ্যাস; কিন্তু বোকা কুঞ্জবিহারীর জন্যে দুঃখ হল। তার ভবিষ্যৎ কোন্ পথে চলেছে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। আহা বেচারা, জীবনে একটা সুযোগ পেয়েছে, কিছুদিন ভোগ করে নিক। কুঞ্জবিহারীর পরিচালনায় ছবি যে কেমন হবে তা তো বোঝাই যায়।

ক্রমে দু'চারটে গুজব কানে আসতে লাগল। কুঞ্জবিহারী ডিরেক্টর হয়েছে বটে কিন্তু আসলে সে সাক্ষীগোপাল; ফিনান্‌শিয়ারের ছেলেই সব কিছু করে। ছোঁড়া ভারি তুখোড়—নাম দীপচাঁদ। রোহিণী দেবীকে সে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে; তাদের ঘনিষ্ঠতা নাকি তোমাদের নীতিশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে গেছে।

সিনেমার ক্ষেত্রে এটা কিছু নতুন কথা নয়। চারিদিকে কাঁচাখেকো দেবতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, নতুন মেয়ে দেখলে আর রক্ষে নেই। দীপচাঁদ যদি বা সাধু ব্যক্তি হত, অন্য কেউ না কেউ জুটে যেতই। তাছাড়া রোহিণীকে এক নজর দেখেই বুঝেছিলাম, চিরজীবন কুঞ্জবিহারীর ঘর করবে এমন মেয়ে সে নয়। পাড়াগাঁয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে শহরের উঁচু ধাপে ওঠবার জন্য সে কুঞ্জবিহারীর সাহায্য নিয়েছিল, আবার কুঞ্জ-বিহারীর গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও উঁচু ধাপে ওঠবার জন্যে সে স্বচ্ছন্দে অন্য লোকের সাহায্য নিতে পারে। বাঘিনী প্রথম মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে—

কুঞ্জবিহারী কিন্তু রোহিণীকে ভালবাসতো। কত ভালবাসতো তার পরিচয় একদিন পেলাম। তখনও রোহিণী আর দীপচাঁদের ব্যাপার কানাঘুষোর মধ্যেই আছে, ধোঁকার টাটি একেবারে ভেঙে পড়েনি। সেদিন আমার কোনও কাজ ছিল না, ভাবলাম—যাই দেখে আসি কুঞ্জবিহারী কেমন শুটিং করছে। স্টুডিওর ভেতর ঢুকে দেখি, সেটের ওপর গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বেধে গেছে। প্রথমটা ভেবেছিলাম বুঝি কুস্তির দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে তারপর দেখলাম, না, সত্যিকার লড়াই চলছে। স্টুডিওসুদ্ধ লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে।

দাঁড়িয়ে দু'জনের মধ্যে একজন আমাদের কুঞ্জবিহারী, অন্য লোকটাকে চিনি না। পরে জানতে পেরেছিলাম, একজন অভিনেতা। দু'জনে মরীয়া হয়ে লড়াই করছে; রক্তারক্তি কাণ্ড। যাহোক, আমি গিয়ে যুদ্ধ থামালাম, কুঞ্জবিহারীকে অতি কষ্টে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলাম।

'কী হয়েছিল?'

কুঞ্জবিহারী তখনও গজরাচ্ছে; বলল—'পাজি বজ্জাৎ সব! আমার বৌয়ের নিন্দে করছিল—রোহিণী দেবীর নামে কুৎসিত অপবাদ দিচ্ছিল—'

বললাম—'ঠাণ্ডা হও। লোকের সঙ্গে মারপিট করলে বদনাম কমবে না, বাড়বে।'

সে হঠাৎ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—'কী অন্যায় দেখুন তো বোশীজি। রোহিণী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ভালমানুষ, এখনও সহবত শেখেনি; পুরুষদের সঙ্গে কি ভাবে মেলামেশা করতে হয় ভাল জানে না, তাই একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা করে ফ্যালে। তা বলে তার নামে এত বড় মিথ্যে অপবাদ দেবে?'

বললাম—'ভারি অন্যায়। তুমি গায়ে মেখো না।'

সে বলল—'সত্যি বলছি আপনাকে, রোহিণী ভারি ভাল মেয়ে। কখনও আমি ওর বেচাল দেখিনি। তবু কেন বাইরের লোক ওর দুর্নাম দেবে? কেন বলবে যে দীপচাঁদের সঙ্গে ওর—'

কুঞ্জবিহারী আবার তেরিয়া হয়ে উঠল।

সেদিন কোনও রকমে তাকে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করলাম, কিন্তু ভবিতব্য যাবে কোথায়? কয়েকদিন পরে শুনলাম, দীপচাঁদ তাকে ছবির ডিরেক্টরের পদ থেকে বরখাস্ত করেছে, আর রোহিণীকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাসায় তুলেছে।

তারপর কতরকম গুজব কানে আসতে লাগল। কুঞ্জবিহারী নাকি জোর করে দীপচাঁদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিল, দীপচাঁদের দারোয়ানেরা তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। কুঞ্জবিহারী পুলিসে এত্তালা করেছে, এবার মোকদ্দমা করবে, ইত্যাদি। তারপর যা হয়ে থাকে—আস্তে আস্তে সব চাপাচুপি পড়ে গেল। কুঞ্জবিহারীর বৌ-চুরি এমন কিছু মহামারী ব্যাপার নয় যে তাই নিয়ে লোকে চিরকাল মশগুল থাকবে।

অনেকদিন পরে আবার কুঞ্জবিহারীর সঙ্গে দেখা হল। ঝোড়ো কাকের মত চেহারা, চোখে আধ-পাগল চাউনি। সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম তার চুলে পাক ধরেছে।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'কী আর করবে কুঞ্জবিহারী, দুনিয়ায় এমন কত হয়। পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীজাতির চরিত্র—'

সে বলল—'রোহিণীর কোনও দোষ নেই। সে গাঁয়ের মেয়ে, তার কতটুকু বুদ্ধি? ঐ হতভাগা নচ্ছার দীপচাঁদ তাকে ভুলিয়ে—'

অন্ধকে চক্ষুদান করা আমার কাজ নয়; আমি সে-চেষ্টা করলাম না।

তারপর যথাসময়ে রোহিণীর ছবি বার হল। এই ছবিই রোহিণী দেবীর একমাত্র কীর্তি, আর দ্বিতীয় ছবিতে নামবার অবকাশ তার হয়নি। বলা বাহুল্য ছবিটি বোম্বাইয়ে হপ্তাখানেক চলবার পর বন্ধ হয়ে গেল। বেশীদিন চলবার শক্তি তার ছিল না। তবে সিনেমা মহলে নবাগত রোহিণীর বেশ নাম হল।

এরপর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। লোকে নানা কথা বলে; কেউ বলে দীপচাঁদ রোহিণীকে বিষ খাইয়েছিল, কেউ বলে রোহিণী আত্মহত্যা করেছিল। মোট কথা একদিন শোনা গেল রোহিণী মরেছে। উদীয়মানা অভিনেত্রীর অকাল মৃত্যুতে কাগজপত্রে একটু লেখালেখি হল।

ভাবলাম কুঁজবিহারীর দিক থেকে ঘটনাটা এমন কিছু মন্দ হল না; ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই। রোহিণী যতদিন বেঁচে থাকতো কুঁজবিহারীর বুকের কাঁটা খচ্ খচ্ করত। এ বরং ভালই হল।

মাস ছয় সাত পরে দাদর স্টেশনে কুঁজবিহারীর সঙ্গে দেখা হল। তেমনি উস্ক-খুস্ক ভাব, মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে। বললে, সিনেমা ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান খুলেছে।

রোহিণীর কথা আর তুললাম না; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে লাভ কি? একথা সেকথার পর জিগ্যেস করলাম—

'কোথাও যাচ্চ নাকি?'

সে বলল—'হ্যাঁ, একবার বোরিভ্লি যাচ্চি।'

'হঠাৎ বোরিভ্লি? সেখানে কেউ আছে নাকি?'

কুঁজবিহারী একটু ইতস্তত করে বলল—'না, সিনেমা দেখতে যাচ্চি।'

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে অপ্রস্তুতভাবে বলল—'রোহিণী দেবীর ছবিটা সেখানে দেখানো হচ্চে—বড় বড় শহরে তো ও ছবি আর দেখানো হয় না...রোহিণীকে অনেকদিন দেখিনি...তার স্যাড্ সঙ্ শুনিনি—' বলতে বলতে কুঁজবিহারীর গলা বুজে এল।

এই সময় লোকাল ট্রেন এসে দাঁড়ালো। কুঁজবিহারী একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসল।

পাণ্ডুরঙের গল্প শেষ হইবার পর সোমনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিল—'কুঁজবিহারীকে পাগলের পার্টই দেওয়া যাক।'

পাণ্ডুরঙ্ বলিল—'ও কিন্তু পারবে না।'

সোমনাথ বলিল—'কেন পারবে না? আমরা মেজে ঘষে ঠিক তৈরি করে নেব।'

পাণ্ডুরঙ্ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিরোইন

এক

অনেকগুলি নবীনা অভিনেত্রী সোমনাথকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। নব-বসন্তে যেমন প্রজাপতির ঝাঁক আসিয়া প্রস্ফুটিত গোলাপকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্যোৎসব শুরু করিয়া দেয়, গন্ধে বিহ্বল হইয়া কেবল উড়িয়া উড়িয়া ফুলকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি এই তরুণীগুলি সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়া বসন্তোৎসবের সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

অন্যায় করে নাই; কারণ আজ বসন্তোৎসব—হোলি। এই মেয়েগুলির দেহে যেমন যৌবনের মদশ্রী, মনেও তেমনি অফুরন্ত রঙ্গরস। সকলে সুন্দরী নয়, কিন্তু সকলেরই অন্তরে রসোল্লাসের মাদকতা তাহাদের কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাহারা একজোট হইয়া, রঙ ও আবীরের হাতিয়ারে সজ্জিত হইয়া সোমনাথের অফিস আক্রমণ করিয়াছিল এবং সোমনাথকে একাকী পাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দিয়াছিল। হাসির লহর, পিচকারির তরল বর্ণ-স্ফুরণ আবীর গুলালের চূর্ণোচ্ছ্বাস চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে রঙীন তরঙ্গ তুলিয়াছিল।

সোমনাথ এখন সিনেমা রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; সকলেই তাহাকে চেনে, সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করে। এই মেয়েগুলির সহিত কর্মসূত্রে সোমনাথের পরিচয় আছে; প্রত্যেকটি মনে মনে তাহার প্রতি প্রীতিমতী। তাই আজ হোলির সূত্র ধরিয়া তাহারা তাহার সর্বাঙ্গে প্রীতির ঝারি উজাড় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

অন্যের প্রীতি নিজের মনেও প্রীতির সঞ্চার করে। মেয়েরা চলিয়া গেলে সোমনাথ ভিজা কাপড়-চোপড় পরিয়াই বসিয়া রহিল এবং স্মিতমুখে তাহাদের কথা ভাবিতে লাগিল। ইহারা কেহ শ্যামলী কেহ গৌরী; কেহ প্রগল্‌ভা, কেহ বা ঈষৎ গর্বিতা। সোমনাথ শুধু ইহাদের চেনেই না, ইহাদের জীবনের গূঢ় কথাগুলিও তাহার জানা আছে। সিনেমা সমাজে কাহারও কোনও কথা গোপন থাকে না, সকলেই কাচের ঘরে বাস করে। ইহাদের জীবনে নিন্দার কথা অনেক আছে; কেহই নিষ্কলঙ্ক নয়, কেহই সতীসাধ্বী নয়। তবু—

ইহাদের নারীত্ব অবহেলার বস্তু নয়; সোমনাথ ইহাদের ঘৃণা করিতে পারে না! সত্য ইহারা নারীত্বের ব্যবসা করে কিন্তু পণ্য মাত্রেই কি হেয়? ফুলও তো বাজারে বিক্রয় হয়; ফুল কি হেয়?

সোমনাথের মনের চিত্রপটে মেয়েগুলি একটি একটি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাদের হাসি, চাহনি, দেহভঙ্গিমা—তাহাদের চমক-ঠমক—

সোমনাথ মনের মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল।

'কি দোস্ত, একেবারে তন্ময় হয়ে গেছ যে!'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। পাণ্ডুরঙ্ বাহির হইতে আসে নাই, অফিসেই ছিল। তরুণীপুঞ্জের আকস্মিক আক্রমণে সে আত্মরক্ষার্থে পাশের ঘরে লুকাইয়াছিল। তরুণীরাও সোমনাথকে পাইয়া আর কাহারও খোঁজ লয় নাই। এখন বিপদ কাটিয়াছে দেখিয়া পাণ্ডুরঙ্ গুটি গুটি পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সোমনাথের সম্মুখে বসিয়া পাণ্ডুরঙ্ দুষ্টামিভরা হাসিল;—'যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ধ্যানের পাত্রী বটে। তা—কোন্‌টির ধ্যান হচ্ছিল?'

সোমনাথ অপ্রস্তুতভাবে বলিল—'আরে না না—'

'পীরের কাছে মাম্‌দোবাজি চলে না, সে চেষ্টা কোরো না। আর এতে লজ্জারই বা আছে কি? এতদিনে যদি তোমার প্রাণে রঙ ধরে থাকে—'

'কী পাগলের মত বক্‌ছ।'

'ভাই সোমনাথ, তোমাকে আমার জীবনের ফিলজফি বলি শোনো। তোমাদের ঐ সংকীর্ণ অনুদার যৌন-নীতি আমি মানি না। এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার আদর্শ; অর্জুন আমার আদর্শ। আরও অনেক বড় বড় আদর্শ আছে। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি; সে আমার গৃহদেবতা; কিন্তু তাই বলে আমি অন্য মেয়ের পানে চোখ তুলে চাইব না, এত অধম আমি নই। তুমি এতদিন নিজের পথে চলেছ, আমি কোনও দিন তোমাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করিনি; কিন্তু আজ যদি তোমার ভিন্ন পথে চলবার ইচ্ছে হয়ে থাকে, আমি বাধাও দেব না। এসব তুচ্ছ জিনিস, এদের বড় ক'রে দেখতে নেই। আসল কথা হচে, দিল খাঁটি হওয়া চাই, ইমান দুরুস্ত্ থাকা চাই। তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব। তোমার যদি কারুর ওপর মন পড়ে থাকে তাতে লজ্জার কিছু নেই। ওটা বয়সের ধর্ম, প্রকৃতির লীলা—'

'চুপ কর পান্ডুরঙ্, ওসব কথা আমার ভাল লাগে না।'

'তুমি মনকে চোখ ঠারছ সোমনাথ। একদিন ঘাড় মুচড়ে পড়বেই, তার চেয়ে চোখ খুলে পড়া ভাল। ঐ যে মেয়েগুলো আজ এসেছিল ওদের প্রত্যেকের মনের কথা আমি জানি। তোমার জন্যে ওরা পাগল। ওরা যখন পরের বাহুতে বাঁধা থাকে তখনও ওরা তোমার কথা ভাবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওরা তোমার স্বপ্ন দেখে—'

'ছি পান্ডুরঙ্'—সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল—'তুমি আমাকে লোভ দেখাবার চেষ্টা করছ।'

পান্ডুরঙ্ নিশ্বাস ফেলিল।

'লোভ দেখাইনি ভাই, অদৃষ্টের কথা ভাবছি। কেউ চেয়ে পায় না, আবার কেউ পেয়েও চায় না—এই দুনিয়া; কিন্তু যৌবনকে বঞ্চনা করলে আখেরে ভাল হয় না সোমনাথ; অন্তরের ভুখা ভগবান একদিন প্রতিশোধ নেবে—'

সোমনাথ আর দাঁড়াইল না, বাড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময় পান্ডুরঙ্‌কে গম্ভীর কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া গেল—'তুমি একটা নরকের কীট।'

কিন্তু মুখে যত ভর্ৎসনাই করুক মনের কাছে তো লুকোচুরি চলে না। সোমনাথ মনে মনে এই মেয়েগুলির রূপযৌবনের চিন্তা করিতেছিল ইহা সে নিজে কি করিয়া অস্বীকার করিবে? নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়া তাহার অন্তরাত্মা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ছি ছি ছি। সে এ কি করিতেছে। তাহার মন তাহার একান্ত অজ্ঞাতসারে এ কোন্ আঁস্তাকুড়ে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে।

তাহার মন তো এমন ছিল না। তিন বছর আগে যখন সে এই সিনেমা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার মন দৃঢ় ছিল, নির্মল ছিল; পরস্ত্রীর প্রতি লুব্ধতা তাহার ছিল না। মন লইয়া সে গর্ব করিতে পারিত; কিন্তু আজ এ কি হইয়াছে! কোন্ শিথিলতার ছিদ্রপথে এই দৌর্বল্য তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে? সব চেয়ে আশ্চর্য, তাহার মনে যে এমন ঘুণ ধরিয়াছে তাহা সে নিজেই এতদিন জানিতে পারে নাই।

লম্পট! কথাটা মনে আসিতেই তাহার শরীর সংকুচিত হইয়া উঠিল। লোকে তাহাকে আড়ালে লম্পট বলিবে, প্রকাশ্যে চোখ টিপিয়া হাসিবে। ভদ্রলোকেরা তাহাকে দেখিয়া স্ত্রী-কন্যা সামলাইবে। আর রত্না—সে কি ভাবিবে? ছি ছি ছি!

বাড়ি ফিরিয়া সোমনাথ ভিজা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া স্নান করিতে গেল। অশান্ত বিবেক-পীড়িত মন, অথচ বাড়িতে কথা কহিবার একটি লোক নাই; দিদি জামাইবাবু এখনও পুণায় আছেন।

স্নান করিতে করিতে তাহার ইন্দুবাবুর কথা মনে পড়িল। ইন্দুবাবু একদিন তাহাকে ললিত ও লতার কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। ললিতও ভাল ছেলে ছিল—

বৈকালবেলা সোমনাথ আবার মোটর লইয়া বাহির হইল; ইন্দুবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দুবাবু তক্তোপোশের উপর পদ্মাসনে বসিয়া একটি লম্বা-চওড়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সোমনাথকে দেখিয়া বই সরাইয়া রাখিলেন।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'কি বই পড়ছেন?'

ইন্দুবাবু একটু অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিলেন—'গীতা। একটা নতুন এডিশন বেরিয়েছে—বেশ ভাল। তাই নেড়ে-চেড়ে দেখছিলাম।' বইখানা আবার টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিতে লাগিলেন—'বঙ্কিম চার অধ্যায়ের বেশী টীকা লিখে যেতে পারেননি, বাঙলাভাষার দুর্ভাগ্য। যদি শেষ করতে পারতেন, অমর গ্রন্থ হত।'

গীতা সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও জ্ঞানই ছিল না। গীতা ভগবদ্ বাক্য, যাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র দর্শন পড়ে তাহারা পাশ্চাত্য দর্শন মুখস্থ করে কিন্তু ষড়্দর্শনের খোঁজ রাখে না। সোমনাথেরও মনের ও-দিকটা অন্ধকারই ছিল। ইন্দুবাবু কথাপ্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যে আলোচনা করিতে লাগিলেন সে তাহা বিশেষ কিছু বুঝিল না, কেবল নীরবে শুনিয়া গেল।

ইন্দুবাবু এক সময় বলিলেন—'আমাদের দর্শনশাস্ত্র পড়বার সময় একটা বড় অসুবিধা হয়—পরিভাষা নিয়ে। কখন কোন পারিভাষিক শব্দ কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা বোঝা শক্ত। টীকাকারেরাও সবাই নিজের কোলে ঝোল টেনেছেন, নানা মুনির নানা মত। এই দ্যাখো না, গীতায় এক জায়গায় বলা হয়েছে—'বিষয় বস্তুর ধ্যান করতে করতে পুরুষের সেই বিষয় আসক্তি জন্মায়; আসক্তি থেকে কাম জন্মায়; কাম থেকে ক্রোধ; ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম; স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশের ফলে মানুষ বিনাশ পায়।' এই শ্লোকগুলিতে সব কথারই মানে বোঝা যায়, কেবল স্মৃতিবিভ্রম ছাড়া। এই স্মৃতিবিভ্রম বলতে ঠিক কি বোঝায় তুমি বলতে পার?'

সোমনাথ বলিল—'স্মৃতিবিভ্রম কথার সাধারণ মানে তো—'

ইন্দুবাবু বলিলেন—'সাধারণ মানে এখানে চলবে না, এটা পারিভাষিক শব্দ। আমার কি মনে হয় জানো? ইংরাজিতে যাকে sense of values বলে সেই মূল্যবোধ হারানোর নামই স্মৃতিবিভ্রম। মানুষ যখন এই জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে তখন তাকে রক্ষা করা শিবের অসাধ্য। তোমার কি মনে হয়?'

সোমনাথ উঠিয়া পড়িল—'আমি এসব কিছু বুঝি না। আচ্ছা, আর একদিন আসব। আপনি শাস্ত্রচর্চা করুন।' বলিয়া সে বিদায় লইল।

আজ সোমনাথ ইন্দুবাবুর কাছে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই; তাহার অস্থির মন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল ইন্দুবাবুর সঙ্গে সাধারণ-ভাবে কথাবার্তা বলিলেই তাহার মনটা সুস্থ হইবে; কিন্তু ইন্দুবাবুকে গীতায় মশগুল দেখিয়া সে নিরাশ হইল। তাহার মনের যে অবস্থা তাহাতে এই জাতীয় সূক্ষ্ম আলোচনা তাহার অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল। সোমনাথের মনে কোনও সজ্ঞান ধর্মবোধ ছিল না, এ বয়সে তাহা থাকে না। যাহা ছিল তাহা রক্তগত শুচিতার সংস্কার। এই সংস্কারই তাহাকে অনেক বিপদে আপদে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিলে জন্মগত সংস্কারও পঙ্গু হইয়া পড়ে—মূল্যবোধ বিকৃত হয়। সোমনাথ যদি মন দিয়া গীতাবাক্য শুনিত তাহা হইলে হয়তো তাহার বর্তমান সংকটও অনেকটা সরল হইয়া যাইত; কিন্তু সে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় নিয়তির

দ্বারা চালিত হইতেছিল। তাহার ভাগ্যদেবী তাহাকে লইয়া আবার নূতন খেলা খেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন।

মোটরে লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে আবার স্টুডিওতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্টুডিওতে আজ ছুটি; কাজকর্ম কিছু নাই। তবু এই স্টুডিও তাহার মনের চারিপাশে এমন শিকড় বিস্তার করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে যে কাজে অকাজে এ স্থানটি ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। হানা বাড়ির মত ইহার একটি অনিবার্য মোহ আছে।

কিন্তু স্টুডিওতে পৌঁছিয়াই একটা সংবাদ বোমাবিস্ফোরণের মত তাহাকে প্রায় মূর্ছাহত করিয়া দিল। শম্ভুলিঙ্গ মহাশয় হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিলেন—'সোমনাথবাবু, আমার কি হবে? রুস্তমজি মারা গেছেন।'

'কী?'

'হ্যাঁ—এই ঘণ্টাখানেক হল। আজ হোলি; বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব মদ খেয়েছিলেন, হঠাৎ হার্ট ফেল করে গেছে।'

সোমনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

রুস্তমজির মৃত্যু যেন চোখে আঙুল দিয়া সোমনাথকে পথ দেখাইয়া দিল।

তারপর এক হপ্তা কাটিয়াছে। রুস্তমজি উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাই ইতিমধ্যেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মামলা শুরু হইয়া গিয়াছে। স্টুডিও আদালতের হেফাজতে রাখিবার কথা হইতেছে।

সোমনাথ অন্য অনেক চিত্র-প্রণেতার নিকট হইতে সাদর আমন্ত্রণ পাইতেছে; সকলেই তাহার হাতে চিত্র রচনার ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে প্রস্তুত; সোমনাথ এই সাত দিনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ছক কাটিয়া যাত্রাপথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে; কোনও প্রলোভনই আর তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

এই কয় বৎসরে সে যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা তাহার সঞ্চয় হইয়াছে। একটা মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়? উপরন্তু তাহার কর্মজীবন এখন তো শেষ হইয়া যাইতেছে না।

জামাইবাবুকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া সে ডাকে দিল। তারপর বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে বিদায় লইল। পাণ্ডুরঙ্‌কে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—'কলকাতায় চললাম। আমার মোটরটা তুমি ব্যবহার কোরো।'

পাণ্ডুরঙ্‌ ভারী গলায় বলিল—'তুমি যেখানেই যাও, আমার ভালবাসা তোমার সঙ্গে থাকবে।'

দুই

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোমনাথ হ্যারিসন রোডের একটি ভাল হোটেলে উঠিল। তাহার চেহারা দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু সোমনাথ আত্মপরিচয় দিয়া একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিতে রাজি নয়। বিখ্যাত অভিনেতা সোমনাথ চৌধুরী কলিকাতায় আসিয়াছে একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, তাহার আর প্রাণে শান্তি থাকিবে না, সময়ে অসময়ে লোক দেখা করিতে আসিবে; কাগজে লেখালেখি হইবে।

সে হোটেলের খাতায় ছদ্মনাম লিখাইল।

তারপর তাহার কাজ আরম্ভ হইল। বসিয়া থাকার কাজ নয়; অনেক ছুটাছুটির কাজ। উকিলের সহিত পরামর্শ, সরকারী দপ্তরে ঘাঁটাঘাঁটি, বড় বড় বিলাতী সওদাগরী অফিসে যাতায়াত, কলকব্জা খরিদ। তিন চার বার তাহাকে কলিকাতার বাহিরেও যাইতে হইল।

এইভাবে মাস দেড়েক কাটিল। তারপর একদিন হোটেলের সম্মুখেই একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল।

'সোমনাথ! তুমি হেথায়?'

ইনি সেই শিক্ষক-বন্ধু, যিনি সোমনাথের প্রথম ছবি বাহির হইবার পর প্রশস্তি জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গান্তরে মিষ্টান্ন দাবি করিয়াছিলেন। ইনি জামাইবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সোমনাথ বন্ধুকে হোটেলে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইল। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ; দুই বন্ধুতে অনেক মনের প্রাণের কথা হইল; কিন্তু সোমনাথ নিজের বর্তমান বৈষয়িক ভাবান্তরের কথা কিছু ভাঙিল না।

বন্ধু এক সময় জিজ্ঞাসা করিলেন—'হঠাৎ এ সময় এলে যে! রত্নাকে দেখতে?'

'রত্নাকে দেখতে! কেন, কি হয়েছে রত্নার?'

'সে কি, তুমি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম—'

'না, আমি কিছু জানি না।'

বন্ধু বিস্মিত হইলেন—'রত্না প্রায় এক বছর হল ভুগছে।'

'কি হয়েছে?'

'সত্যি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম রত্না আর তোমার মধ্যে একটা বোঝা-পড়া—'

'না, তুমি ভুল বুঝেছ। রত্নার সঙ্গে আমার কোনও বোঝাপড়া নেই। সে মাঝে বার দুই বোম্বাই গিয়েছিল, দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত।—কিন্তু তার অসুখটা কী?'

বন্ধু সাবধানে বলিলেন—'তা ভাই আমি ঠিক জানি না। তবে শরীর সুস্থ নয়। তুমি তো জানো আমি ওদের দুঃস্থ আত্মীয়, বেশী মেলামেশা নেই। শুনেছি রত্নাকে মধুপুর না গিরিডিতে নিয়ে গিয়ে রাখবার কথা হয়েছিল; কিন্তু রত্না রাজি হয়নি। —তোমার বোধহয় দেখা করা উচিত।'

বন্ধু চলিয়া যাইবার পর সোমনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই যে বছর দেড়েক আগে একটি ঝড়ের রাত্রে রত্না তাহার বাসায় রাত কাটাইয়াছিল, তারপর হইতে রত্নার কোনও খবরই সে রাখে না। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই; বিবাহ হইলে সোমনাথ নিশ্চয় খবর পাইত। হয়তো অসুখের জন্যই বিবাহ হয় নাই; নচেৎ বিবাহ না হইবার অন্য কোনও কারণ নাই। অসুখটা কী? বন্ধু যেন গুরুতর অসুখের ইসারা দিয়া গেলেন। তাহাকে দেখিতে যাওয়া কি সোমনাথের উচিত হইবে? রত্না সোমনাথের উপর বিরক্ত; হয়তো দেখা করিতে গেলে আরও উত্ত্যক্ত হইবে—

তবু সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সোমনাথ রত্নাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

জামাইবাবুর দাদা কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। বালীগঞ্জে তাঁহার সুদৃশ্য দ্বিতল উদ্যানমধ্যবর্তী বাড়িটি তাঁহার শ্রীসমৃদ্ধির সাক্ষী।

গৃহস্বামী বাড়ি ছিলেন না; দিদির জা মনোরমা দেবী সমাদর করিয়া তাহাকে বসাইলেন। তিনি স্থূলকায়া ও বহুভাষিণী; নচেৎ লোক ভাল।

'এস ভাই। অনেক দিন তোমায় দেখিনি; অবিশ্যি ছবিতে অনেকবার দেখেছি। কী সুন্দর ছবিই করেছ! কে ভেবেছিল তোমার পেটে এত আছে! তা—কবে এলে?'

সোমনাথ ভাসা-ভাসা উত্তর দিল। দু'চার কথার পর সে জিজ্ঞাসা করিল—'রত্না কেমন আছে?'

মনোরমা দেবী বলিলেন—'রত্নার শরীর ভাল যাচ্ছে না ভাই। সেই যে ও-বছর বর্ষার সময় বোম্বাই গিছল, সেখান থেকে ফিরে ওর শরীর খারাপ যাচ্ছে। তোমাদের বোম্বাই ভাল জায়গা নয়, যাই বল। কী রোগ যে নিয়ে এল, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে মেয়েটা। অথচ বাড়িতেই ডাক্তার; ওষধ-বিষুধ সবই খাওয়ানো হচ্ছে; কিন্তু কিছুতেই ওর শরীর সারছে না।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল—'রোগটা কি?'

মনোরম গলা খাটো করিয়া বলিলেন—'উনি তো প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন বুঝি টিবি; কিন্তু এক্স্‌রে করে কিছু পাওয়া যায়নি। ভগবানের দয়া। তবু খুব সাবধানে রেখেছি, বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ—বেশী চলাফেরা বারণ—'

'এখন সে বাড়িতে আছে তো?'

'ওমা, বাড়িতে আছে বৈকি! ওপরে আছে—ওর দাদা বেশী ওপর নীচে করা মানা করে দিয়েছেন। তা ও কি শোনে? মাঝে মাঝে নেমে আসে। তুমি এসেছ সাড়া পেলে হয়তো এখনি নেমে আসবে। তা তুমি ওপরেই যাও না ভাই। তুমি তো বাড়ির ছেলে। এখন না হয় মস্ত লোক হয়েছ, কাক-কোকিলে নাম জানে। যাও, ওপরে যাও, আমি তোমার চা জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দ্বিতলে গিয়া সোমনাথ একটি বন্ধ দরজায় টোকা দিল। ভিতর হইতে রত্নার গলা আসিল—'কে? ভেতরে এস।'

সোমনাথ দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মেয়েলি ছাঁদে সাজানো পরিপাটি কক্ষ। এটি রত্নার নিজস্ব ঘর।

পশ্চিম দিকের জানালার সম্মুখে বসিয়া সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় রত্না একখানা বই পড়িতেছিল। সোমনাথকে দেখিয়া সে সম্মোহিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। তাহার শীর্ণ মুখ হইতে রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা যেন আরও পাংশু দেখাইল।

সোমনাথ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আমাকে কি চিনতে পারছ না?'

'না, পারছি না। এস—বোসো।' কথাগুলি ব্যঙ্গোক্তি হইলেও রত্নার স্বর এত ক্ষীণ ও দুর্বল শুনাইল যে সোমনাথের বুকে তাহা সূক্ষ্ম শলাকার মত বিঁধিল।

দু'জনে একটি সোফায় বসিল। রত্না আরও কিছুক্ষণ সোমনাথের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'কি ভাগ্যি যে এলে! একেবারে ভুলে যাওনি তাহলে?'

সোমনাথ একথার উত্তর অনেক ভাবে দিতে পারিত, কিন্তু সে আবেগভরে বলিয়া উঠিল—'তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছ রত্না!'

রত্না হাসিল। তাহার শীর্ণ মুখে হাসি ভাল মানাইল না। কপাল হইতে একগুচ্ছ রুক্ষ চুল সরাইয়া সে বলিল—'ও কিছু নয়। তুমি কেমন আছ বল। হঠাৎ এ সময়ে কলকাতায় এলে যে! কাজকর্ম কি বন্ধ?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।'

রত্না উচ্চকিতভাবে চাহিল।

'সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ? ও—এবার কলকাতায় বাংলা ছবি করবে!'

সোমনাথ মাথা নাড়িল।

'না। সিনেমা করাই ছেড়ে দিয়েছি।'

রত্না নিশ্বাস রোধ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এই সময় একটি দাসী সোমনাথের জন্য চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। ঘরে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছিল, রত্না উঠিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। বলিল—'ঝি, আমার জন্যেও এক পেয়ালা চা নিয়ে এস।'

ঝি বলিল—'তোমার যে এখন ডাক্তারী দুধ খাবার সময় দিদিমণি।'

রত্না বিরক্ত হইয়া বলিল—'না, চা নিয়ে এস।'

ঝি চলিয়া গেল।

রত্না আবার গিয়া বসিল। সোমনাথ লক্ষ্য করিল রত্নার গালে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইয়াছে, চক্ষু দুটিও যেন চাপা উত্তেজনায় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। সে জলখাবারের রেকাবি টানিয়া আহারে মন দিল।

রত্না বলিল—'এর মানে? সিনেমায় তো বেশ টাকা পাচ্ছিলে।'

সোমনাথ বলিল—'ছেড়ে দেবার ওটাও একটা কারণ। এই তিন বছরে যা পেয়েছি তাতে বাকি জীবনটা চলে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রত্না বলিল—'সিনেমায় এত শিগ্‌গির তোমার অরুচি ধরে যাবে তা ভাবিনি। ও পথে যে যায় তাকে বড় একটা ফিরতে দেখা যায় না। তোমার এই বৈরাগ্যের অন্য কোনও কারণ আছে নাকি?'

সোমনাথ শান্তভাবে বলিল—'আছে। রুস্তমজি মারা গেলেন, সেটাও একটা কারণ। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

ঝি আসিয়া রত্নাকে চা দিয়া গেল। সোমনাথ নিজের চায়ের বাটি তুলিয়া লইয়া একটু হাসিল।

'আর একদিনের চা খাওয়ার কথা মনে পড়ে? বাইরে ঝড়ের মাতন, সমুদ্রের আফ্‌সানি, তার মধ্যে টর্চের আলো জেলে চা তৈরি করে খাওয়া?'

রত্নার মুখখানা ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন একরকম হইয়া গেল; তারপর সামলাইয়া লইল। বলিল—'আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ যে! বল না—তা ছাড়া কী?'

সোমনাথ ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—'কি হবে বলে? তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'তবু বলই না শুনি।'

নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া সোমনাথ বলিল—'ইদানীং ভয় হয়েছিল বুঝি তোমার কথাই ফলে যায়—'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ। তুমি দিদিকে একবার লিখেছিলে, আমি যখন সিনেমায় ঢুকেছি তখন আমার পতন অনিবার্য। ইদানীং আমারও সেই ভয় হয়েছিল। তাই—পালিয়ে এলাম।'

রত্নার পানে সসঙ্কোচে চোখ তুলিয়া সোমনাথ দেখিল, রত্নার করতলে চায়ের পেয়ালা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনি পড়িয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি পেয়ালা লইয়া সরাইয়া রাখিল। রত্নার মুখ আবার পাণ্ডাস বর্ণ ধারণ করিয়াছে—ঠোঁট দুটি অসম্ভব রকম কাঁপিতেছে।

'কি হল রত্না?'

রত্না প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করিল।

'কিছু না। আমার শরীরটা একটু—। মাঝে মাঝে অমন হয়। তুমি আজ এস গিয়ে।'

সোমনাথ ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসিক উত্তেজনা দুর্বল শরীরের পক্ষে ভাল নয়। সে বলিল—'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। বড়দিদিকে পাঠিয়ে দেব?'

'না না, তার দরকার নেই। আমি আপনিই ঠিক হয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

সোমনাথ দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে, পিছন হইতে রত্না ডাকিল—'শোনো।'

সোমনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'আবার আসবে তো?'

'আসব; কিন্তু—'

'কবে আসবে?'

সোমনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'কাল আমাকে বাইরে যেতে হবে। হপ্তা-খানেক পরে ফিরব। তারপর আসব।'

সন্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

তিন

কলিকাতায় আসিয়া সোমনাথ একটি মোটর-লঞ্চ কিনিয়াছিল। পরদিন সকালবেলা সে কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া লঞ্চে উঠিল; ভাগীরথীর আঁকা-বাঁকা পথে নৌকা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল।

এক হপ্তার মধ্যে ফিরিবার কথা, কিন্তু ফিরিতে সোমনাথের এগারো দিন লাগিল। যাহোক, কাজকর্ম সব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়াই সোমনাথ রত্নাদের বাড়ি গেল। আজ রত্নার দাদা বাড়িতে ছিলেন। বয়স্থ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, জামাইবাবুর মত রঙ্গ-রসিকতা বেশী করেন না; কিন্তু ভিতরে রস আছে; বর্ণচোরা আম।

দেবেশবাবু বলিলেন—'সেদিন এসেছিলে, দেখা হয়নি। এস তোমার সঙ্গে গল্প করি।' বলিয়া নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

দুজনে উপবিষ্ট হইলে দেবেশবাবু বলিলেন—'শুনলাম তুমি সিনেমা ছেড়ে দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'টাকা তো বেশ পাচ্ছিলে; নামও যথেষ্ট হয়েছে। তবে ছেড়ে দিলে যে। আর কি ভাল লাগল না?'

'আজ্ঞে না। সময় থাকতে ছাড়াই ভাল।'

দেবেশবাবু একটু হাসিলেন—'বেশ বেশ। কোনও জিনিসেই মোহ থাকা ভাল নয়।'

সোমনাথ নীরব রহিল। দেবেশবাবু তখন বলিলেন—'রত্না অনেক দিন ধরে ভুগছে। ও আমাদের বড় আদরের বোন; ভারি ভয় হয়েছিল। রোগটা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। এখন মনে হয় ধরেছি।'

সোমনাথ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। দেবেশবাবু উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন—'দেহের রোগ নয় মনের রোগ। সেদিন তুমি তাকে দেখে গিয়েছিলে তো, আজ আবার দেখলেই বুঝতে পারবে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, বোম্বাই থেকে ফিরে আসবার পরই তার রোগের সূত্রপাত হয়। মনের মধ্যে অনেকগুলো জট পাকিয়েছিল। যাহোক, এখন বোধহয় সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।'

সোমনাথ নিরুত্তর রহিল। দেবেশবাবু আবার আসিয়া বসিলেন; বলিলেন—'সোমনাথ, তুমি যদি রত্নাকে বিয়ে করতে চাও, আমাদের কোনও আপত্তিই হবে না; বরং আমরা খুব খুশি হব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল—

'আপনি বোধহয় জানেন না, আগে একবার এ প্রস্তাব হয়েছিল; কিন্তু রত্না—'

দেবেশবাবু বলিলেন—'রত্না বড় অভিমানী মেয়ে। সে সময় হয়তো ওর মনে ক্ষোভের কোনও কারণ হয়েছিল। যাহোক, সে সব কেটে গেছে।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—'ওর স্বভাব, যে জিনিস ও মনে মনে চায় প্রাণ গেলেও তা মুখ ফুটে চাইবে না। আমি জানতে পেরেছি, তোমাকেই ও বিয়ে করতে চায়। এখন তোমার হাত।'

সোমনাথ আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেবেশবাবু বলিলেন—'হ্যাঁ, যাও। রত্না ওপরেই আছে। মনে রেখো, রোগীকে অনেক সময় জোর করে ওষুধ খাওয়াতে হয়।' বলিয়া একটু হাসিলেন।

সোমনাথ উপরে গেল।

রত্নাকে দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল। এই কয় দিনে তাহার কী অপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে! শীতের শেষে পাতা ঝরিয়া লতা শুষ্ক শীর্ণ আকার ধারণ করে, আবার নব-কিশলয়ে তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া যায়। রত্নার মুখের সেই দৃঢ় অথচ সুকুমার ডৌল ফিরিয়া আসিয়াছে; গাল দুটিতে নব পল্লবের কোমল অরুণিমা।

রত্না নত হইয়া সোমনাথের পদধূলি লইল; একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—'সেদিন তোমাকে পেন্নাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

সোমনাথের হৃদ্‌যন্ত্র দুন্দুভির মত শব্দ করিতেছে; প্রথম যেদিন সে ক্যামেরা ও মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল সেদিনও এত ভয় হয় নাই; কিন্তু সে সংযতভাবে একটি গদিমোড়া চেয়ারে গিয়া বসিল; গম্ভীর মুখে বলিল—'ভুল সকলেই করে; কিন্তু সময়ে শুধরে নেওয়া চাই।'

রত্না তাহার প্রতি একটি চকিত দৃষ্টিপাত করিল; পরে সোফার এক কোণে বসিয়া বলিল—'এই বুঝি তোমার এক হপ্তা পরে আসা? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

সোমনাথ বলিল—'সোঁদরবনে।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল।

'সে কি! শিকারে গিয়েছিলে?'

'উহুঁ।'

'তবে?'

সোমনাথের স্নায়ুমণ্ডলী এতক্ষণে কিছু ধাতস্থ হইয়াছে, হৃদ্‌যন্ত্রও বেশী গণ্ডগোল করিতেছে না। সে উঠিয়া গিয়া সোফায় রত্নার পাশে বসিল।

'রত্না, তোমাকে একটা খবর দিই। আমি সুন্দরবনে পাঁচশো বিঘে জমি কিনেছি। খুব ভাল ধান জমি। আর কী সুন্দর জায়গা! চারদিকে নদী আর জঙ্গল। কলকাতা থেকে জলপথে চার ঘণ্টার রাস্তা। এবার সেইখানে বসে চাষবাস করব।'

রত্না যেন বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল; শেষে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—'চাষবাস করবে? কিন্তু—চাষবাসের তুমি কী জানো?'

'কিছু জানি না। যখন সিনেমা করতে গিয়েছিলাম তখন সিনেমার কিছুই জানতাম না। শিখেছি। এও শিখব। আমি ট্র্যাক্‌টর কিনেছি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করব। একটা মোটর-লঞ্চ কিনেছি, যখন ইচ্ছে হবে কলকাতায় চলে আসব।'

'কিন্তু চাষবাস কেন? অন্য কোনও কাজ কি করতে পারতে না?'

'আমি সৃষ্টি-ধর্মী কাজ করতে চাই। যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা অনেক বড় বড় সৃষ্টি করেন, তাঁদের সৃষ্টি দেশের সম্পদ। আমার প্রতিভা নেই, কিন্তু শস্য উৎপাদন তো করতে পারব। আমার পাঁচশো বিঘা জমিতে বছরে অন্তত পাঁচ হাজার মন ধান হবে। সব ধান আমি একলা খেতে পারব না, বেশীর ভাগই দেশের লোকের পেটে

যাবে। দেশের অন্ন-সম্পদ বাড়বে। সেটাই কি কম কথা?'

রত্না অনেকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সোমনাথ দেখিল তাহার মুখে শ্বেতাভা ও রক্তাভা পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে। সে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'আমি যা করতে যাচ্ছি তা কি তোমার ভাল লাগছে না?'

রত্না একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসিল; বলিল—'খুব ভাল লাগছে—'

উৎসাহিত হইয়া সোমনাথ বলিল—'আমি সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ি করাচ্ছি রত্না। মাত্র দুটি ঘর; তাদের ঘিরে বারান্দা। আর বাড়ি ঘিরে বাগান। কেমন, সুন্দর হবে না?'

'তা হবে; কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

রত্না নিজের চুড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—'তুমি সারা জীবন শহরে কাটিয়েছ, গত তিন বছর হাজার লোকের মধ্যে কাজ করেছ। দেশজোড়া তোমার সুখ্যাতি। এখন সব ছেড়ে দিয়ে ঐ বনে কি তোমার মন লাগবে?'

সোমনাথ রত্নার একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'লাগবে যদি একটি মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে।'

রত্না সোমনাথের মুঠি হইতে নিজের হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সোমনাথ হাত ছাড়িল না। তখন রত্না ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সোমনাথ বলিল—'কান্নাকাটি কিছু শুনব না। আমাকে বিয়ে করতে হবে; ঐ জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে। যদি রাজি না হও জোর করে ধরে নিয়ে যাব। তোমার দাদা কিছুই বলবেন না।'

রত্না বাঁ হাতে চোখ মুছিবার চেষ্টা করিয়া ভাঙা গলায় বলিল—'তুমি জানো না, আমার টিবি হয়েছে। দাদা মুখে বলেন না, কিন্তু আমি জানি।'

সোমনাথ তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—'তুমি কিছু জানো না। তোমার যা হয়েছে তা দাদা আমাকে বলেছেন। দেহের রোগ নয়, মনের রোগ। মনে মনে প্রেম, আর মুখে ঝগড়া করলে ঐ রোগ হয়। বুঝলে?—যাহোক, ঠিক সময়ে ওষুধ পড়েছে, এবার আর রোগ থাকবে না। ওষুধ যে ধরেছে তার লক্ষণও এরি মধ্যে দেখা যাচ্ছে—' বলিয়া তাহার গালে আঙুলের মৃদু টোকা দিল।

মেয়েরা সময় বিশেষে কাঁদিয়া বড় আনন্দ পায়। রত্না প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল—'কাল সকালেই দিদিকে 'তার' করতে হবে। দিদি আর জামাইবাবু যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ কিছুই হবে না।'

চার

ফুলশয্যার রাত্রে ঘর অন্ধকার করিয়া দুজনে শুইয়াছিল। মধ্যরাত্রির পর বাড়ি নিস্তব্ধ হইয়াছে; ফুলের গন্ধে রুদ্ধশ্বাস বাতাস নিঃশব্দ সঞ্চারে জানালা দিয়া যাতায়াত করিতেছে। আকাশের খণ্ডচন্দ্র অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে।

অন্ধকারে রত্নার একটা হাত সোমনাথের বুকে আসিয়া পড়িল। রত্না মৃদুস্বরে বলিল—'তুমি আমাকে বড্ড জ্বালিয়েছ।'

সোমনাথ তাহার হাত মুঠিতে লইয়া বলিল—'আমি জ্বালিয়েছি; তা তো বটেই। —আচ্ছা রত্না, কবে তোমার এই দুর্বুদ্ধি হল, মানে, কবে তুমি আমাকে ভালবাসলে ঠিক করে বল তো।'

'দশ বছর বয়সে।'

'উঃ কী পাকা মেয়ে!'

'মেজদার বিয়ের ফুলশয্যার দিন তোমাকে দেখি, তুমি বৌদির সঙ্গে এসেছিলে। সেই দিনই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।'

'প্রথম দর্শনেই এত! তারপর।'

'তারপর আট বছর অপেক্ষা করলাম। ঠিক করেছিলাম আই.এ. পর্যন্ত পড়ব তারপর বিয়ে। যখন বিয়ের সময় হল তখন দেখি তুমি সিনেমায় ঢুকে পড়েছ।'

'তাতেই বুঝি মেজাজ বিগড়ে গেল?'

'বোম্বাই এলাম নিজের চোখে দেখতে। যা দেখলাম তাতে মন আরও বিষিয়ে গেল। তারপর এই তিন বছর যে আমার কি করে কেটেছে তা আমিই জানি।'

সোমনাথ বলিল—'আমার ওপর যদি তোমার মন বিষিয়েই গিয়েছিল তবে লুকিয়ে আমার ছবি দেখতে কেন?'

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। ছবিতে তোমাকে দেখতাম আর ভাবতাম—তুমি কি ভাল আছ? নষ্ট হয়ে যাওনি? —সেবার সেই ঝড়ের রাত্রে গিয়ে পৌঁছুলাম; সে রাতটা ভুলব না—'

সোমনাথ বলিল—'আমিও না।'

রত্না বলিতে লাগিল—'সে-রাত্রে যদি তুমি আমাকে চাইতে আমি বোধহয় না বলতে পারতাম না; কিন্তু তুমি ও দিক দিয়ে গেলে না। আমি কি করব? আমি কি বলব, ওগো তুমি আমায় বিয়ে কর?'

'তাহলে সে-রাত্রে আর তোমার সন্দেহ ছিল না?'

'সন্দেহ যায়নি; কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম ভাল হও মন্দ হও তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

সোমনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল।

'এখন সন্দেহ গেছে তো?'

রত্না তাহার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সোমনাথ বলিল—'রত্না, আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যেতাম, যদি তুমি আমার মনের মধ্যে না থাকতে। তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ।'

তারপর দীর্ঘকাল আর কোনও কথা হইল না। স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনের মধ্যে চোখ বুজিয়া রত্না ভাবিতে লাগিল, পূর্ব জন্মে কোন্ পুণ্য করিলে মানুষ এত সুখ অনুভব করে?

একটি মোটর-লঞ্চ নদীর রবিকরোজ্জ্বল বুক চিরিয়া দক্ষিণ মুখে চলিয়াছে! নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে; যেন উড়িয়া চলিয়াছে।

দুই তীরের নগর পিছনে পড়িয়া রহিল; গ্রামগুলি কিছু দূর আসিয়া থামিয়া গেল। কেবল রহিল উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ আর নীচে সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমি।

নদী ক্রমে সপ্তমুখী হইল; আঁকিয়া বাঁকিয়া শাখা বিস্তার করিয়া গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিল। ক্ষিপ্রবেগা তরণী তাহারই পাকে পাকে পথ চিনিয়া চলিয়াছে; যেন বন-কপোত নিজ নীড়ের সন্ধানে উড়িয়া যাইতেছে। অতি নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র একটি নীড়, সেই নীড়ে সে ফিরিবে—তাহাতে কেবল দুইটি পাখির স্থান—

চারিদিকে আলো ও ছায়ার লুকোচুরি। কোথাও আলো বেশী, ছায়া কম; কোথাও আলো কম ছায়া বেশী। আলোতে ছায়াতে মিলিয়া বিচিত্র চঞ্চল ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে।

অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিবে।

অভিসার

আরম্ভ

ঝুম ঝুম করিয়া নূপুর বাজিতেছে।

কৃষ্ণবর্ণ চিত্রপটের উপর একটি প্রদীপের শিখা দেখা দিল। প্রদীপ শিখাটি ধীরে ধীরে নড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই আলোকে চিত্রপটে লিখিত হইল—

'অভিসার'

সম্পূর্ণ লিখিত হইবার পর বাতাসে আলোর শিখা কাঁপিতে লাগিল; তারপর সহসা নিবিয়া গেল।

নূপুর ধ্বনি চলিতেছে।

ফেড্ ইন্।

ক্যামেরার চক্ষু ধীরে ধীরে খুলিতেছে।

ক্লোজ্ শট্।

রাত্রিকাল। কেবল একটি অতি সুন্দর রমণীর মুখ প্রদীপের আলোকে দেখা যাইতেছে। রমণী আলোর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ক্যামেরার চক্ষু পূর্ণ খুলিয়া গেল।

শয়ন কক্ষ। রমণী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে। উর্ধ্বাঙ্গে কেবলমাত্র কাঁচুলি; কটিতটে নীলাম্বর। বাহু ও কবরীতে পুষ্পভূষা। একটি বিগতযৌবনা কিন্তু সুশ্রী দাসী নতজানু হইয়া রমণীর পায়ে নূপুর পরাইয়া দিতেছে। দাসীর মুখের পার্শ্বভাগ দেখা যাইতেছে।

দাসীঃ (নূপুর পরাইতে পরাইতে) এই শ্রাবণ মাসের রাত্রে অভিসার! বলিহারি যাই।

রমণী শয্যা হইতে একটি স্বর্ণ-মুকুর তুলিয়া লইয়া নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে মৃদু হাসিল।

রমণীঃ এই তো অভিসারের সময়—

(সুরে) কাজর-রুচিহর রয়ণী বিশালা
তছু পর অভিসার করু নব বালা।

দাসী নূপুর পরানো শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিড্ ক্লোজ্ শট্।

দাসীর মুখের সম্মুখ ও রমণীর মুখের পার্শ্ব দেখা যাইতেছে। তাহাদের মধ্য-স্থলে দীপদণ্ডে প্রদীপ।

দাসী হাত নাড়িয়া কপট তিরস্কারের সুরে বলিল—

দাসীঃ তা যেন বুঝলুম। কিন্তু তুমি রাজনটী বাসবদত্তা, তোমার অভিসারে যাবার দরকারটা কী শুনি? এম্‌নিতেই তো মথুরার নবীন নাগরিকেরা অষ্টপ্রহর তোমার দোরে ধরণা দিচ্ছে—

বাসবদত্তাঃ তাদের উপর অরুচি ধরে গেছে।—আমার উর্ণা দে—

দাসী বাহির হইয়া গেল।

বাসবদত্তাঃ চিরকাল সবাই আমাকে চেয়েছে, আমার পায়ে লুটিয়েছে—(অরুচি-সূচক মুখভঙ্গী করিয়া) ওদের আর সইতে পারি না—

বাসবদত্তা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাসী বাসবদত্তার পিছন দিক হইতে প্রবেশ করিল এবং একটি চুম্‌কিদার কালো ওড়না তাহার গায়ে জড়াইয়া দিতে লাগিল।

ক্লোজ্ শট্। বাসবদত্তার সম্মুখ হইতে।

বাসবদত্তাঃ (দীপের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) তাই আজ অভিসারে চলেছি—দেখি এমন লোক আছে কিনা যাকে আমার মন চায়—

ক্লোজ্ আপ্।

বাসবদত্তা দীপদণ্ড হইতে দীপ তুলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে লইল। পিছনের আধা-অন্ধকারে দাসীর অস্পষ্ট মুখ দেখা যাইতেছে।

দাসীঃ ও, তাই বল। তা—নতুন মানুষটি কে?

মিড্ শট্। সম্মুখ হইতে।

বাসবদত্তা। জানি না। তাঁকে খোঁজবার জন্যেই তো এই অভিসার—

প্রদীপ লইয়া বাসবদত্তা ধীরপদে অগ্রসর হইল। ক্যামেরা পিছাইতে লাগিল।

নূপুরের ঝুম ঝুম শব্দ।

ডিজল্ভ্।

নূপুরের শব্দ চলিতেছে।

লং শট্—উপর হইতে।

রাত্রি। মথুরার একটি সংকীর্ণ পথ। আশে পাশের উচ্চ অট্টালিকা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাসবদত্তা প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে আসিতেছে।

মিড্ শট্। সমতল হইতে।

পথের একটি মোড়। বাসবদত্তা মোড় ঘুরিয়া চলিয়াছে।

ট্র্যাক্। ক্যামেরা বাসবদত্তার পাশে পাশে।

তাহার চোখের দৃষ্টি চঞ্চল ও সাগ্রহ। সে চতুর্দিকে কুতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

সহসা নেপথ্যে শানাইয়ের সুরে বেহাগ বাজিয়া উঠিল। বাসবদত্তা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া ঊর্ধ্বে চাহিল।

মিড্ লং শট্। নিম্ন হইতে।

তোরণ শীর্ষ। এক প্রহরী দাঁড়াইয়া শানাই বাজাইতেছে। শানাইয়ের শব্দ।

ক্লোজ্ শট্। সম্মুখ হইতে।

প্রহরীর মুখে দ্বিধা-বিভক্ত গালপাট্টা দাড়ি। শানাইয়ে একপদ বাজাইয়া প্রহরী

তাহার সম্মুখস্থিত বালু-ঘটিকা উল্টাইয়া বসাইয়া দিল। তারপর পিছন ফিরিতে গিয়া নিম্নাভিমুখে তাহার দৃষ্টি পড়িল। রেলিংয়ের উপর ঈষৎ ঝুঁকিয়া প্রহরী ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিল।

মিড্ লং শট্। নীচের দিকে তোরণ হইতে।

প্রহরীর পিঠ ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ অতিক্রম করিয়া নিম্নে পথের উপর বাসবদত্তা দীপহস্তে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া আছে, দেখা যাইতেছে।

প্রহরীঃ (গম্ভীরকণ্ঠে) মধ্য রাত্রির প্রহর বাজল; এত রাত্রে কে যায়?
বাসবদত্তাঃ (গর্বিতস্বরে) বাসবদত্তা।

ক্লোজ্ শট্। সম্মুখ হইতে।

প্রহরী সবিস্ময়ে সম্মুখে ঝুঁকিয়া দেখিল। তাহার দাড়ির মধ্যে হাসি দেখা দিল।
প্রহরীঃ নগরনটি, এত রাত্রে কোথায় যাও?

মিড্ ক্লোজ্ শট্। ঈষৎ পার্শ্ব হইতে।

বাসবদত্তা অবজ্ঞাস্ফুরিত অধরভঙ্গী করিল।
বাসবদত্তাঃ অভিসারে।
বাসবদত্তা চলিতে আরম্ভ করিল। নূপুরের শব্দ।

ডিজল্ভ্।

লং শট্।

রাত্রি। সম্মুখে মথুরাপুরীর প্রাকার দেখা যাইতেছে।

মিড্ শট্—ট্র্যাক্—ক্লোজ্ শট্।

প্রাকারের এক অংশ। পশ্চাৎপটে প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর ঊর্ধ্বে ফ্রেমের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। একটি তরুণ ভিক্ষু প্রাকারতলে মাটিতে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার মাথা বাহুর উপর ন্যস্ত; পাশে দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র।
ক্রমে দূর হইতে নূপুরের শব্দ আসিতে লাগিল।

লং শট্—ক্রমে মিড্ লং শট্।

প্রাকারের পার্শ্ব হইতে সমান্তরালে। দূরে দীপ হস্তে বাসবদত্তা আসিতেছে। দীপের প্রভায় বাসবদত্তার মুখ ও পার্শ্বের প্রাচীর আলোকিত।

মিড্ শট্।

প্রাকার গাত্রে বাসবদত্তার ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া সঞ্চারমান। নূপুরের শব্দ স্পষ্টতর।

ক্লোজ্ শট্।

বাসবদত্তার পার্শ্ব হইতে। পশ্চাৎপটে প্রাকারের নিম্নাংশ। বাসবদত্তার সঞ্চারমান পদযুগল মাত্র দেখা যাইতেছে। পদসঞ্চারের তালে নূপুর ধ্বনি।
পদযুগল থামিল; যেন নিকটতর—পায়ে কিছু ফুটিয়াছে। ক্যামেরা স্থির; সামান্য উপর দিকে উঠিয়া বাসবদত্তার নিতম্ব পর্যন্ত প্রকাশ করিল। সে সম্মুখে অবনত হইয়া

পা হইতে কাঁটা তুলিয়া ফেলিয়া দিল। নত অবস্থায় তাহার সমগ্র দেহ ও মুখের পাশ দেখা গেল।

আবার পদযুগল চলিতে লাগিল।

ক্লোজ্ শট্।

পশ্চাৎপটে প্রাকারের নিম্নাংশ। ভিক্ষু পূর্ববৎ ঘুমাইতেছে। নূপুর ধ্বনি কাছে আসিতেছে।

ট্র্যাক্। ক্যামেরা মিড্ শটে পিছাইয়া গেল।

বাসবদত্তা সুপ্ত ভিক্ষুর দিকে অগ্রসর। দীপের নীচে অন্ধকার; বাসবদত্তা সম্মুখস্থ ভূমির উপর কিছু দেখিতে পাইতেছে না; তাহার দৃষ্টি চক্ষুর সমান্তরালে।

বাসবদত্তার পা ভিক্ষুর বক্ষে ঠেকিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপ নত করিয়া নিম্নে চাহিল।

ক্লোজ্ আপ্।

বাসবদত্তা নিম্নে তাকাইয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার মুখ বিস্ময়পূর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ক্লোজ্ শট্।

বাসবদত্তা ভিক্ষুর পাশে নতজানু হইয়া বসিল; তারপর প্রদীপ তাঁহার মুখের একান্ত নিকটে লইয়া গিয়া হর্ষোৎফুল্ল একাগ্র দৃষ্টিতে তাঁহার কমনীয় কান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ক্লোজ্ আপ্।

ভিক্ষু ও বাসবদত্তার মুখ। ভিক্ষুর চক্ষু মুদিত। বাসবদত্তার চক্ষে লুব্ধ কামনা।

ভিক্ষু ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিলেন। দীপের আলোয় তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল; তিনি চক্ষের সম্মুখে হস্ত সঞ্চালন করিলেন।

মিড্ ক্লোজ্ শট্।

ভিক্ষু এক কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঠিয়া ঈষৎ বিস্ময় মিশ্রিত প্রীতির চক্ষে বাসবদত্তার পানে চাহিলেন। বাসবদত্তার অপূর্ব যৌবনশ্রী দেখিয়া প্রশান্ত আনন্দে তাঁহার মুখ ভরিয়া গেল।

ভিক্ষুঃ দেবি, কে আপনি?

ক্লোজ্ শট্।

ভিক্ষু ও বাসবদত্তা পূর্ববৎ। বাসবদত্তা লজ্জা ও বিভ্রমের অভিনয় করিয়া চক্ষু নত করিল।

বাসবদত্তাঃ আমি রাজনটী বাসবদত্তা। (চক্ষু তুলিয়া) আমাকে ক্ষমা করুন কুমার—না জেনে আপনার অঙ্গে পদস্পর্শ করেছি—

ভিক্ষুঃ (উঠিয়া বসিয়া সহাস্যে) তাতে কোনও অপরাধ হয়নি কল্যাণী। আমি ভিক্ষু—আমার নাম উপগুপ্ত—(বাসবদত্তার সাজসজ্জা দেখিয়া মৃদু হাস্যে)—মনে হচ্ছে নগরলক্ষ্মী আজ কোনও ভাগ্যবানের উদ্দেশ্যে অভিসারে চলেছেন।

বাসবদত্তা লীলাবিলাস সহকারে উপগুপ্তের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

বাসবদত্তাঃ কুমার, ধূলাতে যদি কেউ মাণিক কুড়িয়ে পায়, সে কি আর ধন রত্নের সন্ধান করে? এই কঠিন কঠোর ধরণীতল আপনার উপযুক্ত শয্যা নয়, কুমার। দয়া করে আমার গৃহে চলুন—

মিড্ শট্।

উপগুপ্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাসবদত্তাও দাঁড়াইল—তাহার মুখ আশায় উজ্জ্বল। উপগুপ্ত কিছুক্ষণ স্নিগ্ধচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

উপগুপ্তঃ আমি বুদ্ধের ভিক্ষু-ব্রহ্মচারী—

বাসবদত্তার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল; ত্বরিত-হস্তে সে উপগুপ্তের বাহুর উপর হাত রাখিল।

ক্লোজ্ আপ্।

উপগুপ্ত ধীরে ধীরে নিজ বাহু বাসবদত্তার হস্তমুক্ত করিলেন; তাহার মুখের পানে চাহিয়া করুণ সদয় কণ্ঠে কহিলেন—

উপগুপ্তঃ লাবণ্যময়ি, এখনও আমার সময় হয়নি। আজ তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও—যে দিন সময় আসবে আমি আপনি তোমার—(ঈষৎ হাস্য)—

মিড্ শট্।

উপগুপ্তঃ কুঞ্জে যাব।

উপগুপ্ত নত হইয়া দণ্ড ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া লইলেন।

বাসবদত্তা ব্যগ্র ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। ভিক্ষু চলিবার উপক্রম করিয়া পার্শ্বে ফিরিলেন।

বাসবদত্তার বামহস্তে প্রদীপ সহসা নিবিয়া গেল। বাসবদত্তা চকিতে প্রদীপের পানে তাকাইয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র বিদ্যুতের প্রভায় তাহার মুখ যেন ঝলসিয়া গেল।

আকাশের শট্।

অন্ধকার; পরে বিদ্যুৎ চমক।

মেঘ গর্জন করিয়া উঠিল। বাতাসের হা হা ধ্বনি। সব মিলিয়া একটা ব্যঙ্গের অট্টহাসির মত শব্দ।

মিড্ লং শট্।

বৃষ্টি পড়িতেছে; বিদ্যুৎ চমকিতেছে; মেঘ গর্জন করিতেছে। বাসবদত্তা একাকী। সে ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহার সিক্ত বস্ত্র এলোমেলো বাতাসে উড়িতেছে।

বিদ্যুতের সবিশ্রাম আলোকে এই দৃশ্য পরিস্ফুট হইবে।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

দ্রুত চটুল সঙ্গীতের সুর।

মিড্ শট্।

দিন। প্রমোদ উদ্যানের এক অংশ; অগণিত বসন্তকালীন ফুল ফুটিয়া আছে। ভ্রমর উড়িয়া বেড়াইতেছে।

সঙ্গীতের সুর চলিতেছে। ক্রমে তাহাতে গানের কণ্ঠ মিলিল।

'এল বসন্ত সুন্দর—মরি মরি—'

মিড্‌ শট্‌।

প্রমোদ উদ্যানের অপর অংশ। একদল যুবতী গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে ও আবীর খেলিতেছে।

গীত

"এল বসন্ত সুন্দর—মরি মরি!
আবীর কুঙ্কুমের রঙিগল অন্তর—মরি মরি!
কিংশুক ফুল্লমুখী—পঙ্কজ তুল্যমুখী
মধু মলয় বায়ে ফুল-শরের ঘায়ে
তনু চঞ্চল থর থর—মরি মরি।"

ক্লোজ্‌ শট্‌।

যুবক যুবতীগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

ক্লোজ্‌ শট্‌। ভিন্ন দিক হইতে।

ঐ।

সহসা নেপথ্যে পটহ-ধ্বনি হইল। যুবক যুবতীগণ অর্ধপথে থামিয়া নেপথ্যে চাহিল। পটহ থামিল। পটহ বাদকের স্বর শুনা গেল।

পটহ বাদকরে স্বরঃ সাবধান! চৈত্রমাসে নগরে গুটিকারোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে—রাজপুরুষের আজ্ঞা এই যে—

মিড্‌ শট্‌।

পটহ বাদক প্রমোদ উদ্যানের পার্শ্বের পথ দিয়া চলিয়াছে। তাহার বক্ষের উপর কণ্ঠসংলগ্ন পটহ ঝুলিতেছে। দুই হস্তে পটহ দণ্ড। কয়েকজন কৌতূহলী পথচারী তাহার পশ্চাৎ চলিয়াছে।

পটহ বাদকঃ যে কোনও নাগরিক-নাগরিকা গুটিকা রোগে আক্রান্ত হবে, তাকে তৎক্ষণাৎ নগর বাহিরে পরিখার অপর পারে নিক্ষেপ করা হবে।—রোগ সংক্রামক।

ক্লোজ্‌ শট্‌।

নৃত্যপর যুবক যুবতীগণ দাঁড়াইয়া শুনিতেছে।

পটহ বাদকের স্বরঃ নগরবাসিগণ, সাবধান!

পটহের শব্দ হইল। যুবক যুবতীগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিল। তারপর তাচ্ছল্যসূচক উচ্চ হাসিয়া আবার নৃত্যগীত আরম্ভ করিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

লং শট্‌।

দিন। মথুরার একটি পথ। লোক চলাচল অল্প। চারিজন বাহক একটি মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেল। পথচারিগণ স্পর্শ বাঁচাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

মিড্ লং শট্।

ঐ পথ। পাশের একটি বাড়ি হইতে একটি জীবন্ত বসন্ত রোগীকে কয়েকজন লোক ধরাধরি করিয়া বাহির করিল। রোগী কাতরোক্তি করিতেছে। তাহাকে চালির উপর শোয়াইয়া বাহকগণ তুলিবার উদ্যোগ করিল।

ডিজল্‌ভ্।

মিড্ লং শট্।

পথের উপর একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখভাগ। প্রবেশ দ্বারের উপরে ব্যাল্‌কনি।

রুদ্ধ প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে চার-পাঁচজন বিলাসী যুবক সমবেত হইয়াছে। তাহারা দ্বারে ধাক্কা দিতেছে।

মিড্ ক্লোজ্ শট্।

দ্বারের সম্মুখে যুবকগণ। একজন ধাক্কা দিতেছে।

১ঃ দোর খোলো! দোর খোলো! (সকলের দিকে ফিরিয়া) এ কী! আজ হল কী?

২ঃ আজ মদনোৎসব, আর আজই বাসবদত্তার দোর বন্ধ! অ্যাঁ। কালে কালে হল কি!

৩ঃ আরো জোরে ধাক্কা লাগাও—

মিড্ শট্।

ঐ দৃশ্য। উপরের ব্যাল্‌কনি দেখা যাইতেছে। সম্মুখে যুবকগণ ধাক্কা দিয়া চীৎকার করিতেছে। উপরে ব্যাল্‌কনিতে দাসী প্রবেশ করিল। দাসীর মুখ ভয়-বিকৃত; অঙ্গে বেশভূষা নাই। দাসী নিম্নে চাহিল।

দাসীঃ কে—?

যুবকগণ পিছু হইয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল।

ক্লোজ্ শট্ সম্মুখ হইতে।

যুবকগণ ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া আছে।

২ঃ এই যে! এতক্ষণে কিঙ্করী ঠাকরুণ দেখা দিয়েছেন!

১ঃ কি—ব্যাপার কি? আজ কি সারাক্ষণ আমরা দরজাতে ধাক্কা মারব?

ক্লোজ্ শট্।

ব্যাল্‌কনির উপর দাসী। সে দুই হস্ত পরস্পর মর্দিত করিয়া ভয় ও ব্যাকুলতা ব্যক্ত করিল।

দাসীঃ আর্যা গৃহে নাই—

ক্লোজ্ শট্।

ঊর্ধ্বমুখ যুবকগণ। সকলের মুখ ব্যাদিত হইল।

১ঃ গৃহে নাই! গেল কোথায়?

মিড্ ক্লোজ্ শট্।

দাসী শঙ্কিতচক্ষে সম্মুখে দূর সমান্তরালে চাহিল। তার পর দৃষ্টি নত করিয়া স্খলিতস্বরে কহিল—

দাসীঃ ঐখানে নগর পরিখার বাইরে...

দাসী সম্মুখে করাঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

ক্লোজ্ শট্।

যুবকগণ দৃষ্টি নামাইয়া পরস্পর তাকাইল; তারপর যেন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছে এমনিভাবে সভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইল।

লং শট্।

বাসবদত্তার গৃহসম্মুখ হইতে যুবকগণ দ্রুত প্রস্থান করিতেছে।

ডিজল্ভ্।

বাঁশী বাজিতেছে। মৃদু আবহ যন্ত্রসঙ্গীত।

আকাশের শট্।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

লং শট্।

একটি চন্দ্রালোকিত দীর্ঘ বীথি-পথ। কোকিল ডাকিতেছে। পথ নির্জন। দূরাগত উৎসবের শব্দ।

পথের অপর প্রান্তে একটি মনুষ্যমূর্তি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; তাহার হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু; ভিক্ষুর বেশ।

মিড্ শট্।

ভিক্ষু উপগুপ্তঃ উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাঁহার মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি সম্মুখে চাহিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছেন। দূরাগত উৎসবের শব্দ।

ডিজল্ভ্।

মিড্ শট্।

রাত্রি। মথুরার সিংহদ্বার—নগরীর অভ্যন্তর হইতে। মুক্ত তোরণ পথের ভিতর দিয়া বাহিরের আম্র-কানন দেখা যাইতেছে। দ্বারে প্রতিহার নাই। নিঃশব্দ।

উপগুপ্ত প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিঠ ক্যামেরার দিকে। তিনি তোরণ পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন।

ক্যামেরা সম্মুখে কিছুদূর ট্র্যাক করিল।

তোরণের ভিতর দিয়া আম্র-কানন আরও নিকটেই দেখা গেল।

মিড্ লং শট্।

আম্র-কানন। তোরণ দ্বারের বাহির হইতে।
উপরে চন্দ্রালোক, ভিতরে অন্ধকার।
করুণ অথচ দ্রুত আবহ যন্ত্রসঙ্গীত আরম্ভ হইল।

মিড্ শট্।

আম্র-কাননের অভ্যন্তর। চারিদিকে তরুচ্ছায়ায় অন্ধকার; মধ্যস্থলে কিছুস্থান চন্দ্রকরে আলোকিত। ঐ স্থানে বাসবদত্তা পড়িয়া আছে। তাহার শয়নের ভঙ্গী পূর্ব দৃশ্যে ভিক্ষু উপগুপ্তের শয়নভঙ্গীর স্মারক। বাসবদত্তা মাঝে মাঝে হস্ত উৎক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে।

ক্ষীণ কাতরোক্তি। আবহসঙ্গীত চলিতেছে।

ক্লোজ্ আপ্।

ভূলুণ্ঠিতা বাসবদত্তা। তাহার মুখ ও দেহ বসন্তের গুটিকায় ভরিয়া গিয়াছে। সে বাহুতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পড়িয়া গেল।

বাসবদত্তাঃ (ক্ষীণ স্বরে) জল—জল—

পশ্চাৎ হইতে উপগুপ্ত প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কটি পর্যন্ত নিম্নাঙ্গ ও হস্ত-ধৃত দণ্ড কমণ্ডলু দেখা গেল।

বাসবদত্তা ভিক্ষুর আগমন জানিতে পারিল না।

আবহসঙ্গীত চলিতেছে।

ক্লোজ্ শট্।

উপগুপ্ত ও বাসবদত্তা।

উপগুপ্ত বাসবদত্তার শিয়রে বসিলেন ও তাহার আড়ষ্ট শির সযত্নে নিজ অঙ্গে তুলিয়া লইলেন। বাসবদত্তা ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিল।

উপগুপ্তঃ জল পান কর বাসবদত্তা—

উপগুপ্ত জলপূর্ণ কমণ্ডলু তাহার মুখে ধরিলেন।

ক্লোজ্ আপ্।

বাসবদত্তা জল পান করিতেছে। উপগুপ্ত সস্নেহে তাহার মস্তকে ডান হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তাঁহার অধরোষ্ঠ নড়িতেছে; যেন তিনি অস্ফুটস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বাসবদত্তা জলপান শেষ করিল। তাহার মস্তক আবার ভিক্ষুর ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িল।

ক্লোজ্ শট্।

কমণ্ডলু রাখিয়া ভিক্ষু নিজ বস্ত্রান্তরাল হইতে চন্দনপঙ্ক বাহির করিয়া বাসবদত্তার মুখে হস্তে লেপিয়া দিতে লাগিলেন। বাসবদত্তা স্থির অপলক নেত্রে ভিক্ষুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখের কোণ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বাসবদত্তাঃ (স্খলিতস্বরে) কে তুমি দয়াময়?

ক্লোজ্ আপ্।

ভিক্ষু ও বাসবদত্তার মুখ।

ভিক্ষু স্নিগ্ধ সহাস্য দৃষ্টিতে বাসবদত্তার পানে চাহিয়া আছেন।

উপগুপ্তঃ আমি ভিক্ষু উপগুপ্ত। বলেছিলাম, সময় হলে আসব, তাই আজ তোমার কুঞ্জে এসেছি বাসবদত্তা—

ভিক্ষু গম্ভীর মুখে বাসবদত্তার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিলেন।

ক্লোজ্ শট্।

ভিক্ষু বৈরাগ্যপূর্ণ গভীর উদাত্তকণ্ঠে বলিলেন—

উপগুপ্তঃ বল—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি

বাসবদত্তাঃ (কম্পিতস্বরে) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ফেড্ আউট্।